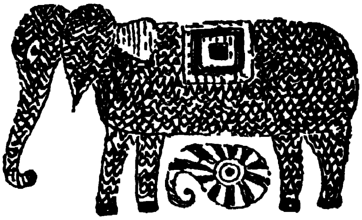
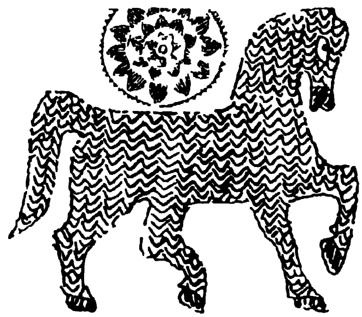


অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

দেখা হয় নাই



আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড

প্রকাশক : শ্রীফণিভূষণ দেব
আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
৪৫ বেনিয়াটোলা লেন
কলিকাতা ৯

মুদ্রক : শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ বসু
আনন্দ প্রেস এন্ড পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড
পি-২৪৮ সি. আই. টি. স্কীম নং ৬ এম
কলিকাতা ৫৪

প্রথম সংস্করণ : ১ বৈশাখ ১৩৫৪

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ : পূর্ণেন্দু পত্রী

আলোকচিত্র : লেখক কর্তৃক গৃহীত ও পরিস্ফুটিত

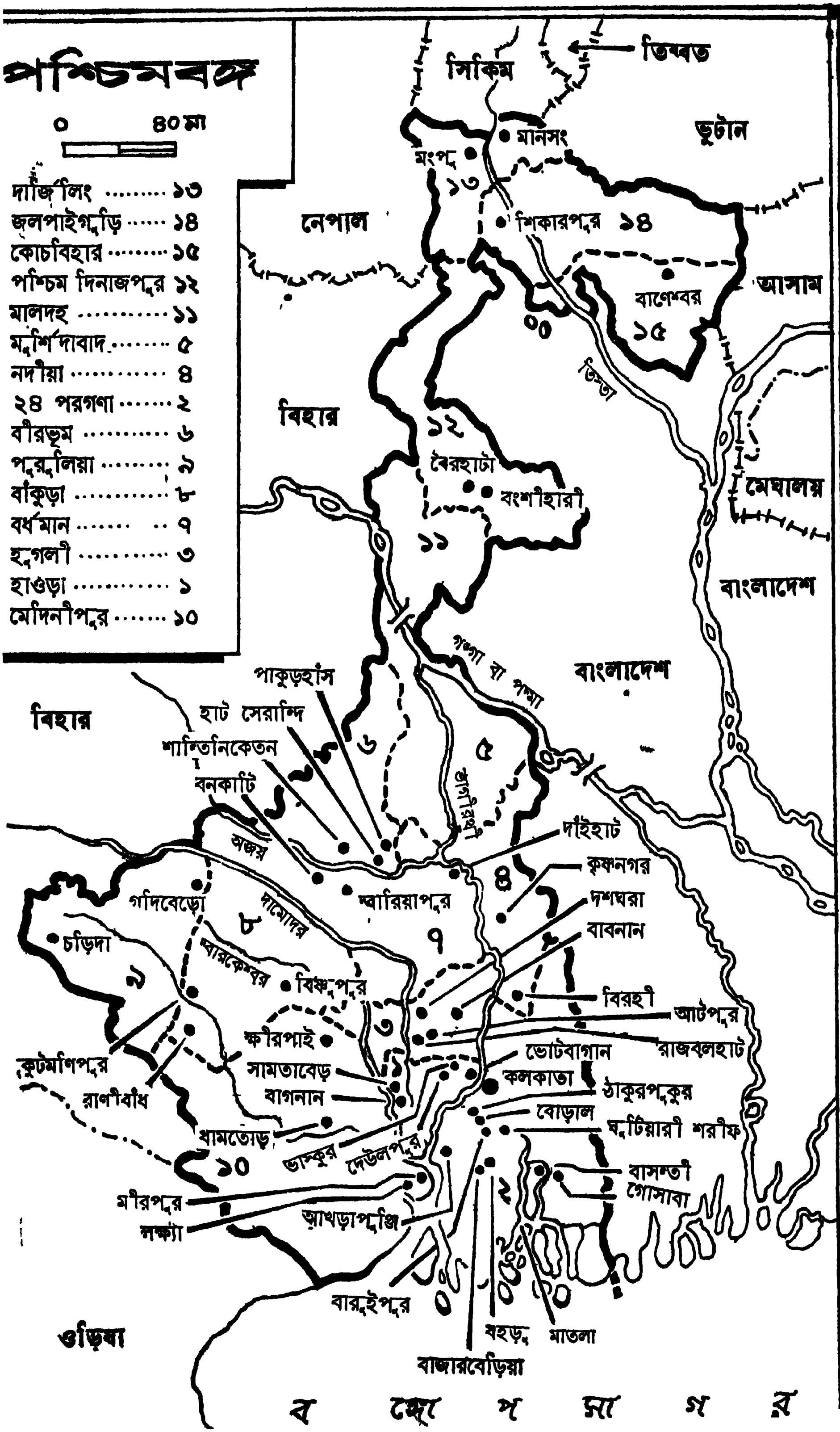
মানচিত্র : অর্দ্ধেন্দু দত্ত

মূল্য : কুড়ি টাকা

খ্যাতি বা পুরস্কারকামনার ঊর্ধ্বে, যাঁরা স্বেচ্ছায় উভয় বাংলার গ্রাম-গ্রামান্তরে চিন্ময় বঙ্গের মহৈশ্বর্যসন্ধানে ব্যাপৃত, সেই অকীর্তিত, আদর্শবাদী, দেশপ্রেমী গবেষকদের উদ্দেশে

সূচীপত্র

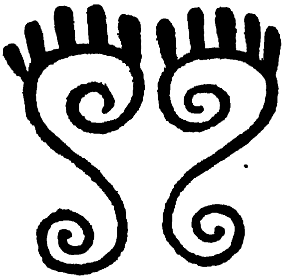
সূচীপত্র


পশ্চিমবঙ্গ
০ ৪০ মা
দার্জিলিং ১৩
জলপাইগুড়ি ১৪
কোচবিহার ১৫
পশ্চিম দিনাজপুর ১২
মালদহ ১১
মুর্শিদাবাদ ৫
নদীয়া ৪
২৪ পরগণা ২
বীরভূম ৬
পুরুলিয়া ৯
বাঁকুড়া ৮
বর্ধমান ৭
হুগলী ৩
হাওড়া ১
মেদিনীপুর ১০
সিকিম
তিব্বত
ভুটান
মানসং
মংপু
নেপাল
শিকারপুর
বাণেশ্বর
আসাম
তিস্তা
বিহার
বৈরহাট্টা
বংশীহারী
মেঘালয়
বাংলাদেশ
গঙ্গা বা পদ্মা
পাকুড়হাঁস
হাট সেরান্দি
শান্তিনিকেতন
বনকাটি
ভাগীরথী
অজয়
দাঁইহাট
কৃষ্ণনগর
দশঘরা
বাবনান
গদিবেড়ো
দামোদর
দ্বারিয়াপুর
চড়িদা
দ্বারকেশ্বর
বিষ্ণুপুর
বিরহী
আটপুর
ক্ষীরপাই
রাজবলহাট
ভোটবাগান
কুটমণিপুর
সামতাবেড়
কলকাতা
ঠাকুরপুকুর
রাণীবাঁধ
বাগনান
বোড়াল
ঘুটিয়ারী শরীফ
খামতোড়
ভাস্কুর
দেউলপুর
বাসন্তী
গোসাবা
মীরপুর
লক্ষ্যা
আখড়াপুঞ্জি
বারুইপুর
ঘহড়ু
মাতলা
বাজারবেড়িয়া
ওড়িষা
বঙ্গোপসাগর

ফি বছর পুজোর ছুটির মুখোমুখি কয়েকটা দিন বড় কষ্টে কাটে আমার। খবর-কাগজে রোজ রিপোর্ট দেখি—এত হাজার লোক ছুটি কাটানোর জন্য হাওড়া স্টেশন থেকে দূরপাল্লার ট্রেন ধরলেন: গতবারের তুলনায় এবারের যাত্রীসংখ্যা অনেক বেশী অথবা কয়েক বছরের মধ্যে এবারই রেকর্ড; যাত্রীদের গন্তব্যস্থল প্রধানত দিল্লী, আগ্রা, কাশ্মীর অথবা পুরী, বাঙ্গালোর, কন্যাকুমারী ইত্যাদি। এসব জায়গায় দেখবার যে কিছু নেই সেকথা বলছি না। কিন্তু উদ্দেশ্য যেখানে ছুটির ক'টা দিন শান্তিতে কাটানো, সেখানে অজস্র অর্থব্যয় ছাড়াও অপরিসীম শারীরিক ক্লেশ সহ্য করে এহেন 'দেশত্যাগ' আবশ্যিক বলে কিছুতেই মনে করতে পারি না। লক্ষ লোকের পরিগ্রাহি দেশভ্রমণের এই মর্মান্তিক দৃষ্টান্তে মনটা বড়ই খারাপ হয়ে যায়। পুজোর হিড়িকে আত্মীয়-বন্ধুদের ট্রেনে তুলে দিতে আমিও হাওড়া স্টেশনে দু'একবার গিয়েছি। তুমুল হট্টগোল, ঠেলাঠেলি, হুড়োহুড়িতে সে যেন এক হাতাহাতি যুদ্ধের দৃশ্য। জানালা গলিয়ে লটবহর মাড়িয়ে ছুটি উপভোগকারীরা যদিও বা কামরায় ঢুকতে পেলেন বস্তাবন্দী আলুর মতো, তখনও তাঁদের সামনে দীর্ঘ পথ। সে পথের শেষে, নতুন পরিবেশে হয়ত ভ্রমণ বা বিশ্রামের কয়েকটা দিন। তারপরে আবার সেই শ্বাসরোধকারী প্রত্যাবর্তন।

হাওড়া স্টেশনের কার ড্রাইভ-এ গাড়ি রেখে, প্লাটফরমের ডার্টি জনতাকে অভি-সম্পাত করতে করতে যাঁরা শীতাতপনিয়ন্ত্রিত কামরায় গিয়ে ওঠেন, তাঁরা আমার লক্ষ্যের বাইরে। আমার জীবনের বাইরেও তাঁরা। বহুবার বহুক্ষেত্রে খুব কাছ থেকে তাঁদের দেখবার সুযোগ পেয়ে এখন দূর থেকে দেখাই নিরাপদ মনে করি। তাঁদের জন্য আমার একটুও মাথাব্যথা নেই। আমার ওঠাবসা, আমার হাসিগল্প দিন-আনি-দিন-খাই নিম্ন-মধ্যবিত্তদের সঙ্গে—যে কোন দেশে, যে কোন যুগে প্রগতির পতাকা যাঁদের হাতে। প্রগতির কথাটা হঠাৎ এখানে কেন তুললাম তা একটু পরেই বলছি। আমার সগোত্রদের দেশভ্রমণে আত্মম্ভরিতা নেই, কিন্তু অব্যবস্থা আছে। কি করে তা আরও মনোহর, আরও উপভোগ্য হতে পারে, সে বিষয়ে দু'কথা বলবার জন্যই কলম ধরেছি।

প্রথম কথা, স্বল্পবিত্তদের ভ্রমণের জন্য পশ্চিমবাংলার বাইরে যেতেই হবে এমন কি কথা আছে? দৈনন্দিন জীবনের একঘেয়েমির বাইরে নতুন পরিবেশে চিত্তবিনোদনই যদি ভ্রমণের উদ্দেশ্য হয় (তা ছাড়া আর কীই বা উদ্দেশ্য হতে পারে), তা হলে তেমন পরিবেশের কি খুবই অভাব আছে পশ্চিমবঙ্গে? দিল্লী, আগ্রায় যেসব ইমারত আমরা দেখতে যাই তা প্রসিদ্ধ সন্দেহ নেই। কিন্তু বিশ্বাস করুন, স্থাপত্য-ভাস্কর্যে পশ্চিম-বঙ্গও একেবারে দেউলিয়া নয়। তারও দেখাবার অনেক কিছু আছে। তবে বঙ্গজননীর ধনরত্ন যে রানীর মতন নয় সেকথা বলাই বাহুল্য। কাশ্মীর বা কন্যাকুমারীর প্রাকৃতিক দৃশ্য যখন বহুদূর থেকে আমাদের আকৃষ্ট করে, তখন ভুলে যাই রবীন্দ্রনাথ কি দেখে



লিখেছিলেন তাঁর কালজয়ী গান—"আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি।" আসল কথা, দৃষ্টিভঙ্গি। বঙ্গজননীর অশেষ রূপ দেখবার জন্য রবীন্দ্রনাথ বা জীবনানন্দ দাশের পরিণত দৃষ্টি সকলের না থাকতে পারে। তবু দেখবার চোখ ও বোঝবার মন সামান্য একটু তৈরি থাকলেই ঘরের কাছাকাছি কত না দর্শনীয় জিনিস ছড়িয়ে পড়ে আছে চারদিকে। এই কথাটাই রবীন্দ্রনাথ যেভাবে বলেছেন, তা শুধু তাঁর পক্ষেই বলা সম্ভব ছিলঃ—

"বহু দিন ধরে বহু ক্রোশ দূরে
বহু ব্যয় করি বহু দেশ ঘুরে
        দেখিতে গিয়েছি পর্বতমালা,
        দেখিতে গিয়েছি সিন্ধু।
দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয়া
ঘর হতে শুধু দুই পা ফেলিয়া
        একটি ধানের শিষের উপরে
        একটি শিশির বিন্দু।"

আমাদের দুয়ারের অদূরে এমন কি আহা-মরি দেখবার জিনিস আছে? ধানের শিষের উপর শিশিরবিন্দুর শোভা তো কবিসুলভ উচ্ছ্বাসমাত্র; তা দেখে দেখে আর ক'দিন কাটানো যায়?

অস্বীকার করি না, এসব সন্দেহে কিছু সত্য থাকলেও থাকতে পারে। কিন্তু ধান-ক্ষেতের পাশেই পাবেন ভরা নদী, পাবেন কাশফুলের সমারোহ, পাবেন মাছরাঙা, কাদা-খোচা, জলপিপির দল—চোখ আপনার জুড়িয়ে যাবে। ধানক্ষেত ছেড়ে, আমবাগান পেরিয়ে, শালুক-ফোটা পুকুরের পাশ দিয়ে গ্রামে উঠে আসুন—এক ভিন্ন পরিবেশে, আপনার প্রাত্যাহিক সংকীর্ণ অস্তিত্বের অতীতে এক নতুন জগতে নিমেষে পৌঁছে যাবেন। নাগরিক মলিনতার বাইরে, শুধু দিনযাপনের গ্লানি থেকে বহু দূরে, বুক ভরে নিশ্বাস নিয়ে অনেক হালকা বোধ করবেন আপনি। শহুরে সংকোচ কাটিয়ে স্থানীয় অধিবাসী-দের সঙ্গে যদি একটু মেশেন, একটু কথা বলেন, তা হলে এই প্রখর প্রগতির যুগেও, ভারতীয় আতিথেয়তার ধারাটি যে একেবারে শুকিয়ে যায়নি বুঝতে পারবেন। মাটির দাওয়ায় চাটাইয়ে বসে দু'টি ভাত, নিদেনপক্ষে এক বাটি গুড়-মুড়ি আপনাকে খেতেই হবে। ভিড় করে আপনাকে দেখতে আসবে গ্রামের লোক—সারল্যে, আন্তরিকতায় আপনা-দের আলাপ ভরে উঠবে কানায় কানায়। শহর-জীবনে যে সতর্কতার বেড়াজালে সর্বদা নিজেকে ঘিরে রাখেন, এখানে সে পাহারার প্রয়োজনই বোধ করবেন না। সে যে কী মুক্তি কি করে বোঝাই! গ্রাম-পরিক্রমায় শারীরিক কষ্ট হয়ত আছে, কিন্তু দৃষ্টি ও হৃদয় দুই-ই

প্রসারিত করবার এমন অবাধ সুযোগ আর কোথায় পাবেন?

মফস্বল শহর বা বড় গ্রামে জনজীবনের বর্তমান চেহারাটা হয়ত এতটা নিষ্কলুষ নয়; নানাভাবে সেখানে নাগরিক চাতুর্যের এখন অনুপ্রবেশ ঘটেছে। তবু দীর্ঘকাল গ্রাম-বাংলায় ঘুরে ঘুরে এ প্রতীতি আমার মনে বদ্ধমূল যে, শহুরে মানসিকতা গ্রামীণ জীবন-ধারার সনাতন বৈশিষ্ট্যগুলিকে এখনও একেবারে গ্রাস করতে পারেনি। কতদিন অবশ্য এ অবস্থাটা টিকে থাকবে তা বলা শক্ত। এ প্রসঙ্গে একটা ছোট ঘটনার কথা বলি—সামান্য হলেও যা আমার কাছে বেশ অর্থবহ মনে হয়েছে। দূর গ্রামে, পথের ধারের গাছতলায়, ট্রানজিস্টার-কোলে এক রাখাল ছেলেকে একদা দেখেছিলাম। কিছু গরু মাঠে চরছে, কিছু এসে বসেছে ছায়ায়—রাখালের কিন্তু সেদিকে মন নেই, মন তাব যান্ত্রিক গানে নিমগ্ন। কাছে গিয়ে যখন শুধোলাম—সে বাঁশিটাঁশি বাজায় কিনা, বেশ তাচ্ছিল্যের সুরে সে বলে উঠল—'রেডিয়ো-কলের' কাছে বাঁশি! খুব কম রাখালই আজকাল বাঁশি বাজায়। মাঠে গরু ছেড়ে দিয়ে ছায়াঢাকা গাছতলায় রাখালের বাঁশি বাজানোর যে সনাতন ছবিটা আমার মতো প্রাচীনপন্থীদের মনে এখনও আঁকা রয়েছে, বাস্তবে তার দৃষ্টান্ত বিরল। মোটা-মুটিভাবে বলতে গেলে, গ্রামীণ সংস্কৃতিপ্রবাহের বিভিন্ন ধারাগুলির বেলাতেও এই একই কথা খাটে। সেগুলিও স্ফূর্তি হারিয়েছে বহুকাল; এখন শুকিয়ে আসছে ধীরে ধীরে এবং আর বিশ-ত্রিশ বছর পরে তাদের আদৌ খুঁজে পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ।

গ্রাম-বাংলার জনজীবনে এখন একটা সংকটের কাল চলছে—সংস্কৃতির সংকট। সনাতন রীতিনীতি, চিরন্তন আচার-আচরণ, শাশ্বত মূল্যবোধ প্রভৃতির ভিত্তিমূল দ্রুত আলগা হয়ে আসছে। এই অমোঘ পরিবর্তনের পরিণাম শুভ কি অশুভ সে প্রশ্ন এখানে তুলছি না। আমার চিন্তা—অতীতে যা ছিল, এখন যা আছে অথবা ভবিষ্যতে যা হবে সে সবই বাঙালীর জীবনচর্যার অন্তর্ভুক্ত। "বাঙালীর ইতিহাস নাই"—বঙ্কিমচন্দ্রের এ খেদোক্তি হয়ত চিরকাল সত্য থাকবে না। আজ হোক, কাল হোক, বাঙালীর সর্বাঙ্গীণ ইতিহাস নিশ্চয়ই লেখা হবে। সে মহৎ ও বিরাট কাজের উপকরণ সংগ্রহের এখনই সময়। অন্তত যে বৈশিষ্ট্যগুলি চোখের উপরে লোপ পাচ্ছে তার বৃত্তান্ত অবিলম্বে সংগৃহীত হওয়া উচিত। আরও বেশী দেরী হয়ে গেলে সংগ্রহ করবার মতো কোন উপাদানই হয়ত অবশিষ্ট থাকবে না।

সর্বদেশে সর্বকালে এ কাজের দায়িত্ব বর্তিয়েছে মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্ত শিক্ষিত সম্প্রদায়ের ওপর। ধনীদের অবসর আছে, কিন্তু এ কাজে উৎসাহ নেই। তাঁদের মধ্যে দু'চারজন ব্যতিক্রমের কথা ধর্তব্যের মধ্যে নয়। অন্য দিকে, গরীবের অন্নচিন্তা এতই চমৎকারা যে অবসর বলতে তাঁদের কিছুই নেই। এ লেখার শুরুতে প্রগতির পতাকা মধ্য-বিত্তেরাই চিরকাল বহন করেছেন বলে যে উক্তি করেছি, তাতে আমি অন্তত নিঃসংশয়।

এই বুদ্ধিজীবীদের পশ্চিমবঙ্গের গ্রাম-পরিক্রমায় উদ্বুদ্ধ করতে পারলে (যদি পারি) একটা মহৎ উদ্দেশ্য সাধিত হবে বলে আমার স্থির বিশ্বাস। এঁদের মধ্যে অল্পসংখ্যক পর্যবেক্ষকও যদি গ্রামগ্রামান্তরে ছড়ানো অপস্রিয়মাণ সাংস্কৃতিক উপাদানগুলি সংগ্রহ করে আনেন, যাঁর যেমন ক্ষমতা সেই মতোই যদি প্রবন্ধাদি লেখেন, তা হলে বেশ বড় একটা কাজের সূত্রপাত হয়। এসব উপকরণের ভিত্তিতেই একদা বাঙালী জাতির পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচিত হবে।

আমার এ আশা যদি ফলবতী নাও হয় তাতেও ক্ষতি নেই। এই লেখাগুলির মাধ্যমে বার বার আমি ফিরে যেতে পারব গ্রাম-পরিক্রমার সেই পরম রমণীয় দিনগুলিতে। ব্যক্তিগতভাবে সে এক মস্ত লাভ। আর বরাতগুণে যদি দু'চারজন অনুরাগী পাঠক-পাঠিকা পাই—আমি তাঁদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাব পশ্চিমবাংলার দিকে-দিগন্তরে। পথের শেষে চমকদার কিছু যদি নাও দেখাতে পারি, পথচলার আনন্দ থেকে তাঁরা কখনই বঞ্চিত হবেন না। বৃষ্টিবিহীন বৈশাখী দিনে তপ্ত বাতাসের হলকা-ওঠা দীর্ঘ পথে তাঁদের আমি নিয়ে যাব বাঁকুড়া, পুরুলিয়ায়; শ্যামছায়াঘন দিনে দূর গ্রামপথে তাঁদের সঙ্গী হব জলপাইগুড়ি, বীরভূম, বর্ধমান, মেদিনীপুরে; শরতের প্রসন্ন আকাশের নীচে খোলা নৌকায় তাঁদের সঙ্গে ভেসে যাব তিস্তা, ইছামতী, ভাগীরথী, মহানন্দায়।

পথচলার কবি, মুক্ত জীবনের কবি, ওয়াল্ট হুইটম্যানের Song of the Open Road-এর লাইনগুলো মনে পড়ছেঃ—

"Afoot and light-hearted
I take to the open road,
Healthy, free,
the world before me,
The long brown path before me
leading wherever I choose.
Camerado! I give you
my hand!
I give you my love
more precious than money,
I give you myself
before preaching or law;
Will you give me yourself?
will you come travel with me?"


দেখা হয় নাই



গুরুসদয় মিউজিয়ম

গ্রাম-বাংলার জনজীবন ও লোকসংস্কৃতির সঙ্গে পাঠকপাঠিকাদের পরিচয় ঘটানোই যে আমার প্রধান উদ্দেশ্য সেকথা আগেই বলেছি। জনজীবনের বহুমুখী প্রকাশের নানা নিদর্শন যেখানে একত্র সংরক্ষিত থাকে, এমন কোন সংগ্রহশালায় গেলে একাজ সহজেই সম্পন্ন হতে পারে। কিন্তু, আমার মতে, সে পল্লবগ্রাহী অভিজ্ঞতা থেকে গ্রামগ্রামান্তরে পরিভ্রমণ করে সরেজমিনে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করাই বহুগুণে শ্রেয়। মফস্বলে রওনা হবার আগে কলকাতার উপকণ্ঠে অবস্থিত এরকম একটি সুন্দর সংগ্রহশালা পরিদর্শন করে গেলে আমাদের অভীষ্ট সম্বন্ধে প্রাথমিক একটা ধারণা তৈরি হতে পারে। তার মূল্যও কম নয়।

আমি ঠাকুরপুকুরের গুরুসদয় মিউজিয়মের কথা বলছি। ডায়মণ্ডহারবার রোড ধরে বেহালা ও বড়িশা পার হয়ে, ৩-এ বাসরুট টারমিনাসের সামান্য দক্ষিণে, রাস্তার ডান পাশে (পশ্চিমে) ব্রতচারীগ্রামে এক একতলা পাকা দালানে সংগ্রহশালাটি অবস্থিত; যাঁদের গাড়ি নেই তাঁদের পক্ষে ৩-এ বাসে যাওয়াই প্রশস্ত। প্রতিষ্ঠানটি বৃহস্পতিবার বন্ধ, রবিবার বেলা দশটা থেকে একটা ও অন্যান্য দিন একটা থেকে পাঁচটা অবধি খোলা থাকে।

পশ্চিমবঙ্গের যে সুসন্তানের নামের সঙ্গে এ প্রতিষ্ঠানটি যুক্ত তিনি স্বর্গত গুরু-সদয় দত্ত, আই সি এস। সরকারী পদমর্যাদার চোখ-ধাঁধানো চোগা-চাপকানের ওপর একখানা আটপৌরে নকশী কাঁথা চাপিয়ে এমন অনাড়ম্বর সারল্যে তিনি জীবন কাটিয়ে গেছেন যে, তাঁকে আমরা ব্রতচারী আন্দোলনের প্রবর্তক ও বঙ্গসংস্কৃতির গভীর অনুরাগী বলেই বেশী করে জানি। তাঁর চাকুরি-জীবনের ইতিহাস থেকে দেখতে পাই, বিভিন্ন সময়ে নানা উচ্চপদ অলংকৃত করলেও বীরভূমের প্রতি তাঁর একটা বিশেষ টান ছিল; একাধিকবার তিনি সে জেলার ম্যাজিস্ট্রেট হিসাবে কাজ করেছেন। রায়বেঁশে নাচের 'নৃত্যালী'র সঙ্গে দেহমন সুস্থ রাখবার নানাবিধ 'কৃত্যালী'র যোগসাধন করে যে ব্রতচারী আন্দোলনের তিনি প্রবর্তন করেন, তার প্রেরণা বীরভূম থেকেই পাওয়া সন্দেহ নেই। আর এক আন্দোলনের তিনিই পথিকৃৎ—শিক্ষিত, শহুরে বাঙালীর মন গ্রামমুখী করবার আন্দোলন, পল্লী-বাংলার বিচিত্র কৃষ্টিসম্ভারের দিকে তাঁদের দৃষ্টি ফেরানোর আন্দোলন। খুব ঢাকঢোল পিটিয়ে এ আন্দোলন হয়নি বলে অনেকেই সেকথা জানেন না। তিনি যথেষ্ট ঘুরেছেন, যথেষ্ট খেটেছেন, যথেষ্ট লিখেছেন এবিষয়ে। সে সম্বন্ধে যাঁরা খবর রাখেন, ঠাকুরপুকুরের গুরুসদয় মিউজিয়ম তাঁদের কাছে পীঠস্থানস্বরূপ, কেননা তাঁর একক প্রচেষ্টায় সংগৃহীত এখানকার শিল্প-নিদর্শনগুলি গ্রাম-বাংলাকে

যতটা প্রকাশিত করে, পশ্চিমবঙ্গের আর কোন সংগ্রহশালা ততটা করে কিনা সন্দেহ।

কিছুদিন আগে এ প্রতিষ্ঠানের সাধারণ সম্পাদক মহাশয় আমার অনুরোধে যে সংক্ষিপ্ত বিবরণীটি পাঠিয়েছিলেন তা থেকে দেখছি, শ্রীযুত দত্ত ১৯২৯ খৃীষ্টাব্দ থেকেই দুই বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলের লোকশিল্প-নিদর্শন সংগ্রহ করতে শুরু করেন। সেগুলি প্রথমে জড়ো করা হয় কলকাতায় তাঁর ১২নং লাউডন স্ট্রীটের বাড়িতে। ১৯৩২ খৃীষ্টাব্দে ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েণ্টাল আর্ট-এর সহযোগিতায় কলকাতায় এক প্রদর্শনীতে সেগুলি দেখানো হলে বিদগ্ধজনের মধ্যে বেশ সাড়া পড়ে যায়। ১৯৪০ খৃীষ্টাব্দে তাঁর পরিকল্পিত লোকসংস্কৃতি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে শ্রীযুত দত্ত ঠাকুরপুকুরে ব্রতচারীগ্রামের পত্তন করেন। এখানেই পরে একটি মিউজিয়ম খুলে সমস্ত সংগ্রহটি সেখানে রাখবেন এই তাঁর উদ্দেশ্য ছিল। সেজন্য, ১৯৪১ খৃীষ্টাব্দে, শিল্পদ্রব্যগুলি সাময়িকভাবে স্থানান্তরিত হয় স্টোর রোডে (বর্তমানে গুরুসদয় রোড) তাঁর নবনির্মিত বাসভবনে। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে সে বছরের জুন মাসেই তিনি পরলোকগমন করেন। ১৯৪৫ খৃীষ্টাব্দে, বঙ্গীয় ব্রতচারী সোসাইটির তত্ত্বাবধানে, গুরুসদয় মিউজিয়মের বর্তমান বাড়িটি তৈরী হলেও লোকশিল্পের নিদর্শনগুলিকে নানা কারণে সেখানে তখনই নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়নি। ইতিমধ্যে রাজ্যপাল আর. জি. কেসী ও কৈলাসনাথ কাটজুর আমলে, কলকাতার লাটভবনে সংগ্রহটির কিছু কিছু অংশ দু'বার প্রদর্শিত হলে জনসাধারণের মধ্যে প্রচুর আগ্রহের সঞ্চার হয়। অবশেষে, ১৯৫৯ খৃীষ্টাব্দে, শিল্পদ্রব্যগুলি নিয়ে আসা হয় বর্তমান মিউজিয়মে ও ডঃ বিধানচন্দ্র রায় প্রদর্শনী-ভবনের দ্বারোদ্ঘাটন ও অধ্যাপক হুমায়ুন কবীর গ্যালারীগুলি উন্মুক্ত করেন দর্শকদের কাছে। সেই থেকে প্রদর্শিত বস্তুগুলি দেখানোর জন্য একজন কিউরেটর নিযুক্ত আছেন এখানে। তাঁর কাছেই শুনেছি, আড়াই শ'র ওপর জড়ানো পট, চার শ'র কিছু বেশী কালীঘাট ও অন্য রকম পট, দু শ'র মত নকশী কাঁথা, দু শ'র কিছু বেশী কাঠের ভাস্কর্য, সমসংখ্যক পোড়ামাটির নকাশি টালি, প্রায় সাড়ে তিন শ' মাটির খেলনা-পুতুল, শতখানেক দশাবতার তাস, সত্তরের মতো অলংকৃত মৃৎপাত্র, সমসংখ্যক খাবারের ছাঁচ, চুয়াল্লিশটি পাথরের মূর্তি (তাদের অধিকাংশই পাল-সেন যুগের ও ভগ্ন), পনেরটি চিত্রিত পুঁথির পাটা, বেশ কিছু চালচিত্র বা ঐ জাতীয় রঙিন ছবি ও তিন শ'র মতো গৃহস্থালীর সরঞ্জাম, ডোকরা শিল্পের নিদর্শন, বাদ্যযন্ত্র, শোলার পুতুল, মাটির পাত্র, পিতল-ব্রোঞ্জের মূর্তি ও গহনা প্রভৃতি এ সংগ্রহশালায় রক্ষিত আছে। গ্রাম-বাংলার প্রায় আড়াই হাজার নিদর্শনের এই বিরাট লোকশিল্প-সংগ্রহটি যে মাত্র একজনের অবসরকালীন পরিশ্রমের ফসল সেকথা ভাবলে আশ্চর্য হতে হয়। একথা হয়ত আংশিকভাবে সত্য যে, এই শতাব্দীর তৃতীয় দশকে উভয় বাংলার যে-কোন জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের এতই দোর্দণ্ডপ্রতাপ ছিল যে, তাঁকে খুশী করবার জন্য গ্রামবাসীরা সহজেই মুক্তহস্ত হতেন। কিন্তু সংগ্রহশালার কাজে যাঁদেরই কিছু অভিজ্ঞতা আছে, তাঁরাই স্বীকার করবেন ১৯২৯ থেকে ১৯৪০ সালের মধ্যে, মাত্র এগারো বছর সময়ে, দুই বাংলার বিভিন্ন জেলা থেকে এত বিশাল এক সংগ্রহের সমাবেশ করা অসামান্য পরিশ্রম ও একাগ্র অভিনিবেশের পরিচায়ক।

এই লোকশিল্প-সংগ্রহের সব ক'টি বিভাগের বিস্তারিত বর্ণনা দিতে পারলে সুখী হতাম, কিন্তু স্থানাভাবে তা সম্ভব নয়। আমাকে সেজন্য কাঠ-খোদাই, নকশী কাঁথা ও পটচিত্রের আলোচনা নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হবে—গুরুসদয় মিউজিয়মে যে সংগ্রহগুলি বেশ উচ্চাঙ্গের। অন্য শিল্প-নিদর্শনগুলি পাঠকপাঠিকারা নিজেরা গিয়ে দেখে আসতে পারেন।

ভারতবর্ষ তথা বঙ্গদেশে কাঠ-খোদাই শিল্পের ঐতিহ্য খুবই প্রাচীন। ব্যবহৃত উপাদানের অস্থায়িত্বের জন্য আদিম নিদর্শনগুলি রক্ষা না পেলেও রামায়ণ-মহাভারতের যুগেই যে কাঠের অলংকৃত গৃহদ্বার, রথ, সিংহাসন প্রভৃতি নির্মিত হত সেকথা ওই মহাকাব্য দুটিতেই উল্লেখিত হয়েছে। ঋগ্বেদেও সূত্রধরদের উল্লেখ দেখতে পাই। শিল্প-শাস্ত্র ও বৃহৎসংহিতায় গাছ কাটবার বিধি, কাঠের গুণাগুণ ও শ্রেণীবিভাগ, কাঠ 'সীজন' বা মজবুত করবার পদ্ধতি ও নানা রকম আসবাব তৈরির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

মধ্যযুগ ও শেষ-মধ্যযুগে বাঙালী সূত্রধরদের প্রতিভা কাঠের রথ, চণ্ডীমণ্ডপের অলংকরণ, বাসগৃহ ও মন্দিরের নকাশি কপাট, প্রতিমা এবং নরনারীর মূর্তি প্রভৃতি নির্মাণে নিয়োজিত হয়েছিল। এ সবের কিছু কিছু দৃষ্টান্ত বর্তমানে গুরুসদয় মিউজিয়মে সংগৃহীত আছে। সামান্য উপকরণে, সাধারণ হাতিয়ারের সাহায্যে, কেবলমাত্র কারিগরি দক্ষতার প্রয়োগে বাঙালী সূত্রধররা একদা এজাতীয় শিল্পসৃষ্টিতে যে অসাধারণ নৈপুণ্য দেখিয়েছিলেন, সেগুলি তার উৎকৃষ্ট নিদর্শন।

পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে এসব কাঠের কারিগর তাঁদের পূর্বতন ঐতিহ্য থেকে বিচ্যুত হয়ে এখন শুধু আসবাবপত্রই তৈরি করেন। এঁদের সম্বন্ধে দীর্ঘ অনুসন্ধানের পর শ্রীগুরুসদয় দত্ত মহাশয় 'প্রবাসী' মাসিকপত্রে (বৈশাখ ঃ ১৩৩৯) 'বাংলার রসকলা-সম্পদ' নামে যে প্রবন্ধটি লিখেছিলেন তার কিছু অংশ উদ্ধৃত করে গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজো করা অসমীচীন হবে না। "বাংলাদেশের নৈসর্গিক অবস্থানমূলক কারণবশতঃ পাথরের অপেক্ষাকৃত অভাবে বাংলার ভাস্করগণ যে বেশীর ভাগ পাথরের পরিবর্তে কাঠের ও মাটির উপরে তাঁহাদের শিল্পকৌশল প্রয়োগ করিতে বাধ্য হইয়াছেন ইহাতে তাঁহাদের ভাস্কর্য-কলাকৌশলের বিন্দুমাত্র গৌরবহানি বর্তায় না। পরন্তু ইহা সর্ববাদিসম্মত যে কাষ্ঠ-ভাস্কর্যে সুনিপুণ ভাস্কর যদি পাথরের কাজ করিবার সুযোগ লাভ করেন, তাহা হইলে তাহাতেও তিনি তাঁহার শিল্পকৌশল ষোল আনা প্রদর্শন করিতে পারেন এবং ইহাও নির্ধারিত হইয়াছে যে, সুদূর অতীতে অশোক-যুগে সাঁচি ও ভারহুতের ভাস্কর্য-শিল্পিগণ প্রথমে কাঠের কাজেই তাঁহাদের অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়াছিলেন। পরিকল্পনায় নিখুঁত, নির্মলতায় ও গৌরবে, ভাবের ও রসের নিবিড় অভিব্যঞ্জনায়, কারুকার্যের সুনিপুণ ছন্দে এবং স্ত্রীপুরুষনির্বিশেষে মানবদেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সৌন্দর্য ও লালিত্যের রূপসৃষ্টিতে এই দারুসৃষ্টিগুলি জগতের ভাস্কর্য-শিল্পে যে অতি উচ্চ স্থান অর্জন করিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। প্রয়োজনীয় অংশগুলির কারুকার্য সম্পূর্ণরূপে করিবার ও নিষ্প্রয়োজনীয় দুটি কয়েক অংশ ইচ্ছাপূর্বক অসম্পূর্ণ রাখিবার যে প্রণালী রদ্যাঁ প্রভৃতি বর্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ ভাস্করদের নিপুণতার চূড়ান্ত লক্ষণ বলিয়া পরি-গণিত হয়, বাংলার দীনদরিদ্র পল্লীভাস্করগণের কাজে এই উচ্চ প্রতিভামূলক লক্ষণের স্বভাবজাত অসংখ্য নিদর্শন পাওয়া যায়। এই অনুপম কৌশলসম্পন্ন পল্লীভাস্করগণ ও তাঁহাদের স্বভাবসিদ্ধ কলাকৌশল বাঙালীর একটি অমূল্য জাতীয় সম্পদ। কিন্তু বর্তমান কালে উৎসাহের অভাবে ইঁহারা এবং ইঁহাদের শিল্পকৌশল অতি শীঘ্রই বাংলাদেশ হইতে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইতে চলিয়াছে।"

আশ্চর্য শোনালেও একথা সত্য যে গুরুসদয় মিউজিয়মে নকশী-কাঁথার যে অপরূপ সংগ্রহটি রক্ষিত আছে, কি সংখ্যায়, কি উৎকর্ষে তার তুল্য সংগ্রহ আর কোন মিউজিয়মে আছে কিনা সন্দেহ। আমি কলকাতার ইণ্ডিয়ান মিউজিয়ম ও আশুতোষ মিউজিয়ম এবং দিল্লীর ন্যাশনাল মিউজিয়মের কথা মনে রেখেই এ উক্তি করছি। ব্যক্তিগতভাবে আমার

বিশ্বাস, স্বর্গত গুরুসদয় দত্ত মহাশয় শুধু এই শিল্পসংগ্রহটির জন্যই চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবার যোগ্য। গ্রাম-বাংলার হৃদয়ের একেবারে অন্তস্তল থেকে যে কারুকলাটি উৎসারিত, তার প্রতি তাঁর যে গভীর অনুরাগ থাকবে এমনই স্বাভাবিক। সেজন্য নিজে গ্রামগ্রামান্তরে ঘুরে বা অন্যের মারফত, প্রধানত যশোহর, খুলনা, ফরিদপুর, বরিশাল ও মৈমনসিংহ জেলা থেকে আহৃত প্রায় দু'শ নকশী-কাঁথার এ সংগ্রহটি তিনি গড়ে তোলেন। অন্য জেলার নিদর্শনও আছে, কিন্তু-তারা সংখ্যায় কম। প্রাপ্তিস্থানের তালিকা দেখেই বোঝা যায়, তাঁকে এবিষয়ে কী অমানুষিক পরিশ্রম করতে হয়েছে।

ভারতীয় কুটিরশিল্পগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শিল্পী পরিবারের স্ত্রী-পুরুষের যৌথ প্রচেষ্টার উপর নির্ভরশীল। আবহমানকাল এ রীতিই চলে এসেছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, মাটির খেলনা পুতুল তৈরির মতো অতি প্রাচীন এক কুটিরশিল্পে এখনও পরিবারের মহিলা, এমন কি শিশুরাও অংশ গ্রহণ করেন দেখা যায়। নকশী-কাঁথার বেলায় কিন্তু এ ব্যবস্থার অভিনব ব্যতিক্রম ঘটেছে। খানকয়েক অব্যবহার্য পুরনো ধুতি-শাড়ি ও সে-গুলির পাড় থেকে ছাড়ানো কিছু রঙিন সুতো—এই সামান্য উপকরণে পল্লীরমণীরাই এসব অপূর্ব শিল্পনিদর্শন সৃষ্টি করতেন। ধুতি-শাড়িগুলিকে ধুয়ে পরিষ্কার করা থেকে শুরু করে, রঙিন সুতো বাছাই ও তাদের সুষম প্রয়োগ, নকশা নির্বাচন ও প্রয়োজনবোধে সেগুলিকে জমিনের ওপর এঁকে নেওয়া এবং সবশেষে অসাধারণ ধৈর্য ও শ্রমসাপেক্ষ সেলাই-এর কাজ সবই বাঙালী বউ-ঝিরা করতেন, কোন পর্যায়েই কখনও পরিবারের পুরুষদের সাহায্যের প্রযোজন হয়নি। গুরুসদয় মিউজিয়মে যে শ'দুয়েক নকশী-কাঁথা রক্ষিত আছে তার একটিও পুরুষের তৈরি নয়।

এ সিদ্ধান্তের স্বপক্ষে কিছু লিখিত প্রমাণ আছে। অন্যত্র মুদ্রিত কাঁথার ছবিটি যশোহর জেলার জঙ্গলবাধাল গ্রামের শ্রীমতী মানদাসুন্দরী দাস্যার তৈরি এক নকশী-কাঁথার। দীর্ঘ পরিশ্রমের ফল এই অপরূপ শিল্পসৃষ্টিটি সম্ভবত এক পারিবারিক বা গ্রামীণ জমায়েতে তিনি তাঁর বাবাকে উপহার দেন। কাঁথাটির কলকাগুলিকে ঘিরে সেলাই-এর অক্ষরে যে কথাগুলি লেখা আছে তা হুবহু নিম্নরূপঃ "এই সজনী জঙ্গল-বাধাল নিবাসী শ্রীযুত বরদাকান্ত বসুর কন্যা আমি শ্রীমতি মানদাসুদরী দাস্যা মোম হস্তে প্রস্তুতপূর্বক শ্রীযুত পীতা ঠাকুর মহাশযেকে এই সজনী প্রণামপূর্বক দিলাম। সভ্যগণ মহাশয়েরা যে ত্রীটী হয মাপ করিবেন।" খুব ছোট এ দু'টি বাক্যের মধ্যে 'শ্রীমতী' 'সুন্দরী', 'মম', 'পিতা', 'মহাশয়', 'ত্রুটি' প্রভৃতি অতি সাধারণ কথাগুলির ভুল বানান থেকে মনে হয়, অল্পশিক্ষিতা বা অশিক্ষিতা মানদাসুন্দরী পরিবারের পুরুষদের কাছ থেকে সম্ভবত কোন সাহাযাই নেননি। গুরুসদয় মিউজিয়মের আর একটি নকশী-কাঁথার শিল্পী হরিশচন্দ্রকাটিনিবাসী "শ্রীমতি শরলাবালা দেবী"। এখানেও বানানের ভ্রান্তি একই সিদ্ধান্তে আসতে সাহায্য করে। এবকম দৃষ্টান্ত আরও আছে।

নকশী-কাঁথার আর এক বৈশিষ্ট্য, এগুলি গৃহে ব্যবহাবের জন্য বা প্রীতি-উপহার হিসেবেই সর্বদা প্রস্তুত হয়েছে; কখনও সাধারণ পণ্যে পরিণত হয়নি। পশ্চিমবঙ্গের গ্রামের মেয়েদের গভীর স্নেহ-ভালবাসার প্রতীক সেগুলি। হৃদয়ের যে উত্তাপের সঙ্গে দীর্ঘ পরিশ্রমপ্রসূত এ উপহারগুলি প্রিয়জনের হাতে তুলে দেওয়া হত, আজকের বাজার থেকে কেনা বহুমূল্য উপঢৌকনে তা একেবারেই অনুপস্থিত। মানদাসুন্দরী দাস্যার কাঁথাটিতে 'দাস্যা' শব্দটির ব্যবহারে বোঝা যায় তিনি ছিলেন পিতৃগৃহনিবাসিনী বিধবা কন্যা। সভ্যগণদের ত্রুটি মার্জনা করবার অনুরোধ থেকে মনে হয় এজাতীয় উপহারের অর্পণ উপলক্ষে সামাজিক বা পারিবারিক প্রীতি-সম্মেলনের ব্যবস্থা করা হত। কী অনির্বচনীয় হৃদ্যতায় যে সে সমাবেশগুলি অভিষিক্ত হত তা এখন কষ্টকল্পনা। আজ

নকশী-কাঁথার কালই শুধু গত হয়নি, বাঙালীর সুকুমার হৃদয়বৃত্তির ক্ষেত্রেও এক যুগান্তর ঘটে গিয়ে থাকবে।

গুরুসদয় মিউজিয়মের নকশী-কাঁথাগুলি প্রধানত পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন জেলা থেকে সংগৃহীত। অজ্ঞাত কারণে, পশ্চিমবঙ্গের মহিলারা এ কারুকর্মটির প্রতি তেমন অনুরক্ত ছিলেন না। সেজন্য এ শিল্পসম্ভার পূর্ববাংলার ভাষায় কয়েকটি শ্রেণীতে বিভক্ত। আকারে যেগুলি সবচেয়ে বড় তাদের নাম 'লেপ'। দৈর্ঘ্যে কমবেশি সাড়ে সাত ফুট ও প্রস্থে আনুমানিক চার ফুট মাপের এ কাঁথাগুলি তুলোর লেপের মতোই সর্বাঙ্গ আবৃত করবার জন্য ব্যবহৃত হত। অপেক্ষাকৃত ছোট 'সজনী' বা সুজনীর আয়তন হত মোটা-মুটি ছ' ফুট×চার ফুট। সাধারণত বিছানার আবরণ হিসাবেই এগুলির প্রচলন ছিল। সম্মানিত অতিথিদের বসবার জন্যও এগুলি পেতে দেওয়া হত। আরও ছোট মাপের 'বেতন' নামের চৌকো কাঁথাগুলি কাজে লাগত বাক্স, তোরঙ্গ ও অন্যান্য আসবাবপত্রের ঢাকা হিসেবে। আয়না, চিরুনি প্রভৃতি প্রসাধনসামগ্রী জড়িয়ে রাখবার জন্য লম্বা আকারের আর এক শ্রেণীর নকশী-কাঁথাও তৈরি হত; তার বেশ একটা কাব্যিক নাম ছিল—'আরশিলতা'। পান, সুপারি, চুন, খয়ের, জাঁতি প্রভৃতি বহনের জন্য নকাশি থলির নাম ছিল 'দুর্জনী'। আর খুব পাতলা জমিনের সবচেয়ে ছোট শিল্পবস্তুকে বলা হত 'রুমাল', যার ব্যবহার সাধারণ রুমালের থেকে ভিন্ন ছিল না। এ সব ক'টি শ্রেণীর নিদর্শনই গুরুসদয় মিউজিয়মে যথেষ্ট সংখ্যায় রক্ষিত আছে।

ঠিক কি উপায়ে এই শিল্পনিদর্শনগুলি তৈরি হত সে বিষয়ে দু'চার কথা বলা যেতে পারে। পাঁচ-সাত প্রস্থ ধোয়া সাদা পুরনো কাপড় পর পর সাজিয়ে প্রথমে মুড়ি সেলাই দিয়ে চার ধার আটকে নেওয়া হত। তারপরে আরম্ভ হত নকশার কাজ। বহু ক্ষেত্রে নকশার সূক্ষ্মতা ও রকমারি দেখে মনে হতে পারে যে ছুঁচলো কাঠ-কয়লা বা ঐ জাতীয় কিছু দিয়ে জমির ওপর আগেই সেগুলি এঁকে নেওয়া হত। কিন্তু সম্ভবত এ ধারণাটি ভুল। প্রাথমিক কোন ড্রয়িং ব্যতীতই শিল্পীরা শুধু ফোঁড়ের সাহায্যে ধীরে ধীরে চিত্র-গুলি ফুটিয়ে তুলতেন মনে হয়। কাজের সুবিধার জন্য মনোগত নকশার অংশবিশেষ হয়ত জমির ওপর ছুঁচের দাগ টেনে অস্থায়ীভাবে ছকে নেওয়া হত। নকাশি কাজ শেষ হলে, সাদা সুতোর অসংখ্য সেলাই চালিয়ে দৃঢ় করা হত জমির ফাঁকা অংশগুলিকে। বিরল ক্ষেত্রে, ফোঁড় তোলার কৌশলে দু'পিঠে একই রকম নকশা ফুটিয়ে কিছু কিছু 'দো-রোখা' কাঁথাও প্রস্তুত হত। গুরুসদয় মিউজিয়মে এরকম দুষ্প্রাপ্য কাঁথাও দু'একটি আছে। অন্যত্র মুদ্রিত দ্বিতীয় ছবিটি এহেন এক 'দো-রোখা' কাঁথার, যেটি গত শতকের প্রথমদিকে ফরিদপুর জেলার কোন মুসলমান পরিবারে (চাঁদ-তারা প্রভৃতি নকশার ব্যবহার থেকে তা-ই মনে হয়) তৈরি হয়েছিল। দৈর্ঘ্যে ছ' ফুট দু' ইঞ্চি ও প্রস্থে চার ফুট সাত ইঞ্চি এ কাঁথাটি তিন 'পুরুষে'র পরিশ্রমের ফল। কোন অজ্ঞাত দিদিমা এটি শুরু করেন, আর শেষ করেন তাঁর নাতনি। শ্রীমতী স্টেলা ক্র্যামরিশ নকশী-কাঁথা সম্বন্ধে তাঁর এক বিখ্যাত প্রবন্ধে এই অনুপম শিল্পকৃতিটির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন। অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ে—মানে দশ-বিশ বছরে—তৈরি বেশ কিছুসংখ্যক নকশী-কাঁথা গুরুসদয় মিউজিয়মে দেখতে পাওয়া যাবে।

কি জাতীয় রং ব্যবহার করা হত এসব নকশার রূপায়ণে? কালো, লাল, নীল, সবুজ, হলুদ ও কমলা রংই বেশী ব্যবহৃত হয়েছে দেখা যায়। রং নির্বাচন কিন্তু বহুক্ষেত্রেই বাস্তবানুযায়ী নয়। এ বিষয়ে শিল্পীরা বিধিনিষেধের নিগড় না মেনে তাঁদের আশিক্ষিত-পটুত্বের যথেচ্ছ ব্যবহার করেছেন। ফলে, হলুদ রঙের হাতি সবুজ রঙের ঘোড়া, লাল রঙের ময়ূর বা নীল রঙের পদ্মের হামেশাই দেখা মেলে।

নকশা নির্বাচন ও তাদের সংস্থানের বেলায় কিন্তু কিছু প্রাথমিক নিয়ম মেনে চলা হত। কেন্দ্রীয় চিত্রটি অনেক ক্ষেত্রেই হত প্রস্ফুটিত এক শতদল পদ্মের, যা শ্রী ও সমৃদ্ধির প্রতীক হিসাবে ভারতীয় ভাস্কর্য ও চিত্রকলার জগতে চিরকালই সমাদৃত। ফলফুলভারে অবনত নানা রকম গাছের প্রতিলিপিও প্রায়ই উৎকীর্ণ হত; সেগুলি হয় কাল্পনিক কল্প-বৃক্ষের, নয়ত কৃষ্ণলীলার সঙ্গে সম্পর্কিত কদম্ব-তরুর। কালজয়ী মহাকাব্য রামায়ণ-মহাভারতের বিবিধ কাহিনী অথবা কমলে-কামিনী প্রভৃতি লোকপ্রিয় উপাখ্যানও বহু ক্ষেত্রে চিত্রিত হয়েছে। নরনারী মূর্তিগুলি পরিচিত ভঙ্গীতে বা গৃহকর্মে নিযুক্ত অবস্থায় দেখানোটাই রীতি ছিল। রাধাকৃষ্ণ বা শিবদুর্গা থেকে শুরু করে জমিদার, মহাজন, পুরোহিত, পাইক, ঘোড়সওয়ার, ফিরিঙ্গী, বর-বধূ, মেছুনী, গয়লানী প্রভৃতি গ্রামীণ জীবনের কত শত 'চরিত্র' যে উৎকীর্ণ হত তার ইয়ত্তা নেই। পশুপক্ষীর পর্যায়ে বাঘ, সিংহ, হাতি, ঘোড়া, গরু, ষাঁড়, কুকুর, বিড়াল, হরিণ, ময়ূর মায় রুই, ইলিশ, চিংড়ি, কাঁকড়াবিছা অবধি বাদ পড়েনি। হুঁকো, ঢেঁকি, বাসনপত্র, জাঁতি, কাঁচি, আয়না-চিরুনি, কাজললতা, পিলসুজ, ছড়ি, ছাতা প্রভৃতি গৃহসামগ্রীও হামেশাই চিত্রিত হয়েছে নকশী-কাঁথার গায়ে। নিভৃত পল্লী-সংসারের আশপাশে চিরপরিচিত বস্তু বা কাহিনীর রূপায়ণে গ্রামীণ শিল্পীরা যে স্বাভাবিক প্রবণতা দেখাবেন, তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই। নকশী-কাঁথাকে সেজন্য সেকালের পল্লীবালাদের নির্মল চিত্তাকাশের এক অপরূপ দর্পণ বললে অত্যুক্তি হয় না।

গুরুসদয় মিউজিয়মের পটচিত্রের সংগ্রহটিও, কি সংখ্যায় কি উৎকর্ষে, খুবই মূল্যবান। আড়াই শ'র ওপর জড়ানো-পট, চার শ'ব কিছু বেশী কালীঘাটের বা অন্য শ্রেণীর পট ও পনেরটি চিত্রিত পুঁথির পাটার একত্র সমাবেশ খুব কমই দেখা যায়। গত শতাব্দীর শেষ অবধি, এমন কি বর্তমান শতকের প্রথমেও পূর্ববঙ্গের ঢাকা, নোয়াখালি, মৈমনসিংহ রাজশাহী এবং পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান, বাঁকুড়া, বীরভূম, নদীয়া, মেদিনীপুর, মুর্শিদাবাদ ও হুগলী প্রভৃতি জেলায় সনাতন অঙ্কনরীতিতে অভ্যস্ত বহু পটুয়া রীতিমত সক্রিয় ছিলেন। এ সমস্ত অঞ্চলের পটই গুরুসদয় সংগ্রহশালায় অল্পবিস্তর স্থান পেয়েছে, তবে পশ্চিমবঙ্গের পটের সংখ্যাই বেশী।

পটচিত্রকলা বাঙালী মনীষার এক সুকুমার ও নিজস্ব সৃষ্টি। এই বিশিষ্ট অঙ্কন-রীতিতে বাঙালী শিল্পীরা একদা এতই একাগ্রভাবে নিযুক্ত হয়েছিলেন যে পাঁচ-সাত শ' বছরের পাঠান-মুঘল-ব্রিটিশ শাসনকালেও তাতে বহিরাগত বিজাতীয় প্রভাব সামান্যই সংক্রমিত হয়েছে। বিরুদ্ধ পরিবেশে এত দীর্ঘকাল শুদ্ধতা রক্ষা করার মধ্যে এ শিল্প-রীতিটির অসাধারণ জীবনীশক্তিরই পরিচয় পাওয়া যায়। গ্রামীণ বাংলার সমাজজীবন যে চারিত্রিক ঋজুতার ভিত্তির উপর এতদিন ন্যস্ত ছিল, এ ছবিগুলিতে তারই সার্থক প্রতিফলন দেখতে পাই। আবহমানকালের সমাজবন্ধন, নীতিজ্ঞান, ধর্মভীরুতা—এক কথায় সে চিরায়ত বনিয়াদ—নষ্ট হবার পর থেকেই পটচিত্রশিল্পের ঘোরতর দুর্দিন শুরু হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের কোন কোন কেন্দ্রে এখনও পট আঁকা হয় সত্য, কিন্তু সেগুলি সনাতন ঐতিহ্য থেকে বিচ্যুত, রুজিরোজগারের নিদর্শনমাত্র।

'পট' সংস্কৃত শব্দ। এ থেকেই বোঝা যায় পটচিত্রবিদ্যা এক সুপ্রাচীন শিল্প। বঙ্গ-দেশে পাল-যুগের আগে আঁকা পটচিত্র এখন খুবই বিরল। পাল-যুগের দুর্লভ নিদর্শন-গুলির অধিকাংশই আবার পুঁথির কাঠের মলাটের গায়ে আঁকা 'পাটাচিত্র'। 'বিষ্ণু-ধর্মোত্তরম' প্রভৃতি প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে উল্লেখিত প্রণালী অনুসারেই এগুলি রচিত। কালক্রমে সে অঙ্কনরীতিতে সামান্য হেরফের হয়ে থাকলেও তা এমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ

নয়। খৃষ্টীয় দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতক থেকে ঊনবিংশ শতকের প্রায় শেষ অবধি পটুয়াদের শিল্পনৈপুণ্যে প্রাচীনতর শৈলীর ধারাবাহিকতা মোটামুটি বজায় ছিল। বর্তমান শতাব্দীর মাঝামাঝি অবধি গ্রামীণ পটুয়ারা চলনসই দক্ষতার সঙ্গে জড়ানো-পট আঁকতেন, নিজেরা গান বাঁধতেন বা পূর্বতন পালাগান কণ্ঠস্থ করে গাইতেন, গ্রামগ্রামান্তরে ঘুরে সমবেত পল্লীবাসীর কাছে সেসব ছবি দেখিয়ে ও গান করে সেগুলির মর্ম বুঝিয়ে বলতেন। পারিশ্রমিক বাবদ সামান্য কিছু অর্থ বা সিধে যা পেতেন তাতেই কায়ক্লেশে তাঁদের দিন চলে যেত। কিন্তু গত বিশ-ত্রিশ বছরে এই অভ্যস্ত জীবনযাত্রায় ঘোরতর বিপর্যয় ঘটে গেছে। এ জীবিকায় এখন পেট চলা দায়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পটুয়ারা তাই মাটির খেলনা-পুতুল বা প্রতিমা নির্মাণের দিকে বেশী করে ঝুঁকেছেন। হাওড়া জেলার প্রশস্থ ও চণ্ডীপুর : বীরভূম জেলার পাকুড়হাঁস : ২৪-পরগণার আখড়াপুঞ্জি : মেদিনীপুর জেলার আকুবপুর, নাড়াজোল, গোগ্রাস-কেশববাড় প্রভৃতি গ্রামের 'চিত্রকর'দের কথা যখন বলব, তখন এ বিষয়ে ও তাঁদের কৌতূহলোদ্দীপক সামাজিক বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধেও বিস্তারিতভাবে আলোচনা করবার অবকাশ হবে।

সাবেক কালের পটুয়ারা কোন্ কোন্ ঘটনা বা কাহিনী রূপায়িত করতেন? চণ্ডী-পট, শক্তিপট, দশাবতার-পট, রামলীলা-পট, কৃষ্ণলীলা-পট, মনসাপট, যমপট, জাদু পট বা চক্ষুদান-পট, কালীঘাটের পট প্রভৃতি কত বিভিন্ন শ্রেণীর পটই না ছিল। প্রস্থে কমবেশি দু ফুট ও দৈর্ঘ্যে বিশ-পঁচিশ ফুট লম্বা একখণ্ড শক্ত কাপড়ের উপর তেঁতুল-বীচির লেই বা মিহি কাদার প্রলেপ মাখিয়ে, শুখানোর পর সেগুলির উপরিভাগ ঘষে মসৃণ করে ছবি আঁকবার উপযোগী করে নেওয়া হত। পরবর্তীকালে জমিন হিসাবে তুলট কাগজেরও প্রচুর ব্যবহার হয়েছে। বলিষ্ঠ ঋজু সীমারেখায় বিষয়বস্তুটি এঁকে নিয়ে ভিতরের অংশ ও পশ্চাৎপটে প্রধানত লাল, কালো, হলুদ, সবুজ প্রভৃতি রঙের প্রয়োগ করা হত। যে লীলা বা বিষয়বস্তুর পট, তার কাহিনীকে ধীরে ধীরে উন্মোচিত করবার জন্য প্রধান দৃশ্যের স্থিরচিত্রগুলি সাধারণত আয়ত আকারের ফ্রেমের মধ্যে একটির নীচে আর একটি আঁকা হত ক্রমান্বয়ে। রামলীলা-পটে রামায়ণের কোন ঘটনা অথবা চণ্ডীপটে দেবী দুর্গার মাহাত্ম্যসূচক কোন উপাখ্যান এইভাবে পর পর অনেকগুলি স্বতন্ত্র ছবিতে রূপায়িত করাই রীতি ছিল। ছবির সংখ্যা বা পটের দৈর্ঘ্য সম্বন্ধে বাঁধাধরা কোন নিয়ম ছিল না ; বিষয়ের গুরুত্ব বা জনপ্রিয়তা অনুসারে তার হেরফের হত। আঁকা শেষ হলে দুই প্রান্তে কাঠের বা বাঁশের দুটি দণ্ড লাগিয়ে (দেয়ালে টাঙানো ম্যাপে যেমন থাকে) দীর্ঘ পটটিকে জড়িয়ে রাখা হত এক দিকের লাঠির গায়ে। গ্রাম-পরিক্রমার সময় এরকম কয়েকটি পট পটুয়ারা নিয়ে যেতেন বগলদাবা করে। তারপর আবালবৃদ্ধবনিতার সামনে মাটিতে বসে, একটি লাঠি থেকে ছাড়িয়ে আর একটি লাঠিতে জড়াতে জড়াতে প্রতিটি চিত্র কিছুক্ষণের জন্য দেখানো হত ও সেই সঙ্গে গান চলত ছবিটিকে কেন্দ্র করে।

গুরুসদয় মিউজিয়মে রক্ষিত সাড়ে ছ' শ'র বেশী নানা শ্রেণীর পটের পৃথক বর্ণনা দেওয়া অসম্ভব। শ্রেণীওয়ারি সংক্ষিপ্ত বিবরণেও হয়ত সামান্যই বলা যাবে। বস্তুত এই অপরূপ শিল্পনিদর্শনের প্রতিটি বিভাগ, এমন কি কিছু কিছু একক পটের উপরও দীর্ঘ প্রবন্ধ লেখা যেতে পারে। পূর্ববর্তী আলোচনায় চণ্ডীপট, শক্তিপট, দশাবতার-পট, রামলীলা-পট, কৃষ্ণলীলা-পট ও মনসাপট সম্বন্ধে পাঠকদের মনে হয়ত একটা মোটামুটি ধারণার সৃষ্টি হয়ে থাকবে। এখন যমপট, চক্ষুদান-পট ও কালীঘাটের পট সম্পর্কে খুব সংক্ষেপে কিছু বলব।

গ্রাম-বাংলার আবহমানকালের শাশ্বত নীতিবোধের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে উপাখ্যান-মূলক পটগুলিতে প্রায়ই অশুভের উপর শুভের জয় রূপায়িত হয়েছে। যমপটে সভাসীন

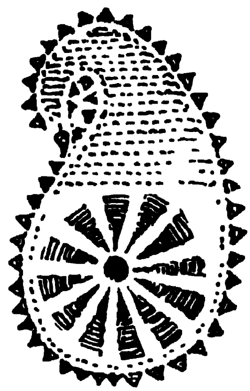
যমরাজের ছবি ও পাপের ভয়ঙ্কর পরিণাম সম্বন্ধে উগ্র রীতিতে আঁকা নরক-যন্ত্রণার ছবিগুলিতে এমনই এক আতঙ্ক সৃষ্টি করবার প্রয়াস থাকত যে তাতেই অনেকে ন্যায়-নীতির পথ অনুসরণ করা শ্রেয় মনে করতেন। চক্ষুদান-পটে মৃত ব্যক্তির কাল্পনিক ছবি এঁকে পটুয়ারা নিয়ে যেতেন তাঁর আত্মীয়স্বজনের কাছে। এসব পট সর্বাংশে সম্পূর্ণ হলেও চোখের মণিটুকু আঁকা শুধু বাকি থাকত। সামান্য পারিশ্রমিকের বিনিময়ে চিত্রকররা ছবিগুলিতে চোখ এঁকে দিতেন, যাতে পরলোকে মৃতের চলাফেরার অসুবিধা না হয়।

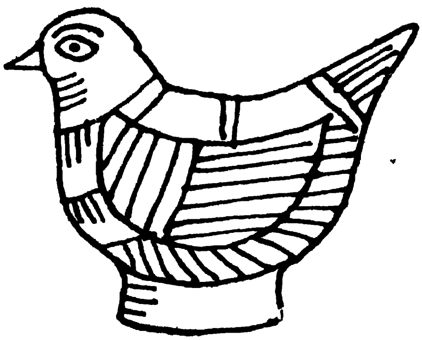
পটশিল্পের ক্ষেত্রে কালীঘাটের পট নিয়ে যত আলোচনা হয়েছে, অন্য কোন শ্রেণীর পট নিয়ে সম্ভবত তা হয়নি। খ্রীষ্টীয় আঠারো শতকেই কালীঘাটের মন্দিরকে কেন্দ্র করে এ রীতির পটুয়ারা নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন মনে হয়। এর অব্যবহিত পরে কলকাতার সাহেবী ও ইঙ্গবঙ্গ সমাজে ইউরোপীয় অঙ্কনরীতির যে প্রাদুর্ভাব ঘটে তার গভীর প্রভাব পড়ে এই শিল্পিগোষ্ঠীর উপর। বিষয় হিসাবে পুরনো দিনের দেবদেবী মূর্তি পরিত্যাগ না করলেও তাঁরা সেকালের সামাজিক জীবনের নানান চিত্র ও পশু, পাখি, মাছ ইত্যাদিও যথেষ্ট পরিমাণে আঁকতে শুরু করেন। যদিও কালীঘাটের পট বলতে বাবু-বিবি সম্পর্কিত সমাজচিত্রগুলিই সাধারণের কাছে বেশী পরিচিত, তবু কালীঘাটের মনীষা বহু ক্ষেত্রে চূড়ান্তভাবে বিকশিত হয়েছে পশুপাখির রূপায়ণে। কয়েকটি বলিষ্ঠ রেখার টানে যে কী নিখুঁত ড্রয়িং ও আশ্চর্য শিল্পসৃষ্টি হতে পারে কিছু কিছু পশু-পাখির ছবি তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। কিন্তু এ ধরনের এত উচ্চাঙ্গের ছবি কালীঘাটের পটুয়ারা বেশী আঁকেননি। কালীক্ষেত্রে সমবেত পুণ্যার্থী জনতা দেবদেবীর পট বা উঠতি ইঙ্গ-বঙ্গ সমাজের কেচ্ছার ছবি যত অবলীলাক্রমে বুঝতে পারতেন, অঙ্কনকৌশলের কৌলীন্য নিশ্চয়ই ততটা পারতেন না। এর জন্য চোখ এবং মন যতখানি তৈরি থাকা দরকার তা তাঁদের ছিল না। ফলে, দ্রুত রেখার টানে সহজে আঁকা যায় ও ক্রেতা-সাধারণের মনোহরণ করতে পারে এমন পটই আঁকা হত বেশী। কিন্তু রং ব্যবহারের বিদেশী পদ্ধতি ও বিষয় নির্বাচনের পৃথক রীতি কালীঘাটের পটুয়াদের অল্পাধিক প্রভাবিত করলেও, তাঁরা রেখাঙ্কনের চিরাচরিত শৈলীটি থেকে বিশেষ বিচ্যুত হননি। এ বিষয়ে জনৈক বিদগ্ধ সমালোচক বলেছেন, মধ্যযুগের দরবারী চিত্রকলার বর্ণাঢ্যতা, সূক্ষ্মতা ও আড়ষ্টতার প্রভাবমুক্ত কালীঘাটের পটে জনমানসের ধ্যানধারণাই অনায়াস-নৈপুণ্যের সঙ্গে আরোপিত হয়েছিল। সাবলীল রেখাঙ্কনের দিক থেকে কালীঘাটের পট অজন্তা ও বাঘ চিত্রাবলীর সমগোত্রীয়, আবার মুঘল বা রাজপুত চিত্রকলার সঙ্গে তার সংস্রব লক্ষণীয়ভাবেই অনুপস্থিত। এত উচ্চাঙ্গের শিল্পসৃষ্টিও যে মাত্র দু'চার পয়সায় বিক্রি হত সেকথা হয়ত সুবিদিত নয়। কালীঘাটের পটুয়াদের তাই রাশি রাশি ছবি আঁকতে হত। সেজন্যই তাঁদের অঙ্কনপদ্ধতি বাহুল্যবর্জিত এবং রেখাঙ্কন বলিষ্ঠ ও দ্রুত হতে বাধ্য হয়েছে।

কালীঘাটের নামকরা পটুয়াদের মধ্যে নীলমণি দাস, বলরাম দাস, গোপাল দাস প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কিন্তু নিবারণচন্দ্র ঘোষ ও কালীচরণ ঘোষ এই দু' ভাইয়ের মতো অসামান্য দক্ষতা আর কেউ দেখাতে পেরেছেন কিনা সন্দেহ। ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে, আশি বছরের বেশী বয়সে, দু'জনেরই দেহাবসান হয় ও তাঁদের পরলোক-গমনের সঙ্গে কালীঘাট পটের গৌরব-রবিও অস্তমিত হয়েছে। কালীঘাটে এখনও কিছু কিছু পট আঁকা হয়। কিন্তু বিগত দিনের কৌলীন্যের ছাপ তাতে অনুপস্থিত।

এ নিবন্ধ শেষ করবার আগে সামান্য একটু নিবেদন আছে। গুরুসদয় মিউজিয়মে রক্ষিত কাঠ-খোদাইয়ের কাজ, নকশী-কাঁথা বা পটচিত্র সম্বন্ধে যে আলোচনা করলাম, তা যে পূর্ণাঙ্গ নয় সে বিষয়ে আমি সম্পূর্ণ সচেতন। পাদটীকা-কণ্টকিত গবেষণামূলক

প্রবন্ধ লেখা আমার অভিপ্রায় নয়; সে কাজের জন্য যোগ্যতর কেতাবী গবেষকরা আছেন। পটশিল্প বিষয়েই অন্তত ন' দশজন 'প্রখ্যাত' গবেষকের লেখার সারাংশ আমার কাছে আছে, কিন্তু নিশ্চিতরূপে জানি, স্বর্গত গুরুসদয় দত্ত ও শ্রীসুধাংশুকুমার রায় ছাড়া অন্যেরা এই গ্রামীণ শিল্পটির অধ্যয়নের জন্য গ্রামে গ্রামে যাবার প্রয়োজন তেমন অনুভব করেননি; লাইব্রেরীর আরাম-কেদারায় বসে অনায়াসেই কেল্লা ফতে করেছেন। আমার বিনীত অভিলাষ পশ্চিমবঙ্গের পথেঘাটে ধুলোয়-ঢাকা যেসব মণিমুক্তা ছড়ানো আছে, তার সঙ্গে পাঠকপাঠিকাদের মোটামুটি পরিচয় করিয়ে দেওয়া; বাকিটা তাঁরা নিজেরাই দেখে বুঝে নিতে পারবেন।





বোড়াল

কলকাতার দক্ষিণ শহরতলির এক অংশে ঠাকুরপুকুর (যেখানে গুরুসদয় মিউজিয়ম অবস্থিত), আর এক অংশে বোড়াল। গড়িয়া থেকে বারুইপুর রোড ধরে খালের সাঁকো পার হয়ে প্রথম ডানহাতি পিচের রাস্তায় মাইলটাক গেলেই বোড়াল গ্রাম। প্রখর সভ্যতাদীপ্ত এক আধুনিক মহানগর থেকে দু' পা ফেললেই যে কিংবদন্তীর কুয়াশায় ঢাকা প্রাচীন এক জনপদে অবলীলাক্রমে পৌঁছানো যায়, সেকথা সহসা বিশ্বাস করা শক্ত। বোড়ালের অধিবাসীরা অপরাধ নেবেন না, মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করছি, এখানকার কিছু কিছু রাস্তা পিচের; রেডিও, বিজলী বাতি ও পাখা ঘরে ঘরে, পোস্ট-অফিস, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় সবই এখানে বর্তমান। স্থানীয় বাসিন্দাদের অধিকাংশই শিক্ষিত ও নাগরিক জীবনধারায় অভ্যস্ত। তবুও, আমার দৃষ্টিতে, বোড়ালের চিরায়ত সত্তা দূর অতীতের দিকে প্রসারিত, হালের পোষাকী আবরণে যা বিনষ্ট তো হয়ইনি, ঢাকাও পড়েনি ভালভাবে। প্রাচীনে নবীনে মেশানো এক আজব গ্রাম বোড়াল। প্রথমে তার প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করে পাঠকপাঠিকাদের নিয়ে যাব এক আশ্চর্য কিংবদন্তীর দেশে, যার তুলনা শুধু দূর দেহাতেই মেলে।

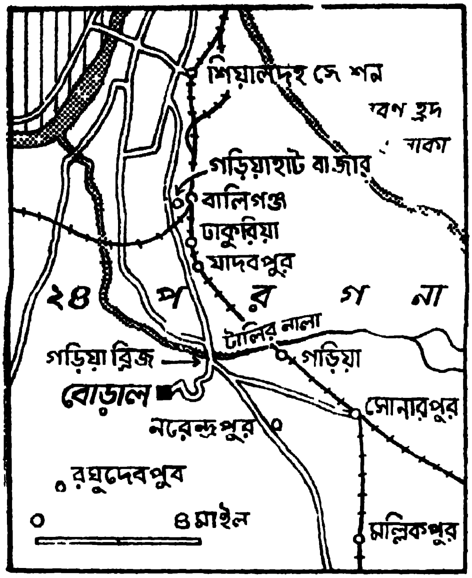
জনপদ হিসাবে কলকাতা থেকে বোড়ালের বয়স অনেক বেশী। আনুমানিক ১৪৯৫ খ্রীষ্টাব্দে রচিত বিপ্রদাসের 'মনসামঙ্গল' কাব্যে কলকাতার প্রথম উল্লেখ পাওয়া গেলেও, এ শহরের পত্তন ১৬৯০ খ্রীষ্টাব্দে জব চার্নকের সুতানুটিতে আগমনের সময় থেকেই সাধারণত ধরা হয়ে থাকে। এখন অবধি সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে শহর কলকাতার ইতিহাসকে খ্রীষ্টীয় পনের শতকের ওদিকে প্রসারিত করা যায় কিনা সন্দেহ। পক্ষান্তরে, বোড়াল থেকে সংগৃহীত সুঙ্গ-কুশান যুগের অনেকগুলি পোড়ামাটির মূর্তি আশুতোষ মিউজিয়মে রক্ষিত আছে। এদের মধ্যে খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকের, মাথায়-ফিতে-বাঁধা যক্ষিণী মূর্তিটির প্রত্নতাত্ত্বিক গুরুত্ব অসাধারণ। এসব আবিষ্কারের ভিত্তিতে বোড়ালের প্রাচীনত্ব আটঘরা, হরিনারায়ণপুর বা চন্দ্রকেতুগড় থেকে কম বলে মনে হয় না। পরবর্তীকালে, অর্থাৎ পাল যুগেও যে এখানকার সংস্কৃতিস্রোত অবিচ্ছিন্ন ছিল, তার কয়েকটি 'পাথুরে প্রমাণ' আজও এ গ্রামে এবং কলকাতার দুটি সংগ্রহশালায় দেখা যায়। শেষোক্ত পুরাবস্তুগুলির কথা পরে বলছি; গ্রামের পুরাবস্তুগুলিকে চাক্ষুষ করতে হলে আমাদের প্রথমে যেতে হবে স্থানীয় বিখ্যাত দেবী ত্রিপুরসুন্দরীর মন্দিরে। স্বর্গ, মর্ত্য, পাতাল—এই তিন 'পুর'-এর একচ্ছত্র অধিষ্ঠাত্রী বলে তাঁর নাম ত্রিপুরসুন্দরী। তাঁর ধ্যানমূর্তি দশমহাবিদ্যার তৃতীয় বিদ্যা ষোড়শীর অনুরূপ। এ দেবী ও তাঁর অধুনালুপ্ত প্রাচীন মন্দির সম্পর্কে এত অজস্র কিংবদন্তী প্রচলিত যে, আমরা পরে

সে বিষয়ে আলোচনা করব।

বারুইপুর রোড থেকে বেরিয়ে যে পিচের রাস্তা গ্রামে গিয়ে ঢুকেছে, তাতে প্রায় মাইলখানেক গেলে পথের ডান পাশে স্থানীয় উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়। সেটিকে ডান হাতে রেখে, কাঁচা রাস্তায় আরও এক ফার্লং দূরে দেবী ত্রিপুরসুন্দরীর সমতল ছাদের আধুনিক দালান-মন্দির। দেবীমূর্তিটি প্রাচীন না হওয়াই সম্ভব। পুরোহিত মহাশয়ের মতে সেটি অষ্টধাতুর, কিন্তু চুরি যাবার ভয়ে মাটির প্রতিমার সাদৃশ্যে পরিবর্তন করে নেওয়া হয়েছে। দেবীর পাদপীঠে গোলাকার এক তামার চাকতির গায়ে যে ছোট পায়ের ছাপটি উৎকীর্ণ আছে, ভক্তজন তাকে ধ্বজবজ্রাংকুশচিহ্নযুক্ত বিষ্ণুর পাদপদ্ম বলে বিশ্বাস করেন। নির্ভরযোগ্য প্রমাণ ছাড়া এটিকেও প্রাচীন বলা যায় না। তবে ঠাকুরঘরের পিছনের দেওয়ালে এক কুলুঙ্গিতে রক্ষিত পাথরের চতুর্ভুজা তারা মূর্তিটি সেন-যুগ বা পরবর্তীকালের হতে পারে। উচ্চতায় প্রায় দেড় ফুট ও প্রস্থে আনুমানিক এক ফুট, সাধারণ কালো পাথরে তৈরি এই 'বা-রিলিফ' ভাস্কর্যটির স্থূল ও নিরেস কারিগরির সঙ্গে পাল-ভাস্কর্যশৈলীর কিছুমাত্র সম্পর্ক নেই। মন্দিরের পাশের দীঘি থেকে পাওয়া এ পুরাবস্তুটির নজিরে বোড়ালের ইতিহাসকে খ্রীষ্টীয় বার-তের শতক অবধি টেনে নিয়ে যাওয়া যেতে পারে। কিন্তু প্রাচীনতর পুরাবস্তু এ গ্রামে আরও কয়েকটি আছে।

স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিদের নিয়ে গঠিত ও ১৩৪০ বঙ্গাব্দে রেজিস্ট্রিকৃত ত্রিপুরসুন্দরী সেবা সমিতি দেবীর নিত্য সেবা-পূজা ও উৎসবাদি পরিচালনা করে থাকেন। মন্দির চত্বরের মধ্যেই তাঁদের অফিস-ঘরে ও সামনের বারান্দায় রক্ষিত পাল-যুগের কয়েকটি ভাস্কর্য থেকে সন্দেহ থাকে না যে খ্রীষ্টীয় নবম-দশম-একাদশ শতকেও বোড়াল এক সমৃদ্ধ জনপদ ছিল। এখানকার উল্লেখযোগ্য পুরাবস্তুর সংখ্যা তিনটি। প্রথমটি মোটা-দানার বেলে-পাথরের এক স্তম্ভমূল, যার গায়ে উৎকীর্ণ কারুকার্য থেকে বোঝা যায়, এটি আদিতে কোন প্রাচীন মন্দিরের অংশ ছিল। দ্বিতীয়টি অনন্তশয্যায় শয়ান কষ্টি-পাথরের এক বিষ্ণুমূর্তির নিম্নভাগ। বিষ্ণুমূর্তি ও উপরের নাগছত্রটি এখন আর নেই, তবে কুণ্ডলীকৃত নাগশয্যাটি ও নীচের ক্ষুদ্র মূর্তিগুলির কারিগরি বেশ সুন্দর। এটিও কোন লুপ্ত দেবালয়ের বিগ্রহ বা অলংকরণ হওয়াই সম্ভব। বেলে-পাথরের স্তম্ভমূলটির সাক্ষ্যে প্রমাণ হয় যে একদা এখানে অন্তত একটি পাথরের মন্দিরের অস্তিত্ব ছিল। অনন্ত-বিষ্ণুমূর্তিটি সে মন্দিরের সামিল ছিল কিনা সেকথা এখন আর বলা সম্ভব নয়। তৃতীয় পুরাবস্তুটি কষ্টিপাথরের এক শিবমূর্তির ভগ্ন মুখমণ্ডলের, যার তুল্য উৎকৃষ্ট ভাস্কর্য পাল-শৈলীতেও বিরল। মুখের সামনের দিক—কপাল থেকে নাক অবধি—সম্পূর্ণ ভগ্ন; সম্ভবত কোন প্রতিমা-চূর্ণকারীর কাজ। কিন্তু মাথার চুল বেষ্টন করে তিনটি উদ্যত সর্পফণা, অতি সূক্ষ্ম কারুকার্যমণ্ডিত জটাজাল ও অপরূপ দুটি কান ও সুগঠিত অধর থেকে এটিকে উচ্চস্তরের পাল-ভাস্কর্য বলে চিনতে ভুল হয় না। স্থানীয়ভাবে প্রাপ্ত এ ভগ্ন মূর্তিটি আদিতে ঠিক কোথায় কিভাবে উপাসিত হত তা বলা শক্ত।

ত্রিপুরসুন্দরী মন্দিরের অদূরে, গ্রামের অন্যতম বৃহৎ জলাশয় 'সরল দীঘির' পূব পাড়ে, মাঝের পাড়ায় বসু পরিবারের গৃহদেবতা কষ্টিপাথরের এক বিষ্ণুমূর্তি বোড়ালে পাল-যুগের আর এক 'পাথুরে' নিদর্শন। বসু-পরিবারের কর্তা শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসুর মতে, প্রায় সাড়ে তিন ফুট উচ্চতার এই শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী বাসুদেব মূর্তিটি ১৩৬৬ বঙ্গাব্দে 'সরল দীঘি'র কাছে অপর একটি পুষ্করিণী খননের সময় পাওয়া যায়। সে পুকুরে একটি লক্ষ্মীমূর্তিও নাকি জলতলে শায়িত আছে; জলের গভীরতার জন্য সেটি উদ্ধার করা যায়নি। আবিষ্কারের সময় বিষ্ণুমূর্তিটির নাক ভাঙা ছিল; পরে তা সারিয়ে নেওয়া হয়েছে। বসু-পরিবারের ভদ্রাসনের সামনে এক আধুনিক দালান-মন্দিরে বহু-



দিনের ব্যবধানে তিনি এখন আবার নিত্যউপাসিত।

এ মন্দিরের সামনে এক বকুল গাছের তলায় আর দু'টি পুরাবস্তুর দেখা মেলে। প্রথমটি মাটিতে পোঁতা লম্বা ধরনের এক পাথরের দণ্ড, যার উপরের দিক দেখতে অনেকটা টোপরের মতো। এটি প্রাচীন কোন ইমারতের অংশ কিনা সঠিক বলা যায় না। বর্তমানে ইনি মাকাল ঠাকুর জ্ঞানে পূজিত। মাকাল বা মাখাল ঠাকুর চব্বিশ পরগণার দক্ষিণাঞ্চলে আরও অনেক আছেন। বহু যুগ ধরে তাঁরা ধীবর সম্প্রদায়ের উপাস্য দেবতা। তাঁদের সন্তোষবিধান করতে পারলে জালে বেশী মাছ পড়ে, জেলেদের এ বিশ্বাস বহুকালের। প্রায় দু'শ বছরের পুরাতন 'তারকেশ্বর শিবতত্ত্ব' গ্রন্থে মাখালের উল্লেখ দেখে মনে হয় তিনি অর্বাচীন লৌকিক দেবতা নন। যথা—"ক্ষেত্রপাল মহাকাল প্রভৃতি দেবতা/যাহার যেরূপ ভক্তি সেরূপ গঠিতা/কোথায় ওলাইচণ্ডী মাখাল জলায়/বৃক্ষতলে মহাপ্রভু স্থান দৃশ্যপ্রায়॥" দ্বিতীয় পুরাবস্তুটি আয়ত আকারের বেশ বড় এক প্রস্তরখণ্ড (২'-১"×১'-২"×৮") যার সামনের দিকে প্রথাগত এক কীর্তিমুখ ও তার দু'-পাশে মালাধারী দুই পুরুষমূর্তি 'বা-রিলিফ' পদ্ধতিতে উৎকীর্ণ আছে। অনুরূপ অলংকরণযুক্ত বহু প্রস্তরফলক ত্রিবেণীর জাফর খাঁ গাজীর সমাধির গাঁথনিতেও ব্যবহৃত হয়েছে। এ সবই যে একদা পূর্বতন হিন্দু মন্দিরের অংশ ছিল তাতে সন্দেহ নেই। বোড়ালের এ মূর্তিগুলি ও তাদের সামনে রক্ষিত আর এক টুকরো সাধারণ পাথরকে এখন যথাক্রমে ককাই চণ্ডী, ষষ্ঠী, শীতলা ও ওলাবিবি জ্ঞানে পূজা করা হয়ে থাকে। এ'রা সকলেই চিরায়ত লৌকিক দেবী। এছাড়া গ্রামের বিভিন্ন স্থানে একাধিক 'বাবা-ঠাকুরে'র থানও দেখা যায়। এতগুলি প্রাচীন লৌকিক দেবদেবীর জনপ্রিয় উপস্থিতি থেকে একথা মনে হওয়াই স্বাভাবিক যে পাল-সেন যুগের সমকালীন সমৃদ্ধির অবসানে, বোড়াল গ্রাম বেশ কিছুদিনের মতো এক জনবিরল আরণ্যক অঞ্চলে পরিণত হয়। সে সময়ের অরণ্যচারী স্থানীয় অধিবাসীরা যেসব দেবদেবীর উপাসনা করতেন, তাঁদেরই স্মৃতি এ-সব লৌকিক দেবতার মধ্য দিয়ে আজও অব্যাহত রয়েছে।

পাল-যুগের আর দু'টি স্থানীয় নিদর্শন—এক বাসুদেব ও এক সরস্বতী মূর্তি—

যথাক্রমে আশুতোষ মিউজিয়ম ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সংগ্রহশালায় রক্ষিত আছে। দুটিই পাথরের ও আকারে বেশ ছোট। ভাস্কর্যশৈলীর বিচারে, পণ্ডিতেরা তাদের আনুমানিক খ্রীষ্টীয় দশম শতকের বলে অনুমান করেছেন। ত্রিপুরসুন্দরীর বর্তমান মন্দিরটি যেখানে অবস্থিত, আগে সেখানে এক প্রাচীন ঢিবি ছিল। মন্দির নির্মাণের আগে সেটিকে খোঁড়া হলে ইটের তৈরি এক ইমারতের অংশ আবিষ্কৃত হয়। আশুতোষ মিউজিয়মের প্রাক্তন অধ্যক্ষ শ্রীদেবপ্রসাদ ঘোষ সরেজমিনে পরিদর্শন করে সেটিকে সেন-যুগের বলে সিদ্ধান্ত করেন। অতএব খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দী থেকে খ্রীষ্টীয় তের শতক অবধি বোড়াল যে এক সমৃদ্ধ জনপদ ছিল, তার স্বপক্ষে যথেষ্ট 'পাথুরে প্রমাণ' রয়েছে। আদিমতম কৃষ্টিসম্পদগুলির উৎপত্তিস্থল হিসেবে গড়ে উঠতেও এ লোকালয়ের দু'এক শ বছর লেগে থাকতে পারে। বোড়ালের ইতিবৃত্তকে সেজন্য খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতক অবধি প্রসারিত করলে মারাত্মক কোন ভ্রান্তি না হবারই কথা।

খ্রীষ্টীয় তেরো-চৌদ্দ শতক থেকে সতেব শতকের মাঝামাঝি অবধি বোড়ালের ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় একটা ছেদ লক্ষ করা যায়। এর কারণ অনুমানসাপেক্ষ। বোড়ালের সমৃদ্ধি অদূরে প্রবাহিত আদি-গঙ্গার ওপরই নির্ভরশীল ছিল। মুসলিম বিজয়ের কিছু পরে বাণিজ্যিক লেনদেনের এই একমাত্র পথটি হয়ত বন্ধ হয়ে যায়। আদি-গঙ্গাও ধীরে ধীরে মজে আসতে থাকে। শেষ আঘাত হানে সম্ভবত পর্তুগীজ জল-দস্যুরা। সুন্দরবনের উদ্যত বাহু তখন সহজেই ঢেকে ফেলে বহু যুগের প্রাচীন এই জন-পদকে। সতের শতকের শেষদিকে সে জঙ্গল হাসিল করে, যেসব পরিবার এখানে এসে বসতি করেন, তাঁদের মধ্যে ঘোষ, বসু ও মিত্র বংশই প্রধান। চট্টোপাধ্যায় ও মুখোপাধ্যায়রা আসেন আরও পরে। ঘোষ পরিবারের কুলপঞ্জী থেকে মনে হয়, বর্তমান পর্যায়ে, তাঁরাই এখানকার আদি বাসিন্দা। বর্তমান পুরুষ থেকে ন'পুরুষ আগেকার দয়ারাম ঘোষ প্রথমে এখানে বসতি স্থাপন করেন। তাঁর ছেলে নরনারায়ণ ও নাতি টিকারাম ঘোষ। টিকারামের নির্মিত ইঁটের দুটি লিপিযুক্ত আটচালা মন্দির এ পরিবারের প্রাচীনত্বের সাক্ষী হিসাবে এখনও তাঁদের ভদ্রাসনের সামনে বর্তমান আছে। উচ্চতায় প্রায় ২৫ ফুট এবং দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ১৫ ফুট×১৩ ফুট, এ দেবালয় দুটির লিপিফলকে প্রতিষ্ঠাকাল ১৬৯৮ শকাব্দ (১৭৭৬ খ্রীষ্টাব্দ) বলে উল্লেখিত আছে। ঘোষ পরিবারের আধুনিক সুসন্তান ৺প্রিয়-নাথ ঘোষ কোচবিহার রাজ্যের দেওয়ান ছিলেন। ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে গ্রামের উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়টি তিনিই প্রতিষ্ঠা করেন। বসু পরিবারের সবচেয়ে কীর্তিমান পুরুষ রাজ-নারায়ণ বসু। তাঁর প্রপিতামহ শুকদেব বসু প্রথমে এখানে এসে বসতি করেন। আদি ব্রাহ্মসমাজের কাজে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের ডান হাত ছিলেন রাজনারায়ণ। 'জাতীয় গৌরব সম্পাদনী সভা' তাঁরই কীর্তি এবং সে প্রতিষ্ঠানের ভাবধারা অনুসরণ করেই নবগোপাল মিত্র হিন্দু মেলার প্রবর্তন করেন। পূর্ববঙ্গ রেলপথ কর্তৃক ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 'বাংলায় ভ্রমণ' নামক উপাদেয় পুস্তকটি থেকে রাজনারায়ণ সম্পর্কে কিছু অংশ উদ্ধৃত করছি। "১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই সেপটেম্বর রাজনারায়ণ জন্মগ্রহণ করেন। সেকালের হিন্দু কলেজের যে সকল ছাত্র উত্তরকালে বাংলার গৌরব বর্ধন করিয়াছিলেন, রাজনারায়ণ তাঁহাদিগের অন্যতম। ভূদেব মুখোপাধ্যায় ও মাইকেল মধুসূদন দত্ত রাজনারায়ণের সহপাঠী ছিলেন এবং ইঁহাদের পরস্পরের মধ্যে বিশেষ সম্প্রীতি ছিল।. .যৌবনে তিনি ব্রাহ্মধর্ম অবলম্বন করেন। বাংলার তদানীন্তন ছোটলাট হ্যালিডে সাহেব রাজনারায়ণকে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের পদ দিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু উক্ত চাকুরী তাঁহার মনঃপূত না হওয়ায় তিনি স্কুল মাস্টারের কার্য গ্রহণ করেন। ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি মেদিনীপুর

গভর্নমেণ্ট স্কুলের হেডমাস্টার নিযুক্ত হন। তৎকালে শিক্ষিত সমাজে সুরাপান প্রচলিত ছিল। রাজনারায়ণ ইহা নিবারণের জন্য বিশেষ উদ্যোগী ছিলেন। স্ত্রী-শিক্ষার বিস্তার ও ব্যায়ামচর্চায়ও তাঁহার বিশেষ আগ্রহ ছিল। রাজনারায়ণ কতকগুলি বাংলা পুস্তক প্রণয়ন করেন। তৎপ্রণীত 'সেকাল আর একাল', 'বাঙ্গালা ভাষা বিষয়ক প্রস্তাব' ও 'বিবিধ প্রবন্ধ' প্রভৃতি গ্রন্থ উল্লেখযোগ্য। ১৯০০ খৃীষ্টাব্দের ১৬ই সেপ্টেম্বর রাজনারায়ণ পরলোকগমন করেন। জগদ্বিখ্যাত মনীষী শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ রাজনারায়ণ বসুর দৌহিত্র। রাজনারায়ণ বসুর জন্মভিটা এখন পরিত্যক্ত ও জঙ্গলাকীর্ণ।" সে জীর্ণ ভদ্রাসনের একটি ছবিও এ গ্রন্থে মুদ্রিত হয়েছিল (প্রথম খণ্ড ঃ ১৭৩ পৃষ্ঠা)। কিন্তু আজ সে বসত-বাটির চিহ্নমাত্র নেই। সেখানে এখন রাজনারায়ণ বসু স্মৃতিমন্দির, প্রিয়নাথ গ্রন্থাগার ও এক অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে।

এই হল বোড়ালের সেকাল ও একালের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। 'পতন অভ্যুদয় বন্ধুর পন্থায়' বিবর্তিত সে সুদীর্ঘ ইতিবৃত্তের সঙ্গে যে অজস্র কিংবদন্তী এসে যুক্ত হয়েছে তাদের মূল্যও কম নয়। এবার সে বিষয়ে বলব।

ত্রিপুরসুন্দরীই বোড়ালের সবচেয়ে বিখ্যাত ও জনপ্রিয় দেবী। তাঁকে ঘিরে নানান কিংবদন্তী প্রচলিত। তাঁর অধিষ্ঠানক্ষেত্রকে যে পীঠ বলে দাবী করা হয়, সেকথা হয়ত সুবিদিত নয়। সতীর করতালু নাকি এখানে পড়েছিল। স্থানীয় এক দীঘিতে তাঁর শাঁখাও পড়েছিল বলে জনশ্রুতি। দেবীর বর্তমান মন্দিরটি নির্মাণের আগে সেখানকার প্রাচীন ঢিবিটি যখন খোঁড়া হয়, তখন নাকি পূর্বতন বিগ্রহের অষ্টধাতুনির্মিত এক হাতের তালু পাওয়া যায়। লোকে বলে, তাতে দেবীর ধ্যানমূর্তির বিবরণ লেখা ছিল। পুরোহিত এত যত্ন ও সাবধানতায় সেটিকে নিজের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে রাখেন যে কুলোকের তাতে সন্দেহের উদ্রেক হয়। ফলে সেটি চুরি যায়। সতীর হাতের তালু এখানে পড়বার উপাখ্যানের সঙ্গে অষ্টধাতুর করতালু আবিষ্কারের কাহিনীটি যেন উদ্দেশ্যমূলকভাবে জড়িত, যাতে এ বিষয়ে ভক্তজনের প্রত্যয় দৃঢ় হয়। দেবীমূর্তির করতালুতে তাঁর ধ্যান-মূর্তির বিবরণ লিখিত থাকাটা খুবই আশ্চর্যজনক; কোন বিগ্রহেই সাধারণত তা থাকে না। সে যাই হোক, এই অভিজ্ঞানটির আবিষ্কারের সময় খননকার্যে নিযুক্ত এক আদি-বাসী শ্রমিক সেটির চারদিকে নাকি এক কুয়াশার আবরণ দেখতে পায়। কথাটা কর্তাদের কানে পেঁাছলে তাঁরা বিশেষ আমল দেন না। পরদিন সেই শ্রমিক একই স্থানে কুয়াশার ভিতর থেকে সিংহবাহিনী এক দেবীমূর্তিকে আবির্ভূত ও অন্তর্হিত হতে দেখে। কর্তারা এবার কৌতূহলী হয়ে দেখতে এলেন। কুয়াশা তখন অপসৃত হয়েছে। গাঁইতি দিয়ে আর একটু খোঁড়া হতেই দুই বিরাট সাপ সেখান থেকে বার হয়ে পাশের জঙ্গলে চলে গেল। কর্তারা তখন খনন বন্ধ রেখে সেই শ্রমিককে টাকাকড়ি দিয়ে দেশে পাঠিয়ে দিলেন। বললেন, যে সাক্ষাৎ দেবীর দর্শন পেয়েছে তার আর মজুরি করা শোভা পায় না। এ ঘটনার অনেক দিন পরে মন্দিরের কাছাকাছি আরও কিছু খোঁড়াখুঁড়ির প্রয়োজন হয়। সে কাজে নিযুক্ত আর একজন শ্রমিক নাকি মাটির নীচে দেবী ত্রিপুরসুন্দরীর এক সোনার মূর্তি দেখতে পায়। সে রাত্রেই দেবী খননকার্য বন্ধ করে জমি সমতল করে দিতে স্বপ্নাদেশ দেন। সে আদেশ পালিত হয়। দেবীকে তারপর আর বিরক্ত করা হয়নি।

ত্রিপুরসুন্দরী মন্দিরের পশ্চিমে ২২ বিঘার এক বিরাট দীঘি ছিল; হেজেমজে গিয়ে আয়তন এখন অনেক কমে গিয়েছে। জনশ্রুতি, এখানেই সতীর শাঁখা পড়েছিল। সে দীঘিতে একদা নাকি রাশি রাশি সহস্রদল পদ্ম ফুটত আর তার তীরে ছিল এক সান-বাঁধানো ঘাট। সেই ঘাটে বসে এক সর্বসুলক্ষণা কিশোরী একদিন পথচারী এক শাঁখারির

কাছ থেকে দ্'টি শাঁখা চেয়ে নিয়ে পরে। দাম নিতে বলে তার বাবা, গ্রামের দক্ষিণপাড়ার রামহরি ম্খ্জ্যের কাছ থেকে। রামহরির কোন মেয়ে ছিল না। কিন্তু শাঁখারি-কথিত নির্দিষ্ট কুলুঙ্গিতে প্রয়োজনীয় অর্থ অপ্রত্যাশিতভাবে রাখা আছে দেখা গেল। কৌতূহলী হয়ে দ্জনে যখন দীঘির ঘাটে এলেন, তখন কিশোরী অন্তর্ধান করেছে, কিন্তু শাঁখাপরা দ্টি কোমল হাত একবার মাত্র জলের উপর উঠে আবার ড্বে গেল জলতলে।

ত্রিপ্রস্ন্দরীর মন্দিরের সামনে পাকা এক নাটমণ্ডপ আছে। তার পাশেই এক কদম গাছ। সে গাছে প্রতি বৎসর সরস্বতী প্জার ঠিক আগে দ্টি করে ফ্ল ফোটে। আষাঢ়-শ্রাবণের বদলে মাঘ মাসে কদমফ্ল ফোটার এ ঘটনাকে ভক্তজন দৈবী কৃপা বলেই মনে করেন। মন্দিরের কাছেই খ্ব প্রাচীন ও বিশাল সেন-দীঘিটি এখন এত প্র্ শৈবালদামে ঢাকা যে মাঝখানের সামান্য একট্ অংশ ছাড়া অন্যত্র জল তো দেখাই যায় না, সে ঘন আস্তরণের উপর দিয়ে ছাগল প্রভৃতি লঘ্ ওজনের প্রাণীও স্বচ্ছন্দে চলাফেরা করতে পারে। মাঝখানের যে অংশট্কু ঢাকা পড়েনি, সেখানে নাকি অলৌকিক কারণে কোন জলজ উদ্ভিদ জন্মাতে পারে না। আগে মাথায় সিঁদ্র লেপা ও নাকে আংটি পরানো অতিকায় সব শাল মাছ দেখা যেত এ দীঘিতে। একবার এক শিকারী বন্দ্কের গ্লীতে তাদের একটিকে আহত করার পর থেকে আর তাদের দেখা যায় না। এ জলাশয়ের আর এক চমকপ্রদ মাহাত্ম্য ছিল। এর উত্তর ও প্ব পাড়ে যে দ্টি বাঁধানো ঘাট জীর্ণ অবস্থায় দেখা যায়, সেখানে গিয়ে উৎসবের রান্নার জন্য প্রয়োজনীয় বাসনকোসনের তালিকা রেখে এলেই পরদিন সকালে জলতল থেকে সেগ্লি অলৌকিকভাবে আবির্ভূত হত। বলা বাহ্ল্য, কাজ হয়ে গেলে নির্ভুলভাবে তালিকা মিলিয়ে আবার সেগ্লিকে রেখে আসতে হত দীঘির ঘাটে। একবার স্থানীয় এক পরিবারের জনৈক বধ্ একটি বাটি ফেরত না দিয়ে এই অলিখিত শর্ত লঙ্ঘন করার ফলে এ মাহাত্ম্য চিরতরে ল্প্ত হয়েছে।

বোড়ালের আর এক জাগ্রত দেবতা পঞ্চানন্দ। সেন-দীঘির পশ্চিম পাড়ে (প্ব পাড়ে ত্রিপ্রস্ন্দরীর মন্দির) বছর তেরো আগে নির্মিত সমতল ছাদের এক দালান-মন্দিরে তাঁর অধিষ্ঠান। শিবের লৌকিক বিকল্প হলেও, প্রোহিত মহাশয় বলেন, শিব ও পঞ্চানন্দের ধ্যানের মধ্যে কিছ্ পার্থক্য আছে। প্রধানত শিশ্রক্ষক ও শিশ্রোগ-নিরাময়কারী হিসাবেই তিনি উপাসিত। বন্ধ্যা স্ত্রীলোকরাও প্ত্র কামনায় তাঁর শরণাপন্ন হন। মানত করে ঢিল বাঁধা ও মনস্কামনা প্র্ণ হলে প্জো দিয়ে ঢিল খ্লে দেবার রীতিটি এখানে বহ্লপ্রচলিত। পঞ্চানন্দের বর্তমান মাটির ম্তিটি প্রথাগত। তাঁর বাহন গোভূত (নামান্তরে 'গ্মো'), যার হাত ও পা অবিকল মান্ষের এবং বাকি অংশ গর্র মত। খড়ম-পরা দ্টি পায়ের একটি ঝ্লিয়ে ও অপরটি আড়াআড়িভাবে বিপরীত ঊর্তে রেখে তিনি এই বাহনের উপর উপবিষ্ট। দ্বিভ্জ মূর্তি, ডান হাতে একটি ছোট ত্রিশ্ল বরাভয় ম্দ্রায় ধরা, আর বাঁ হাত ভূমিস্পর্শ ম্দ্রার অন্করণে নীচের দিকে প্রলম্বিত। গলায় মণিবন্ধে ও কন্ইয়ের কাছে র্দ্রাক্ষের মালা ও বলয়। শিরে জটাজাল। তার উপরে ও দ্ই কাঁধে উদ্যতফণা তিনটি সাপ। কানে ধ্তুরার ফ্ল, স্থ্লোদর, ত্রিনেত্র, গ্ম্ফয্ক্ত, বীরত্বব্যঞ্জক চেহারা। শিবের সঙ্গে তাঁর সাদৃশ্য এতই নিকট যে স্থানীয় লোক-কল্পনায় তিনি অদ্রের ত্রিপ্রস্ন্দরীর ভৈরব বলে খ্যাত। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ত্রিপ্রস্ন্দরী পদতলশায়ী শিবের নাভিপদ্ম থেকে উত্থিত এক সহস্রদল পদ্মের উপর উপবিষ্টা। তাঁর পাদপীঠে ব্রহ্মা, বিষ্ণ্, পঞ্চম্খ সদাশিব, একম্খ ঈশ্বরশিব ও একম্খ র্দ্রশিবের পাঁচটি ছোট ম্তিও স্থাপিত আছে। দেবীর কাছাকাছি এতগ্লি শিবের উপস্থিতি সত্ত্বেও বেশ কিছ্ দ্রের পঞ্চানন্দ জনমানসের সহজ কল্পনায় তাঁর ভৈরবে পরিণত হয়েছেন। কিংবদন্তীর দেশে এতে আশ্চর্যের কিছ্ই নেই। পঞ্চানন্দকে কেন্দ্র

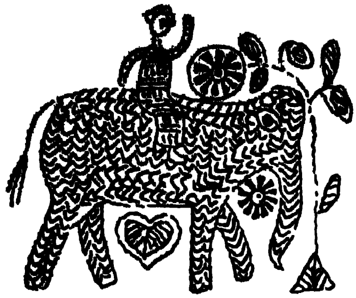
করে আরও জনশ্রুতি আছে। বর্তমান আকৃতিতে, আধুনিক মন্দিরে স্থান পাবার আগে, তাঁর অধিষ্ঠান ছিল এক কালো পাথরের টুকরোর মধ্যে, যেটি এখনও বর্তমান মন্দিরে রক্ষিত আছে। পিরামিড আকৃতির এ পাথরের খন্ডটি আগে বিরাজ করত সেন-দীঘির ধারে এক গাছতলায়। কাছেই নাকি এক প্রাচীন ইঁটের মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ দেখা যেত। অনুমান, সেইটিই ছিল তাঁর আদি মন্দির। প্রাকৃতিক কারণে সে দেবালয় ধূলিসাৎ হলে, তিনি গাছতলার মুক্ত জীবনই বেছে নেন। কেননা, বর্তমান পাকা মন্দিরের দেওয়াল কিছুদূর গেঁথে পরদিন প্রভাতে তা ভেঙে পড়েছে দেখা যায় কয়েকবার। অবশেষে 'বাবা' স্বপ্নাদেশে সম্মতি জানালে নাকি মন্দির নির্মাণ সম্ভব হয়। গ্রামবৃদ্ধেরা বলেন, গাছ-তলায় থাকবার সময় পঞ্চানন্দ নাকি খড়ম পায়ে ঘুরে বেড়াতেন গ্রামময়; গভীর নিশীথে সে খড়মের শব্দ স্পষ্ট শোনা যেত। পাকা দালানে আশ্রয় নির্দিষ্ট হবার পর এ নৈশ-ভ্রমণ বন্ধ হয়েছে।

গ্রামের যেখানে শ্মশান, আগে তার পাশ দিয়ে আদি-গঙ্গা প্রবাহিত ছিল মনে হয়। এখানকার পাশাপাশি দুটি ইঁটের আটচালা মন্দিরের বিগ্রহ শ্মশানেশ্বর শিবলিঙ্গ। দক্ষিণের মন্দিরটি এখন পরিত্যক্ত; উত্তরদিকের শিবলিঙ্গটির আজও নিত্যপূজা হয়। সে শিবমন্দিরের দেওয়ালে নিবদ্ধ এক আধুনিক মর্মরফলকে লেখা আছে—"শ্রীমন্ত সওদাগর প্রতিষ্ঠিত আদি মহাশ্মশানেশ্বর মন্দির।" শ্রীমন্ত সওদাগর নিজেই কিংবদন্তীর মানুষ; মন্দির-লিপিতে প্রতিষ্ঠাতা বলে তাঁর উল্লেখ লোককল্পনার পরাকাষ্ঠা। আরও জনশ্রুতি আছে এ দেবালয় দুটিকে ঘিরে। দুটি ইমারতের উপরই বড় বড় বট-অশ্বত্থ গাছ গজিয়েছে। উত্তরের মন্দিরটিকে রক্ষা করবার জন্য একবার স্থির হয় যে চূড়াস্থিত গাছ-পালা কাটা হবে ও সেজন্য কিছু শ্রমিকও নিয়োগ করা হয়। তাদের একজন যে ডালটি কাটতে যায়, অমনি দেখে এক বিরাট সাপ ঠিক কুড়ুলের তলায় বার বার তার গলাটি বাড়িয়ে দিচ্ছে। আত্মাহুতির জন্য বহুক্ষণ এভাবে চেষ্টা করে অবশেষে সাপটি পঞ্চফণা বিস্তার করলে শ্রমিকটি অজ্ঞান হয়ে নীচে পড়ে যায় ও অন্য মজুরীরা ভয়ে কাজ ফেলে পালায়। শ্মশানেশ্বর তখন স্বপ্নাদেশে জানান যে সাপটি তাঁরই আশ্রিত মনসা। এহেন সময়ে এক ভ্রাম্যমান সাধু সেখানে উপস্থিত হয়ে পুরোহিতকে নির্দেশ দেন যে শিব-মন্দিরের কাছে মনসার ঘট স্থাপন করলে শ্মশানেশ্বর নিশ্চয়ই তুষ্ট হবেন ও তখন গাছ কেটে মন্দিরটিকে রক্ষা করা যাবে। সে আদেশ শিরোধার্য করে, বোড়াল আদি মহাশ্মশান সমিতি মন্দিরপ্রাঙ্গণে এক মনসার 'থান' স্থাপন করেছেন। সেখানে পঞ্চমুখী নাগের প্রতিকৃতি সমেত এক মর্মরফলকে লেখা আছে—"ওঁ আদি মহাশ্মশানেশ্বর আশ্রিত মনসা মা।" বোড়ালের আরণ্যক অতীতের জন্য সেখানে মনসাভক্তি একদা প্রসারলাভ করে থাকলে আশ্চর্যের কিছু নেই। কিন্তু লৌকিক দেবী মনসার মাহাত্ম্য বিস্তারের জন্য বর্ণহিন্দু দেবতা শিব যখন সক্রিয় হন, তখনই বিস্ময়ের কারণ ঘটে। শৈবধর্মের সঙ্গে উত্তর-সুন্দরবন অঞ্চলের লৌকিক ধর্মের মিশ্রণের এই কিংবদন্তীআশ্রিত কাহিনীটি সে-জন্য বেশ কৌতূহলোদ্দীপক।

এ নিবন্ধের গোড়ার দিকে ঘোষ পরিবার সম্বন্ধে যা লিখেছি তা নিছক ইতিহাস। এবার একটু কিংবদন্তীর অবতারণা করা যেতে পারে। এক কষ্টিপাথরের কৃষ্ণ ও এক অষ্টধাতুর রাধিকা বহুপুরুষ ধরে এ পরিবারের গৃহদেবতা। প্রায় দু'শ বছর আগে, টিকারাম ঘোষের আমলে এ বাড়িতে একবার ডাকাত পড়ে। অমনি কৃষ্ণ ও রাধিকা দুই ঘোড়ার পিঠে চেপে ডাকাতদের নাকি এভাবে তাড়া করেন যে তারা হতবুদ্ধি হয়ে আত্ম-সমর্পণ করে। ডাকাত দলের সর্দার টিকারামকে একটি মশাল দিয়ে যায়, যেটি জ্বালালে বাড়িতে কোনদিনই আর ডাকাত পড়বে না। সে মশাল ঘোষ পরিবারে এখনও নাকি

সযত্নে রক্ষিত আছে। অদ্যাবধি তাঁদের ভদ্রাসনে আর ডাকাতি হয়ওনি।

বোড়ালের আর এক কিংবদন্তী—জীবন্ত কিংবদন্তী বললেও অত্যুক্তি হয় না—স্বামী উমানন্দ দেব, পূর্বাশ্রমে যিনি ছিলেন ডক্টর নৃপেন্দ্রকুমার দত্ত, এম এ, পি এইচ ডি, প্রাক্তন অধ্যক্ষ, সংস্কৃত কলেজ ও সম্পাদক, বঙ্গীয় সংস্কৃত সমিতি, কলকাতা। পুরাকীর্তির সন্ধানে ঘুরতে ঘুরতে বোড়ালের জোড়াশিবমন্দিরের কাছে হঠাৎ তাঁর দেখা পেয়ে গেলাম। মন্দির দুটি আনুমানিক দেড় শ বছরের প্রাচীন, অলংকরণহীন ও সাধারণ আটচালা শৈলীর, বৈশিষ্ট্য বলতে বিশেষ কিছুই নেই। কিন্তু অসাধারণত্ব আছে মন্দিরপ্রাঙ্গণে অবস্থিত এক ছোট গৃহের অধিবাসী স্বামী উমানন্দের। প্রায় চার বছর আগে তাঁকে যখন দেখি তখনই তাঁর বয়স আশির কাছাকাছি। টকটকে গায়ের রং, ধীরভাষী, সমাহিত, সাধকোচিত চেহারা। নিজের বিষয়ে তাঁকে বিশেষ কিছুই বলাতে পারলাম না। তবে চলে আসবার সময় আমার মতো অভাজনের প্রতি অশেষ কৃপায় তাঁর লেখা একটি বাংলা বই 'মহাপুরুষ সন্নিধানে', আমাকে উপহার দিলেন। সে বই-এর পরিশিষ্টে ইংরেজীতে রচিত তাঁর আর দুটি পুস্তকের উল্লেখ দেখে চমৎকৃত হলাম। 'দি এরিয়ানাইজেসন অব ইন্ডিয়া' ও 'অরিজিন অ্যান্ড গ্রোথ অব কাস্ট ইন ইন্ডিয়া' (দুই খণ্ড)—এ বইগুলি, সংশিলষ্ট বিষয়ে প্রামাণ্য পুস্তক হিসেবে একদা ঘাঁটাঘাঁটি করেছি। তাদের প্রখ্যাত লেখক উচচাঙ্গের গবেষণাক্ষেত্র থেকে বহুদিন আগে সরে এসেছেন নামহীন, খ্যাতিহীন ঈশ্বরসাধনার ক্ষেত্রে। পূর্বাশ্রমের খ্যাতি প্রতিপত্তির মোহ আজ আর তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না। বুঝতে অসুবিধা হয়নি, অনেক বড় সম্পদের তিনি সন্ধান পেয়েছেন। স্বামী উমানন্দ তাঁর সাধনোচিত ধামে প্রয়াণ করেছেন কিনা জানি না। শুধু জানি, কিংবদন্তীর দেশ বোড়ালের কথা উঠলে, তাঁকে আমার বার বার মনে পড়বে এক জীবন্ত কিংবদন্তীর মতো।



ঘুটিয়ারী শরীফ

শহুরে মধ্যবিত্ত বাঙালীরা রবিবার বা ছুটিছাটার দিনগুলো কিভাবে কাটান তার একটা রীতিমত সমীক্ষা হলে কেমন হয়? সামাজিক প্রবণতা, সামাজিক অভ্যাস, সামাজিক রীতিনীতি প্রভৃতি গোষ্ঠী-আচরণ নিয়ে কত গবেষণা তো হামেশাই হচ্ছে। এ বিষয়টা নিয়ে কেউ কেন যে মাথা ঘামায় না তাই ভাবি। রাজনৈতিক 'বন্ধ'-এর কথা বলছি না; সেসব আরোপিত আলস্যের দিনে অধিকাংশের ক্ষেত্রেই বাধ্যতামূলক বেড-রেস্ট। কিন্তু অন্য ছুটির দিনে, যখন ইচ্ছে করলেই বেরিয়ে পড়া যায়, যখন "ঘর হতে শুধু দুই পা ফেলিয়া" চিত্তাকর্ষক পরিবেশের মধ্যে হাজির হওয়া যায় অনায়াসেই, সেসব দিনগুলো আমাদের কি করে কাটে? কারো হয়ত বা তাস-পাশা-আড্ডায়, কারো আত্মীয়বন্ধু সন্দর্শনে, কারো বা সাধ্যমতো ভাল খাওয়াদাওয়ার পর পরিতৃপ্ত দিবানিদ্রায়। সিনেমা-থিয়েটারও আছে, মিছিল-সমাবেশও বাদ নয়, নিদেনপক্ষে শহরেরই আনাচে-কানাচে অপেক্ষাকৃত মনোরম জায়গায় হয়ত কিছুক্ষণের পায়চারি। কোনটাই অপাংক্তেয় নয়; কয়েকটির প্রতি আমারও অনুরক্তি স্বীকার্য। তবু ক্যামেরার ঝোলা কাঁধে ফেলে, হাত-ব্যাগে নোটবই, পেন্সিল ও টুকিটাকি জিনিস নিয়ে বেরিয়ে পড়বার দিকেই আমার অনুরক্তি অনেক বেশী। ছুটিছাটায় শহর ছেড়ে পালানোর অভ্যাসটা এখন এতই বদ্ধমূল যে আমার বড় সাধ, পাঠকপাঠিকাদের মধ্যেও এ বাতিকটা সংক্রামিত করি। পারব কি? আশা করতে অবশ্য দোষ নেই।

প্রথমেই কথা উঠবে, সারা দিনের খাবার ব্যবস্থা কি হবে? নিতান্ত শিশুরা যদি সঙ্গে না থাকে (সহজসাধ্য ভ্রমণ ছাড়া তাদের সঙ্গে না নেওয়াই ভাল) আর প্রাতরাশটা যদি একটু বড় মাপের হয়, তাহলে প্লাস্টিকের কৌটায় কিছু পাঁউরুটি, কিছু শশা, কিছু কলা, কিছু সিদ্ধ ডিম নিয়ে নিশ্চিন্তে বেরিয়ে পড়তে পারেন। দূর দেহাতের নগণ্য গ্রামেও আজকাল ছোটখাট চায়ের দোকান হয়েছে। সেখানে বাঁশের বেঞ্চিতে বসে যেমন-তেমন চা ও সস্তা বিস্কুট আপনার বাঁধা। বরাতগুণে যদি সহৃদয় কোন গ্রামবাসীর সঙ্গে আলাপ জমাতে পারেন, তবে ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য এক বাটি গুড়-মুড়ি আর তৃষ্ণা নিবারণের জন্য গাছ-পাড়া ডাব আপনার হকের পাওনা। পশ্চিমবাংলার হাজার দুয়েক গ্রাম-শহর পরিক্রমার সময় দুপুরের খাবার নিয়ে আমাকে কখনই ভাবতে হয়নি। সর্বত্রই যে আতিথেয়তা পেয়েছি এমন নয়; সেক্ষেত্রে হাতব্যাগে রাখা শশা, কলা বা পাঁউরুটির লাঞ্চ চমৎকারই লেগেছে, যেমন লাগে চড়ুইভাতির রান্না, যা বাড়িতে বসে খেলে হয়ত কান্নাই পায়। গ্রাম-পরিক্রমার শুরুতে ভোজন-পারিপাট্যের দিকে যদিও বা কারও একটু-আধটু নজর থাকে, দুদিনেই দেখবেন তা অদৃশ্য হয়েছে। চোখের ও মনের খোরাক তখন এত

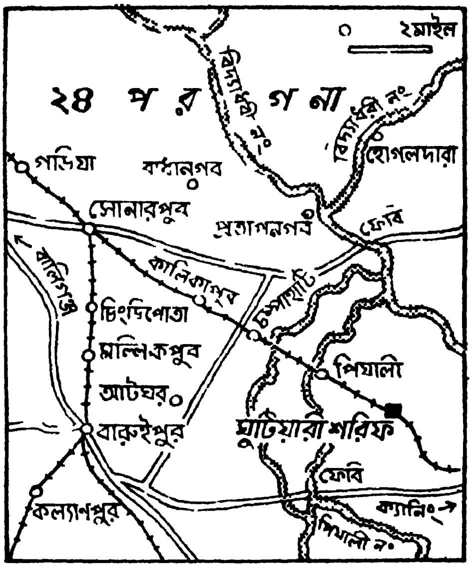
বেশী পরিমাণে পাবেন যে পেটের খোরাকের কথাটা ক্রমশই গৌণ হয়ে আসবে। কদাচিৎ হয়ত মুশকিল হয় সুপেয় জল পাওয়া নিয়ে। তবে অধিকাংশ গ্রামেই আজকাল টিউব-ওয়েল হয়েছে। সেজন্য এবিষয়ে সাধারণত কোন অসুবিধা হয় না। তবু সাবধানের মার নেই বলে আমার পরামর্শ—ফি বছর একবার টি এ বি সি ইনজেকশন নিয়ে রাখবেন। আশ্চর্য শোনালেও কথাটা সত্যি যে দেশকে তন্নতন্ন করে জানবার পরিকল্পনায় টি এ বি সি-র ভূমিকা মোটেই তুচ্ছ নয়।

আজকের গন্তব্যস্থলে যেতে-আসতে দানাপানির ভাবনা না ভাবলেও চলতে পারে; সকালের ব্রেকফাস্ট্টা একটু হেভি হলেই যথেষ্ট। কেননা, সকাল নটা নাগাদ শেয়ালদায় ট্রেনে উঠে, ভ্রমণ শেষ করে বেলা একটার মধ্যে আবার সেখানে ফিরে আসা খুবই সম্ভব। অকুতোভয়ে অন্নচিন্তা পরিহারের সদুপদেশগুলো সেজন্য অন্য ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বলেই ধরতে হবে। আমি শেয়ালদা-ক্যানিং লাইনের ঘুটিয়ারী শরীফের কথা বলছি। সারা দিন-মান ক্যানিং লোকাল-এর কিছুমাত্র অভাব নেই। শেয়ালদা থেকে ঘুটিয়ারী শরীফের দূরত্ব কুড়ি মাইল; সময় লাগে আনুমানিক এক ঘণ্টা। ভাড়া, তৃতীয় শ্রেণীতে পঁচাশি পয়সা; প্রথম শ্রেণীতে চার টাকা। একটু আগেভাগে এসে শেয়ালদা টারমিনাস থেকে উঠলে ইলেকট্রিক ট্রেনের তৃতীয় শ্রেণীতে ভ্রমণ মোটেই কণ্টকর নয়।

দূরত্ব মোটে কুড়ি মাইল ও ট্রেন জার্নির সময় মাত্র এক ঘণ্টা হলেও এ পথের বৈচিত্র্য ভোলবার নয়। শেয়ালদা-রাণাঘাট বা হাওড়া-বর্ধমান মেন লাইনের দুপাশে নোংরা ঘিঞ্জি শহরতলী যেন আর শেষ হতে চায় না; অবিরাম তারা পিছু ধাওয়া করে প্রায় ঘণ্টা-খানেক। শহর থেকে বেরিয়ে পড়বার মধ্যে যে নিঃসীম মুক্তি, উধাও-মনের পাখা মেলবার মধ্যে যে অবাধ আনন্দ তার আস্বাদ পেতে অপেক্ষা করতে হয় অনেকক্ষণ। শেয়ালদা-ক্যানিং লাইনে কিন্তু মাত্র দশ মাইল দূরের সোনারপুর অবধিই নাগরিক কলুষ বিস্তৃত। তারপরে হঠাৎ বন্ধনমোচনের মতো অবারিত মাঠের উদার বিস্তৃতি, দুদিকে দিগন্ত অবধি ফিরোজা-সবুজের সমারোহ, দক্ষিণ সমুদ্র থেকে ধেয়ে-আসা মাতাল বাতাস। সভ্যতার ক্ষত এই অভিশপ্ত শহরের এত কাছে আপনাকে হারিয়ে ফেলবার এমন অবাধ সুযোগ যে অপেক্ষা করে আছে তা নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। স্টেশনগুলোর নামই বা কী অপরূপ মাধুর্যে ভরা—কালিকাপুর, চম্পাহাটি পিয়ালি—যেন সুরেলা গানের এক-একটি কলি। সিম্বারোজো, কোটোপাক্সি—এই স্থানবাচক নামগুলো এক ইংরেজ কবিকে একদা অভিভূত করেছিল। মনে আছে, নামের ঝঙ্কারে আমিও একবার বিমোহিত হয়েছিলাম বহুকাল আগে। সিংহলে গিয়েছিলাম সেবার। উদ্যোগপর্বে যখন ম্যাপ আর চার্ট, নোটবই আর চিঠিপত্র নিয়ে গলদ্ঘর্ম, তখন রাশি রাশি নামের অরণ্য থেকে ধারালো তীরের মতো সহসা ছুটে এসেছিল দুটি নাম—ট্রিংকোমালী, মিহিন্টালে তারপরে পিয়ানোর টুং-টাং সুরের মতো নাম দুটি সর্বক্ষণ কানে বেজেছে। আজও সিংহল প্রসঙ্গে স্থানবাচক এ নাম দুটিই সর্বাগ্রে মনে এসে হৃদয় হরণ করে।

পশ্চিমবাংলায়ও সুমধুর গ্রামের নামের অভাব নেই। চব্বিশ-পরগণার প্রাথরপ্রতিম নদীয়ার বিরহী, পশ্চিম দিনাজপুরের বিরহিণী, মুর্শিদাবাদের কিরীটেশ্বরী, মেদিনী-পুরের মালঞ্চ, হুগলীর চাঁপারুই, বর্ধমানের মৌখিরা, বাঁকুড়ার ঝিলিমিলি, বীরভূমের কীর্ণাহার—কত শত নাম এখনও সমাদরের অপেক্ষায় পথেঘাটে পড়ে আছে। গ্রামের নাম নিয়ে অল্পস্বল্প গবেষণা হয়েছে, কিন্তু আরও অনুসন্ধানের যে যথেষ্ট অবকাশ আছে তাতে সন্দেহ নেই।

গ্রামের নামমাহাত্ম্য থেকে এবার ঘুটিয়ারী শরীফে ফিরে আসা যাক। একই নামের



রেল-স্টেশন। সেখান থেকে সিমেণ্ট-পাথরকুচি-বাঁধানো পথে পীর গাজী মোবারক আলি সাহেবের দরগা ও মসজিদ দু'তিন মিনিটের পথ। পূর্ববঙ্গ রেলপথের প্রচার বিভাগ থেকে ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 'বাংলায় ভ্রমণ' নামক পুস্তকটি থেকে এই বিখ্যাত মুসলিম তীর্থটি সম্বন্ধে কিছু উদ্ধৃতি এখানে হয়ত অপ্রাসঙ্গিক হবে না এইজন্য যে, প্রচুর তথ্য-পূর্ণ এ উপাদেয় গ্রন্থটি বহুদিন অমুদ্রিত থাকায় এখন নিতান্ত দুষ্প্রাপ্য হয়ে পড়েছে। "গাজী সাহেব সম্বন্ধে ঐতিহাসিক তথ্য বিশেষ কিছুই জানা যায় না, তবে নানারূপ প্রবাদ প্রচলিত আছে। যে স্থানে ঘুটিয়ারী শরীফ অবস্থিত উহা মদনমল পরগণার অন্তর্গত। পূর্বে এই অঞ্চল সুন্দরবনের অংশবিশেষ ছিল। কথিত আছে যে গাজী সাহেব অদ্ভুত ক্ষমতাবলে বনের ব্যাঘ্র প্রভৃতি হিংস্র জন্তুকে বশীভূত করিয়া এই অঞ্চলে মনুষ্যের বসতি স্থাপন করেন। তিনি ব্যাঘ্রপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া জঙ্গলে ঘুরিয়া বেড়াইতেন। একবার স্থানীয় জনৈক নাবালক জমিদার, বাদশাহ সরকারে সময়মত খাজনা না দিতে পারায় বাদশাহের আদেশে ধৃত হইয়া রাজধানীতে নীত হন। বালকের জননীর ক্রন্দনে বিচলিত হইয়া গাজী সাহেব প্রকাণ্ড একটি ব্যাঘ্রের পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া রাজধানীতে বাদশাহের দরবারে গিয়া উপস্থিত হন। বলা বাহুল্য, বাদশাহ তাঁহার অদ্ভুত ক্ষমতা দর্শনে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করেন ও বালককে মুক্ত করিয়া দেন। অতঃপর বাদশাহ গাজী সাহেবের নামে মদনমল পরগণার জমিদারী সনদ প্রদান করেন। সুন্দরবনের নিকটবর্তী বহু গ্রামে গাজী মোবারক আলী বা সংক্ষেপত মোবারক গাজী ও তাহার ভ্রাতা কালু হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে পূজিত হন। গাজী সাহেবের দেহত্যাগ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত কাহিনীটি প্রচলিত আছে। একবার ভীষণ অনাবৃষ্টি হইয়া অজন্মা উপস্থিত হইলে শিষ্যগণের অনুরোধে গাজী সাহেব খোদার দরবারে আরজি পেশ করিবার জন্য একটি গৃহের মধ্যে গিয়া উহার অর্গল বন্ধ করিয়া দেন এবং প্রত্যেককে সাবধান করিয়া বলেন যে, যতক্ষণ তিনি ধ্যানস্থ থাকিবেন, ততক্ষণ যেন কেহ গৃহমধ্যে প্রবেশ না করে। ক্রমে ক্রমে তিন দিন চলিয়া গেল, গাজী সাহেবের বাহিরে আসিবার কিন্তু কোনই লক্ষণ দেখা গেল না। তখন জনকয়েক লোক নানারূপ আশঙ্কা করিয়া দরজা ভাঙ্গিয়া

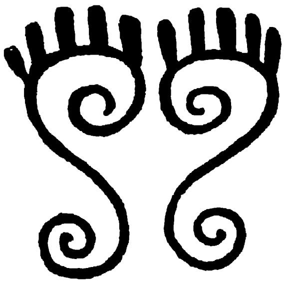
গৃহমধ্যে প্রবেশ করে এবং দেখিতে পায় যে গাজী সাহেবের দেহ সংজ্ঞাহীন অবস্থায় পড়িয়া আছে। তিনি দেহত্যাগ করিয়াছেন মনে করিয়া তাহারা সেই গৃহমধ্যেই কবর খুঁড়িয়া তাঁহাকে সমাহিত করে। সেই দিনই কিন্তু প্রবল বারিপাত হয় ও রাত্রে গাজী সাহেব জনৈক অনুরক্ত শিষ্যকে স্বপ্নে দেখা দিয়া বলেন যে, তাঁহার ধ্যানস্থ দেহকে ভুল-বশত মৃতদেহ মনে করিয়া লোকগুলি তাঁহার কবর দিয়াছে। অম্বুবাচীর সময় এই ঘটনাটি ঘটে। ঘুটিয়ারী শরীফের সুন্দর ও বৃহৎ মসজিদটি গাজী সাহেবের সমাধির উপর নির্মিত। প্রতি বৎসর আষাঢ় ও ভাদ্র মাসে গাজী সাহেবের স্মরণার্থে ঘুটিয়ারী শরীফে দুইটি বৃহৎ মেলা বসে। এই মেলায় বহু মুসলমান ও হিন্দু ভক্ত উপস্থিত হইয়া গাজী সাহেবের দরগাহে শিরনি দিয়া থাকেন।"

পশ্চিমমুখী যে কুঠুরির মধ্যে গাজী সাহেবের মখমলে আবৃত কবরটি অবস্থিত তার সামনের ঢাকা বারান্দায়, প্রবেশপথের দু'পাশে, ক্যাশবাক্স সামনে রেখে দরগাহের পান্ডারা বসে থাকেন। প্রতি বৃহস্পতি ও শুক্রবার, যখন হিন্দু-মুসলমান মিলিয়ে অন্তত হাজার-খানেক যাত্রী আসেন প্রধানত কলকাতার দিক থেকে, তখন পান্ডাদের বেশ ব্যস্ত থাকতে হয়। আষাঢ় মাসের প্রথমদিকে, অম্বুবাচীর সময় পীর সাহেবের উরস্ উপলক্ষে যখন সাতদিনব্যাপী ও ১৭ই শ্রাবণ একদিনব্যাপী আর একটি মেলা ("চন্নন মেলা") বসে, তখন অগণিত ভক্তের ভীড় সামলানোর জন্যে কর্তৃপক্ষকে ইলাহী ব্যবস্থা করতে হয়। যাত্রীরা কবরটি প্রদক্ষিণ করে মখমলের ঢাকনাটি ছুঁয়ে পীরের দোয়া ভিক্ষা করেন, তারপরে পান্ডাদের কাছ থেকে কলাপাতায় মোড়া ছোট এক-একটি পুরিয়া নিয়ে সংলগ্ন দক্ষিণে চতুর্দিকে ঘাট-বাঁধানো এক গোল আকারের পুকুরে গিয়ে যে-আচারটি পালন করেন তা বেশ অভিনব। দু' হাতের আঙুল পরস্পরের মধ্যে গলিয়ে, কলাপাতার পুরিয়াটি তার উপর রেখে জলে হাত ডোবালে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সেটি ভেসে হাতের উপর থেকে কিছু দূরে চলে যায়। তখন অসীম ধৈর্যে জলে হাত ডুবিয়ে তাঁরা উবু হয়ে বসে থাকেন, যতক্ষণ না পুরিয়াটি অলৌকিক শক্তিচালিত হয়ে ডোবানো হাতের উপর আবার ফিরে আসে। যাঁদের আসে না তাঁরা মন্দভাগ্য; যাঁদের আসে তাঁদের মনোবাসনা পূর্ণ হবে, এই বিশ্বাস। আমার কভারেজের দিন বিশেষ ভীড় ছিল না। দেখলাম, জন পাঁচ-সাত মেয়েপুরুষ এভাবে তাঁদের ভাগ্য পরীক্ষা করছেন। অনেকক্ষণ লক্ষ করে আমার মনে হল, খুব কম ক্ষেত্রেই পুরিয়াগুলি ফিরে আসে। কিন্তু তাতে ভক্তজনের বিশ্বাসের কোন হানি হয় বলে মনে হল না।

পীর সাহেবের কবরের ওপর চার মিনার ও এক গম্বুজযুক্ত ইমারতটি বারুইপুরের রায়চৌধুরী পরিবারের স্বনামখ্যাত রাজবল্লভ রায়চৌধুরী নির্মাণ করিয়ে দেন বলে জনশ্রুতি। আর এক কিংবদন্তী অনুসারে, রায়চৌধুরী পরিবারের আদি পুরুষ মদন রায়ই (যিনি প্রতাপাদিত্যের সেনাপতি ছিলেন ও মানসিংহের কাছে প্রতাপাদিত্যের পরাজয়ের পর সেকালের সুন্দরবনের বিস্তীর্ণ অংশ জুড়ে মদনমল্ল পরগণার অধিপতি হন) নাকি খাজনা খেলাপের দায়ে যখন পলাতক জীবনযাপন করছিলেন, গাজী মোবারক আলি তাঁকে ধরা দিতে বলেন ও সরকারী সেরেস্তায় খাজনার হিসাব যাচাই করে দেখা যায় যে, বাকি রাজস্বের পরিমাণ অলৌকিকভাবে মাত্র এক টাকায় পরিণত হয়েছে। (সতীশ-চন্দ্র মিত্র প্রণীত 'যশোহর-খুলনার ইতিহাস' গ্রন্থের দ্বিতীয় খন্ডের ২৮৫ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে : "মেদন্মল বর্তমান ২৪-পরগণার অন্তর্গত বারুইপুর প্রভৃতি স্থান লইয়া গঠিত প্রাচীন পরগণা")। খাজনা খেলাপের দায় থেকে অব্যাহতি পেয়ে মদন রায় নাকি এ অঞ্চলে গাজী সাহেবের মাহাত্ম্য প্রচার করেন। এখনও অম্বুবাচীর সময়কার বার্ষিক উৎসবে বারুইপুরের 'বাবু'রা অর্থসাহায্য করে থাকেন ও তাঁদের দেওয়া শিরনি প্রথমে

নিবেদিত হবার পরে অন্যেরা পীরের দরগায় শিরনি দিতে পারেন।

বাঙালী হিন্দু ও মুসলমান দুই ভিন্ন জাতি এই প্রলাপে এখনও যাঁরা বিশ্বাস করেন, তাঁরা মোসলেম তীর্থ ঘুটিয়ারী শরীফে যে কোন জমায়েতের দিন উপস্থিত হলে দেখতে পাবেন, এখানে আগত হিন্দু ভক্তের সংখ্যাই বেশী। ধর্মের ক্ষেত্রে বাঙালী হিন্দু ও বাঙালী মুসলমানের এহেন নৈকট্যের দৃষ্টান্ত গ্রাম-বাংলায় আরও অনেক আছে।

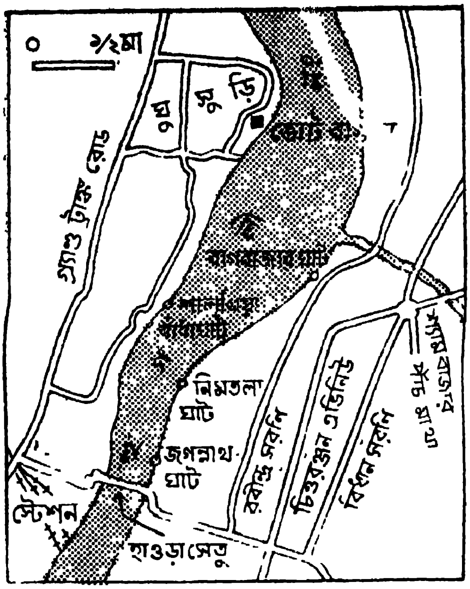


ভোটবাগান

'ভোট' অর্থে ভুটিয়া বা তিব্বতী, আর 'বাগান' অর্থে প্রশস্ত ভূমির মধ্যে তাঁদেরই এক আস্তানা—যেমন বারাকপুরের লাটবাগান বলতে বোঝায় সেখানকার লাটভবনকে। হাওড়া শহরের অতি ঘিঞ্জি ঘুসুড়ি এলাকায় তিব্বতীরা কিভাবে এসে এই মঠ স্থাপন করলেন সে এক আরব্য-উপন্যাসের মতো কাহিনী। পরে সে প্রসঙ্গে আসছি। প্রথমে, কি করে সেখানে পৌঁছনো যায় তার হদিস দিয়ে নিই। ঘুসুড়ির এ-গলি সে-গলি করতে করতে নানাজনের নানা পথনির্দেশ (কখনও বা বিপরীত নির্দেশ) মানতে মানতে কখন যে কিভাবে এই তিব্বতী আশ্রমে এসে পৌঁছলাম—বিশ্বাস করুন—তা সঠিক বলতে পারব না। আমি এতই গ্রাম্য ও সেকেলে যে শহরের গলিঘুঁজিতে এলে যেন পড়ি সমুদ্রে, আর ঘুসুড়ির মতো অঞ্চল হলে—মহাসমুদ্রে। উৎসাহী পাঠক যদি ভোটবাগান পরিদর্শনের ইচ্ছা পোষণ করেন, তবে হাওড়া স্টেশনের সামনে থেকে বালীখালগামী বাসে (যা ঘুসুড়ি হয়ে যায়) সওয়ার হয়ে ঘুসুড়িতে এসে নামবেন। তারপরে পথচারীদের কাছে মহাকাল মঠ বা শঙ্কর মঠের নাম করতে করতে (স্থানীয় লোকের কাছে ভোটবাগান এই নামেই পরিচিত) দেখবেন, যথাসময়ে ৫নং গোঁসাইঘাট রোডে অবস্থিত আপনার লক্ষ্যে পৌঁছে গেছেন।

সেখানে পৌঁছে কিন্তু আশ্চর্য হবেন এই দেখে যে তথাকথিত তিব্বতী মঠের চেহারায় কিছুমাত্র তিব্বতিয়ানা নেই। মঠের পুরনো বিবরণ ইত্যাদি থেকে মনে হয় আদিতে তিব্বতী স্থাপত্যের হয়ত বেশ ছাপ ছিল এ ইমারতে, কিন্তু কয়েকবার সংস্কারের ফলে এখন তার কোন চিহ্ন খুঁজে পাওয়া শক্ত। প্রধান দোতলা দালানটি ছাড়া আর আছে দশটি ছোট-বড় সমাধিমন্দির, যেগুলির নীচে মঠের বিভিন্ন মহন্ত সমাহিত আছেন। এদের মধ্যে যেটি সবচেয়ে বড় তার পিতলের প্রতিষ্ঠালিপি থেকে জানা যায় যে ১৭১৭ শকাব্দে বা ১২০২ বঙ্গাব্দে (মে, ১৭৯৫) পুরণ গিরি মহন্তের সমাধির উপর এটি নির্মিত হয়েছিল।

কে এই পুরণ গিরি? আমার বিবেচনায় তাঁর মতো এক অদ্ভুতকর্মা পুরুষ ভারত-ইতিহাসে বিরল অথচ তাঁর সম্বন্ধে সাধারণের বিশেষ কোন জ্ঞান আছে বলে মনে হয় না। তিনি ১৭৪৩ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দ অবধি মাত্র ৫২ বছরের জীবনে একাধারে গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী, ক্লান্তিহীন ভূপর্যটক, দূরদর্শী কূটনীতিক ও বুদ্ধিমান ব্যবসায়ী হিসাবে যে অসামান্য কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন, তা স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকবার যোগ্য। 'গিরি' উপাধি থেকেই বোঝা যায় তিনি ছিলেন দশনামী শৈব-সম্প্রদায়-ভুক্ত। এই সন্ন্যাসীগোষ্ঠী সম্বন্ধে শ্রীঅক্ষয়কুমার দত্ত তাঁর 'ভারতবর্ষীয় উপাসক



'সম্প্রদায়' গ্রন্থে লিখেছেন যে তাঁরা শঙ্করাচার্যের শিষ্য-পরম্পরা। শঙ্করাচার্যের শিষ্যদের মধ্যে চারজন ছিলেন প্রধান—পদ্মপাদ, হস্তামলক, মণ্ডন ও তোটক। পদ্মপাদের প্রধান দুই শিষ্য—তীর্থ ও আশ্রম; হস্তামলকের দুই—বন ও অরণ্য; মণ্ডনের তিন—গিরি, পর্বত ও সাগর আর তোটকের তিন—সরস্বতী, ভারতী ও পুরী। প্রথম চারজন মঠাচার্যের দশ-জন শিষ্য থেকে দশনামী সম্প্রদায়ের উৎপত্তি। এই বিশেষ সন্ন্যাসীকুল সম্পর্কে এখানে বিস্তৃতভাবে লিখবার অবকাশ না থাকলেও এটুকু বলা যেতে পারে যে, পশ্চিমবাংলায় তাঁদের প্রতিষ্ঠিত মঠগুলি প্রধানত হাওড়া ও হুগলী জেলায় অবস্থিত ও সেগুলি তারকেশ্বরের কেন্দ্রীয় মঠের অধীন।

পুরণ গিরি সম্বন্ধে সম্ভবত প্রথম অনুসন্ধান করেন জোনাথান ডানকান নামে এক ইংরেজ ভদ্রলোক, যিনি বাংলাভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন ও ১৭৮৫ খৃষ্টাব্দে 'ইম্পে কোড' নামক তৎকালীন এক আইন-গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ করেন। পুরণ পুরীর (ডানকান তাঁকে পুরী বলেই অভিহিত করেছেন) জীবনকাহিনী তাঁর কাছ থেকেই সংগ্রহ করে তিনি 'এসিয়াটিক রিসার্চেস'-এর পঞ্চম খণ্ডে তা প্রকাশ করেন। সে বিবরণী থেকে জানা যায়, পুরণ পুরী (গিরি) ন' বছর বয়সে গৃহত্যাগ করে সন্ন্যাসী হন। ডানকানকে অনুসরণ করে অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয়ও তাঁর 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়' গ্রন্থে তাঁকে এক ঊর্ধ্ববাহু সাধু ও তাঁর পদবী 'পুরী' বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি লিখেছেন—"আমাদের এই ঊর্ধ্ববাহু ঠাকুরটি অনুগ্রহ করিয়া দুই একবার রাজকার্যও করিয়া দিয়াছেন। তিনি যে সময় ভোটদেশের (তিব্বতের) রাজধানীতে অবস্থিতি করিতেছিলেন, সে সময় তথাকার রাজপুরুষেরা তাঁহার দ্বারা গভর্নর-জেনারেল হেস্টিংসের সমীপে রাজকার্য সংক্রান্ত কতকগুলি কাগজপত্র প্রেরণ করেন এবং তিনি সেই সমস্ত লইয়া বারওয়েল এবং এলিয়ট সাহেবের সমক্ষে (হেস্টিংসকে) অর্পণ করিয়াছিলেন। আর একবার তাঁহাকে কাশী নগরীতে রাজা চেত সিং ও তাঁহার রেসিডেণ্ট গ্রেহামের নিকট পাঠাইয়া দেওয়া হয়।"

এ সব দৌত্যকার্যের মারফত পুরণ গিরি ও হেস্টিংসের যোগাযোগই যে ভোটবাগান

মঠের প্রতিষ্ঠার কারণ, সেকথা পরে বলছি। প্রথমে তাঁর দীর্ঘ ভ্রমণকাহিনীর কথা বলি। কেননা, স্থলপথে ভূপর্যটনে তিনি যে অনেক বেশী প্রসিদ্ধ ফাহিয়ান, হিউয়েন সাং বা মার্কো পোলোর চেয়ে কিছু কম ছিলেন না সেকথা সুবিদিত নয়। ঠিক কোন্ বয়সে তিনি তাঁর পরিভ্রমণ শুরু করেন তা জানা না গেলেও, নিতান্ত অল্প বয়সেই যে তা আরম্ভ হয় এমনই মনে হয়। তা না হলে, তখনকার অনগ্রসর পরিবহণ ব্যবস্থায় এই স্বল্পায়ু সন্ন্যাসীর পক্ষে এত দেশদেশান্তরে যাওয়া সম্ভব হত না। রামেশ্বরে তীর্থ সেরে প্রথমে তিনি যান সিংহলে। সেখান থেকে সমুদ্রপথে মালয়ে। তারপরে জাহাজে করে দেশে ফিরে মালাবার, কোচিন, দ্বারকা ও হিংলাজ হয়ে উপস্থিত হন কাবুলে। গজনীর কাছে আহমদ শা আবদালীর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎকার বিষয়ে যে কৌতূহলোদ্দীপক কাহিনীটি প্রচলিত আছে, তা থেকে তাঁর কূটনীতিক প্রতিভার পরিচয় মেলে। হিন্দু সাধুদের অলৌকিক ক্ষমতার কথা শুনে আহমদ শা তাঁর নাকের উপর পুরানো ক্ষতটি নিরাময়ের জন্য তাঁর শরণাপন্ন হন। চিকিৎসাবিদ্যায় পারদর্শিতা ও অলৌকিক ক্ষমতা কোনটাই না থাকায় পুরণ গিরি বললেন, যেহেতু আহমদ শা'র রাজ্যপ্রাপ্তি ও এই ক্ষতের আবির্ভাব একই সময়ের ঘটনা, সেজন্য দু'য়ের মধ্যে যোগাযোগ অতি স্পষ্ট। অতএব ক্ষত সেরে গেলেই তিনি রাজ্যচ্যুত হবেন। ধাপ্পাটা সবাই মেনে নিলে। চতুর সন্ন্যাসীও কাবুলে আর কালহরণ না করে খোরাসান ও হীরাট হয়ে কাশ্যপ সাগরের তীরে গিয়ে পেঁছিলেন। সেখানে নাগি-'বাকি'র কাছে (বর্তমান পেট্রোলিয়ামকেন্দ্র বাকু?) তিনি এক গহবর-নিসৃত অগ্নিপ্রবাহ দেখতে পান। (কোন পেট্রোল-কূপের মুখের কাছে আগুন ধরে গিয়ে হয়ত এবকম ঘটে থাকতে পারে)। এরপর কাশ্যপ সাগর অতিক্রম করে তিনি যান আস্ত্রাকানে। সেখানে বহু হিন্দু অধিবাসী নাকি তাঁকে সাদর অভ্যর্থনা জানায়। অতঃপর এক জমাট বরফের নদী (ভল্গা?) পার হয়ে আঠারো দিন হেঁটে তিনি মস্কো নগরীতে গিয়ে উপস্থিত হন। সেখানে কিছুদিন থেকে, দেশে ফিরবার পথে তিনি ইরানের তাব্রিজ ও ইস্পাহান হয়ে বসরায় পেঁছিন। সেখানে এক হিন্দু মন্দিরে দুটি দেবমূর্তি ও বহু হিন্দু অধিবাসীর তিনি সাক্ষাৎ পান। তাঁর বিবরণ থেকে মনে হয়, সে সময়ে মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন জায়গায় স্থায়ী হিন্দু উপনিবেশ ছিল। অবশেষে তিনি মস্কট হয়ে সুরাটে ফিরে আসেন।

দ্বিতীয় বার ভূপর্যটনে বার হয়ে তিনি বাল্খ, বোখারা ও সমর দ দেখে কাশ্মীরের মধ্য দিয়ে গঙ্গোত্রী ও যমুনোত্রী পরিক্রমা করে ফিরে আসেন। আর এক-বার তিনি নেপালে যান ও সেখান থেকে অতি দুর্গম ও অপরিচিত পথে মানস-সরোবর ও ব্রহ্মপুত্র নদের উৎসস্থান পরিভ্রমণ করে তিব্বতে যান। দীর্ঘকাল সেখানে বসবাস করে তিনি তিব্বতী ভাষা ও ধর্মশাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। সে সময়ে দালাই লামা নাবালক থাকায়, তাশী লামা তাঁর অভিভাবক হিসাবে তিব্বতের কর্তা ছিলেন। তাঁদের দু'জনের মধ্যে তখন যে অন্তরঙ্গতার সৃষ্টি হয় তারই ফলে পুরণ গিরি তাঁর জীবনের কূটনীতিক পর্যায়ে উপনীত হন।

পুরণ গিরির বয়স যখন ২৯ বছর, তখন, ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে, বঙ্গদেশের গভর্নর হয়ে এলেন ওয়ারেন হেস্টিংস। পরের বছর এ পদটি গভর্ণর-জেনারেলের মর্যাদায় উন্নীত হয় ও হেস্টিংস বোম্বাই ও মাদ্রাজ সরকারের উপর কর্তৃত্ব করবার অধিকার লাভ করেন। ১৭৭২ থেকে ১৭৮৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত বাংলা তথা ভারতে ইংরেজ শাসনের সর্বোচ্চ দায়িত্ব তাঁরই উপর ন্যস্ত ছিল। সমকালীন ইংলণ্ডে শিল্পবিপ্লবের ফলে যন্ত্রজাত পণ্য বিক্রির জন্য ভারতের ঔপনিবেশিক বাজার আরও সম্প্রসারিত করা বিশেষ প্রয়োজন হয়ে পড়ে। উত্তর-বাংলার হিমালয়ের পাদদেশীয় যাবতীয় অঞ্চল, মায় কোচবিহার, তখন

ভুটানের প্রত্যক্ষ প্রভাবাধীন ছিল। ১৭৬৯ খ্রীষ্টাব্দে কোচবিহারের রাজা রুদ্রনারায়ণ ভুটানরাজের বিরাগভাজন হলে তাঁকে বন্দী করে ভুটানে নিয়ে যাওয়া হয় ও সিংহাসনে বসানো হয় তাঁর ভাই রাজেন্দ্রনারায়ণকে। ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে, বন্দী অবস্থায়, রুদ্রনারায়ণের মৃত্যু হলে তাঁর পুত্র ধরেন্দ্রনারায়ণ কিছুদিনের জন্য রাজা হন, কিন্তু অল্পকাল পরেই ভুটান গোটা কোচবিহার রাজ্যটি দখল করে নেয়। ধরেন্দ্রনারায়ণ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর সাহায্যপ্রার্থী হলে ১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজরা কোচবিহার অধিকার করে। অন্যদিকে, ভুটানরাজ তিব্বত ও চীনের সহায়তা চাইলে তিব্বতের বিচক্ষণ রাজনীতিক তাশী লামা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর প্রতাপের কথা মনে রেখে ভুটানরাজকে বিরোধ মিটিয়ে ফেলতে বলেন ও মীমাংসা যাতে সহজতর হয়, সেজন্য পুরণ গিরির মারফত হেস্টিংসের কাছে এক চিঠি পাঠান। আদিতে ভারতীয় কিন্তু এখন এক বিদেশী রাষ্ট্রের দূত হিসাবে এক নবীন সন্ন্যাসী কলকাতায় এসে হেস্টিংস ও তাঁর দুই কাউন্সিলার—বারওয়েল ও এলিয়টের সঙ্গে দেখা করলেন। তাঁর সফল দৌত্যের ফলে স্থির হল, ইংরেজরা ভুটানের সঙ্গে সন্ধি করবেন ও বেঙ্গল সিভিল সার্ভিসের তরুণ সিভিলিয়ান জর্জ বোগলের নেতৃত্বে এক প্রতিনিধিদল তিব্বতের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ কূটনীতিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপনের জন্য লাসায় যাবে। এ বিষয়ে পুরণ গিরির অবশ্যই কিছু কৃতিত্ব ছিল, কিন্তু বিলেতী পণ্যের বাজার বাড়ানোর আগ্রহটাই হেস্টিংসকে সবচেয়ে বেশী প্রভাবিত করে থাকবে। তিনি পুরণ গিরির দক্ষতা ও দেশভ্রমণের অভিজ্ঞতায় মুগ্ধ হয়ে তাঁকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর প্রতিনিধিরূপে তিব্বতে পাঠানো স্থির করেন ও গিরি সে প্রস্তাবে রাজী হয়ে ১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দে লাসায় ফিরে যান। ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত মিঃ মারখাম রচিত 'ন্যারেটিভ্‌স অব বোগলে' গ্রন্থে বোগলের জবানীতে একথা বলা হয়েছে যে, তাশী লামার সঙ্গে বোগলে মিশনের আলাপ-আলোচনায় পুরণ গিরি খুবই উল্লেখযোগ্য অংশ গ্রহণ করেন।

সফল বোগলে মিশন কলকাতায় ফিরে এল তাশী লামার কাছ থেকে এক অনুরোধ নিয়ে যে, হেস্টিংস যেন ইংরেজদের রাজধানী কলকাতার কাছাকাছি গঙ্গাতীরে কিছু জমির বন্দোবস্ত করে দেন, যেখানে তিব্বতী কূটনীতিক প্রতিনিধিরা থাকতে পারেন ও পুরণ গিরির তত্ত্বাবধানে এক মঠ নির্মাণ করে সে দেশের বণিক ও তীর্থযাত্রীদের আশ্রয়ের ব্যবস্থা করা যায়। গৌরদাস বসাক ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দের বঙ্গীয় এসিয়াটিক সোসাইটি জর্নালে (প্রথম খণ্ড) ভোটবাগান মঠের প্রতিষ্ঠা সম্পর্কিত যাবতীয় তথ্য উদ্ধার করে যে দীর্ঘ প্রবন্ধ লেখেন, তা থেকে জানা যায় হেস্টিংস ঔপনিবেশিক স্বার্থেই এ ব্যাপারে অগ্রণী হয়ে হাওড়ার ঘুসুড়িতে ১০০ বিঘা ও ৫০ বিঘার দুটি সংলগ্ন প্লট বন্দোবস্ত করে দেন। এই জমিতেই পাঞ্চেন লামার অর্থানুকূল্যে ও পুরণ গিরির প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে ভোটবাগান মঠের প্রতিষ্ঠা হয়।

ভোটবাগান মঠ প্রতিষ্ঠিত হবার পর পুরণ গিরি কিছুদিন সেখানে বসবাস করেন। এদিকে হেস্টিংস ভাবলেন, মঠ প্রতিষ্ঠার সুবন্দোবস্ত করে দেওয়ায় তাশী লামা যেহেতু অনুগৃহীত বোধ করেছেন, সেজন্য তাঁর সহায়তায় বিলাতী পণ্যের বাজার হয়ত তিব্বত ছাড়িয়ে চীন অবধি প্রসারিত করা যেতে পারে। পুরণ গিরির কাছ থেকে তিনি নিশ্চয়ই শুনে থাকবেন যে, আধ্যাত্মিক জ্ঞান ও পূত চরিত্রের জন্য তাশী লামার খ্যাতি তাবৎ বৌদ্ধজগতে দূরবিস্তৃত ছিল। এই কারণেই সমকালীন চীন-সম্রাট বেশ কিছুদিন ধরে তাশী লামার কাছে দীক্ষা নিয়ে তাঁকে গুরুপদে বরণ করবার আমন্ত্রণ জানাচ্ছিলেন। হেস্টিংস স্থির করলেন, পুরণ গিরি ও বোগলেকে তাশী লামার সঙ্গে চীনে পাঠাবেন। কিন্তু চীন-সম্রাটের আগাম অনুমতি ছাড়া তাঁর রাজসভায় বোগলের মতো এক অনাহূত

ফিরিঙ্গীর উপস্থিতি ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি করতে পারে ভেবে ঠিক হল, শুধু পুরণ গিরিই তাশী লামার সঙ্গে চীনে যাবেন; পরে অবস্থা বুঝে বোগলকে পাঠানো হবে। পুরণ গিরি সেইমত তিব্বতে পেঁছবার পর, ১৭৭৯ খৃষ্টাব্দের মাঝামাঝি, তাশী লামা পিকিং রওনা হন। এই ভ্রমণের এক চমকপ্রদ বিবরণ পরবর্তীকালের জন্য রক্ষিত হয়েছে। পুরণ গিরির লেখা সে রোজনামচাটির এক ইংরেজী অনুবাদ হেস্টিংস-এর কাছ থেকে সংগ্রহ করে আলেকজাণ্ডার ডালি রিম্পল্ নামে জনৈক ইংরেজ ১৮০৮ খৃষ্টাব্দের 'ওরিয়েণ্টাল রিপারটরি'তে তা প্রকাশ করেন। এই ভ্রমণবৃত্তান্তে পথের ও চীন-সম্রাটের দরবারের বিস্তৃত বর্ণনার মধ্য দিয়ে পুরণ গিরির পর্যবেক্ষণক্ষমতা ও রচনাকৌশল খুবই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। পিকিং-এ পেঁছবার আগেই চীন-সম্রাট এগিয়ে এসে আর এক শহরে তাশী লামাকে অভ্যর্থনা করেন ও সেখানকার বিরাট রাজপ্রাসাদেই দীক্ষাদান সম্পন্ন হয়। তারপর রাজধানীতে গিয়ে সম্মানিত অতিথিদের মহাসমারোহে অভিনন্দিত করা হয় দ্বিতীয় বার। যে বৃহৎ প্রাসাদে তাশী লামা ও পুরণ গিরির থাকবার ব্যবস্থা হয়েছিল, চীন-সম্রাট মাঝে মধ্যে সেখানে আসতেন। এখানেই তাশী লামার মধ্যস্থতায়, পুরণ গিরি চীন-সম্রাটের দেখা পান ও তাঁকে জানান যে, তিব্বতের দক্ষিণে সম্প্রতি এক ফিরিঙ্গী-রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, যার আয়তন চীনের থেকে অনেক ছোট হলেও সামরিক শক্তি কম নয় এবং তার শাসনকর্তা ওয়ারেন হেস্টিংস চীন-সাম্রাজ্যের সঙ্গে বন্ধুত্বের অভিলাষী। পুরণ গিরির সৌজন্যে সন্তুষ্ট হয়ে চীন-সম্রাট ভারতবর্ষের ফিরিঙ্গী রাজার কাছে এক পত্র পাঠাবেন স্থির হল। কিন্তু এই সময়ে, ১৭৮০ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে, বসন্তরোগে আক্রান্ত হয়ে তাশী লামা পিকিংয়েই দেহরক্ষা করলেন। যে শববাহীদল তাঁর মরদেহ তিব্বতে নিয়ে এল, পুরণ গিরি তাঁদের সঙ্গেই রওনা হয়ে ফিরে এলেন কলকাতায়।

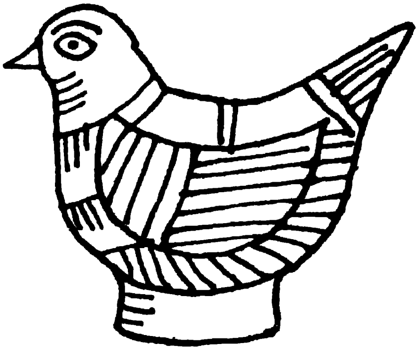
বছর তিনেকের মধ্যেই লামারা এক শিশুর মধ্যে তাশী লামার পুনরাবির্ভাব কল্পনা করে তিব্বতী প্রথা অনুসারে তাঁকেই ধর্মগুরুর শূন্য গদিতে বসালেন। এই অভিষেক-উৎসব উপলক্ষে ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে হেস্টিংস আবার পুরণ গিরি ও স্যামুয়েল টার্নার নামে এক মিলিটারী অফিসারকে তিব্বতে পাঠান। শেষোক্ত ব্যক্তির লেখা ও ১৮০০ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত 'এম্ব্যাসী টু টিবেট্' গ্রন্থে এই ভ্রমণের যে বিবরণ দেওয়া হয়েছে, তাতে পুরণ গিরির বারংবার সপ্রশংস উল্লেখ আছে। পুরণ গিরি শেষবার তিব্বতে যান ১৭৮৫ খৃষ্টাব্দে। তখন হেস্টিংস গভর্নর-জেনারেলের পদে ইস্তফা দিয়ে দেশে ফিরে গেলেও পরবর্তী বড়লাট ম্যাকফার্সন এই দৌত্য-যাত্রায় সানন্দে সম্মতি দেন। কিছুদিন পরে দেশে ফিরে এসে পুরণ গিরি ভোটবাগান মঠেই স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করলেন। পর পর দু'জন বড়লাটের স্নেহভাজন এই দশনামী সন্ন্যাসীটির তখন কলকাতার সরকারী মহলের উঁচুতলায় খুবই নামডাক। পরবর্তী গভর্নর-জেলারেল লর্ড কর্নওয়ালিস (১৭৮৬-৯৩) ও সার জন শোর-এর (১৭৯৩-৯৮) আমলেও এ প্রতিপত্তি অক্ষুণ্ণ ছিল। তিব্বত ও চীন সম্পর্কিত সব বিষয়েই তাঁর পরামর্শ নেওয়া হত এবং লাটসাহেবরাও তাঁর সঙ্গে দেখা করবার জন্য মাঝে মধ্যে ভোটবাগানে যেতেন।

ব্রিটিশ মহলে যাঁর এত খ্যাতি, তিব্বতী মহলেরও তিনি কম আস্থাভাজন ছিলেন না। প্রধানত তাঁরই ব্যক্তিত্বের জন্য ভোটবাগান অচিরেই তিব্বতী তীর্থযাত্রী ও বণিকদের এক বড় কেন্দ্রে পরিণত হল। লামারা তো সংবৎসর শহু সংখ্যায় আসতেনই, আর আসতেন নানা শ্রেণীর তিব্বতী ব্যবসায়ী, যাঁদের অগাধ বিশ্বাস ছিল পুরণ গিরির উপর। এই আস্থাকে কাজে লাগানোর মধ্য দিয়ে তাঁর বহুমুখী চরিত্রের বৈষয়িক দিকটিরও দেখা মেলে। ভারতের বাজারে তখন তিব্বতী সোনার প্রচুর চাহিদা ছিল এবং ভোটবাগান মঠেই এই চালানী সোনা প্রতি বৎসর আমদানী হত প্রচুর পরিমাণে। আরও আশ্চর্যের

কথা, পুরণ গিরি নিজেই এ ব্যবসায়ে লিপ্ত ছিলেন ও বিক্রি হওয়া অবধি গচ্ছিত সোনা রক্ষণাবেক্ষণ করতেন। ভোটবাগান স্বর্ণভাণ্ডারের বিপুলতার কথা লোকমুখে প্রচারিত হতে দেরি হল না। ফলে ১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দের এক রাতে ডাকাত পড়ল সেখানে। ঘুসুড়ি তখন আজকের মতো জনবহুল অঞ্চল ছিল না। সামান্য কিছু কর্মচারী ও সন্ন্যাসী নিয়ে বিরাট ডাকাতের দলকে বাধা দিতে গিয়ে পুরণ গিরি সড়কির আঘাতে গুরুতরভাবে আহত হলেন। দস্যুরা সোনাদানা লুঠ করে চলে গেল। এ খবর কলকাতায় পেঁছসে বড়লাট তাঁর ব্যক্তিগত চিকিৎসককে পাঠালেন। কিন্তু প্রায় দেড় দিন বেঁচে থেকে মাত্র ৫২ বছর বয়সে বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী এই অদ্ভুতকর্মা সন্ন্যাসীর জীবনদীপ নিবে গেল। পুরণ গিরির প্রধান শিষ্য দলজিৎ গিরির কাছে ঘটনার বৃত্তান্ত শুনে বড়লাট ডাকাতদের ধরবার জন্য যে কড়া হুকুম দিলেন, তাতে দলের চারজন কিছুদিনের মধ্যেই ধরা পড়ল। বিচারে তাদের ফাঁসির আদেশ হলে, ভোটবাগান মঠের প্রাঙ্গণেই তাবৎ জনতার সামনে তাদের নাকি ফাঁসি দেওয়া হয়।

দশনামী সম্প্রদায়ের মহন্তদের সমাহিত করবার ব্যাপারে এক বিশেষ রীতি প্রচলিত আছে। কবরের মতো গর্ত খুঁড়ে তাঁদের মৃতদেহ উপবিষ্ট অবস্থায় সমাহিত করা হয়ে থাকে। পুরণ গিরিকে যেখানে এভাবে সমাধিস্থ করা হয়, সেখানে পরে এক মাঝারি গড়নের আটচালা-মন্দির নির্মাণ করিয়ে দেন তাঁর প্রধান শিষ্য দলজিৎ গিরি। এই সন্ন্যাসী সম্প্রদায় বিশ্বাস করেন, মৃত্যুর পরে জীবের শিবত্বপ্রাপ্তি ঘটে। সেজন্য এজাতীয় সমাধি-সৌধে তাঁরা সর্বদাই শিবলিঙ্গের প্রতিষ্ঠা করে থাকেন। এখানেও তাই করা হয়েছে। গর্ভগৃহে প্রবেশপথের উপরে যে প্রতিষ্ঠালিপিটি নিবদ্ধ আছে, তা পিতলের পাতের উপর খোদাই করা। এহেন ধাতব প্রতিষ্ঠাফলক পশ্চিমবঙ্গের খুব কম মন্দিরেই দেখেছি।

কয়েকবার সংস্কারের ফলে প্রধান মঠের আকারপ্রকারে আজ যে তিব্বতিয়ানার কোন ছাপ নেই সেকথা আগেই বলেছি। কিন্তু উপাসিত মূর্তিগুলি খাঁটি তিব্বতী বা চৈনিক। তিব্বত এবং চীন থেকে পুরণ গিরিই সেগুলি সংগ্রহ করে এনেছিলেন। কারুকার্যের দিক থেকেও তারা অপূর্ব। প্রধান প্রবেশদ্বার দিয়ে ভিতরের প্রাঙ্গণে ঢুকে তার বিপরীত প্রান্তে সমতল ছাদের যে দালান-মন্দিরে উপস্থিত হওয়া যায়, সেখানে মূর্তিগুলি রক্ষিত। অতি বিশদ ও সুচারু কারুকার্যে মণ্ডিত পিতলের এক বৃহৎ সিংহাসনের উপর চতুর্মুখ শিব, তিনটি মহাকাল ও একটি দুর্গামূর্তি স্থাপিত। সব ক'টিই খুব ছোট আকারের—মাঝখানের মহাকাল মূর্তিটি সবচেয়ে বড় হলেও তার উচ্চতা ছ'ইঞ্চির বেশী নয়। সিংহাসনের বাঁয়ে যে ধাতব তারামূর্তিটি আছে তার উচ্চতা প্রায় দু'ফুট ও সেটির কারিগরি খুব উচ্চাঙ্গের। এসব দেবদেবীর নিত্যপূজা মঠের সামান্য আয় থেকেই চালানো হয়। সামান্য বলছি এজন্য যে, সাবেককালের তিব্বতী সাহায্য লুপ্ত হয়েছে অনেক দিন। দশনামী সম্প্রদায়ের অন্যান্য কেন্দ্রে—যেমন তারকেশ্বরে—সাধারণ বাঙালীর পৃষ্ঠপোষকতা যতটা সহজলভ্য, ভোটবাগানে তা নয়। কেননা, এখানকার বৌদ্ধ দেবদেবীরা শিবের মতো জনপ্রিয় দেবতা নন। ফলে প্রণামীর অঙ্কটা তুলনায় অনেক কম। তাছাড়া শিল্পপ্রসারের দরুন মঠের বহু জমি হস্তান্তরিত হয়েছে। সম্পত্তির মোকদ্দমায় রিসিভারও নিযুক্ত হয়েছে কয়েকবার। হেস্টিংসের দেওয়া ১৫০ বিঘা জমির মধ্যে সেজন্য ৫ বিঘাও এখন অবশিষ্ট আছে কিনা সন্দেহ। একদা ভারত-তিব্বত সংস্কৃতির মিলনস্থল এ কেন্দ্রটির এখন একেবারে অন্তিম দশা। সে দুর্গতি থেকে একে আর উদ্ধার করা যাবে বলে মনে হয় না।



পাকুড়হাঁস

শ্রদ্ধেয় শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন মহাশয়ের কাছ থেকে সম্প্রতি একটি চিঠি পেয়েছি। তাতে বীরভূম ও মুর্শিদাবাদ জেলার গ্রামীণ পটুয়াদের সম্বন্ধে তিনি নানাবিধ প্রত্যক্ষ বিবরণ দিয়েছেন যা গুরুসদয় মিউজিয়মের পট-সংগ্রহের বর্ণনাকালে ইচ্ছা থাকলেও আমি লিখবার অবকাশ পাইনি। বীরভূম জেলার কুড়মিঠা গ্রামে তাঁর পল্লীনিবাসে একাধিকবার ও জাতীয় অধ্যাপক ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের কলকাতার বাসভবনে বহুবার তাঁর পদপ্রান্তে বসবার যে সুযোগ আমার হয়েছে, তাকে আমি দুর্লভ সৌভাগ্য বলে মনে করি। তিন খণ্ডে প্রকাশিত তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'বীরভূম বিবরণ'-এর উপাদান সংগ্রহের জন্য কী অমানুষিক পরিশ্রম যে তাঁকে করতে হয়েছে, সে কথা তখন শুনেছি। আজ থেকে পঞ্চাশ-ষাট বছর আগে, গ্রামীণ যানবাহন বলতে যখন গরুর গাড়ি ছাড়া আর কিছুই ছিল না, তখন এই জ্ঞানতপস্বী হয় গোযানে নয় এক মজুরের বাঁক থেকে ঝোলানো দুই ঝুড়িতে তাঁর জিনিসপত্র চাপিয়ে পায়ে হেঁটে বীরভূম ও সংলগ্ন জেলাগুলির দূরদূরান্তরে ঘুরে বেড়িয়েছেন অনাহারে অনিদ্রায়। শারীরিক ক্লেশ তুচ্ছ করে, সরেজমিনে (লাইব্রেরী থেকে নয়) দেশকে জানবার প্রেরণা যাঁদের কাছ থেকে পেয়েছি তাঁদের মধ্যে তাঁর স্থান শীর্ষে। সেজন্য তাঁরই জেলা বীরভূমের এক পটুয়াদের গ্রাম পাকুড়হাঁস সম্বন্ধে আজ কিছু লিখব স্থির করেছি।

বোলপুর-লাভপুর বাস রুটে নানুরে নেমে, কাঁচা রাস্তায় মাইল তিনেক পুবে পাকুড়হাঁসে পৌঁছনো যায়। একদা বর্ধিষ্ণু এ গ্রামে বছর চল্লিশ আগে গুরুসদয় দত্ত মহাশয় বেশ কয়েক ঘর পটুয়ার বাস দেখেছিলেন। সেকথা তাঁর লেখা 'পটুয়া সঙ্গীত' গ্রন্থে উল্লেখিত হয়েছে। তাঁরা নিজেদের আঁকা পট দেখিয়ে ও গান গেয়ে কাছাকাছি গ্রামে বা মেলায় 'ভিক্ষা' করে বেড়াতেন। 'ভিক্ষা' কথাটির স্থানীয় অর্থ ঠিক begging নয়; সঙ্গীত সহযোগে জড়ানো বা দীঘল পট দেখানোর পর উপস্থিত ব্যক্তিরা টাকা-পয়সা, চালডাল বা কাপড়চোপড় যা দক্ষিণা দেন তাকেই এক্ষেত্রে 'ভিক্ষা' বলে। কিছুদিন আগে, আমার পরিদর্শনের সময়, পাকুড়হাঁসে পটুয়াদের সংখ্যা এসে দাঁড়িয়েছিল মাত্র তিন-চার ঘরে। এখন আরও কমেছে কিনা জানি না। তবুও পাকুড়হাঁসকে পটুয়াদের প্রতিনিধিত্ব করতে পারে এমন গ্রাম বলে চিহ্নিত করা ভুল নয় কেননা নানাবিধ আর্থিক ও সামাজিক কারণে এই বিশেষ শিল্পিগোষ্ঠীর সর্বব্যাপী সংখ্যাহ্রাসের জন্য এখন খুব কম গ্রামেই তাঁদের যথেষ্ট পরিমাণে দেখা যায়।

আর পাঁচটা গ্রামের পটুয়াদের মতো পাকুড়হাঁসের পটুয়াদেরও এখন দৈন্যদশা। পৈতৃক বৃত্তিতে তাঁদের আর পেট চলে না বহুদিন। সেজন্য সকলেই এখন ঘরামি বা সাধারণ



শ্রমিকের কাজ করেন ও অবসর সময়ে গান গেয়ে বাপ-ঠাকুরদার আঁকা পট দেখিয়ে বেড়ান। পাকুড়হাঁসে পট আঁকবার শিল্পীও এখন নেই বললেই চলে। সেখানকার রেণুপদ চিত্রকর (এঁদের পদবীর কথা পরে বলছি) যে জড়ানো পটগুলি আমাকে দেখিয়েছিলেন, তা নাকি ময়ূরেশ্বর থানার দক্ষিণ-পূর্ব প্রান্তে রামনগরের কাছে মোজরা নামে আর একটি গ্রামের সুধীর পটুয়ার অঙ্কিত। শেষোক্ত গ্রামটি মুর্শিদাবাদ জেলায় অবস্থিত। সাঁইথিয়া থেকে বাসে কোটাসুর ও রামনগর হয়ে সেখানে যাওয়া যায়। সেখানকার আরও দু'তিন ঘর সক্রিয় পটুয়া এখন নাকি প্রধানত রাজমিস্ত্রির ও প্রতিমা গড়ার কাজ করে থাকেন।

পাকুড়হাঁসের পটুয়ারা 'মাল', 'পটুয়া' ও 'চিত্রকর' এই তিনটি পদবীই বিকল্পে ব্যবহার করে থাকেন। আমার পরিদর্শনের সময় প্রধান যে কয়েকজনের সন্ধান পেয়েছিলাম তাঁরা রেণুপদ, কানাই, দেবেন্দ্র ও ছোবান (শোভান?) মাল (অথবা পটুয়া বা চিত্রকর)। গ্রামের যে পাড়ায় তাঁদের বাস তার নাম 'মালপাড়া'।

পটুয়ারা যে হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যবর্তী প্রাচীন এক গোষ্ঠী সেকথা গুরুসদয় দত্ত মহাশয় তাঁর 'পটুয়া সংগীত' গ্রন্থে সবিস্তারে বলেছেন। সাহিত্যরত্ন মহাশয়ও তাঁর চিঠিতে লিখেছেন—"পটুয়ারা বহু পুরানো সম্প্রদায়। ইহারা মহামতি চাণক্যের গুপ্তচর ছিল। বিশাখদত্তের 'মুদ্রারাক্ষসে' ইহাদের উল্লেখ আছে। বাণভট্টের হর্ষ-চরিতে রাজধানী প্রবেশের মুখে হর্ষ এই যম-পর্যটকদের দেখিয়া অমঙ্গলের আশঙ্কায় ভীত হন।.. ইহারা অযাত্রা।" প্রসঙ্গত, 'হর্ষ-চরিত' ও 'মুদ্রারাক্ষস' যে যথাক্রমে খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতকের প্রথম দিকে ও অষ্টম শতকে রচিত হয়েছিল একথার উল্লেখ থেকেই বোঝা যাবে এ সম্প্রদায় কত প্রাচীন।

'ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে'র মতে ব্রাহ্মণবেশী বিশ্বকর্মার ঔরসে গোপকন্যাবেশী ঘৃতাচীর গর্ভে যে নয় পুত্রের জন্ম হয়, তাঁরা মালাকার, কর্মকার, শঙ্খকার, কুন্দিবক (তাঁতি), কুম্ভকার, কাংস্যকার, সূত্রধার, চিত্রকার ও স্বর্ণকার সম্প্রদায়ের আদি পুরুষ। সেদিক থেকে পটুয়ারা অন্যান্য কুটিরশিল্পীদের সগোত্র ও তাঁদের মতোই সামাজিক মর্যাদার

অধিকারী। কিন্তু অতীতের ব্রাহ্মণশাসিত সমাজে ব্রাহ্মণনির্দিষ্ট চিত্রাঙ্কন পদ্ধতির ব্যতিক্রম করেছিলেন বলে তাঁরা হয়ত পতিত হন। কেন তাঁরা এই ভ্রষ্টাচারের দোষে দায়ী হলেন? গুরুসদয় দত্তের মতে—"গণজাতির প্রয়োজনের আহ্বানে ও স্বকীয় আত্মার অনুপ্রেরণার ফলে বাংলার জাতীয় শিল্পী পটুয়াগণ তাঁহাদের গীতিকায়, চিত্রে ও মৃন্ময়ী প্রতিমা পরিকল্পনার ক্ষেত্রে শাস্ত্রীয় বিধিবিধানের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া বাংলার নিজস্ব ভাব ও রসের ব্যঞ্জনাময় রূপকল্পনা করিতে সাহস প্রদর্শন করিয়া ব্রাহ্মণ সমাজের ভ্রূকুটি উপেক্ষা করিয়াছিল বলিয়াই যে তাহারা সমাজ হইতে ব্রাহ্মণগণ কর্তৃক পাতিত হইয়াছিল এইরূপ মনে হয়। কিন্তু ব্রাহ্মণগণ ও সমাজ কর্তৃক নির্যাতিত এই জাতীয় ভক্তসাধক শিল্পিগণ জাতীয় ভাবধারা ও রূপধারাকে যে বর্জন করে নাই, ইহা বাংলার গণজাতীয় আত্মার দুর্দমনীয় স্বাধীনতাপ্রিয়তারই প্রকৃষ্ট পরিচয়।" ('পটুয়া সংগীত' ঃ পরিচায়িকা)।

পটুয়াগীতির কিছু কিছু পালা হর-পার্বতীর লীলাকে কেন্দ্র করে রচিত। সেখানে মহাদেবকে দূর কৈলাসবাসী মহামহিমান্বিত দেবতা বা দুর্গাকে ষড়ৈশ্বর্যময়ী দেবীরূপে কল্পনা না করে পটুয়ারা ছবিতে ও গানে তাঁদের সাধারণ বাঙালী ঘরের দম্পতিরূপেই চিত্রিত করেছেন। শিবের কোচ-রমণীর প্রতি আসক্তি দেখাতে বা পার্বতীকে বাগদিনীর ভূমিকায় নামাতে তাঁদের বাধেনি। স্থূলভাবে বলতে গেলে, এ প্রবণতা সমকালীন সাহিত্যের ক্ষেত্রেও বিস্তৃত ছিল। তাঁর 'গ্রাম্য সাহিত্য' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ সেজন্য যথার্থই বলেছেন—"কৈলাস ও হিমালয় আমাদের পানাপুকুরের ঘাটের সম্মুখে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং তাহাদের শিখররাজি আমাদের আমবাগানের মাথা ছাড়াইয়া উঠিতে পারে নাই। যদি তাহারা নিজ নিজ অভ্রভেদী মূর্তি ধারণ করিবার চেষ্টামাত্র করিত, তাহা হইলে বাংলার গ্রামের মধ্যে তাহাদের স্থান হইত না।"

প্রবলপ্রতাপ পৌরাণিক দেবদেবীদের ঘরোয়া অন্তরঙ্গতার স্তরে নামিয়ে আনবার অপরাধে ব্রাহ্মণশাসিত সমাজ থেকে পটুয়ারা সম্ভবত বিতাড়িত হন। অন্য দিকে, ইসলামের সদাপ্রসারিত বাহুর মধ্যে ধরা দিলেও তাঁরা রামায়ণ-মহাভারত বা পৌরাণিক কাহিনীআশ্রিত সংগীত কিংবা হিন্দুর প্রতিমা নির্মাণের বংশগত পেশা ছাড়তে পারেননি। ফলে, হিন্দু সমাজে তাঁদের জাত গেছে, মুসলমান সমাজেও তাঁদের স্থান হয়নি। পটুয়াদের সেজন্য হিন্দু নামও যেমন আছে, মুসলমান নামও তেমনই সবল নয়। ছেলেদের সুন্নত হয়, কিন্তু সধবারা সিঁদুর ও কোন কোন ক্ষেত্রে শাঁখাও পরেন। পুরুষেরা রোজা রাখেন, নামাজ পড়েন, কিন্তু সাধারণত দাড়ি রাখেন না। ঈদ, মহরম প্রভৃতি পরবে তাঁদের যোগদান যেমন আবশ্যিক, তেমনই আবার পঞ্চানন, শীতলা, মনসা প্রভৃতি লৌকিক দেবদেবীর উপাসনাতেও তাঁদের বাধা নেই। মৃতদেহকে কবর দেওয়াই রীতি, কিন্তু সে রীতি সাধারণত পালিত হয় মুখাগ্নি করবার পরে। 'খাঁটি' মুসলমানদের সঙ্গে এঁদের বিয়ে-সাদি হয় না; হিন্দুদের সঙ্গে তো সেকথা ওঠেই না। অতএব, নিজেদের ধর্মসংকর সমাজের মধ্যেই তাঁদের বৈবাহিক সম্পর্ক সীমিত। এহেন হিন্দু-মুসলমান মিশ্র প্রথার সবই যে কেবল পাকুড়হাঁস গ্রামে অনুসৃত হয়, সেকথা বলছি না, কেননা এবিষয়ে কিছু কিছু আঞ্চলিক পার্থক্যও দেখা যায়। বীরভূম ছাড়া মুর্শিদাবাদ, বর্ধমান, হাওড়া, মেদিনীপুর ও ২৪-পরগণা জেলার অনেকগুলি পটুয়াপল্লীতে যেসব সামাজিক রীতি-নীতি প্রচলিত দেখেছি, এখানে একত্রে তারই সার-সংকলন করলাম। পরবর্তী 'আখড়াপুঞ্জি' নিবন্ধটিও এ প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য।

'গুরুসদয় মিউজিয়ম' নিবন্ধে পটচিত্রের প্রকারভেদ, অঙ্কন প্রণালী প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা করেছি বলে এখানে তা থেকে বিরত হচ্ছি। তবে পটুয়া-সংগীত সম্বন্ধে দু'-

চার কথা বলতে বাধা নেই। জড়ানো পটের এক-একটি 'ফ্রেম'-এ যে ছবি আঁকা থাকে পটগীতি সর্বত্রই তার হুবহু অনুসারী নয়; ছবিতে যা রূপায়িত, অনেক ক্ষেত্রে সংগীতে তা অনুপস্থিত, আবার ছবিতে যা নেই, সংগীতে তা ব্যক্ত। কৃষ্ণলীলা, রামলীলা, হর-পার্বতীলীলা প্রভৃতি যে বিষয়েই দীঘল পট আঁকা হোক না কেন, তার শেষ দু'একটি 'ফ্রেম'-এ যমরাজের রাজসভা বা নরকযন্ত্রণার দৃশ্য দেখানোই সাধারণ রীতি। এগুলি দেখানোর সময় পরলোকে পাপীর শাস্তি ও পুণ্যবানের পুরস্কারের কথা প্রায় সব গানেই থাকে। আশ্চর্য শোনালেও একথা সত্যি যে এই দীর্ঘ গানগুলি পটুয়াদের কাছে লিখিত-ভাবে পুঁথির আকারে কখনই রক্ষিত হয়নি; পুরুষানুক্রমে তাঁরা এগুলি কণ্ঠস্থ করে এসেছেন। পাকুড়হাঁস গ্রাম থেকে সংগৃহীত কয়েকটি গানের মধ্যে যে গানটি দিয়ে এ প্রবন্ধ শেষ করছি তা থেকে পটুয়া-সংগীতের রচনারীতি ও গ্রামীণ সারল্য পরিস্ফুট হবে।

সিন্ধুবধ পালা

অজ রাজার পুত্র রাজা নামে দশরথ।
সভা করে বসে আছে লয়ে প্রজাগণ॥
রাজার পাপে রাজ্য নষ্ট প্রজায় কষ্ট পায়।
গিন্নীর পাপে গৃহস্থালী নষ্ট লক্ষ্মী ছেড়ে যায়॥
শনির চিন্তায় মহারাজা রথ সাজাইল।
ধনুকে টঙ্কার দিয়ে শনিকে জাগাইল॥
শনির নিঃশ্বাসে রথ উড়িতে লাগিল।
কোথায় ছিল জটায়ু পক্ষী রথ ধরে নামাইল॥
নিজের গলার পুষ্পমালা জটার গলে দিল।
মত্ততা মত্ততা ভাব মনে যেন রেখো॥
এইখানেতে থাকো জটা পুষ্পরথ আগুলে।
কানন বনে মৃগ শিকার করে আসিব ফিরে॥
একাদশী করে আছে বনের অন্ধক মুনি।
পালনের জল আনতে গো যাও গুণের সিন্ধু মুনি॥
নিত্য নিত্য যাই গো পিতা সরোবরের ঘাটে।
আজ যাব না যাব না পিতা প্রাণ কেঁদে ওঠে॥
যাও রে গুণের সিন্ধু কর রে গমন।
কাল গিয়েছে একাদশী আজ ব্রাহ্মণ ভোজন॥
কাঁদিতে কাঁদিতে সিন্ধু কমণ্ডলু নিল হাতে।
ধীরে ধীরে যাত্রা করে সরোবরের ঘাটে॥
চৌপাটি বন খুঁজে রাজা মৃগ নাহি পায়।
তমালতলে বসে রাজা তম্বুল টানি রয়॥
জলের হড়হড়ানি রাজা কর্ণেতে শুনিল।
বনের মৃগ বলে সিন্ধুকে বধিল॥
'বাপ রে' বলে সিন্ধু পড়িল সরোবরের জলে।
কে মেলি রে দুরন্ত বাণ অংগ গেল জ্বলে।
শিগ্গির নিয়ে চল মা-বাবারই কোলে॥
ঘোড়া থেকে নেমে রাজা মরা সিন্ধু নিল।
মরা সিন্ধু নিয়ে রাজা কাঁদিতে লাগিল॥

হায় রে বিধি কি করিলাম।
কার পুত্র মেরে কার প্রাণ কাঁদাইলাম॥
পাতার মচমচানি মুনি শোনেন আপন কানে।
কে এলি রে গুণের সিন্ধু করি যে রে কোলে॥
তোমার সিন্ধু নয় গো মুনি নাম দশরথ।
না জানাতে বধ করেছি তোমারই নন্দন॥
মাঠের মধ্যে এক বিরিক্ষি সেই তো মাঠের মাথা।
একা মায়ের পুত্র মলে মা দাঁড়াবে কোথা॥
মেলি মেলি রে রাজা মেলি তিনজন।
তিনজনের সৎকার্য কর রে এখন॥
এক চিতে তিনটি মরা দাহন করিল।
কলসী কলসী ঘৃত-মধু ঢালিতে লাগিল॥

*

রবির পুত্র যমরাজা যম নাম ধরে।
বিনা অপরাধে কারও দণ্ড নাহি করে॥
কালদূত আর অষ্টদূত যমের প্রহরায় থাকে।
যাকে যখন হুকুম করে ধরে করে খাড়া॥
চুপ্ত গুপ্ত মুহুরী যারা দিবারাত্র লেখে।
যার যখন গো বিধির লেখন দুই ভেদ লেখে॥
দেবতার ফল যে জন চুরি করে খায়।
তপ্ত সাঁড়াশি করে তার জিহ্বা কেড়ে নেয়॥
নিজের পতি থাকতে যে পরপতিতে ধায়।
খাজুর গাছে তুলে তার উচিত শাস্তি দেয়॥
ভাল জল থাকতে যে জন খারাপ জল দেয়।
যমালয়ে যমপুরীর খারানি জল খাওয়ায়॥
ভানারির চাল যে জন ভুল করে নেয়।
যমালয়ে ঢেঁকি দিয়ে মস্তকে পাড় দেয়॥
বিটিবেচা টাকা যে জন ভক্ষণ করে লেয়।
গোমাংসের ঝুড়ি তার মস্তকেতে দেয়॥
হরিমতী বেশ্যা ছিল মহাপাপের পাপী;
অন্নদান, বস্ত্রদান, দানধ্যান করেছিল,
তিনি স্বর্গলাভ করিলে—ন॥

একেবারে শেষের তিন পংক্তিতে কোন ছন্দ নেই; সেগুলি সুর করে গাওয়াও হয় না। পালার শেষে শ্রোতারা যাতে মুক্তহস্তে দান করেন, সেরকম অনুরোধের ভঙ্গিতে টেনে টেনে এ লাইনগুলি বলা হয়। পাঠক লক্ষ করে থাকবেন, এক-একটি বিশেষ চিত্রকল্পকে মোটামুটি অনুসরণ করে পর পর দু'তিন লাইন রচিত হয়েছে। গান ও ছবি দেখানো যখন এক সংগে চলতে থাকে, তখন তারা পরস্পরের পরিপূরক হিসেবে কাজ করে। গুরুসদয় দত্ত মহাশয়ের 'পটুয়া সঙ্গীত' পুস্তকে যেসব গান সংগৃহীত হয়েছে তা উত্তর-রাঢ়ের, প্রধানত বীরভূম জেলার। আমার বিবেচনায়, মেদিনীপুর জেলাকে কেন্দ্র করে দক্ষিণ-রাঢ়েও অল্পবিস্তর পৃথক আর এক শ্রেণীর পটুয়া সঙ্গীতের প্রচলন ছিল বা এখনও কিছু কিছু আছে। এ গানগুলি লুপ্ত হবার পূর্বে সংগৃহীত হওয়া উচিত।

আখড়াপুঞ্জি

পুরাণে দশ-মাতৃকার মূর্তি বিধিবন্ধ আছে, কিন্তু দেশ-মাতৃকার সেরকম কোন বর্ণনা নেই। দেশমাতা সেজন্য এক-এক দেশপ্রেমিকের কাছে এক-এক রূপে প্রতিভাত। বঙ্কিমচন্দ্রের বঙ্গজননী প্রধানত দশপ্রহরণধারিণী দুর্গা। কিন্তু তিনিই আবার 'কমলা কমলদলবিহারিণী' ও 'বাণী বিদ্যাদায়িনী'। সপ্ত কোটি সন্তানের বলই তাঁর বল। সুজলা, সুফলা, মলয়জশীতলা এই বঙ্গভূমির তিনি সুহাসিনী, সুমধুরভাষিনী, সুখদাত্রী, বরদাত্রী মাতা। রবীন্দ্রনাথের বঙ্গজননী তাঁর দরিদ্র বেশ, মলিন হাসি ও ভাঙা ঘরের একাকিত্বের ঊর্ধ্বে সোনার মন্দিরে অধিষ্ঠিতা এক দেবীপ্রতিমা, যাঁর ডান হাতে খড়্গ জ্বলে, বাঁ হাত করে শঙ্কাহরণ। যাঁকে দেখে দেখে সন্তানের আঁখি আর ফেরে না।

কিন্তু এসব কবিকল্পনার অতীতে কি কোন বঙ্গজননীর অস্তিত্ব আছে—প্রত্যক্ষ, দৃষ্টিগোচর, রক্তমাংসের বঙ্গজননী? যাঁর সামনে গিয়ে দাঁড়ানো যায়, যাঁর সঙ্গে কথা বলা যায়, যাঁর কাছ থেকে উত্তরও পাওয়া যায়? খুবই সৃষ্টিছাড়া প্রশ্ন সন্দেহ নেই। কিন্তু—বিশ্বাস করুন—এহেন এক জীবন্ত বঙ্গজননীর আমি একবার দেখা পেয়েছিলাম। সে বিস্ময়কর সাক্ষাৎকারের সব কিছু খুঁটিনাটি এখনও আমার স্পষ্ট মনে আছে।

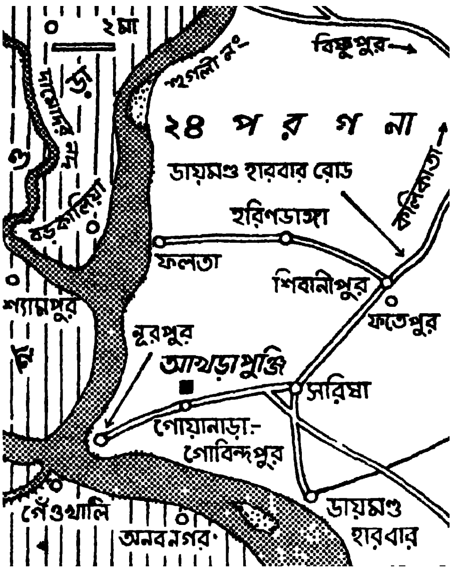
*

সরিষা আশ্রমে বসে কথা হচ্ছিল সেখানকার রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসীদের সঙ্গে। কলকাতা-ডায়মণ্ডহারবার সড়কের উপরই এই শাখা-আশ্রম, ডায়মণ্ডহারবার থেকে মাইল চারেক উত্তরে। সন্ন্যাসীদের কয়েকজন দীর্ঘকাল এখানে থেকে কাজ করছেন; কাছাকাছি অঞ্চলের খবরাখবর তাঁরা ভালই জানেন। এ রকম ওয়াকিফহাল ঘাঁটি থেকে এক-এক তল্লাটের মোটামুটি সংবাদ সংগ্রহ কবে বিশদ অনুসন্ধানের জন্য গ্রাম-পরিক্রমায় বার হয়ে পড়াই সুবিধাজনক। তাতে বৃথা পরিশ্রমের অনেক লাঘব হয়। স্থির হল, আখড়াপুঞ্জিতে সেদিনই যাওয়া যেতে পারে, কেননা সরিষা থেকে সে-পল্লীর দূরত্ব পাঁচ মাইলের বেশী নয় যা অতিক্রম করতে মাত্র ঘণ্টাখানেক লাগবার কথা। সরিষা বাজারে এসে ডায়মণ্ডহারবার—নূরপুর রুটের বাস ধরবার জন্য যেটুকু অপেক্ষা করতে হয়েছিল, সে সময়ে স্থানীয় লোকজনের কাছে খোঁজ করে জানতে পারলাম, কলকাতা থেকে সরাসরি নূরপুরগামী বাস দিনে দু'তিনটির বেশী যায় কিনা সন্দেহ। সেজন্য কলকাতার দিক থেকে কেউ যদি আখড়াপুঞ্জি যেতে চান, তাহলে ডায়মণ্ডহারবারগামী বাসে সরিষা বাজার অবধি এসে, বাস বদল করে, ডায়মণ্ডহারবার-নূরপুর রুটের বাস ধরাই শ্রেয়, যেহেতু এ দু'টি রুটেই যথেষ্টসংখ্যক বাস চলে। পিচের সড়ক থেকে প্রায় মাইলখানেক

উত্তরের গ্রাম আখড়াপুঞ্জি। নুরপুরগামী বাস থেকে গোয়ানাড়া-গোবিন্দপুর স্টপেজে নেমে এই মাইলটাক পথ হেঁটে যাওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই।

সরিষা আশ্রমের সন্ন্যাসীরা বলেছিলেন, আখড়াপুঞ্জিতে বেশ কিছু ঘর পটুয়া বাস করেন যাঁরা না-হিন্দু না-মুসলমান। ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ শুদ্ধি করে তাঁদের কয়েক ঘরকে হিন্দু করেছেন। এ খবর আমার কাছে মূল্যবান, কেননা হিন্দু ও মুসলমান উভয় সমাজের প্রত্যন্ত সীমার অধিবাসী এই অবহেলিত গোষ্ঠী সম্বন্ধে ইতিপূর্বে খোঁজ করে বেড়িয়েছি বীরভূম, বর্ধমান, হাওড়া, হুগলী ও মেদিনীপুর জেলার গ্রামগ্রামান্তরে। তাঁরা সকলেই 'রাঢ়-বঙ্গের' বাসিন্দা। ভাগীরথীর পূর্ব তীরে, ২৪-পরগণা জেলায় তাঁদের অস্তিত্ব অতএব আমার কাছে তাৎপর্যপূর্ণ। রাঢ় অঞ্চলের বাইরের পটুয়াদের সামাজিক রীতিনীতি, ধর্মীয় আচার-আচরণ, জীবিকার পদ্ধতি প্রভৃতিতে কোন উল্লেখযোগ্য পার্থক্য আছে কিনা সে বিষয়ে খোঁজ করবার জন্য গোয়ানাড়া-গোবিন্দপুর স্টপেজে যখন বাস থেকে নামলাম, তখন বেলা বেশ গড়িয়ে গিয়েছে। পথের ধারে দু'একটি পাকা বাড়ি, কিছু দোকানপাট, অল্পস্বল্প লোকজন। মোড়ের মাথার চায়ের দোকানের জটলার কাছাকাছি হতেই প্রত্যাশিত জেরা শুরু হয়ে গেল—কোথায় যাবেন, কার বাড়ি যাবেন, আগমনের উদ্দেশ্য কি ইত্যাদি। অপরিচিত আগন্তুক সম্বন্ধে গ্রাম-বাংলার লোক খুবই কৌতূহলী সন্দেহ নেই, কিন্তু তাঁদের প্রাথমিক সংশয় দূর করতে পারলে অকৃপণ সহযোগিতা অবধারিত। এখানেও তার ব্যতিক্রম হল না। চায়ের দোকানের পাওনা মিটিয়ে দিয়ে এক যুবক এসে বললেন—আমার বাড়ি আখড়াপুঞ্জি; কলকাতায় চাকরি করি; আজ শনিবার তাই বাড়ি ফিরছি; চলুন আপনাকে 'শর্টকাট' রাস্তা দেখিয়ে নিয়ে যাই। বাড়ি-ঘরের পিছনে কিছু দূর এসে আইল-পথ ধরে আমরা মাঠে নেমে পড়লাম। দূরের গাছ-পালার দিকে দেখিয়ে যুবক বললেন—এই মাঠটুকু পেরোলেই ওইখানে আখড়াপুঞ্জি গ্রাম।

আমার আসবার উদ্দেশ্য আগেই বলেছিলাম; পথ চলতে চলতে পটুয়াদের সম্বন্ধেই প্রধানত কথাবার্তা হতে লাগল। স্থানীয় লোকের কাছে তাঁরা 'পটিদার' বলে পরিচিত; বাস তাঁদের গ্রামের স্বতন্ত্র এক অংশে—পোটোপাড়ায়। সংখ্যায় ১৫।১৬ ঘর। তাঁরা নানা-রকম প্রতিমা ও মেলার পুতুল তৈরি করেন; পট আঁকার রেওয়াজ এখন আর নেই বললেই চলে। পূর্বপুরুষেরা পট আঁকতেন কিনা, সে পট দেখিয়ে গ্রামগ্রামান্তরে গান গেয়ে বেড়াতেন কিনা, আগেকার সেসব পট এখনও কারও কাছে সঞ্চিত আছে কিনা সে বিষয়ে সঙ্গী যুবকটি বিশেষ কিছু জানেন না। হঠাৎ যুবকটি জিজ্ঞাসা করলেন—আপনি তো নিশ্চয়ই খবরের কাগজের লোক; তা না হলে এত কষ্ট করে এই অজ পাড়াগাঁয়ে পটিদার-দের খোঁজ করতে আসবেন কেন। বললাম—ঠিক সে রকমটা নয়, তবে কাগজ-টাগজে কালেভদ্রে লিখিটিখি, এই আর কি। উৎসাহ বেড়ে গেল যুবকের। বললেন—দেখুন, আমরা ব্রাহ্মণ; গ্রামের সম্ভ্রান্ত পরিবার। সেইজন্যই বলি—আপনি যখন পটিদারদের সম্বন্ধে লিখবেন, তখন এঁরা হিন্দুদের সঙ্গে কিরকম প্রবঞ্চনা করেন সেকথা লিখতে যেন ভুলবেন না। আমার প্রশ্নের জবাবে বিষয়টা তিনি আরও বিশদভাবে বুঝিয়ে বললেন। শুদ্ধি হয়ে যে দু'এক ঘর পটিদার হিন্দু হয়েছেন, তাঁরা ছাড়া আখড়াপুঞ্জির বাকি সব পটিদার মুসলমান। কিন্তু দুর্গা, কালী, সরস্বতী প্রভৃতি পূজার মরসুমে তাঁরা যখন বেহালা বা ডায়মণ্ডহারবারের বাজারে অস্থায়ী ডেরা বেঁধে হিন্দুর কাছে বিক্রীর জন্য রাশি রাশি প্রতিমা বানান, তখন গ্রামের কামাল পটিদার নাম নেন কমল চিত্রকর, মানেক পটিদার হন মানিক চিত্রকর আর কালু পটিদার নিজেকে প্রচারিত করেন কালিপদ চিত্র-কর বলে। এভাবে নাম ভাঁড়িয়ে হিন্দু নাম নেওয়ার মধ্যে যে জঘন্য প্রতারণা আছে, আপনার লেখায় তার যেন স্পষ্ট উল্লেখ থাকে।



না-হিন্দু না-মুসলমান এই পটুয়া সম্প্রদায়ের তৈরি প্রতিমা যে খাঁটি হিন্দুরা বিনা প্রত্যবায়ে আবহমানকাল কিনে আসছেন; প্রধানত মুসলমান দর্জিদের তৈরি রেডিমেড পোশাক ও টুপি যে হিন্দুরা খরিদ করেন লাখে লাখে; মুসলমান বাবুর্চির হাতের রান্না যে শহুরে হোটেল-রেস্তোরাঁয় হিন্দু রসনার ব্যাপক তৃপ্তিসাধন করে থাকে—এসব যুক্তি দিয়ে ব্রাহ্মণ যুবককে টলানো গেল না। বাকি পথটুকু প্রায় নীরবেই হেঁটে এলাম দু'জনে, কিন্তু মনে হল, এই পটুয়াগোষ্ঠী কেন যে দীর্ঘকাল হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়েরই বাইরে এক স্বতন্ত্র জীবনযাপন করতে বাধ্য হয়েছেন, সে প্রশ্নের যেন জবাব পেয়ে গেলাম। হর্ষচরিত ও মুদ্রারাক্ষস থেকে জানা যায়, পটুয়া সম্প্রদায় ভারতবর্ষে মুসলিম আবির্ভাবের অনেক আগে থেকেই ভারতীয় সমাজের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। মুসলমান শাসনকালে আরও বহু অন্ত্যজ হিন্দুর মতো তাঁরাও ধর্মান্তরিত হন। কিন্তু গণ-ধর্মান্তর যত সহজে সম্পন্ন হয়, বিকল্প জীবিকা সংগ্রহ তত সহজে সাধিত হয়নি। ফলে, হিন্দু পৌরাণিক কাহিনীর পট আঁকা ও সে বিষয়ে পালা গান করে বেড়ানো এবং প্রতিমা নির্মাণ তাঁদের পেশা হিসাবে থেকেই যায়। সেজন্য ধর্মীয় আচরণে মুসলমান হলেও হিন্দু-ঘেঁষা জীবিকার কারণে তাঁরা কখনই খাঁটি মুসলমান বলে স্বীকৃত হননি। পক্ষান্তরে, প্রতিমা নির্মাণের বংশগত দক্ষতা ও হিন্দু পুরাণের নানা কাহিনী কণ্ঠস্থ থাকা সত্ত্বেও তাঁদের ইসলামী জীবনযাত্রা হিন্দু সমাজে প্রবেশের অন্তরায় হয়েছে। দুই ধর্মের মাঝামাঝি পড়ে তাঁরা উভয় ধর্মেরই রীতিনীতি গ্রহণ করেছেন। এই স্বতঃবিরুদ্ধ অস্তিত্ব থেকে তাঁরা হয়ত সাবেক হিন্দুয়ানিতে ফিরে যেতে পারতেন যদি হিন্দু সমাজ তাঁদের প্রতি সদয় হতেন, সামাজিকভাবে তাঁদের যদি অপাঙ্‌ক্তেয় করে না রাখতেন। জীবিকা ও ধর্মীয় জীবনে তাহলে একটা মেলবন্ধন ঘটতে পারত। কিন্তু সঙ্গী যুবকটির কথায় তাঁদের অচ্ছুত করে রাখবার মনোভাব বর্ণ হিন্দুসমাজে এখনও যে কত প্রবল তার প্রমাণ পেলাম। অন্য দিকে, হিন্দু পুরাণ ও প্রতিমাশিল্পে আকণ্ঠ নিমজ্জিত এ সম্প্রদায়ের মুসলমান সমাজে পুরাপুরি স্বীকৃতি পাওয়াও যে কত দুরূহ সেকথাও

সহজেই অনুমেয়। এই শিল্পীগোষ্ঠীর না-হিন্দু না-মুসলমান অস্তিত্বের এই হল পটভূমি।

গ্রামের পোটোপাড়ায় যখন এসে পেঁছলাম, তখন এরকম নানান চিন্তারই আলোড়ন চলছিল মনে মনে। পাড়ায় ঘুরে ঘুরে জানলাম ১৫।১৬ ঘরের এই পটুয়া সম্প্রদায় কয়েক পুরুষ আগে মেদিনীপুর জেলার সুতাহাটা থানার চৈতন্যপুর ও ২৪-পরগণা জেলার ডায়মণ্ডহারবার থানার বাগদা গ্রাম থেকে এসে এখানে বসতি স্থাপন করেন। ঠিক কি কারণে এই স্থানান্তর ঘটে এখন তা আর জানা যায় না। চৈতন্যপুর ও কাছাকাছি গ্রাম আকুবপুরে সক্রিয় পটুয়ারা এখনও বাস করেন। শেষোক্ত পল্লীর রজনী চিত্রকর তাঁর কৃতিত্বের জন্য কয়েক বছর আগে রাষ্ট্রীয় পুরস্কার পেয়েছেন। বাগদা গ্রামের খবর আমার ঠিক জানা নেই। সে যাই হোক, ভাগীরথীর পূর্ব ও পশ্চিমের দুই গ্রাম থেকে সাবেক পটুয়ারা যে এখানে এসে একত্র বসবাস শুরু করেন সেটা এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

আখড়াপুঞ্জির পটুয়ারা এখন পট আঁকা বা পট দেখানো ছেড়ে দিয়েছেন উপার্জনের স্বল্পতার জন্য। প্রতিমা ও মেলার পুতুল তৈরি করাই বর্তমানে তাঁদের প্রধান জীবিকা। দুর্গা, সরস্বতী, লক্ষ্মী, কালী, শীতলা, ষষ্ঠী, মনসা পঞ্চানন্দ ইত্যাদি প্রতিমাই প্রধান; অন্যান্য মূর্তিও বায়না পেলে, প্রয়োজনে ফোটো দেখে, তাঁরা তৈরি করে দিতে পারেন। বড় বড় পুজোর মরসুমে কারিগরদের প্রায় সকলেই বেহালা বা ডায়মণ্ডহারবারে অস্থায়ীভাবে কিছুদিন থেকে, সেখানে প্রস্তুত প্রতিমা সেখানেই বিক্রী করে দিয়ে বাড়ি ফিরে আসেন। মেলার পুতুল ও পশুপাখি প্রভৃতি গ্রামেই তৈরি হয় যথেষ্ট পরিমাণে। সেগুলি কাছাকাছি মেলায় কিছু কিছু বিক্রী হয়, তবে বেশী অংশ কেনেন সরিষার হাটের পাইকাররা। অল্প দক্ষতাসাপেক্ষ এসব সস্তা জিনিস সাধারণত মহিলারা বা ছোট ছেলেমেয়েরা তৈরি করে থাকেন। কিন্তু প্রতিমা তৈরির ক্ষেত্রেও তাঁদের ভূমিকা নিতান্ত কম নয়; সেখানেও তাঁরা রীতিমতো সাহায্য করে থাকেন পুরুষদের। পরিবারের প্রায় সকলেই উপার্জনে অংশ নেন বলে আখড়াপুঞ্জির পটুয়াদের জমি-জায়গা বিশেষ না থাকলেও আর্থিক অবস্থা মন্দ নয়।

এখানকার পটুয়ারা চারটি উপাধি ব্যবহার করেন—পটিদার, চিত্রকর, গাজি ও গায়েন। প্রায় কুড়ি বছর আগে ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ যে তিনটি পরিবারের শুদ্ধি করেছিলেন, তাঁরা একই পল্লীতে বাস করলেও অন্য পবিবারগুলি থেকে ধর্মীয় ও সামাজিকভাবে স্বতন্ত্র। চলতি কথায় তাঁরা হিন্দু, অন্যেরা মুসলমান। কিন্তু এই তথাকথিত মুসলমান সম্প্রদায়ের আচার-আচরণ অন্যান্য স্থানের মুসলমান পটুয়াদের মতই চমকপ্রদ। তাঁদের সুন্নত হয়, মৃতদেহ কবর দেওয়া হয়, রোজা পালন করতে হয়, স্থানীয় মসজিদে গিয়ে নামাজও পড়তে হয়। মহরম, ঈদ প্রভৃতি উৎসব সকলেই পালন করেন। ঘনিষ্ঠ আত্মীয়দের ক্ষেত্রে মরণোত্তর অশৌচের কাল সাধারণত ৪১ দিন। বিয়ে হয় দিনের বেলায়, হিন্দুদের মতো রাত্রে নয়। নিকা, তালাক প্রভৃতির ব্যবস্থা আছে এবং চার বিবি অবধি বিবাহ করা চলে। কিন্তু পুরুষদের মূল নাম মুসা, ঈসা, মালেক, খয়রদ্দি, খালেক, কামালও যেমন আছে, তেমনি আছে কানাই, বলাই, প্রভাস, রণজিৎ, অনিল, সুরেশ, বিমল প্রভৃতি। তাছাড়া কবর দেবার আগে মৃতদেহের মুখাগ্নি করা প্রচলিত। পুরুষরা কেউ দাড়ি রাখেন না। এঁদের সধবা মহিলারা অধিকাংশই সিঁদুর ব্যবহার করেন, শাঁখাও ব্যবহার করেন অনেকে, কিন্তু নোয়া কেউ পরেন না। গ্রামের একান্তে পঞ্চানন্দ, শীতলা, মনসা প্রভৃতি দেবদেবীর যে 'থান' আছে সেখানে আপদবিপদে মেয়েপুরুষ সকলেই মানত করেন, মনস্কাম পূর্ণ হলে পুজো দেন। অন্য দিকে, শুদ্ধিপ্রাপ্ত তিন ঘর পটুয়া এখন পুরোপুরি হিন্দু রীতিনীতি মেনে চলেন। তাঁদের ঘিরে দু' একটি কাহিনী শুনলাম যা

রীতিমতো কৌতূহলোদ্দীপক। শুদ্ধি হবার পরও এ'দের একজন মৃত্যুকালে নির্দেশ দিয়ে যান চিরাচরিত প্রথা অনুসারে তাঁকে যেন কবর দেওয়া হয়। হিন্দু হলেও সে নির্দেশ পালন করা হয় তাঁর ক্ষেত্রে। আর এক পরিবারের কর্তা ও বড় ছেলে মুসলমান থেকে যান, ছোট ভাই শুদ্ধি নিয়ে হন হিন্দু। কিছুদিন পর কর্তা মারা গেলে, বড় ভাই বল্লেন তাঁকে কবর দিতে হবে, ছোট ভাই বল্লেন দাহ করতে হবে। বড় ভাই-এর কথাই টেকে এবং শেষ পর্যন্ত তাঁকে কবরই দেওয়া হয়।

পটুয়াদের মুসলমান ও হিন্দু অংশের মধ্যে যে বিবাহাদি হয় না, সেকথা বলাই বাহুল্য। কিন্তু উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হল, পটুয়া সমাজের বাইরের সাধারণ মুসলমান বা হিন্দু পরিবারের সঙ্গেও এ দুই অংশের কোন বৈবাহিক সম্পর্ক নেই। কেননা এ'দের না-হিন্দু না-মুসলমান অস্তিত্বের জন্য এ'রা এতই পতিত যে নিম্নতম শ্রেণীর কোন হিন্দু বা মুসলমানও এ'দের সঙ্গে কুটুম্বিতায় উৎসাহী নন। ফলে বীরভূম, বর্ধমান, মুর্শিদাবাদ, হাওড়া, হুগলী, মেদিনীপুর, ২৪-পরগণা প্রভৃতি জেলার দূরদূরান্তে বিচ্ছিন্নভাবে যেসব হিন্দু বা মুসলমান পটুয়া বাস করেন, তাঁরা বহু পরিশ্রমে পরস্পরের খোঁজ করে পুত্রকন্যার বিবাহ দেন। আখড়াপুঞ্জির এক হিন্দু পটুয়া এইভাবে আত্মীয়তা স্থাপন করেছেন হাওড়া জেলার প্রশস্থ ও কুলগাছিয়া গ্রামের হিন্দু পটুয়াদের সঙ্গে। বিবাহের ক্ষেত্র খুব সংকীর্ণ হওয়ার যাবতীয় কুফল কি হিন্দু কি মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের পটুয়াদের সমভাবেই ভোগ করতে হয়। এটাই সাধারণ অবস্থা, তবে এর কিছু ব্যতিক্রমও আছে। আর্থিক বা অন্যভাবে সমাজে প্রতিষ্ঠিত হলে হিন্দু বা মুসলমান পটুয়ারা বাইরের স্বধর্মীদের কাছে বিয়েসাদির ব্যাপারে যে গ্রহণযোগ্য হন না এমন নয়।

*

আখড়াপুঞ্জি গ্রামে সেদিন পেঁাছেছিলাম সন্ধ্যার কিছু আগে। পুতুল-প্রতিমা তৈরির পাট সেদিনের মতো চুকে গেছে—ছবি তোলা আর হল না। সেজন্য জিজ্ঞাসাবাদ ও তথ্য সংগ্রহের দিকে নজর দেওয়া গেল বেশী পরিমাণে। পরিদর্শন শেষ করে ফিরতি পথ ধরব, এমন সময় ভিড়ের মধ্য থেকে কে একজন এগিয়ে এসে অনুরোধ করলেন—আমার বাড়িতে এসে দয়া করে এক কাপ চা খেয়ে যাবেন? অনেক পরিশ্রম হয়েছে আপনার। এতখানি রাস্তা আবার হেঁটে যেতে হবে। পথ দেখিয়ে তিনি তাঁর বাড়িতে নিয়ে গেলেন। একটু দূরে তাঁর কুঁড়েঘরের মাদুর-বিছানো দাওয়ায় গিয়ে বসলাম।

শীতের রাত্রি। চারিদিকে ঘোর অন্ধকার। জোনাকি জ্বলছে কাছের গাছপালায়। চালের বাতা থেকে একটা লণ্ঠন ঝুলছে। তার আলো গিয়ে পড়েছে সামনের কৌতূহলী জনতার চোখেমুখে। দাওয়ায় বসে আমি আর গৃহস্বামী কথা বলছি। তারা সেসব কথা শুনছে নীরবে, একমনে।

গৃহস্বামী শুদ্ধি-হওয়া হিন্দু পটুয়া। বললেন—আমরা দু' ভাই। বড় ভাই হিন্দু হননি, আমি হয়েছি। সেজন্য কোন অসুবিধা ছিল না, কেননা পোটোপাড়ার হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বরাবরই সম্প্রীতি অক্ষুণ্ণ আছে। কিন্তু মুশকিল হল, যখন আমাদের বাবা মারা গেলেন। দাদা বললেন, তাঁর কবর হবে, আমি বললাম, তাঁর দাহ হওয়াই উচিত।

তাঁকে বাধা দিয়ে বললাম—এ ঘটনার কথা আর কেউ যেন বলছিলেন একটু আগে। তিনি বললেন—হবে হয়ত, আমি তখন সেখানে ছিলাম না। যাই হোক, সালিশীতে শেষটায় ঠিক হল কবরই হবে। মুখাগ্নি করে বাবার তো কবর হল। আমি হিন্দুমতে অশৌচ পালন করলাম। তারপর কালীঘাটে গিয়ে পুরুত ধরে, মাথা মুড়িয়ে, ভাল করে

ধাবার শ্রাদ্ধ-শান্তি করে এলাম।

জিজ্ঞাসা করলাম—আপনার মা কি বেঁচে আছেন? তাঁর কী মত ছিল এ বিষয়ে?

পোড়োনোতেই মত ছিল তাঁর। তিনিও তো হিন্দু। আমার সংসারেই থাকেন। দাদার বাড়িতেও যান মাঝে মাঝে, তবে সেখানে থাকেন না।

আমার বড় ইচ্ছা হল তাঁর মা'র সঙ্গে একবার দেখা করি। কথাটা বলতেই গৃহ-স্বামী অন্দরে খবর দিয়ে এসে আমাকে ভিতরে নিয়ে গেলেন।

পরিষ্কার নিকানো উঠোনের একপাশে একটি তুলসীমঞ্চ। সেখানে জ্বালানো সন্ধ্যা-প্রদীপটি তখন সবে নিবে গেছে মনে হল। কাছেই সাদা থানধুতি-পরা এক বর্ষীয়সী মহিলা দাঁড়িয়ে। মাথার ঘোমটা তাঁর অনেকখানি নামানো।

তাঁর আড়ষ্টতা কাটানোর জন্য মামুলি দু' একটা প্রশ্ন করলাম—সধবাদের শাঁখা, সিঁদুর, নোয়া পরা সম্বন্ধে। অল্পস্বল্প জবাব দিলেন তিনি। তারপরে, আর প্রশ্ন খুঁজে না পেয়ে জিজ্ঞেস করলাম—আচ্ছা মা, এই যে আপনার এক ছেলে মুসলমান আর এক ছেলে হিন্দু, এটা কিরকম লাগে আপনার?

কিছুক্ষণ কোন কথা বললেন না মহিলা। তারপরে বেশ স্থির গলায় জবাব দিলেন—আমার এক ছেলে হিন্দু আর এক ছেলে মুসলমান তাতে আমাব একটুও দুঃখ নেই বাবা। ওরা দু'জনেই আমার নাড়ীছেঁড়া ধন। আমার কাছে ওরা দু'জনেই সমান।

এইবার এ রচনার সমে ফিরে যেতে পারি। সেদিন পশ্চিম আকাশে একফালি চাঁদের ম্লান আলোয় মাঠের পথে একাকী ফিরে আসতে আসতে আমার যেন মনে হল সমস্ত ভুবন জুড়ে বীণাধ্বনির সুমধুর সুরে সেই আশ্চর্য কথাগুলি সঙ্গীতের মত বাজছে—"ওরা দু'জনেই আমার নাড়ীছেঁড়া ধন ; আমার কাছে ওরা দু'জনেই সমান।" বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্র-নাথ বঙ্গজননীকে দেখেছেন কবিকল্পনায়। আমি দেখলাম প্রত্যক্ষ, জীবন্ত, রক্তমাংসের শরীরে—যাঁর সঙ্গে কথা বলা যায়, উত্তরও পাওয়া যায়। আমার সৌভাগ্যের তুলনা হয় না।

দশাবতার তাস

বিষ্ণুপুরের খ্যাতি প্রধানত মন্দির-নগরী হিসেবে। আমার সাধ্যমত সে খ্যাতিব পরিচয় অন্যত্র দেবার চেষ্টা করেছি। কিন্তু আরও কিছু পরিচয় আছে এ শহরের যা মল্ল-রাজাদের পুরাকীর্তির মতো জাজ্বল্যমান না হলেও তাঁদের সুকুমারবৃত্তির আর একটি দিককে উদ্ভাসিত করে। আমি দশাবতার তাসের কথা বলছি, যা মল্ল-রাজকুলের পৃষ্ঠ-পোষকতায় খ্রীষ্টীয় অষ্টম অথবা নবম শতকে বিষ্ণুপুরে প্রথম প্রচলিত হয়েছিল বলে পণ্ডিতেরা মনে করেন।

বিষ্ণুপুরে যাঁরা কখনো যাননি তাঁদের অবগতির জন্য বলি, হাওড়া থেকে খড়্গপুর হয়ে রেলপথে বিষ্ণুপুরের দূরত্ব ১২৬ মাইল; ট্রেনে সময় লাগে প্রায় ছ' ঘণ্টা। গোমো প্যাসেঞ্জার সকাল ন'টা নাগাদ হাওড়া থেকে ছেড়ে বিষ্ণুপুরে পেঁছয় বিকেল তিনটেব কিছু আগে আর ফিরতি ট্রেন বিষ্ণুপুর থেকে বেলা বারোটার কাছাকাছি সময়ে রওনা হয়ে হাওড়ায় আসে সন্ধ্যা ছ'টার কিছু পরে। বেলাবেলি যাতায়াতের জন্য এ দু'টিই সবচেয়ে ভাল ট্রেন। রাতের গাড়িও আছে, তবে তাতে অসুবিধা বেশী। আনুমানিক ভাড়া, তৃতীয় শ্রেণীতে পাঁচ টাকা, দ্বিতীয় শ্রেণীতে এগারো টাকা। বিকল্পে, তারকেশ্বর অবধি ট্রেনে গিয়ে বাকি পথ বাসেও যাওয়া যায়। কিন্তু মুণ্ডেশ্বরী নদীর উপর সেতু নির্মাণের কাজ এখনও শেষ হয়নি বলে ফেরী নৌকায় নদী পার হয়ে হরিণখোলায় একবার ও

আরামবাগে আর একবার বাস বদল করতে হয়। উভয় ক্ষেত্রে সময় ও অর্থব্যয় পড়ে প্রায় একই রকম। লটবহর বেশী না থাকলে শেষোক্ত পথে যাওয়াই হয়ত সুবিধাজনক। কেননা, তাতে আর দু'চারটে নতুন জায়গা দেখা যায়, আরও পাঁচজনের সঙ্গে মেলামেশার সুযোগ মেলে।

দশাবতার তাস কতদিনের প্রাচীন সে আলোচনার শুরুতেই একথা বলা প্রয়োজন যে বহু সংস্কৃত গ্রন্থে দাবা বা পাশা জাতীয় খেলার উল্লেখ থাকলেও তাস বা অনুরূপ কোন খেলার উল্লেখ দেখা যায় না। অতএব প্রাচীন ভারতবর্ষে যে তাস খেলার প্রচলন ছিল না এমনই মনে হয়। কিন্তু মল্ল-রাজধানী বিষ্ণুপুরের দশাবতার তাসের উৎপত্তি-কাল বেশ প্রাচীন হওয়াই সম্ভব। পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দের এশিয়াটিক সোসাইটি অফ বেঙ্গলের মুখপত্রে প্রকাশিত তাঁর এক গবেষণামূলক প্রবন্ধে এই দৃঢ় অভিমত প্রকাশ করেন যে, দশাবতার তাসের প্রথম প্রচলন হয় আনুমানিক খ্রীষ্টীয় অষ্টম বা নবম শতকে যখন মল্ল-রাজকুলের আদি-পুরুষেরা বিষ্ণুপুর সিংহাসনে সমাসীন ছিলেন। শাস্ত্রী মহাশয়ের সিদ্ধান্ত যে মূল যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত তা বুঝতে হলে এই শ্রেণীর তাসের সংক্ষিপ্ত একটু বিবরণ দেওয়া প্রয়োজন।

সাধুদের পরিত্রাণ, দুষ্কৃতকারীদের বিনাশ ও ধর্ম সংস্থাপনের জন্য বিষ্ণু যে অবতাররূপে দশবার পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছিলেন এ পৌরাণিক কাহিনী সর্বজন-বিদিত। ভারতীয় জনমানসে মীন, কূর্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন (ত্রিবিক্রম), রাম (রঘুনাথ), পরশুরাম, বলরাম, জগন্নাথ (বিকল্পে বুদ্ধ) ও কল্কি—এই দশ অবতারের সেজন্য অসীম প্রভাব। এ'দের প্রত্যেককে অবলম্বন করে এক-একটি রং বা শ্রেণীর কল্পনা করা হয়েছে বলে এ তাসের নাম দশাবতার তাস। দশটি রঙের প্রতিটিতে থাকে বারোটি তাস; অর্থাৎ মোট তাসের সংখ্যা এক শ কুড়ি। এক রঙের বারোটি তাসের মধ্যে 'অনার্স কার্ড' মাত্র দু'টি—সর্বোচ্চটিতে উৎকীর্ণ থাকে অবতারের এক বহুবর্ণ চিত্র আর পরেরটিতে থাকে তাঁর উজীর বা মন্ত্রীর। পরবর্তী অল্প মূল্যের দশটি তাস ইউরোপ-আগত হাল আমলের তাসের মতই দশ, নয়, আট থেকে তিরি, দুরি, টেক্কা পর্যন্ত। তাসের গায়ে অবতার ও তাঁর উজীরের মূর্তি প্রথাগত ভঙ্গিতে আঁকা হলেও নিম্নমূল্যের তাসগুলিতে কিন্তু পৃথক পৃথক প্রতীকচিহ্নের ব্যবহার করা হয়। যেমন, মীন অবতারের প্রতীক মাছ, কূর্ম অবতারের কচ্ছপ, বরাহের শঙ্খ, নৃসিংহের চক্র, বামনের কমণ্ডলু, রামের তীর, পরশুরামের কুঠার, বলরামের মুষল, জগন্নাথ বা বুদ্ধের পদ্ম আর কল্কির খড়্গ। মীন অবতারের (বা রঙের) টেক্কায় সেজন্য আঁকা থাকে একটি মাছ, তিরিতে তিনটি, নহলায় ন'টি ইত্যাদি। একই নিয়মে জগন্নাথ বা বুদ্ধ অবতারের পঞ্জায় আঁকা থাকে পাঁচটি পদ্ম, ছক্কায় ছ'টি ইত্যাদি। অন্যান্য অবতারের বেলায়, প্রতীকভেদে, একই রীতি অনুসরণ করা হয়ে থাকে। অবতারদের মধ্যে রাম বা রঘুনাথের আপেক্ষিক গুরুত্ব সব-চেয়ে বেশী। তাঁর এতই সম্মান যে রাম-অবতারের তাস দিয়ে যিনি খেলা শুরু করবেন, সে পিটটি তো তিনি পাবেনই, এমন কি সর্বোচ্চ তাসের সুবাদে পরের পিটটিও তাঁর বাঁধা, তা তিনি যে তাস দিয়েই খেলা আরম্ভ করুন না কেন।

অবতারদের মধ্যে পাঁচজন 'অন্ত্যজ' আর পাঁচজন 'অভিজাত'। মনুষ্যেতর প্রাণী বা তার কাছাকাছি যাঁদের আকৃতি তাঁরা হীন শ্রেণীর, যেমন মীন, কূর্ম, বরাহ, নৃসিংহ ও বামন আর মানুষ বা দেবতার মত যাঁদের আকৃতি তাঁরা উচ্চ শ্রেণীর, যেমন রাম, পরশু-রাম, বলরাম, জগন্নাথ (বুদ্ধ) ও কল্কি। অভিজাত অবতারের রঙের ক্ষেত্রে 'অনার্স কার্ডে'র পরেই টেক্কা হল সর্বোচ্চ তাস, তারপরে দুরি, তিরি ইত্যাদিক্রমে দশ সবচেয়ে ছোট তাস। অন্য দিকে অন্ত্যজ অবতারদের রঙে, 'অনার্স কার্ডে'র পরে দশ হল সর্বোচ্চ

তাস আর টেক্কা সব থেকে ছোট। আর এক অদ্ভুত নিয়ম—দিনমানে হলে রাম অবতারের তাস পেতে খেলা শুরু করতে হয়, আর রাত্রে 'স্টার্টার' হয় মীন অবতার।

দশাবতার তাস ও তার খেলবার পদ্ধতির এই সংক্ষিপ্ত বিবরণের পরে আমরা হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের সেই যুক্তিতে ফিরে যেতে পারি, যার সাহায্যে তিনি প্রমাণ করবার চেষ্টা করেছেন যে এই তাসখেলার প্রথম প্রচলন হয় খ্রীষ্টীয় অষ্টম বা নবম শতকে। বিষ্ণুপুরের তাসে অবতারদের যে পর্যায়ক্রম নির্দিষ্ট আছে, তাতে বুদ্ধের স্থান পঞ্চম। তাঁর প্রথাগত আকৃতি হল গোলাকার দেহকাণ্ডের উপরে একটি মাথা ও দুটি হাত। তিনি যে বিকল্পে জগন্নাথ হিসাবেও স্বীকৃত, সেকথা আগেই বলেছি। তাঁরও অবয়ব খুব সুনির্দিষ্ট নয়। শাস্ত্রী মহাশয়ের মতে এই না-পশু না-মানুষ গড়নের জন্য বুদ্ধ বা জগন্নাথের স্থান অর্ধ-পশু নৃসিংহ ও বিকৃত-মানব বামনের ঠিক মাঝখানে হওয়া উচিত, কেননা দশাবতার তাসে প্রাণী জগতের প্রাচীনতম জীব মীন থেকে শুরু করে কলির অবতার কল্কি পর্যন্ত আকৃতিগত বিবর্তনের একটা নির্দিষ্ট ক্রম লক্ষ করা যায়। কিন্তু বিষ্ণুর দশ অবতারের যে তালিকা পৌরাণিকভাবে সিদ্ধ তাতে বুদ্ধের স্থান নবম, তাঁর পরেই কল্কি। শাস্ত্রী মহাশয় অতএব মনে করেন, পুরাণসম্মতভাবে বুদ্ধের নবম স্থান নির্দিষ্ট হবার আগেই দশাবতার তাসের প্রচলন হয়ে থাকবে যেজন্য তাঁকে দেখানো হয়েছে পঞ্চম স্থানে। অন্যান্য সাক্ষ্যপ্রমাণ দিয়ে তিনি আরও দেখিয়েছেন যে, পুরাণসম্মত এই পরম্পরাক্রমটি নৈষ্ঠিকভাবে স্থির হয় খ্রীষ্টীয় একাদশ শতকে ক্ষেমেন্দ্রের বা দ্বাদশ শতকে জয়দেবের সময়ে। অতএব, তাঁর প্রথম সিদ্ধান্ত—দশাবতার তাসের উৎপত্তিকাল অনধিক খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতক।

বুদ্ধ (বা জগন্নাথ) অবতারের নিম্নমূল্যের তাসগুলি চিরাচরিতভাবে পদ্ম-চিহ্ন দিয়ে অঙ্কিত করা হয়। এ প্রথা তখনই প্রচলিত হওয়া সম্ভব যখন বুদ্ধের অপর নাম ছিল পদ্মপানি। পাল-রাজত্বের প্রথম দিকে মহাযান বৌদ্ধধর্ম যখন বঙ্গদেশে বিশেষভাবে প্রতিষ্ঠিত ছিল, তখনই যে এ নামটির যথেষ্ট প্রচলন ছিল তার ঐতিহাসিক প্রমাণ রয়েছে। শাস্ত্রী মহাশয় সেজন্য তাঁর দ্বিতীয় সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, বিষ্ণুপুরের মল্ল-রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় খ্রীষ্টীয় অষ্টম কি নবম শতাব্দীতে এই তাস খেলার সূত্রপাত হয়। (ওড়িষায় দশাবতার তাসের যে রকমফের দেখা যায় তা বিষ্ণুপুরের সাবেক তাস থেকেই উদ্ভূত বলে মনে করবার কারণ আছে।)

মুসলমান আমলে যে তাসের প্রচলন হয় তার নাম 'গঞ্জিফা'। আইন-ই-আকবরীতে উল্লেখিত আছে যে, আকবরের সময়ের পূর্বে বারোটি রং ও প্রত্যেক রঙের বারোটি তাসের এক রকম 'গঞ্জিফা' উত্তরভারতে প্রচলিত ছিল। তাকে আরও সরল করে আকবর বাদশা মোট আটটি রং ও প্রতি রঙে বারোটি তাসের (অর্থাৎ মোট ৯৬টি তাসের) এক খেলার প্রবর্তন করেন। মুঘল দরবারে এ জাতীয় 'গঞ্জিফা'ই খেলা হত। সে খেলার নিয়মকানুন বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, তা দশাবতার তাস থেকে মূলত ভিন্ন নয়। অতএব, মুঘল আমলের 'গঞ্জিফা' বিদেশাগত কোন স্বতন্ত্র খেলা নয়; তা বিষ্ণুপুরে পূর্বপ্রচলিত খেলারই দরবারী রূপ।

ভারতে বিদেশী তাসের সূত্রপাত হয় ইউরোপীয়দের আবির্ভাবের পরে। Schopen, Harten, Ruiten প্রভৃতি ওলন্দাজ শব্দ থেকেই যে ইশকাপন, হরতন, রুইতন প্রভৃতি নামের উদ্ভব হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। মাত্র চারটি রং ও বাহান্নটি তাসের এ-খেলা যে তুলনায় দশাবতার তাস থেকে অনেক সরল তা সহজেই বোঝা যায়।

মল্ল-রাজধানী বিষ্ণুপুরে একদা দশাবতার তাসের বহু কারিগর বাস করতেন। তাঁদের বংশগত উপাধি ছিল 'সূত্রধর'। বঙ্গদেশে শেষ-মধ্যযুগে এই 'সূত্রধর' শিল্পীরাই একা-

ধারে কাঠ-খোদাইয়ের কাজ, পাথরের ভাস্কর্য, কাঁচা বা পোড়ামাটির খেলনা-পুতুল তৈরি ও পটচিত্র অংকনের কাজ করেছেন। দশাবতার তাসে যেসব ছবি আঁকতে হত তা পট আঁকবার পদ্ধতি থেকে কিছুম. ভিন্ন ছিল না বলে পটুয়া শিল্পী বা 'সূত্রধর' শিল্পীরাই এ কাজটি করতেন। অসাধারণ . তা দেখাতে পারলে এ'দের মধ্যে কেউ কেউ 'ফৌজদার' এই রাজ-পদবীতেও ভূষিত হতেন। বিষ্ণুপুরের গদাধর ফৌজদার, সতীশ ফৌজদার, কেদার সূত্রধর প্রমুখ অনেকে একদা দশাবতার তাস চিত্রণে বিপুল খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। কলকাতার আশুতোষ মিউজিয়মে ও বিষ্ণুপুর বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সংগ্রহশালায় রক্ষিত কয়েক প্রস্থ প্রাচীন দশাবতার তাসের সঙ্গে আধুনিক কালে প্রস্তুত এ তাসের তুলনা করলে বুঝতে কষ্ট হয় না যে, পটচিত্রশিল্পের অবনতির সঙ্গে সঙ্গে এক্ষেত্রেও অংকনপটুত্ব যথেষ্ট পরিমাণে হ্রাস পেয়েছে। শিল্পীর সংখ্যাও এখন মুষ্টিমেয়। তাঁরা সকলেই অন্য জীবিকা গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছেন; অবসর সময়ে কিছু কিছু তাস তৈরি করে থাকেন মাত্র।

দশাবতার তাস পটচিত্রের সগোত্র এক নিপুণ শিল্পনিদর্শন। সামান্য কিছু যন্ত্রপাতি ও বংশগত দক্ষতায় এগুলি তৈরি হয়ে থাকে। পুরনো ধোয়া কাপড় পর পর কয়েক প্রস্থ সাজিয়ে প্রথমে আঠা দিয়ে জুড়ে শুকিয়ে নেওয়া হয়। এ আঠা তেঁতুল-বীচিব গুঁড়ো সিদ্ধ করে শিল্পী পরিবারের মেয়েরাই তৈরি করে দেন। তারপরে খড়িমাটিব প্রলেপ লাগানো হয় দু' পিঠে। এই জমিনের উপর পরে ছবি আঁকতে হবে বলে মসৃণ পাথরেব নোড়া ঘষে ঘষে তাকে সমতল করে নেওয়া হয়। অতঃপর প্রায় চার ইঞ্চি ব্যাসের একটি গোল চাকতি কাপড়েব উপর চেপে ধরে কাঁচি চালিয়ে অনরূপ আকারের চাকলা কেটে নেওয়া হয় প্রয়োজনীয় সংখ্যায়। এগুলিরই এক পিঠে দশ অবতার ও তাঁদের দশ উজিবেব মূর্তি ও নিম্নমূল্যের তাসে প্রতীক চিহ্নগুলি আঁকা হয রং-তুলি দিয়ে। কিছুদিন আগেও এসব রং স্থানীয় গাছগাছড়া থেকে সনাতন পদ্ধতিতেই তৈরি হত। বিষ্ণুপুরে একদা 'পাটরাঙা' নামে এক বিশেষ সম্প্রদায়ের বাস ছিল যাঁদেব বংশগতপেশাই ছিল উদ্ভিজ্জ উপাদানে নানারকম পাকা রং তৈরি করা। এখন প্রয়োজন সামান্য বলে বাজার থেকে রেডিমেড রং কিনে নেওয়াই রীতি। তাসের সামনের দিকে মূর্তি বা চিহ্ন আঁকা শেষ হলে উলটো পিঠে গালা ও মেটে সিঁদুরের এক মসৃণ প্রলেপ লাগিয়ে এদের অঙ্গসজ্জা শেষ করা হয়।

দশাবতার তাস এখন কদাচিৎ খেলা হয়ে থাকে। আজকের ঊর্ধ্বশ্বাস জীবনযাত্রায় দশটি রঙের ও এক শ কুড়িটি তাসের এ জটিল খেলায় কারই বা আসক্তি থাকবে? দশাবতার তাসেব অন্তিম আশ্রয় সেজন্য নির্ধারিত হয়েছে বিভিন্ন সংগ্রহশালায়। উৎসাহী পাঠক একটু শ্রম স্বীকাব করে সেগুলি চাক্ষুস করলে, পটচিত্রশিল্পের এই অপেক্ষাকৃত অপরিচিত শাখাটি যে একদা মনোহর রঙে ও দক্ষ তুলির টানে কত সমৃদ্ধ ছিল, সেকথা সহজেই বুঝতে পারবেন।

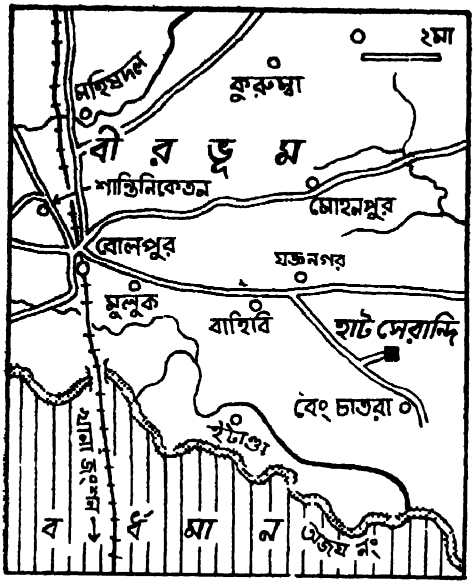
হাট সেরান্দি

শান্তিনিকেতনের পৌষ-মেলায় যাঁরা গিয়েছেন তাঁরা জানেন, সেখানে বিশ্বভারতীর তরফ থেকে মেলার তদারকি করবার জন্য টিনের চালার নীচে খড়ের বেড়া দেওয়া যে অস্থায়ী অফিস খোলা হয়, তার আসবাব বলতে (মেলার উদ্যোক্তারা অপরাধ নেবেন না) গুটি দুই তক্তপোশ আর খানকয়েক নড়বড়ে চেয়ার। তাতে বসেই পালা করে ডিউটি দেন কর্মকর্তারা। এত সামান্য আসবাবেও তাঁদের জমায়েত জমে উঠতে বাধে না, কেননা আরও চিত্তাকর্ষক উপকরণ—চীনাবাদাম ভাজা, পেঁয়াজি, ঘুগনি, জিলিপি, চা, পান, সিগারেট প্রভৃতি—হাত বাড়ালেই মেলার দোকান থেকে পাওয়া যায়। অতএব স্থানীয় ও প্রবাসী শান্তিনিকেতনপ্রেমীদের যে জমাট আড্ডাটি এখানে বসে তার তুলনা মেলা ভার। হাট সেরান্দি গ্রামের নাম আগে কখনো শুনিনি; প্রথম শুনলাম এই আড্ডায়।

প্রধানত পৌষ-মেলা কভার করতেই সেবার শান্তিনিকেতনে গিয়েছিলাম। স্থিতি কয়েক দিনের। কিন্তু দ্বিতীয় দিনেই বুঝলাম মেলায় তেমন আর নতুন কিছু ছবি তোলবার নেই। মেলা-অফিসে গিয়ে দেখি সেদিনকার 'ও. সি.' শান্তিদেব ঘোষ মহাশয়। জনকয়েক পার্শ্বচর সমভিব্যাহারে তিনি ভাজা চীনাবাদামের খোসা আঙুলে টিপে ভাঙছিলেন আর দানা ছুঁড়ে দিচ্ছিলেন তাঁর পুরুষ্টু গোঁফজোড়ার নামো'তে। ক্যামেরা-ধৃতকর অথচ লক্ষ্যহীন এ অধমের আরজি শুনলেন মন দিয়ে। তারপর বললেন—সোজা হাট সেরান্দি চলে যান; সেখানে এমন আশ্চর্য জিনিস দেখবেন যা আর কোথাও দেখেননি। কী সেই তাজ্জব জিনিস?

বাদামভাজার ঠোঙা আমার হাতে দিয়ে বললেন- সে গ্রামে বেশ কয়েক ঘর গেরস্থ-বাড়িতে এখনও পটে-আঁকা দুর্গা 'প্রতিমা'র পুজো হয়। পৌষের প্রথমে সে পটের নাগাল পাব কি করে জিজ্ঞেস করতেই জবাব পেলাম—উপাসিত পট সংবৎসর বাড়িতে রেখে সামনের বছরের পট আঁকা হবার পর বিসর্জন দেওয়াই সে গ্রামের রীতি। গত পুজোর কয়েকটি দুর্গা-পট সেজন্য পৌষ মাসেও দেখতে পাওয়া যাবে। আমি আর দেরি করিনি। বাদামের ঠোঙা আগেই শেষ করেছিলাম। ঘোষ মহাশয়ের অর্ডারি চায়ের কাপটা এসে পৌঁছনো অবধি অপেক্ষা করেছিলাম মাত্র। তারপরই বোলপুর রেল স্টেশনের কাছ থেকে বোলপুর-পালিতপুর সার্ভিসের এক বাস ধরে আট মাইল দূরে হাট সেরান্দি গ্রামের মোড়ে এসে নেমেছিলাম ঘণ্টাখানেকের মধ্যে। শীতের সেই মোলায়েম সকালে, বাস-চলা পিচের সড়ক থেকে কাঁচা রাস্তায় আধ মাইলটাক তফাতে ধনেশ্বর চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বাড়ি অবধি হেঁটে যেতে কোনই কষ্ট হয়নি।

চট্টোপাধ্যায় পরিবারের এখানে বহু পুরুষের বাস। প্রায় সত্তর-আশি ঘর ব্রাহ্মণ



আছেন এ গ্রামে। প্রধান সম্প্রদায় সদ্‌গোপ; তাঁদের সংখ্যা প্রায় দু'শ ঘর। এছাড়া আছেন বাউড়ি, বাগদি, সূত্রধর প্রভৃতি—সব মিলিয়ে জনসংখ্যা প্রায় সাড়ে-চার হাজার। অধিকাংশই কৃষিনির্ভর, তবে হালে শিক্ষিত পেশাতেও অনেকে নিযুক্ত আছেন। পোস্ট-অফিস ও হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল আছে; মেয়েরা ছেলেদের সঙ্গে একত্রেই পড়ে। মোটামুটিভাবে বীরভূম জেলার অন্যতম বর্ধিষ্ণু গ্রাম; প্রাচীনও বটে।

চট্টোপাধ্যায় বংশের এখানে স্থিতি অন্তত দু'শ বছর। এই দীর্ঘকাল ধরে তাঁদের সাবেক ঠাকুরদালানে একাদিক্রমে পটে-আঁকা দুর্গা প্রতিমার পূজা হয়ে আসছে। আগে গ্রামের সব ক'টি প্রতিমাই এভাবে তৈরি হত। এখন মোট তেরোটি পুজোর মধ্যে সাত-আটটি ক্ষেত্রে পটের ঠাকুর ও বাকিগুলিতে মাটির মূর্তি তৈরি হয়। পূজার বিধি উভয় ক্ষেত্রেই এক, তবে পটের প্রতিমাগুলিকে পরবর্তী দুর্গাপূজা অবধি রক্ষা করে তারপরে বিসর্জন দেওয়া হয়। প্রথমে নাকি বহিরাগত পটুয়ারা প্রতিমা এঁকে দিয়ে যেতেন। কিন্তু আনুমানিক দেড় শ বছর ধরে গ্রামের শিল্পীরাই পুরুষানুক্রমে সে কাজ করছেন। তাঁদের উপাধি 'সূত্রধর'; পেশা—পটে এঁকে বা মাটি দিয়ে প্রতিমা নির্মাণ। কুঁড়েঘরের চালার নীচের বাঁশের ফ্রেম ও কাঠের দরজা-জানালা প্রভৃতিও তাঁরা তৈরি করে থাকেন। গ্রামে এখন দশ-বারো ঘর সূত্রধরের বাস। তাঁরা সকলেই পট আঁকতে পারেন না; যাঁরা পারেন তাঁদের মধ্যে কালিপদ ও গুরুপদ সূত্রধরই প্রধান। তাঁরা দুই সহোদর ভাই; বয়স পঞ্চান্ন থেকে ষাটের মধ্যে।

আমার পরিদর্শনের দিন ছোট ভাই গুরুপদ উপস্থিত ছিলেন না। অতএব চাটুজ্যে বাড়ির ঠাকুরদালানে মাদুরে বসে বড় ভাই কালিপদকে জেরা শুরু করলাম। ইতিমধ্যে অতিথিপরায়ণ গৃহস্বামী এক কাঁসি ঘি-মাখা মুড়ি ও প্রচুর পরিমাণ আলুর চপ রেখে গিয়েছিলেন সামনে। সাতই পৌষ যে শুভদিন তাতে আর সন্দেহ রইল না মনে। শান্তিদেববাবুর আধ-ঠোঙা বাদামভাজার অনতিকাল পরেই এহেন মুখরোচক খাদ্য নিতান্ত শুভদিন ছাড়া বড় একটা জোটে না। জিজ্ঞাসাবাদ বেশ জমে উঠল। মন প্রফুল্ল

থাকলে মগজ যে কত ভাল কাজ করে সেকথা সকলেরই জানা।

হাট সেরান্দির পটুয়াদের হাতিয়ার বলতে কয়েকটি মাটির খুরি ও কিছু তুলি। উপকরণ—পট আঁকবার কাপড়, সেটি টানটান করে সাঁটবার জন্য বাঁশের বাতার এক ফ্রেম, কিছু কাদাগোলা, কিছু জলে তেঁতুলবীচির গুঁড়ো সেদ্ধ করা আঠা ও বোলপুরের বাজার থেকে কেনা গুঁড়ো রং। স্থানীয়ভাবে উদ্ভিজ্জ উপকরণে রং তৈরি করার প্রথা বহুকাল হয় লোপ পেয়েছে। তবে হরিতাল, পিউড়ি, হীরাকষ প্রভৃতি এখনও ব্যবহৃত হয়।

প্রথমে চালচিত্রসমেত দুর্গাপ্রতিমার আকার অনুযায়ী বাঁশের একটি ফ্রেম বানিয়ে নিয়ে কাদাগোলা-ভেজানো এক প্রস্থ মোটা কাপড় তার উপর লাগিয়ে নেওয়া হয় টানটান করে ও কাপড়ের প্রান্তগুলি মুড়ে দেওয়া হয় ফ্রেমের পিছন দিকে। কাদাগোলা তৈরি হয় পরিষ্কার এঁটেল মাটি গুঁড়ো করে তা গামছায় ছেঁকে ও পরিমাণ মত জল মিশিয়ে। কাদা শুকিয়ে গেলে তার উপর খড়িগোলার প্রলেপ লাগিয়ে জমিন তৈরি করে নেওয়া হয়। তারপর তুলির সাহায্যে ফিকে লাল রং দিয়ে প্রান্তরেখা ও অন্যান্য ড্রইং-এর কাজ শেষ করে মূর্তিগুলিতে বিশদভাবে রং লাগানোর পর ঘন নীল রং দিয়ে পশ্চাৎ-পটের খালি জমিন ভরাট করে দেওয়াই রীতি। চাটুজ্যে বাড়িতে রক্ষিত প্রতিমাটি ছিল দৈর্ঘ্যপ্রস্থে প্রায় পাঁচ ফুট; অন্যান্য দুর্গাপটগুলি কমবেশি একই মাপের। ব্যবহৃত রঙের বিন্যাস নিম্নরূপ : পশ্চাৎপট সর্বত্রই ঘোর নীল; কার্তিকের মুখ হলদে, জামা সবুজ, ধুতি সাদা ('অস্তর'-এর উপর আবার খড়িগোলা মাখিয়ে চূড়ান্ত সাদা করা হয়ে থাকে); ময়ূর—সবুজ, হলদে ও খয়েরি; সরস্বতীর মুখ সাদা, শাড়ি ফিকে নীল, উড়ুনি হলদে; অসুরের গায়ের রং সবুজ ও ধুতি লাল; সিংহের রং হলদে ও খয়েরি; দুর্গার অঙ্গ সামান্য কমলা-মেশানো হলুদ, শাড়ি লাল, উড়ুনি সবুজ; লক্ষ্মীর দেহের রং একই, শাড়ি লাল, উড়ুনি ফিকে নীল; গণেশের মুখ সাদা, দেহ কমলা ও ধুতি হলদে। উপরের চালচিত্রের মাঝখানে শিব; তাঁর দু'পাশে সিংহবাহনা কালী, রাম-লক্ষ্মণ, সীতা, রাধাকৃষ্ণ ও শুম্ভনিশুম্ভ বধের দৃশ্য। পাঠক লক্ষ করে থাকবেন, শাক্ত দেবীর মূর্তি এখানে প্রধান হলেও তাঁর আশপাশে কৃষ্ণ-রাধিকা বা রাম-লক্ষ্মণকে স্থাপন করতে কোনই বাধা হয়নি।

রঙের প্রয়োগ ও চালচিত্রের বর্ণনা একটু বিশদভাবেই করলাম এই জন্য যে, সে রীতি নাকি একইভাবে অনুসৃত হয়ে আসছে চিরকাল; শুধু পরিধেয়ের ক্ষেত্রে সামান্য যা কিছু ইতরবিশেষ হতে পারে। ড্রইং-পদ্ধতিও বংশানুক্রমিকভাবে বিধিবদ্ধ। ফলে এমন অনুমান অসঙ্গত নয় যে, এ গ্রামে দেড় শ বছর আগেও আজকের মত দুর্গা-পটই অঙ্কিত হত। পুরনো ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতার এ এক চমৎকার নিদর্শন। দুর্গা-পটগুলিকে সংবৎসর রক্ষা করার প্রথাটিও বহু প্রাচীন।

স্থানীয়ভাবে উদ্ভিজ্জ রং তৈরি করার ব্যাপারে কালিপদ সূত্রধরের কাছে শুনলাম, তাঁর ঠাকুরদার আমলে কুলগাছের লাক্ষা ('লাহা') থেকে লাল, ধোবারা যে নীল ব্যবহার করে তা থেকে নীল, গিরিমাটি থেকে হলুদ বা কমলা, ভুসো কালি থেকে কালো ও এসব রঙের মিশ্রণে মধ্যবর্তী রং তৈরি করা হত। কিন্তু সেসব পদ্ধতি যে বহুকাল হয় উঠে গেছে সেকথা আগেই বলেছি।

খুব আধুনিক প্রক্রিয়ায় আঁকা দু'একটি দুর্গা-পট পুজোর সময় আজকাল কলকাতাতেও চোখে পড়ে। তারা যে হাট সেরান্দি-প্রভাবিত নয় সেকথা বলাই বাহুল্য। বস্তুত, এ গ্রামের প্রথায় পশ্চিমবাংলার আর কোথাও দুর্গাপ্রতিমা তৈরি হয় বলে আমি জানি না।

এ গ্রামে সাধারণ স্থাপত্য-ভাস্কর্যের কয়েকটি 'টেরাকোটা' মন্দিরও আছে। উত্তর-পাড়ায় মণ্ডল-পরিবারের পাশাপাশি দুই বাড়ির অঙ্গনে যথাক্রমে যে দুটি দেউল শিব-মন্দির ও নবরত্ন শ্রীধর (শালগ্রাম) মন্দির আছে তারা তেমন উল্লেখযোগ্য নয়। এ পরিবারের আর এক শরিকের পূর্বপুরুষ-প্রতিষ্ঠিত দেউল শিব-মন্দিরটির প্রতিষ্ঠা-লিপি ("শ্রীশ্রীহরি/শকাব্দা ১৭৩৯/সন ১২.../শ্রীপবন মণ্ডল") থেকে দেখা যায়, সেটি ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে, অর্থাৎ ১৫৫ বছর আগে নির্মিত হয়েছিল। পোড়ামাটির অলংকরণ সাধারণ শ্রেণীর হলেও, হুবহু একই রকম অনেকগুলি প্রহরীমূর্তি থেকে বোঝা যায় যে, কোন কোন ক্ষেত্রে 'টেরাকোটা' ফলকগুলি ছাঁচে ফেলেও তৈরি হত।

এ মন্দিরের লাগোয়া পশ্চিমে যে কুঁড়েঘর তাতে গ্রামের প্রবলপ্রতাপ ধর্মরাজ অধিষ্ঠিত। তিনি এক পবিত্র শিলাখণ্ড, কূর্মমূর্তি নন। নিত্যপূজা ছাড়াও তাঁর বার্ষিক গাজন উৎসব বেশ ঘটা করে পালন করা হয়। তখন আশপাশের গ্রামের অনেকেই গাজন-সন্ন্যাসী হন। উৎসববিধি—প্রথম দিন উপবাস, দ্বিতীয় দিন 'ঘাট পুজো', তৃতীয় দিন 'মুক্তস্নান' এবং চতুর্থ দিন 'ভাড়াল ভরা' ও 'চড়ক দেওয়া'। 'ঘাট পুজো'র দিন সিংহাসন-সমেত ধর্মরাজকে বাজনা বাজিয়ে নির্দিষ্ট পুকুরে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে স্নানের পর, কলা গাছের কাণ্ড জোড়া দিয়ে ভেলার মত বানিয়ে তার উপর প্রধান ভক্ত্যাকে শুইয়ে (তিনি ধর্মরাজকে বুকে ধরে থাকেন) বাজনাবাদ্যিসমেত গাঁ ঘুরিয়ে মন্দিরে নিয়ে আসা হয়। 'মুক্ত স্নানের' দিন গাজন-সন্ন্যাসী ও অন্যান্যরা একই পুকুরে গিয়ে আনুষ্ঠানিক স্নান করেন। 'ভাড়াল ভরা' উৎসবে গোয়ালারা একটি বড় ভাঁড় দুধ ও জলে পূর্ণ করে দেবার পর সন্ন্যাসীরা সেটিকে সাড়ম্বরে গ্রাম প্রদক্ষিণ করে মন্দিরে নিয়ে আসেন। মানসিকের সংখ্যা অনুসারে সে সময় পাঁচ-সাতটি পাঁঠাবলি হয়। সেদিন সন্ধ্যায় হয় 'চড়ক দেওয়া'—অর্থাৎ, প্রধান ভক্ত্যা সিংহাসনসমেত ধর্মরাজকে বাজনা সহযোগে গ্রাম ঘুরিয়ে মন্দিরে ফিরে এলে উৎসবের সমাপ্তি হয়।

*

শান্তিদেব ঘোষ মহাশয় ঠিকই বলেছিলেন, হাট সেবান্দিতে এমন নতুন জিনিস দেখতে পাব যা আর কোথাও দেখিনি। সনাতন রীতির পটে দুর্গার উপাসনা আমার কাছে সত্যিই অভিনব। কিন্তু তিনি বলেননি এমন আর এক নতুন জিনিস দেখলাম ফিরবার সময়। কাজ সেরে গ্রামের বাইরে মাঠে এসে যখন পড়েছি, তখন বেলা আর বেশি নেই। সামনে প্রায় আধ মাইল ধূলিধূসরিত পথ। এতক্ষণে যেন হঠাৎ টের পেলাম বেশ ক্লান্ত লাগছে। পাশ দিয়ে এক গরুর গাড়ি চলেছে পিচ-রাস্তার দিকে। তার চালক এতক্ষণ হয়ত আমাকে দেখেছে গ্রামের এখানে সেখানে ঘোরাঘুরি করতে, ছবি তুলতে। বেশ হৃদ্যতার সঙ্গে বললে—যাবেন নাকি বাবু এ পথটুকু গাড়ি চেপে? আমার সঙ্গে সঙ্গী ছিলেন একজন। শহুরে মানুষ; তাঁকে কিছুতেই আরোহী হতে রাজী করানো গেল না; তিনি হেঁটেই যাবেন। ক্যামেরার ঝোলা তাঁর কাঁধে দিয়ে সওয়ার হলাম। গরুর গাড়ি আমার কাছে নতুন নয়; অবস্থার ফেরে বহুবারই চড়তে হয়েছে। তবে এ গাড়িতে কোন ছই নেই, শক্ত বাঁশের খোলা পাটাতন, খড়ও নেই তার উপর। বোধ হয় মাটি কেটে আনতে যাচ্ছিল শুকনো কোন পুকুর থেকে। হঠাৎ কি কারণে জানি না, বলা নেই কওয়া নেই দুই গরু ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড় দিল সেই এবড়োখেবড়ো কাঁচা রাস্তা ধরে। বসে থাকলে গাড়ি থেকে ছিটকে পড়তে পারি, এই আশঙ্কায় উবু হয়ে শুয়ে পড়লাম বাঁশের পাটাতনের উপর। গাড়োয়ানের প্রাণপণ চেষ্টা সত্ত্বেও গরুর থামবার কোন লক্ষণ নেই। এদিকে বুকের পাঁজর ভেঙে যাবার ভয়ে কনুইয়ে ভর দিতেই বুঝলাম কনুইও জখম না হয়ে যায় না।

তখন যা থাকে বরাতে বলে দু' হাতের আঙুলে আঙুল গলিয়ে মাথার তলায় দিয়ে চিত হয়ে শুয়ে পড়লাম। আক্ষরিকভাবে, এরকম আন্দোলিত জীবনে হইনি। গরুকে বাগ মানানো গেল প্রায় পিচ-রাস্তার কাছে এসে। পিছনে তাকিয়ে দেখি, দূরে বন্ধুবর আসছেন ক্যামেরার ব্যাগ কাঁধে ঝুলিয়ে। মরে গেলেও ক্যামেরার ঝোলা কখনো হাতছাড়া করি না; আজকের ব্যতিক্রম দৈবনির্দিষ্ট বলেই মনে হল। না হলে দীর্ঘদিনলালিত এ যন্ত্রপাতিগুলো বাঁচাবার কোনই আশা ছিল না। অথবা এমনও হতে পারে, ৭ই পৌষ সত্যিই এক মহাপুণ্যদিন। পিচের রাস্তা পেরিয়ে ওপারের মাঠে নেমে যাবার আগে গাড়োয়ান যথেষ্ট দুঃখপ্রকাশ করলে। বললে—আমার 'চকা' গরু, গাড়িতে নতুন জুতেছি, এখনও মাঝে মাঝে ভয় পায়। একটু পরেই বন্ধুবর এসে হাজির হলেন। বিমল আনন্দে উদ্ভাসিত তাঁর মুখ। সব দৃশ্যটা তিনি শুধু প্রত্যক্ষই করেননি, বিলক্ষণ উপভোগও করেছেন মনে হল। ক্যামেরার ঝোলাটা ফেরত নিতে নিতে দুই বন্ধু ও ভালুকের গল্পটা তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিলাম।



মীরপুর

পশ্চিমবাংলার যেকোন গ্রামের মতই এ গ্রাম। চোখে পড়তে পারে এমন পার্থক্য কিছুমাত্র নেই। যে বাড়ির দাওয়ায় এসে বসেছি, তার মাটির ভিত, চাল টালির। সামনের নিকনো উঠনে, কাঁঠাল-জামরুলের ছায়ায় উৎসুক জনতা। তাদের সব ক'টি চোখে কৌতূহলের উত্তেজনা। আশ্চর্য আমার কথাবার্তা, আশ্চর্য আমার অভিপ্রায়। বাইরের বিস্ময়বিজড়িত জগৎ থেকে আমি এক ক্বচিৎ-আগত আগন্তুক।

যে পায়ে-চলা পথ ধরে এখানে এসে পেঁাছেচি, দক্ষিণবঙ্গের যেকোন গ্রাম্য পথের মতই তা মনোরম। জোয়ারে-ভরা খালের পাশ দিয়ে, দু'ধারের ধান খেতের মাঝ দিয়ে, শালুকফোটা নয়ানজুলির কোল ঘেঁষে আম-জাম-সুপারি-নারকেলের বাগান পার হয়ে চিরপরিচিত গ্রাম-বাংলার ঘ্রাণ নিতে নিতেই এসেছি। তখন শরতের শেষ কি হেমন্তের শুরু। প্রগাঢ় নীল আকাশে আলসে মেঘের সাদা ভেলা। আর সারাটা পথ, মাটি থেকে, খেত থেকে ওঠা সেই সোঁদাসোঁদা গন্ধ। আমাব রক্তে মিশে আছে সে পরিবেশের রূপ-ঐশ্বর্য। আমার নিঃশ্বাসবায়ুতে সে পরিবেশের সৌবভ সদা-প্রবাহিত। পারিপার্শ্বিক আমার অতি পরিচিত, সমবেত জনতার বেশবাসও অবিকল বাঙালীদের মত। তবু মেয়ে-পুরুষের নামে এত তফাত কেন?

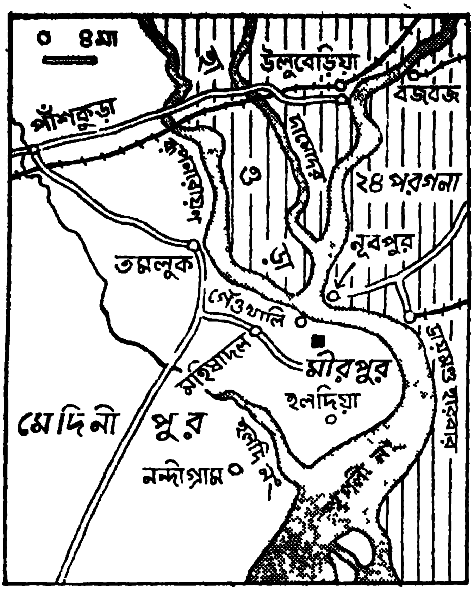
একেবারে সামনের সারিতে যে ক'টি বালিকা-কিশোরী অধীর আগ্রহে দাঁড়িয়েছিল, তাদের নাম জিজ্ঞেস করলাম। তোমার নাম কি মা? আমার নাম জাসিন্থা—জাসিন্থা নুনিস্। তোমার?—ফিলোমিনা পেরেরা। তোমার?—সিসিলিয়া দা'ক্রুজ। পিছনে দাঁড়ানো পুরুষেরা নাম বললেন—বেনেডিক্ট রোজারিও, মানুয়েল টেজরা, জোয়াকিম সুত প্রভৃতি। খাঁটি এই বাঙালী গ্রামে এরা কারা? ছায়াসুনিবিড় এই দূর পল্লীতে এসব পর্তুগীজ নাম কোথা থেকে এল? আশ্চর্য শোনাবে বটে, তবু একথা সত্যি যে এ'রা পর্তুগীজদেরই বংশধর। সে বংশস্বাতন্ত্র্যের শুধুমাত্র নাম ছাড়া আজ আর অন্য বিশেষ কিছু অবশিষ্ট নেই। যেটুকু বা আছে তা তেমন ধর্তব্যের মধ্যে না হলেও সেকথা পরে বলছি। প্রায় দু'শ বছর ধরে এ গ্রামে একটানা বসতির ফলে গ্রামীণ বাঙালীর মতোই তাঁদের কথা-বার্তা, বেশভূষা, জীবনযাপন প্রণালী। অথচ বিদেশী রক্তের খুব ফিকে একটু ছোপ এখনও তাঁদের গায়ে লেগে আছে। এহেন আশ্চর্য গ্রাম পশ্চিমবাংলায় আর একটিও নেই।

সাধারণের কাছে এ লোকালয়ের সংক্ষিপ্ত নাম মীরপুর। পর্তুগীজ-বংশোদ্ভূত ও দেশী খ্রীষ্টানদের বাস বলে অনেকেই কিন্তু বলেন– মীরপুর খ্রীষ্টানপাড়া। মেদিনীপুর জেলার মহিষাদল থানার ভাগীরথীতীরবর্তী দুটি মৌজা, সুখলালপুর ও বেতকুণ্ডু জুড়ে এর বিস্তৃতি। হাওড়া থেকে ট্রেনে পাঁশকুড়া, সেখান থেকে বাসে মহিষাদল অবধি

এসে অন্য বাসে গেঁওখালি পোঁছে কাঁচা রাস্তায় মাইল দুই হেঁটে এলে এ গ্রামে উপস্থিত হওয়া যায়। অন্যথায় ডায়মণ্ডহারবারগামী বাসে সরিষার মোড়ে নেমে, ডায়মণ্ডহারবার-নুরপুর রুটের বাস ধরে নুরপুর-গেঁওখালি লঞ্চ সার্ভিসে গঙ্গা পার হলেই পৌঁছনো যায় ওপারের গেঁওখালিতে। সেখান থেকে মীরপুর হাঁটাপথে দু' মাইল। এ গ্রামের খ্রীষ্টান অধিবাসীদের কথা বলবার আগে পূর্ব ভারতে পর্তুগীজদের আবির্ভাব ও উপনিবেশ স্থাপন সম্পর্কে একটু উপক্রমণিকার হয়ত প্রয়োজন আছে।

ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার তাঁর সম্পাদিত 'বাংলাদেশের ইতিহাস (মধ্যযুগ)' গ্রন্থে (প্রথম সংস্করণ ঃ পৃঃ ৩০৭) বলেছেন—"পর্তুগীজেরা অনেকে বাংলায় স্থায়ীভাবে বাস করিত। বরিশালের পূর্বে, নোয়াখালির দক্ষিণে ও চট্টগ্রামের পশ্চিমে বঙ্গোপসাগরের উত্তর প্রান্তে যে সমুদয় দ্বীপ ছিল, সেখানেই তাহারা বেশীর ভাগ বাস করিত এবং জলপথে দস্যুবৃত্তি করিত। সন্দ্বীপ দ্বীপটি কয়েক বৎসর যাবৎ পর্তুগীজ কার্বালোর অধীনে ছিল। তারপর সিবাস্তিও গন্‌স্যালভেস তিবৌ নামক এক দুর্ধর্ষ জলদস্যু তিন বৎসর (১৬০৭—১৬১০ খ্রীঃ) সন্দ্বীপে স্বাধীন নরপতির ন্যায় রাজত্ব করিয়াছিল।... বাংলাদেশের কোন কোন জমিদার তাহার মিত্র ছিল। সৈনিক ও সেনানায়ক হিসাবে পর্তুগীজদের খুব খ্যাতি ছিল। হুগলী হইতে সপ্তগ্রাম পর্যন্ত ভূভাগ তাহাদের অধিকারে ছিল। অন্যান্য বহু স্থানে তাহাদের বসতি ছিল। বাংলার বহু জমিদার এবং সময় সময় সুলতানেরাও পর্তুগীজ সেনা ও সেনানায়কদিগকে আত্মরক্ষার্থে নিযুক্ত করিতেন। মুঘল যুগে বাংলার নবাবেরা পর্তুগীজ সৈন্য পোষণ করিতেন।"

এহেন একদল পর্তুগীজ সৈনিককে মহিষাদলের রাজা আনন্দলাল উপাধ্যায় (মতান্তরে তাঁর স্ত্রী রানী জানকী দেবী) খ্রীষ্টীয় আঠারো শতকের মাঝামাঝি সময়ে বর্গীদের আক্রমণ প্রতিরোধ করবার জন্য মহিষাদলের চার মাইল পুবে এই মীরপুর গ্রামে বসতি করান। এখানকার বর্তমান বাসিন্দাদের মতে তাঁদের পূর্বপুরুষেরা সম্ভবত ব্যাণ্ডেলের পর্তুগীজ উপনিবেশ থেকে এসেছিলেন। কিন্তু এ জনশ্রুতির সমর্থনে কোন নির্ভরযোগ্য প্রমাণ নেই। পর্তুগীজদের সম্বন্ধে সাধারণভাবে হয়ত একথা বলা যায় যে, দীর্ঘকাল এদেশে থাকবার সময় তারা কিন্তু সাদা চামড়ার অলীক গরিমাজড়িত ব্যাধিতে বিশেষ ভোগেনি। কালা আদমীদের আলোকের পথে নিয়ে যাবার যে গুরু দায়িত্ব ভগবান শ্বেতকায়দের উপর অর্পণ করেছেন সেই বানানো গল্পও তাদের কিছুমাত্র বিব্রত করেনি। তারা ব্যাপকভাবে অত্যাচার ও লুটপাট করেছে সত্য, কিন্তু সভ্যতাগর্বী ইংরেজের মতো আদর্শবাদের ধোঁকার পিছনে শোষণের ব্যবস্থাটা পাকা করেনি। তারা তাই এদেশে স্থায়ী-ভাবে বসবাস করেছে। এ দেশের মেয়ে নিয়ে ঘরসংসার পেতেছে, তারপরে ধীরে ধীরে মিশে গিয়েছে স্থানীয় জীবনস্রোতে। মীরপুরের আদি পর্তুগীজদের বেলাতেও এর ব্যতিক্রম হয়নি। পর্তুগীজ নাম ও পদবী ব্যবহার করে আজও যাঁরা এখানে বাস করছেন, প্রায় দু'শ বছরে বা আনুমানিক আট পুরুষে এ অঞ্চলের অধিবাসীদের সঙ্গে তাঁদের মিশ্রণ এতই গভীর হয়েছে যে সাধারণ বাঙালী খ্রীষ্টানদের থেকে তাঁদের আর পৃথক করা যায় না। ভাষায়, পোষাক-পরিচ্ছদে, আহার-বিহারে তাঁরা গ্রাম-বাংলার জনজীবনের সামিল হয়ে পড়েছেন। শুধু এক-আধজনকে এখনও দেখা যায় যাঁদের রং খুব ফর্সা, চুল কটা, চোখ নীল। শোনা যায়, এরকম চেহারার লোক আগে নাকি আরও বেশী দেখা যেত। এ সম্প্রদায়ের মধ্যে এখন যেসব পদবী প্রচলিত তা হল—দা'ক্রুজ, টেজ্‌রা, রোজারিও, লবু, নুনিস, রতা, সুত ও পেরেরা। ফার্নাণ্ডো ও পলিয়ান পদবীর এখন আর কেউ নেই। পুরুষদের মূল নাম—জন, সামুয়েল, অ্যাণ্টনী, ফ্রাঙ্কো, লরেন্স, বেনেডিক্ট, মানুয়েল, আবুসালেম, মার্টিন, স্টিফেন, মাথিয়াস, জোসেফ, জেসাই, লুকাস,



জোয়াকিম, আব্রাহাম, ডেভিড, নিকোলাস প্রভৃতি ছাড়াও কানাই বলাই জাতীয খাঁটি বাঙালী নামও আছে। মেয়েদেব ক্ষেত্রে—মনিকা, সিসিলিয়া, মারিয়ম, মার্থা, মেরী, সালোমে, সালেমিয়া, জাসিন্থা, সিয়োন, মারিয়া, ফিলোমিনা, ক্যাথারিন, ইভা, অ্যাগনেস, এলিজাবেথ, মার্গারেট, নেলী, আন্না, বারবারাও যেমন আছে, তেমনি সৌদামিনী বা হেমনলিনীও একেবারে বিরল নয়।

পর্তুগীজ বংশোদ্ভূত নন এরকম কিছু বাঙালী খ্রীষ্টানও এ গ্রামে বাস করেন। তাঁরা আদিতে খাঁটি বাঙালী ছিলেন, এখনও আছেন। পর্তুগীজদের পত্তন এখানে কায়েম হবার পর নিম্নবর্ণের কিছু স্থানীয় হিন্দু পাদরীদের হাতে খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত হন। এঁরা তাঁদেরই বংশধর। অপর গোষ্ঠীর সঙ্গে এঁরা ধর্মের বন্ধনে আবদ্ধ। বলা বাহুল্য, এই 'অপর গোষ্ঠী'র এখন আর কোন বংশগত স্বাতন্ত্র্য নেই; পার্থক্য যা তা শুধু তাঁদের নামে।

ক্যাথলিক ও প্রোটেস্টাণ্ট দুই শ্রেণীর খ্রীষ্টানই এ গ্রামে বাস করেন। তাঁদের আনুমানিক সংখ্যা যথাক্রমে ৩০০ ও ২০০। গীর্জা দু'টি একটু বড় আযতনের দু'টি কুটির। ক্যাথলিকরা কলকাতার সেণ্ট পল চার্চকে ও প্রোটেস্টাণ্টরা বৈঠকখানার চার্চকে তাঁদের প্রধান গীর্জা বলে মানেন। উৎসব-পার্বণে সেখান থেকেই তাঁদের পাদরীরা আসেন। তাঁরা ব্যাপ্‌টিজম করান, বিয়েসাদি দেন, গোর দেবার সময় প্রার্থনা করেন। কবর দেওয়া হয় গ্রামের পশ্চিমে, ধানখেতে-ঘেরা উঁচু এক টুকরো ডাঙা জমিতে। "এখানে আসিলে সকলেই সমান"—ক্যাথলিক ও প্রোটেস্টাণ্টের কবর সেখানে পাশাপাশি। একটিমাত্র ইঁটের স্মৃতিসৌধ আছে এ সমাধিক্ষেত্রে। গ্রামবাসীরা বলেন, সেটি প্রতাপ পরামানিকের, যিনি এ গ্রামের ছোটখাট জমিদার ছিলেন। পাশের অনাবৃত আর একটি কবরের শিয়রে যে মর্মর স্মৃতিফলক উৎকীর্ণ তার ইংরেজী ও বাংলা লিপির মর্মার্থ—কলকাতার বি. কে. আচার্য, বার-এট্-ল'র পত্নী ডাক্তার মিসেস কাদম্বিনী আচার্য এখানে শায়িতা। তাঁর জন্ম ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে এপ্রিল ও মৃত্যু ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৬শে মে।

কাদম্বিনী আচার্যের আর এক পরিচয়—তিনি পশ্চিমবঙ্গের এককালীন রাজ্যপাল ডক্টর হরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের শাশুড়ী। গ্রামবৃদ্ধদের মতে, মৃত্যুকালে তিনি মহিষাদল রাজ-বাড়ির অন্তঃপুরিকাদের জন্য লেডী ডাক্তার হিসাবে নিযুক্ত ছিলেন। কাছেপিঠে কোথাও খ্রীষ্টানদের কবরস্থান না থাকায় তাঁর মৃতদেহ নাকি হাতীর পিঠে করে এনে এখানে সমাধিস্থ করা হয়।

গ্রামের ভিতরে এক সম্পন্ন গৃহস্থের দাওয়ায় এসে যখন বসলাম, তখন আবালবৃদ্ধ-বনিতার ভীড় জমলো সামনের উঠোনে। তাঁদের ও গৃহস্বামীকে অনেকক্ষণ জিজ্ঞাসাবাদ করে নানা তথ্য টুকে নিলাম নোটবইতে। কয়েকবার চা দেবার ফাঁকে ফাঁকে বর্ষিয়সী গৃহকর্ত্রীও সে আলোচনায় এসে যোগ দিতে লাগলেন। পাদরীদের মধ্যস্থতায় ব্যাপ্‌টি-জমের কথা আগেই বলেছি। তা সত্ত্বেও অন্নপ্রাশনের হিন্দু প্রথাটি এঁদের মধ্যে ব্যাপক-ভাবে প্রচলিত। অনুষ্ঠানটিও ঠিক হিন্দু রীতি অনুসারেই পালিত হয়। যাবতীয় খ্রীষ্টানী আচার পালন করে গীর্জায় গিয়ে বিয়ে হলেও 'গায়ে-হলুদ'-এর চল আছে এবং কনেকে শাঁখা-সিঁদুর পরানো মোটেই বিরল নয়। পর্তুগীজ ঐতিহ্যের জন্য লাভ-ম্যারেজে বাধা নেই, কিন্তু দু'পক্ষের অভিভাবকদের দ্বারা নির্দিষ্ট বিয়ের সংখ্যাই বেশী। যেহেতু ক্যাথলিক ও প্রোটেস্টান্টের মধ্যে বিয়ে হতে পারে না, সেজন্য ভালোবাসার বিয়েতে ছেলেমেয়ে এই দু'সম্প্রদায়ের হলে জটিলতা দেখা দেয়। সেখানে গ্রাম্য সালিশীর মধ্যস্থতায় একপক্ষ অঙ্গীকার করে, অর্থাৎ অন্য সম্প্রদায়ভুক্ত হতে রাজী হয়। বরপণ বা কন্যা-পণের রেওয়াজ নেই। বিবাহ-বিচ্ছেদের রীতি আছে, তবে গ্রামবৃদ্ধেরা সাধারণত এহেন মনান্তর মিটিয়ে দিয়ে থাকেন।

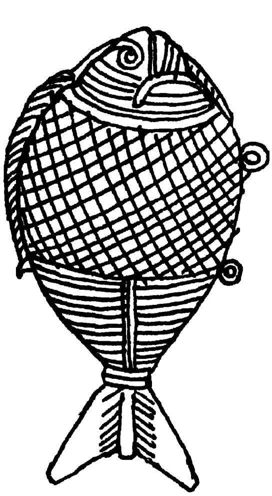
বিধবাদের ক্ষেত্রে সরু পাড়ের সাদা শাড়িই প্রচলিত পরিধেয়। কিন্তু হিন্দু বিধবাদের মতো তাঁরা নিরামিষাশী নন। বস্তুত, এ সম্প্রদায়ের মধ্যে মাছ-মাংস খাওয়ার ব্যাপারে কোন ধর্মীয় নিষেধ নেই; রুচি ও সামর্থ্য অনুসারে গরু ও শুয়োরের মাংসও সকলেই খেয়ে থাকেন। জলখাবারের বেলায় চা, বিস্কুট, কেক, পাঁউরুটির প্রতি আসক্তি কিছু বেশী।

গৃহসজ্জার ক্ষেত্রে সাহেবিয়ানার কিছু প্রাবল্য নজরে পড়ে। খড়ে-ছাওয়া কুঁড়েঘরও যেমন আছে তেমনি টালি-ছাওয়া কুটিরের সংখ্যাও কম নয়। সম্পন্ন গৃহস্থঘরে টেবিল, চেয়ার, বেড-কভার, পর্দার ব্যবহার আছে। ট্রানজিস্টার রেডিও ঘরে ঘরে। তবে এ পণ্যটি এখন গ্রাম-বাংলার প্রায় সর্বত্রই দেখা যায়। অমিতব্যয়িতার মাত্রা যে কিছু বেশী সেকথা গ্রামবাসীরা নিজেরাই স্বীকার করেন।

পেশায় এঁরা কৃষিজীবী ও চাকুরে। অধিকাংশেরই কিছু কিছু জমিজমা আছে। যাঁদের ভূসম্পত্তি বেশী, তাঁরা প্রধানত কৃষিনির্ভর, কিন্তু এহেন গৃহস্থের সংখ্যা কম বলে অনেককেই বাইরের চাকুরিতে বার হতে হয়েছে। তাঁরা জাহাজের কর্মী (সারেঙ্গ, কুক, বাটলার, শুখানী প্রভৃতি), ছাপাখানার কারিগর (মেসিনম্যান, বাইন্ডার ইত্যাদি) অথবা নানান কারখানার শ্রমিক (ফিটার, মেকানিক ইত্যাদি)। অল্প কয়েকজন শিক্ষকতাও করেন। অদূরের গেঁওখালিতে কৃষিজাত পণ্যের বিবিধ ব্যবসা থাকলেও তাতে এ সম্প্রদায় কখনো নিয়োজিত হবার চেষ্টা করেননি। বেকারসমস্যা সেজন্য বেশ প্রবলই বলা যায়। মোটামুটিভাবে সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে কলকাতার কাছাকাছি আর পাঁচটা গ্রাম থেকে এ পল্লীর বিশেষ কোন পার্থক্য নেই। সাংস্কৃতিক দিকের একটু খবর পেলাম ফিরে আসবার সময়।

কাঁচা রাস্তা ধরে গ্রামের বাইরে সবুজ ধানখেতের মধ্যে এসে পড়েছি। এতক্ষণের অভিজ্ঞতার রোমন্থন করতে করতে হয়ত বা অন্যমনস্কভাবেই হাঁটছিলাম। পিছন থেকে কারা যেন আমাকে ডাকছে মনে হল। দ্রুতপদে কয়েকটি ছেলেমেয়ে কাছে এসে বললে,

আমাদের থিয়েটারের দল 'উদয়ন ক্লাব' সম্বন্ধে তো কিছু লিখে নিয়ে গেলেন না? আর একটু দাঁড়ালাম; শুনলাম তাদের কথা। 'উদয়ন ক্লাব' খৃীষ্টমাস ও গুডফ্রাইডের সময় থিয়েটার করে থাকে। 'সিরাজউদ্দৌলা', 'টিপু সুলতান', 'ভাড়াটে চাই' প্রভৃতি পালা তারা ইতিপূর্বেই মঞ্চস্থ করেছে। স্ত্রী-ভূমিকার বেলায় তারা কি করে জিজ্ঞেস করতেই দলের সবচেয়ে বড় মেয়েটি ফোঁস করে উঠল। "জানেন, আমাদের, মানে মেয়েদের, পার্ট করতে দেয় না; এখনও ছেলেদের মেয়ে সাজিয়ে নেয়; কী বিচ্ছিরি যে দেখায় কি বলব!" কি যেন নাম বলেছিল মেয়েটির, ঠিক মনে নেই। ধরুন, সালেমিয়া, সালেমিয়া রতা। তার কথা ভাবতে ভাবতে বাকি পথটুকু ফিরে এলাম। অভিনয়দক্ষতা হয়ত আছে মেয়েটির, কিন্তু প্রকাশের পথ খুঁজে পাচ্ছে না। এ আক্ষেপ সাময়িক হওয়াই সম্ভব। পর্তুগীজ উৎস থেকে শুরু করে বাঙালিয়ানার সড়কে এ সম্প্রদায় বহুদূর অগ্রসর হয়ে এসেছে। অদূর ভবিষ্যতে গ্রামে হয়ত ইলেকট্রিসিটি আসবে, কাঁচা রাস্তাটি পাকা হবে, 'উদয়ন ক্লাব'-এর নিজস্ব পাকা স্টেজ হবে। সালেমিয়া কি তখন সুযোগ পাবে—লুৎফা অথবা আলেয়ার ভূমিকায় নামবার?





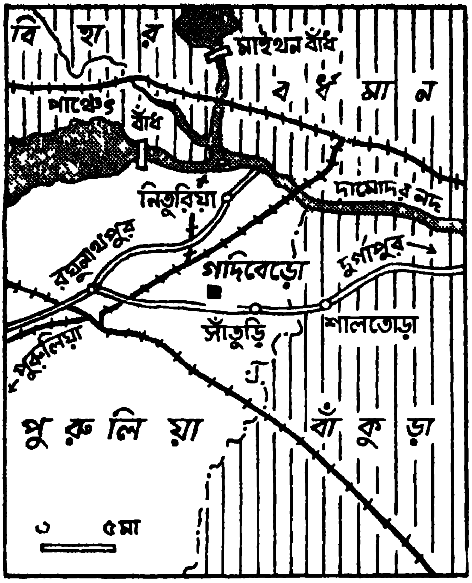
গদিবেড়া

ঘুমন্ত পুরীর রাজকন্যাকে উদ্ধার করতে চলেছেন রাজপুত্র। গায়ে তাঁর ঝকমকে পোশাক, মাথায় পালক-বসানো পাগড়ি, কোমরে ধারালো তলোয়ার, তরুণ তেজোদৃপ্ত চেহারা। পক্ষিরাজে সওয়ার হতেই দুধের মতো সাদা সেই ঘোড়া দুই ডানা মেলে উড়ে গেল আকাশে। নীচে ছবির মতো কত নদনদী, বনউপবন, গ্রামপ্রান্তর। পক্ষিরাজের কিন্তু ক্লান্তি নেই। তীক্ষ্ন চোখে চারিদিকে চেয়ে দেখছেন রাজপুত্র—কোথায় সেই ঘুমন্ত পুরী। অনেক অনেক যোজন চলার পরে, দিগন্তসীমার কাছে, সবুজ পাহাড়ের কোলে নীল এক হ্রদ দেখা গেল। তার তীরে রাজধানী; বাড়িঘরের ছায়া, পাশের পাহাড়ের ছায়া পড়েছে সেই মৃদুশিহরিত কাকচক্ষু জলে। একটু উঁচুতে, পাহাড়ের গায়ে, ধবধবে শ্বেতপাথরের বিশাল রাজপ্রাসাদ। কিন্তু পথঘাট জনহীন, সরোবরে কেউ স্নান করছে না, জীবনের কোন চিহ্ন নেই কোন দিকে। রাজপুত্র বুঝলেন, লক্ষ্যে এসে পৌঁছেছেন। রাজপুরীর বিরাট ফটকের সামনে নেমে এল পক্ষিরাজ। তলোয়ার কোষমুক্ত করে নির্ভয়ে চারিদিকে চাইলেন রাজপুত্র। তারপর খোলা দরজা পার হয়ে রাজপুরীর ভিতরে চলে গেলেন।

বর্ণনাটা এখানেই থামাই। কেননা এ রূপকথার বাকি অংশটুকু আমার মতোই আর সকলের ছেলেবেলা থেকেই জানা। কিন্তু সে কাহিনী শুনতে শুনতে শৈশবের অবাধ কল্পনায় যেসব উজ্জ্বল ছবি ফুটে উঠত চোখের সামনে, তা হয়ত সকলের ক্ষেত্রে হুবহু একই রকম নয়। আর যে যাই দেখুক, আমি কিন্তু রাজপুত্রকে দেখেছি এক নীল হ্রদ পার হয়ে পাহাড়ের গায়ের সেই বিরাট প্রাসাদের চত্বরে গিয়ে নামতে। আমি স্পষ্ট দেখেছি হ্রদের সেই স্বচ্ছ জলে ডানামেলা পক্ষিরাজের সাদা ছায়া পড়েছিল। শাণিত কৃপাণ হাতে রাজপুত্র যখন তোরণ পার হয়ে প্রাসাদের ভিতরে দূর থেকে দূরে চলে গেলেন তখন তেজী ঘাড়টা বাঁকিয়ে পক্ষিরাজ তার সামনের পা দুটো পাথরবাঁধানো উঠোনের উপর ঠুকছিল, ফেনা ঝরে পড়ছিল তার মুখ থেকে, ইস্পাতের স্তরের মতো পেশীগুলো ঘামে ভিজে চিকচিক করছিল। আমি একটুও ভুল দেখিনি; চোখের সামনে এসব একেবারে স্পষ্ট দেখেছি। আর এক শিশু, রূপকথার অন্য এক শ্রোতা, হয়ত এসব ছবি ভিন্নভাবে দেখে থাকবে। তার সঙ্গে আমার কোন বিবাদ নেই। আমার শৈশবস্মৃতিতে সেই সবুজ পাহাড় আর সেই নীল হ্রদের দৃশ্য এখনো এতই উজ্জ্বল যে, চার-পাঁচ দশক পরে বাস্তবে তার হঠাৎ দেখা পেয়ে বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে গেলাম। রূপকথার রঙীন কল্পনা যে এত-দিন বাদে এভাবে সামনে এসে দাঁড়াবে তা স্বপ্নেও ভাবিনি।

*

পুরুলিয়া থেকে রঘুনাথপুর, শালতোড়া, বড়জোড়া হয়ে দুর্গাপুর আসছিলাম



মোটরে। সেখান থেকে ট্রেন ধরে কলকাতায় ফিরব। সকাল ও দুপুরটা কেটেছে পুরুলিয়া জেলার গ্রামগ্রামান্তরে। রঘুনাথপুরে যখন এসে পৌঁছলাম, তখন বেলা পড়ে আসছে। প্রায় নব্বুই মাইল দূরের দুর্গাপুরে ঠিক সময়ে হাজির হতে হলে বেশ জোরেই গাড়ি চালিয়ে যেতে হবে। আর কোথাও থামবার সময় নেই। গাড়ি জোরেই ছুটল। কিন্তু ক্ষণে ক্ষণেই মন ফেলে আসতে লাগলাম পথে ও পথের প্রান্তে। এমন ঢেউখেলানো পথ আর কোথায় পাবেন! এক তরঙ্গের শীর্ষ থেকে দেখা যায় মসৃণ কালো পিচের ফিতে হুহু করে নীচে নেমে গেছে। আবার পরক্ষণেই উঠে এসেছে আর এক তরঙ্গের শীর্ষে। সেই অস্থায়ী চূড়া থেকে আবার নেমেছে নীচে, আবার উঠেছে উপরে। এই চলার দোলা মাইলের পর মাইল। আর দু' পাশের শাল-পলাশ-মহুয়ার বন? এমনটি বুঝি আর দেখবেন না কোথাও! দীর্ঘ পথের দুধারে, আপনার পাশে পাশে, তরঙ্গায়িত বনভূমির নিকটে দূরে তারা আপনার সহযাত্রী। এ পথে ভ্রমণেব সময়টা যদি প্রথম বসন্তে ফেলতে পারেন, তাহলে দেখবেন ননীর মত নরম টোপাটোপা সাদা ফুলে মহুয়া গাছের তলা ছেয়ে আছে। আর সেই সঙ্গে সর্বত্র পলাশের নেশা ও চাঁপা-সবুজে মেশানো শালপাতার আশ্চর্য সতেজ রঙে চোখ জুড়িয়ে যাবে আপনার।

মুগ্ধ চোখ সেই দিকে রেখেই গাড়ির জানালায় বসেছিলাম। নিবিড় নীল আকাশ; পড়ন্ত সূর্যালোকে আলোকিত প্রান্তর। ছবির পর ছবি আসছে, সামনে থাকছে কিছুক্ষণ, তারপর সরে যাচ্ছে পিছনের দিকে। রঘুনাথপুর থেকে মাইল ছ'য়েক আসবার পর সেই অবিশ্বাস্য ঘটনাটা একেবারে চোখের উপরই ঘটল। রাস্তার বাঁ দিকে, কিছু দূরে, শৈশব-কল্পনার সেই সবুজ পাহাড় আর নীল হ্রদ সহসা যেন ইন্দ্রজালের মতো ভেসে এল মহাশূন্য থেকে। চমকে উঠলাম—এই তো সেই তরঙ্গিত-চূড়া পাহাড়, ওই তো সেই আয়নার মতো স্বচ্ছ সরোবর। শুধু শ্বেতপাথরের রাজপ্রাসাদ আর তার সামনের প্রশস্ত উঠনটা এত দূর থেকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না। তবে, নিশ্চয়ই আছে কোথাও, জলের ধারে যেসব বাড়িঘর দেখা যাচ্ছে তার মধ্যে মিশে, পক্ষিরাজ যেখানে এসে নেমেছিল। দিন-শেষের সোনালী আলোয়, নির্মল আকাশের নীচে, সমস্ত দৃশ্যটা প্রত্যক্ষ স্বপ্নের মতো

ঝলমল করতে লাগল আমার চোখের সামনে। গাড়ি থামিয়ে কিছুক্ষণ সেই বাস্তবায়িত কল্পনার দিকে তাকিয়ে রইলাম মুগ্ধ বিস্ময়ে। ঘুমন্ত রাজপুরীর পরিবেশের যে পরিষ্কার ছবিটা আমার শৈশবস্মৃতিতে দৃঢ়ভাবে মুদ্রিত হয়ে আছে তার থেকে কোনই তফাত নেই। মনের কোন গহন গোপনে ছবিটা লুকিয়ে ছিল এতদিন তা টেরও পাইনি।

ড্রাইভার এদিকে ঘনঘন ঘড়ি দেখছে, দুর্গাপুরে ট্রেন ধরাতে হবে তাকে। তাকে দোষ দিই না। সে বেচারা জানে না, প্রায় পঞ্চাশ বছর পিছনে ফেলে-আসা এক সুমধুর স্মৃতির আমি তখন আস্বাদ নিচ্ছিলাম পুরনো মদের মতো। কোন্ গ্রাম, কি তার নাম, কারা সেখানে থাকে, কিছুই খোঁজ নেওয়া হল না। দুর্গাপুরে যথাসময়ে পৌঁছে কলকাতায় ফিরে এলাম। কিন্তু হঠাৎ-দেখা সেই সবুজ পাহাড় আর নীল হ্রদের ছবিটা আমাকে আচ্ছন্ন করে রইল অল্প জ্বরের মতো।

*

মাসখানেকের মধ্যেই আবার ফিরে গেলাম সেপথে। বাঁকুড়া জেলার শালতোড়া ছাড়িয়ে, পশ্চিমমুখী রাস্তায় কয়েক মাইল দূরে, রাস্তার পাশে, পুরুলিয়া জেলার সাঁতুড়ি থানার বাড়ি। দারোগাবাবুকে মোটামুটি একটা বর্ণনা দিতেই তিনি বললেন, বুঝেছি, গদিবেড়ো গ্রামের কথা বলছেন। রঘুনাথপুরের দিকে আরও সাত-আট মাইল গেলে, ডানহাতি এক পাহাড়ের কোলে এক হ্রদের ধারে সে গ্রাম পাবেন। পিচের সড়ক ছেড়ে কাচা রাস্তায় মাইলটাক পথ। কিন্তু সেখানে কি দেখবেন? ওটা তো মাদ্রাজীদের গ্রাম।

মাদ্রাজীদের গ্রাম? বিস্ময়ের ওপর এ আর এক বিস্ময়! 'গদিবেড়ো' এই হতকুচ্ছিত নামটা শুনে আমার রূপকথার ঘুমন্ত রাজপুরীর ভাবকল্পনাটা ইতিপূর্বেই বেশ আহত হয়েছিল। মাদ্রাজীদের গ্রাম শুনে যেন পায়ের তলার মাটি সরে যেতে লাগল। দারোগাবাবু বললেন, বাঙালীও আছে, তারাই সংখ্যায় বেশী, তবে গ্রামের নেতৃত্ব মাদ্রাজীদের হাতে। তাঁরা ব্রাহ্মণ। গ্রামের অধিকাংশ লোক তাঁদেরই শিষ্য, জমিজমার মালিকানাও বেশীর ভাগ তাঁদের হাতে। বাঁকুড়া-পুরুলিয়া সীমান্তে অবস্থিত এই দূর পল্লীতে দ্রাবিড়সন্তানেরা কিভাবে, কতদিন আগে এসে বসতি করেছেন, দারোগাবাবু তা জানেন না, তবে এখানে তাঁদের বাস যে কয়েক পুরুষের তাতে তাঁর সন্দেহ নেই। মনে আছে, 'হাইলি ইন্টারেস্টিং' বলে ঘুঁষি মেরেছিলাম দারোগাবাবুর টেবিলে। কেননা আমার শৈশব এখন দূর অতীতে বিলীয়মান। রূপকথা শোনা মাত্র আজ আর মন তেমন সহজেই উধাও হয়ে যায় না। রাজপুত্র-রাজকন্যাদের বদলে সাধারণ মানুষের পুত্রকন্যাদের ভাবনাই এখন মনকে ভাবায় অনেক বেশী। এই পরিবর্তনের, এই দৃষ্টিবদলের নামই জীবন। নতুন চিন্তাভাবনা, নতুন মূল্যবোধকে আঁকড়ে ধরেই আমরা বাঁচি, পরিপূর্ণ হই। পুরনো মালা শুখানোর সাথে সাথে নবীন মালাগাঁথা চলে অবিরাম।

দারোগাবাবুর সঙ্গে আর বৃথা সময় নষ্ট না করে শৈশবকল্পনার সেই সবুজ পাহাড় ও মৃদুশিহরিত নীল হ্রদের তীরে এসে পৌঁছেছিলাম অনতিবিলম্বে। বহু যুগ আগেকার সেই মনগড়া ছবির সঙ্গে চোখের সামনের দৃশ্যের হুবহু মিল থাকলেও আজ আর সেই কাল্পনিক মর্মরপ্রাসাদ ও রাজপুত্র রাজকন্যাদের সন্ধানে আমি এতটুকু উৎসাহী নই। তার বদলে পশ্চিমবাংলার এই দূর পল্লীতে তামিলভাষী এক স্থায়ী জনগোষ্ঠীর রহস্য উন্মোচন করাটাই এখন আমার কাছে অনেক বেশী জরুরী।

একটু খোঁজ করে রামচন্দ্র আচার্য গোস্বামী মহাশয়ের বৈঠকখানায় এসে বসলাম কিছুক্ষণ পরে। মাদ্রাজের (অধুনা তামিলনাড়ু) তিনেভেলী জেলায় আদি নিবাস হলেও পরিষ্কার বাংলা বলেন রামচন্দ্রবাবু। অনেক পুরুষ আগে তিরুপতিতে তীর্থ করতে

গিয়ে, তাঁর পূর্বপুরুষ গোপালাচারীর সঙ্গে দেখা হয় পঞ্চকোটরাজের। রামানুজ সম্প্রদায়ের প্রখ্যাত সন্ত এই আয়েঙ্গার ব্রাহ্মণের পূত চরিত্রে মুগ্ধ হয়ে পঞ্চকোটরাজ তাঁকে গুরুপদে বরণ করে নিজ রাজ্যে নিয়ে আসেন। নিরালায় সাধন-ভজনের সুবিধার জন্য পাহাড়ের কোলে এই নিরিবিলি স্থানটি গুরু পছন্দ করেন। এখানেই তাঁর আশ্রম স্থাপিত হয়। কিছু মন্দিরাদিও তৈরি হয়। এক বাঁধ দিয়ে বিশাল জলাশয়টির সৃষ্টি হয় কিছুদিন পরে। পাহাড়বেষ্টিত স্থান বলে নাম হয় 'বেড়ো'; আর রাজগুরুর গদির অবস্থানের জন্য 'গদিবেড়ো'। মৌজার নাম শুধু 'বেড়ো'; থানা রঘুনাথপুর। আসানসোল-আদ্রা রেলপথের বেড়ো স্টেশনটি কাঁচা রাস্তায় দু' মাইল দূরে অবস্থিত।

রামচন্দ্রবাবু বললেন, বর্তমান পুরুষে তাঁরা দু' ভাই। তিনি ছোট। গ্রামে থেকে যজমানি ও ভূসম্পত্তির দেখাশোনা করেন। বড় ভাই শ্রীনিবাস আচার্য গোস্বামী এম.এ., বি.এল। কলকাতা হাইকোর্টের অ্যাডভোকেট হিসাবে তাঁর নাম লেখানো আছে বটে, তবে গুরুগিরির জন্য তাঁকে প্রায়ই এখানে এসে থাকতে হয়। পঞ্চকোটরাজ বাঁকুড়া, বর্ধমান, পুরুলিয়া ও ধানবাদ জেলায় যে ১০৪টি মৌজা তাঁর গুরুকে প্রণামীস্বরূপ দিয়েছিলেন, সে বিশাল ভূসম্পত্তির এখন সামান্যই অবশিষ্ট আছে। তবে এই সম্প্রসারণের সুযোগ পেয়ে তিনেভেলী জেলার আম্বাসমুদ্র থেকে রাজগুরু গোপালাচারীর বহু আত্মীয় ও দীক্ষিত শিষ্য ক্রমে ক্রমে এখানে এসে বসতি করেন। গুরু-পরিবার শুধু যজমানিই করেননি; গ্রামের নানাবিধ উন্নতির জন্যও তাঁরা দায়ী। স্থানীয় হায়ার সেকেন্ডারী স্কুল, আয়ুর্বেদীয় হাসপাতাল ও দুটি তাঁদেরই কীর্তি।

গ্রামের বর্তমান লোকসংখ্যা ছ' হাজারের মতো। তার মধ্যে ষাটটি পরিবারভুক্ত প্রায় সাড়ে-তিন শ জনের পূর্বপুরুষ মাদ্রাজী। স্থানীয় বাঙালীরা নানা বর্ণের—যথা রাঢ়ী ব্রাহ্মণ (মুখোপাধ্যায়, ভট্টাচার্য, চক্রবর্তী প্রভৃতি); গন্ধবণিক (দাস, মুদি); সুবর্ণ বণিক (পোদ্দার); তাঁতি (নাথ); কর্মকার, শরাফ ইত্যাদি। গোপালাচারীর যেসব দীক্ষিত শিষ্য এখানে এসেছিলেন, তাঁদের অধিকাংশই নাকি ছিলেন মৎস্যজীবী। তাঁরা কালক্রমে স্থানীয় বাঙালী কৈবর্ত প্রভৃতি সম্প্রদায়ের সঙ্গে বিবাহাদি করে প্রায় বাঙালী হয়ে পড়েছেন। কিন্তু গুরু-পরিবার ও তাঁদের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়দের বিয়েসাদি এখনও হয় তিনেভেলী জেলায় তাঁদের নিজেদের সমাজে। বাইরে বাংলা বললেও বাড়িতে তাঁরা তামিলই বলে থাকেন।

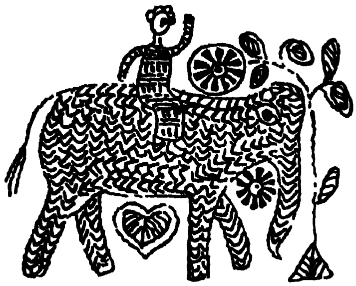
পঞ্চকোটরাজের অর্থানুকূল্যে বাংলারীতির যে দু'টি আটচালা ও একটি জোড়-বাংলা মন্দির একদা এখানে নির্মিত হয়েছিল, তার কোনটিতেই প্রতিষ্ঠাফলক নেই, কিন্তু অল্পবিস্তর 'টেরাকোটা' অলংকরণ আছে। সেগুলির রচনাশৈলীর নজিরে, দেবালয় তিনটির বয়স দু'শ বছরের কাছাকাছি মনে হয়। অতএব এখানকার দ্রাবিড় উপনিবেশও মোটামুটি ততদিনের প্রাচীন। প্রধান মন্দিরটি আটচালা; বিগ্রহ কেশবজীউ (কৃষ্ণ) ও রাধিকা। দ্বিতীয়টিও ক্ষুদ্রতর আটচালা; বিগ্রহ রঘুনাথ। 'টেরাকোটা' অলংকরণ এ মন্দিরেই সবচেয়ে বেশী। তৃতীয়টি এক পরিত্যক্ত জোড়বাংলা মন্দির; আগে তাতে কি বিগ্রহ ছিল কেউ বলতে পারেন না। আটচালা মন্দির পুরুলিয়া জেলায় আরও দু'চারটি আছে, কিন্তু এইটিই সম্ভবত সেখানকার একমাত্র জোড়বাংলা মন্দির। আর একটি জোড়-বাংলা ইমারত অবশ্য দেখেছি ঝালদার কাছে; কিন্তু সেটি এক মুসলমানী কবরের উপর নির্মিত।

*

গদিবেড়ো গ্রাম পরিক্রমা করে পিছনের পাহাড় ও মন্দিরাদির ছবি তুলে আবার যখন রামচন্দ্র আচার্য গোস্বামী মহাশয়ের বৈঠকখানায় এসে বসলাম, তখন বেশ ক্লান্ত। ছোট

ছোট দু'তিনটি মেয়ে এসে দাঁড়িয়েছে ঘরের মধ্যে। তাদের পরনে মাদ্রাজী ধরনের কুর্তা ও ঘাগরা। নিজেদের মধ্যে তারা তামিলে কথা বলছে মনে হল। রামচন্দ্রবাবুকে বললাম— বাড়িতে আপনারা তো তামিলেই কথা বলেন; সে ভাষাতে একটু কথা বলুন না এই মেয়েদের সঙ্গে! তিনি কি যেন বললেন মেয়েদের। অমনি তারা এক ছুটে বাড়ির ভিতর চলে গেল। অনতিকাল পরে এক গেলাস জল আর এক কাঁসি মালপুয়া এনে রাখল আমার সামনে। সেগুলির সদ্ব্যবহার করতে করতে মনে কোনই সংশয় রইল না, এঁরা এখনও উৎকৃষ্ট তামিল বলেন। যে তামিল মুহূর্তমধ্যে এমন সুখাদ্য সামনে এনে হাজির করতে পারে তার উচ্চ মানে সন্দেহ কি!





চৌড়দা

পশ্চিমবঙ্গের লুপ্ত বা লুপ্তপ্রায় কুটিরশিল্পগুলির কথা বাদ দিলেও যেগুলির জীবনীশক্তিতে এখনও তেমন ভাটা পড়েনি তাদের সংখ্যা অনায়াসেই শতাধিক হবে। উৎপন্ন সামগ্রীর মনোহারিত্ব বা তাদের নির্মাণকৌশলের বৈচিত্র্যও অসীম। পশ্চিমবঙ্গে কলকারখানার ব্যাপক সূত্রপাত খুব বেশী দিনের নয়। তাছাড়া স্থানীয় অধিবাসীদের প্রায় সত্তর ভাগ এখনও পল্লীবাসী। নাগরিক সমাজবিন্যাস বা আধুনিক উৎপাদন-ব্যবস্থা অদ্যাবধি তাঁদের বিশেষ স্পর্শও করেনি। অতএব দৈনন্দিন প্রয়োজন মেটানোর জন্য গ্রামীণ হস্তশিল্পের সংখ্যা এখানে যে বেশ বেশী হবে এমনই স্বাভাবিক। কিন্তু আশ্চর্য এই যে, এত অগণিত সুকুমারশিল্পের আনুপূর্বিক বিবরণসমেত ভালো কোন বই বাংলাভাষায় এখনও লেখা হয়নি। এ বিষয়ে সচিত্র পুস্তক তো আরও দুষ্প্রাপ্য। বিচ্ছিন্নভাবে প্রবন্ধাদি যা প্রকাশিত হয়েছে, প্রয়োজনের তুলনায় তাও অনেক কম। সে-গুলিও সব ক্ষেত্রে চিত্রসংবলিত নয়। অথচ এ জাতীয় বিষয়বস্তু পাঠকসাধারণের কাছে সহজবোধ্য করতে হলে শুধু লিখিত বিবরণই যথেষ্ট হতে পারে না; সঙ্গে হাতে-আঁকা ছবি বা আলোকচিত্র থাকা নিতান্ত প্রয়োজন। কেননা, বক্তব্য এক্ষেত্রে যতটা না বুদ্ধিগ্রাহ্য তার চেয়ে বেশী দৃষ্টিগ্রাহ্য। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, আমাদের প্রতিমানির্মাণশিল্প যতই বিস্তারিতভাবে আলোচিত হোক না কেন, নির্মাণপ্রণালী ও সৃষ্ট বস্তুর ছবির অভাবে তা নীরস, এমনকি দুর্বোধ্য হওয়া খুবই সম্ভব। কিন্তু মূলত দৃষ্টিগ্রাহ্য এমন বহু বিষয়ের গবেষক মহলে ছবি আঁকতে বা ফটো তুলতে না জানাটা এতই নিত্য ও ব্যাপক যে, তাঁদের অনেকেই এসব দক্ষতা অর্জনকে অপ্রয়োজনীয় এমন কি হেয় জ্ঞান করেন বলে শুনেছি। তাঁদের একমুখী পাণ্ডিত্যকে আমি বিন্দুমাত্র ঈর্ষা করি না। কিন্তু সাধারণ বাঙালী পাঠক হিসেবে আমার খেদ এই যে, বঙ্গকৃষ্টির এসব ধারক ও বাহকদের কাছে আমাদের যতখানি প্রত্যাশা তার সামান্যই তাঁরা পূরণ করে থাকেন। আমাদের সংস্কৃতিসম্পদ সম্বন্ধে বাঙালী জনসাধারণ এখনও যে রীতিমত অজ্ঞ, তার পাঁচটা কারণের মধ্যে এটি বেশ গুরুত্বপূর্ণ। সাধারণ মানুষের অভিনিবেশ আকর্ষণ করবার মতো করে বাঙালীর কৃষ্টিসম্ভারের কথা আমরা আজও তাঁদের সামনে ব্যাপকভাবে উপস্থিত করতে পারিনি। ফলে জাতিগতভাবে আমাদের সংস্কৃতিবৈভবের নানা উপাদান সম্বন্ধে আমরা সম্যক অবহিত নই এবং সেজন্যই সে বিষয়ে উৎসাহীও নই। পরিস্থিতিটি অবশ্যই পরিতাপের। কিন্তু তার জন্য মুখ্যত দায়ী যে আমরাই—অর্থাৎ কৃষ্টি-প্রবক্তা সম্প্রদায়—তাতে সন্দেহের অবকাশ কম। অধমের এই খেদোক্তিতে কেউ যেন না রুষ্ট হন। কেননা, "এ শুধু চোখের জল, এ নহে ভর্ৎসনা।"

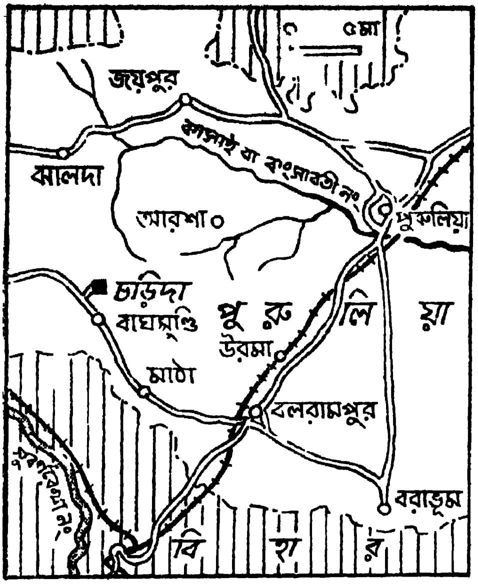
পুরুলিয়া জেলার ছো নাচের মুখোশ-শিল্প বিষয়ে লিখতে বসে এই 'চোখের জলে'ই বারবার অভিভূত হচ্ছি। এ প্রবন্ধের সঙ্গে রঙিন ছবি ব্যবহার করাই হয়ত উচিত ছিল, কেননা আলোচ্য কুটিরশিল্পটির মতো বর্ণাঢ্য গ্রামীণ কারুকলা পশ্চিমবঙ্গে বেশী নেই। সেটা সম্ভব হলে পাঠকসাধারণের কাছে এ শিল্পের সূক্ষ্মতা ও মনোহারিত্ব আরও প্রাঞ্জলভাবে পেশ করতে পারতাম। কিন্তু বর্তমান গ্রন্থে তা সম্ভব নয় বলে পাঠককে দুধের স্বাদ ঘোলে মেটাতে হবে।

পুরুলিয়া জেলায় ছো নাচের প্রচলন খুবই ব্যাপক। অনেকের ধারণা, সেখানে কম পক্ষে আড়াই শ ছো নাচের দল আছে। এ খবর সত্য হলে, গড়ে তিন-চারটি গ্রাম পিছু এক-একটি দল থাকবার কথা। এ বিষয়ে নির্ভরযোগ্য কোন আদমশুমার না হয়ে থাকলেও ছো নাচের জনপ্রিয়তার কাছাকাছি আসতে পারে, এমন কোন আঞ্চলিক নৃত্যরীতি যে পশ্চিমবঙ্গের অন্যত্র নেই সেকথা নিঃসংশয়ে বলা চলে। পত্র-পত্রিকায় এ নাচ সম্বন্ধে নিতান্ত কম লেখা হয়নি। সঙ্গীত নাটক একাডেমীর আমন্ত্রণে দিল্লীতে ও কলকাতার কোন কোন প্রেক্ষাগৃহে এ নাচ একাধিকবার দেখানো হয়েছে বলে পুরুলিয়া জেলার বাইরেও অনেকে এ নাচের সঙ্গে পরিচিত। কিছুকাল আগে ছো নাচের একটি দল বিদেশেও তাঁদের শিল্পনৈপুণ্য দেখিয়ে এসেছেন। কিন্তু যে অপরূপ মুখোশগুলি এ নাচের প্রাণ, তাদের সম্বন্ধে এখনও যথেষ্ট পরিমাণে লেখা হয়েছে কিনা সন্দেহ। পুরুলিয়ার মাত্র দু'টি গ্রামের কারিগরেরা এই সুকুমার শিল্পটির চর্চা করেন বলে তার অভিনবত্ব আরও বেশী। বাঘমুণ্ডি থানার চড়িদা ও জয়পুর থানার ডুমুরডিহি গ্রাম দু'টির মধ্যে প্রথমটির গুরুত্বই সমধিক, কেননা সেখানে শিল্পীর সংখ্যা প্রায় চল্লিশ ঘর আর ডুমুরডিহিতে মাত্র চার-পাঁচ ঘর। তাছাড়া ডুমুরডিহির প্রধান কারিগর মধু রায়, গোকুল রায় প্রভৃতিদেরও পৈতৃক নিবাস চড়িদায়; বর্তমান পুরুষেই তাঁরা উঠে এসে ডুমুরডিহিতে বসতি করেছেন। পেশা ও ঐতিহ্যগত এই ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের জন্য এই দুই কেন্দ্রের শিল্পীদের মধ্যে কারিগরি পদ্ধতিতে কোনই পার্থক্য নেই।

মাত্র দু'টি গ্রামের মুখোশশিল্পীরা প্রায় আড়াই শ ছো নাচের দলের চাহিদা কি করে মেটান সে এক সঙ্গত প্রশ্ন। উত্তরে বলা যায়, এ মুখোশগুলি এমনিতেই বা সামান্য পরিচর্যায় বহুদিন পর্যন্ত চলে। দ্বিতীয়ত, এগুলির দাম বেশ বেশী বলে দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত দলগুলিকে (অধিকাংশই তাই) তাদের চাহিদা খুব সীমিত রাখতে হয়। সাধারণ মুখোশের দাম প্রতিটি পাঁচ-ছ' টাকা; নাচের জন্য এত নিরেস আভরণ বিশেষ উপযোগী বলে বিবেচিত হয় না। 'সাজানো' বা পুঁতি, পালক ইত্যাদি দিয়ে অলংকৃত মুখোশের দাম প্রতিটি তিরিশ-চল্লিশ টাকার কম নয়। আর অভিনীত পালার গুরুত্ব অনুযায়ী সব অভিনেতার জন্য পুরো সেট হাজার-বারো শ টাকা অবধি পড়তে পারে।

শিল্পীরা এত চড়া দামও যে ঘরে বসেই পান তার অন্যতম কারণ হল তাঁদের গ্রাম দু'টিতে সহজেই পৌঁছনো যায়। ডুমুরডিহি তো পুরুলিয়া-রাঁচি সড়কের সংলগ্ন গ্রাম, পুরুলিয়া থেকে দশ-বারো মাইল দূরে; আর চড়িদা (স্থানীয় উচ্চারণে 'চোড়দ্যা') পুরুলিয়ার প্রায় কুড়ি মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমের থানা-কেন্দ্র বাঘমুণ্ডি থেকে কাঁচা রাস্তায় মাইল দেড়েক পশ্চিমে। পুরুলিয়া শহর থেকে বাঘমুণ্ডি অবধি নিয়মিত বাস সার্ভিস আছে। সে রুটের বাস বলরামপুর ও মাঠা হয়ে এক ঘণ্টার কিছু বেশী সময়ে যাত্রীদের বাঘমুণ্ডি পৌঁছে দেয়। বাকি কাঁচা রাস্তাটুকু বাঘমুণ্ডি-ঝালদা রোডের অংশ; শীত-গ্রীষ্মে ধুলো ও বর্ষায় কাদা হলেও মোটেই অগম্য নয়।

এই দূর পল্লীতে এহেন এক কুশলী শিল্পীসম্প্রদায় কোথা থেকে, কিভাবে এলেন? এ বিষয়ে ডক্টর আশুতোষ ভট্টাচার্য মহাশয়ের মতটি প্রণিধানযোগ্য। তাঁর অধীনে গ্রাম-



সমীক্ষার একটি দল ১৯৬৮ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে এ অঞ্চলে অনুসন্ধান কার্য চালিয়েছিলেন। তাঁর মতে—"চারিদিককার আদিবাসী এবং অর্ধ-আদিবাসী সংস্কৃতির মাঝখানে এই গ্রামের অবস্থান বিস্ময়কর। কারণ ৪০টি অভিজাত শিল্পীর পরিবার এই গ্রামে বাস করে; ইহারা প্রধানত মৃৎশিল্পী হইলেও কাষ্ঠশিল্পও ইহাদের অনুশীলনের বিষয়। অভিনব পদ্ধতিতে ছো-নাচের মুখোশ নির্মাণ ইহাদের প্রধান ব্যবসায়। ছো-নাচের বিষয়বস্তু রামায়ণ-মহাভারত। ইহাদের বিষয়গত মর্যাদারক্ষায় শিল্পীদিগের সতর্কতা দেখিয়া মনে হয়, ইহারা অভিজাত সমাজের শিল্পী।.. এই অঞ্চলের আদিবাসী সামন্ত রাজগণ যখন হিন্দুধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করিলেন, তখন হিন্দু পদ্ধতিতে প্রতিমা পূজা করিতে গিয়া বাংলাদেশ হইতে মৃৎশিল্পীদিগকে লইয়া গিয়া সেখানে বসতি স্থাপন করাইয়া থাকিবেন।...শিল্পিগণ বাঙ্গালী কায়স্থের পদবীধারী এবং বাংলাদেশের সঙ্গে সামাজিক বন্ধনে আবদ্ধ। স্থানীয় সামন্তরাজার পৃষ্ঠপোষকতায় মাত্র কয়েক পুরুষ পূর্বে ইহারা গিয়া সেই অঞ্চলে বসবাস করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মুখোশ নির্মাণের পদ্ধতি বাঙ্গালী শিল্পীরই একটি বিশিষ্ট কলাকৌশল।" ('লোকশ্রুতি' ঃ আশ্বিন ১৩৭৫। পৃঃ ২৪৯—৫০)।

চড়িদার মুখোশ শিল্পীদের আদিপুরুষরা যে বাঙালী ছিলেন তার আরও প্রমাণ - এঁরা নিজেদের জাতিতে সূত্রধর বলে বলেন, এঁদের পদবী পাল, শীল, দত্ত। শেষ-মধ্য-যুগীয় বাংলায় 'সূত্রধর' শিল্পীদের বহুমুখী অবদানের কথা বর্তমান গ্রন্থের অন্যান্য প্রাসঙ্গিক নিবন্ধে বেশ বিস্তারিতভাবেই বলা হয়েছে। তাছাড়া উপরের উপাধিগুলি যে খাঁটি বাঙালী উপাধি তাতেও সন্দেহ নেই। তাঁদের প্রধান উপাস্য দেবদেবী—দুর্গা, কালী, গণেশ, বিশ্বকর্মা, ভাদু, টুসু প্রভৃতি। নিরামিশ নৈবেদ্য সহযোগে, ব্রাহ্মণ পুরোহিত দিয়ে এসব পূজা অনুষ্ঠিত হয়। বলিদানের প্রথা নেই। বিবাহ, শ্রাদ্ধ প্রভৃতিতে ব্রাহ্মণ পুরোহিত নিয়োগ করা হয়ে থাকে। বরপণ প্রথা প্রচলিত। মৃতদেহ দাহ করাই রীতি। পাঠক লক্ষ করবেন, শুধু শক্তিপূজায় বলিদান না দেওয়া ছাড়া অন্যান্য সামাজিক বিধি হুবহু বাঙালীদের মত। ডক্টর তুষার চট্টোপাধ্যায় 'লোকশ্রুতি' পত্রিকার একই সংখ্যায়

অন্যত্র বলেছেন—"বিভিন্ন অনুসন্ধানের উত্তর বিশ্লেষণ করে অনুমান হয়, চোড়দা গ্রামের সূত্রধরগণ সম্ভবত বর্ধমান জিলার কোন স্থান থেকে বহু পূর্বে আগে এখানে স্থায়ী-ভাবে চলে আসেন।...বর্ধমান ও অন্যান্য স্থানের সমগোত্রীয় সূত্রধরদের গোত্র-পরিচয় ও শিল্পকর্মের তুলনামূলক বিচারের মাধ্যমে এ সম্বন্ধে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যেতে পারে।" এঁদের কথ্য ভাষাও যে পুরোপুরি বাংলা এবং কুশলী শিল্পীদের সুচাঁদ, মধু, গোকুল, মহেশ, সতীশ, হীরালাল, অসীম প্রভৃতি নামও যে খাঁটি বাঙালী নাম, সে-কথাও উল্লেখযোগ্য। বাঙালী কায়স্থ সমাজে বিভিন্ন পদবীধারীদের মধ্যে বিবাহে যেমন কোন বাধা নেই, এখানকার পাল, শীল ও দত্তদের মধ্যেও তেমনি বিবাহ প্রচলিত।

গ্রামবৃদ্ধদের মতে এ সম্প্রদায়ের আদি বাসিন্দারা সম্ভবত কাষ্ঠশিল্পী ও মৃৎশিল্পী ছিলেন। ছো নাচের মুখোশ নির্মাণে দক্ষতা তাঁরা সম্ভবত পরে অর্জন করেন। এখন মুখোশ তৈরি প্রধান পেশা হলেও নানাবিধ প্রতিমা গড়া ও দরজা, জানালা, টেবিল, চেয়ার, আলমারি, পালঙ্ক, চাকি, বেলুন, বারকোশ প্রভৃতি কাঠের সামগ্রী ও মেলায় বিক্রির জন্য সনাতন ধাঁচের কাঠের মা-পুতুলও তাঁরা যথেষ্ট পরিমাণে তৈরি করে থাকেন। প্রধানত, রাঁচি জেলার বিখ্যাত সতী মেলা ও বড়কাগড়ের রথের মেলা, সিংভূমের ছাতা-পুকুর মেলা, বাঘমুণ্ডির ঝাবড়ি মেলা ও টাটানগরের মেলায় কাঠের ছোট জিনিসগুলি ও পুতুল বিক্রির জন্য নিয়ে যাওয়া হয়। মুখোশ তৈরির মরশুম সাধারণত মাঘ-ফাল্গুন থেকে জ্যৈষ্ঠ অবধি চলে বলে বছরের বাকি সময়টা তাঁরা এসব বিকল্প কাজ নিয়ে থাকবার অবকাশ পান।

চৈত্র-সংক্রান্তির শিবের গাজন-উৎসবের মধ্য দিয়েই প্রতি বছর ছো নাচের উদ্বোধন হয় পুরুলিয়ায়। তখন শিবের মন্দির বা থানে পূজা দিয়ে বৈশাখের প্রথম থেকেই বিভিন্ন দল তাঁদের নাচ শুরু করেন নিজেদের গ্রামে বা আমন্ত্রণ পেলে অন্য স্থানেও। এই গণ-নৃত্য পুরোদমে চলে জ্যৈষ্ঠের শেষ অবধি। মুখোশশিল্পীদের প্রস্তুতি কিছু আগেই শুরু হয়—মাঘ থেকে জ্যৈষ্ঠ অবধি তাঁদের ফুরসত থাকে না।

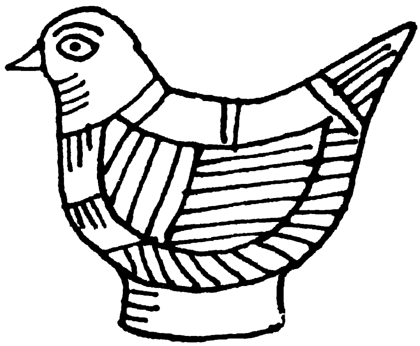
রামায়ণ-মহাভারতের এক-একটি কাহিনী অবলম্বন করেই যে ছো নাচের পালাগুলি রচিত হয়, সেকথা আগেই বলেছি। সেজন্য রাম, সীতা, হনুমান, রাবণ, ভীম, অর্জুন, অভিমন্যু, দুর্যোধন প্রভৃতি প্রধান চরিত্র ছাড়াও আরও অগণিত উপ-চরিত্রের মুখোশ তৈরি হয়ে থাকে। এছাড়া পৌরাণিক কাহিনীর পাত্রপাত্রী ও দুর্গা, কালী, শিব, মনসা প্রভৃতি পৌরাণিক ও লৌকিক দেবদেবীর মুখোশও প্রয়োজন হয়। জীবজন্তুও বাদ যায় না—সিংহ, বাঘ, ভালুক, শুয়োর, হরিণ, ময়ূর ইত্যাদির মুখোশও খুব সমাদৃত।

অন্যান্য গ্রামীণ শিল্পের মতই ছো নাচের মুখোশ তৈরির পদ্ধতিতে বিশেষ জটিলতা নেই। প্রথমে, মাটি দিয়ে অভীষ্ট মূর্তির একটি নিরেট মডেল বানিয়ে নেওয়া হয়; একে বলে 'মাটি গড়া'। মৃৎশিল্পের বংশগত অভিজ্ঞতা এই কাজে কারিগরদের খুব সাহায্য করে। রোদ্দুরে শুখাবার পর মডেলটিকে ভাটিতে পুড়িয়ে শক্ত করে নেওয়া হয়। তারপরে মডেলের গায়ে ছাই মাখিয়ে নিয়ে (যাতে মুখোশটি পরে ছাড়িয়ে আনতে অসুবিধা না হয়), ময়দার আঠা-মাখানো পুরনো খবরের কাগজ চার-পাঁচ ভাঁজ পুরু করে মডেলের রিলিফ অনুযায়ী তার উপর আঙুল দিয়ে চেপে চেপে মসৃণভাবে লাগানো হয়। একে বলে 'কাগজ চিটানো'। কাগজের আবরণটি শুখালে, সেটি ছাড়িয়ে নিয়ে যত্নে তৈরি মিহি কাদার প্রলেপ লাগানো হয় তার উপর। এর নাম 'কাবিজ লেপা'। অতঃপর এই কাদার আস্তরণের উপর এক প্রস্থ পুরনো কাপড় লাগিয়ে নেওয়া হয়, যাকে বলে 'কাপড় সেটানো'। এরপরে খুব ছোট একরকম পোড়ামাটির কর্নিক দিয়ে জমিন পালিশ করা হয়, যার নাম 'থাপি পালিশ'। পালিশ-করা মুখোশটি রোদে শুখালে, প্রথমে তার উপর এক প্রস্থ খড়িমাটির

গোলা লাগিয়ে শুখিয়ে নিয়ে রং-তুলির সাহায্যে চোখ, মুখ, চুল, গোঁফ ইত্যাদি এঁকে নেওয়া হয়। তারপরে আরম্ভ হয় তারের কাঠি, পাখির পালক, ময়ূরপাখা, রাংতা, পুঁতি, 'কিরণপোখরি', 'জামিরপাতা', সল্‌মা-চুমকি, নানা রঙের চীন-কাগজ, শণ, পাট প্রভৃতির সমবায়ে শিরোভূষণ নির্মাণ, কারিগররা যাকে বলেন 'মুখোশ সাজানো'। এ কাজটি খুবই পরিশ্রমসাধ্য ও ছো নাচের প্রধান পুরুষ ও নারী চরিত্রগুলির জন্যই এহেন শিরোভূষণ নির্মিত হয়। এই শ্রেণীর মুখোশের মধ্যে যেগুলি বিশেষ আড়ম্বরবহুল তাদের নাম 'পঞ্চখিলান'।

উপকরণের দিক থেকে মাটি, খবরের কাগজ, পুরনো কাপড় বা ময়দার আঠা সহজেই সংগ্রহ হয়, কিন্তু মুকুট সাজানোর নানাবিধ উপাদান শিল্পীদের বেশ দাম দিয়ে কিনতে হয় বাজার থেকে। ঘরে-তৈরি উদ্ভিজ্জ রং কখনও ব্যবহৃত হত কিনা তা বর্তমান শিল্পীরা বলতে পারেন না। তাঁরা বরাবরই কেনা রং ও 'কোপাল ভার্নিস' (কারিগরদের ভাষায় 'গোপাল বার্নিস') ব্যবহার করে আসছেন। তবে মুখোশের চুল 'গাবানো'র (রাঙানোর) জন্য হীরাকষ ও হরিতকী একত্র সিদ্ধ করে তার ক্বাথে পাট বা শণের ফেঁসো চুবিয়ে রেখে রং করে নেওয়াটা এখনও প্রচলিত প্রথা।

চড়িদার কারিগররা বলেন, তাঁদের আর্থিক অবস্থা ভাল নয়। উপাদানের উচ্চ মূল্য এর অন্যতম কারণ। তাঁদের মধ্যে মাত্র দু'চারটি পরিবারের সামান্য চাষের জমি আছে; অন্যান্যদের ক্ষেত্রে শিল্পীর পেশাই একমাত্র নির্ভর। বাঘমুণ্ডির ব্লক ডেভেলপমেণ্ট অফিসারের মতে কিন্তু তাঁদের অবস্থা খুব খারাপ নয়। কেননা ৭।৮ বছর আগে ১৭জন সভ্যকে নিযে যে সমবায় সমিতিটি গঠিত হয়েছিল, তা দু'তিন বছর চলেই ভেঙে যায়। আর্থিক অবস্থা সঙ্গীন হলে সমবায়ের মাধ্যমে যে ঋণ ও অন্যান্য সাহায্য তাঁরা পাচ্ছিলেন তা হয়ত এভাবে পায়ে ঠেলতেন না। অবশ্য সমবায় সমিতি ভেঙে যাবার অন্য কারণও থাকতে পারে। তবে মোটামুটিভাবে একথা বলা যায় যে, ছো নাচের মুখোশের বিপুল চাহিদা যখন সীমিতসংখ্যক কয়েকটি পরিবার মিটিয়ে থাকেন, তখন তাদের অবস্থা নিতান্ত হীন না হওযারই কথা। তাছাড়া চড়িদার অধিকাংশ শিল্পী-পরিবার প্রতিমা নির্মাণ ও কাঠের মিস্ত্রীর কাজও করে থাকেন এবং বায়না পেলে সেসব কাজ বাইরে গিয়েও করে দিয়ে আসেন। পুরুষদের বিভিন্ন কারিগরির কাজে মেয়েরা যে অংশ গ্রহণ করেন না, তাও এ বিষয়ে প্রাসঙ্গিক। আমাদের কুটিরশিল্পের ক্ষেত্রে পরিবারের মহিলা, এমন কি ছোট ছোট ছেলেমেয়ের সহযোগিতা প্রায় সর্বত্রই দেখা যায়। চড়িদায় ছেলেরা দশ-বারো বছর বয়স থেকে শিক্ষানবিসি শুরু করে, কিন্তু মেয়েরা কোন বয়সেই করে না। আর্থিক অবস্থা নিতান্ত খারাপ হলে এসব শিল্পী পরিবারের আবালবৃদ্ধবনিতা হয়ত তাঁদের অবসর সময়টুকু উপার্জনের জন্য নিয়োগ করতেন। সেজন্য আমাদের আর পাঁচটা কুটিরশিল্পের কারিগরদের থেকে তাঁরা যে কিছুটা সচ্ছল এমন অনুমান হয়ত অসঙ্গত নয়।



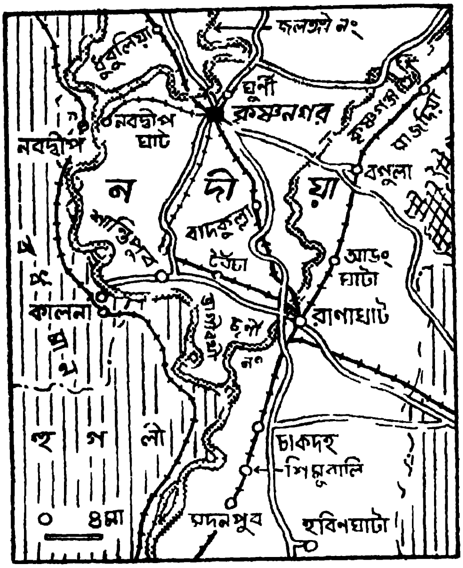
কৃষ্ণনগরের মাটির পুতুল

ছো নাচের মুখোশের মত ঘূর্ণি-কৃষ্ণনগরের মাটির পুতুলও এক বর্ণোজ্জ্বল কুটির-শিল্প। বাস্তবানুগতার দিক থেকেও তাদের মধ্যে সাদৃশ্য আছে। প্রথমটিতে ব্যবহৃত প্রাণী-চরিত্রের মুখোশগুলি যেমন তাদের আদি রূপের হুবহু নকল, দ্বিতীয়টির ক্ষেত্রে যাবতীয় শিল্প-নিদর্শনেও তেমনি বাস্তবতার ছাপ খুবই স্পষ্ট। নদীয়া জেলার সদর শহর কৃষ্ণনগরের একাংশে এই ঘূর্ণি পল্লী অবস্থিত, যেখানকার মৃৎশিল্পীদের বর্তমান অবস্থা আশাপ্রদ না হলেও তাঁদের খ্যাতি জগৎজোড়া। যে কারুকৃতির সেবায় এই শিল্পী-গোষ্ঠী দু'শ বছরেরও বেশী সময় নিয়োজিত আছেন, তাকে পশ্চিমবাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কুটিরশিল্প বলতে বাধা নেই। তবে আর পাঁচটা উৎকৃষ্ট কুটিরশিল্পের মতো এটিরও আজ দৈন্যদশা। সে দুর্গতি অন্তিমে পেঁাছবার আগে বঙ্গসংস্কৃতির এ অমূল্য উপাদানটিকে সকলেরই সরেজমিনে দেখে আসা উচিত।

সকালে স্নানের পর প্রাতরাশ সেরে শেয়ালদা থেকে লালগোলা প্যাসেঞ্জার ধরা কিছুই কঠিন নয়। তেষট্টি মাইল দূরের কৃষ্ণনগর সিটি স্টেশনে এ ট্রেন পেঁাছয় প্রায় এগারোটা নাগাদ। ভাড়া—তৃতীয় শ্রেণীতে দু' টাকা পঞ্চাশ পয়সা, দ্বিতীয় শ্রেণীতে ছ' টাকা ও প্রথম শ্রেণীতে বারো টাকা। কৃষ্ণনগর স্টেশনেই মোটামুটি পরিচ্ছন্ন হোটেলে ভাত, ডাল, ভাজা, তরকারি, মাছ-মাংসের ঝোল পাওয়া যায়। অর্ডার করবার মিনিট দশেকের মধ্যেই খানা তৈয়ার। দুপুরের খাবার পাট এখানেই চুকিয়ে স্টেশনের বাইরে সাইকেল রিকশায় চেপে সোজা ঘূর্ণি চলে যেতে পারেন—মাইল তিনেক দূরে। ঘুরেফিরে দেখতে, কেনা-কাটা করতে, বড় জোর দু'তিন ঘণ্টা লাগতে পারে। শিল্পীদের সম্বন্ধে যদি খোঁজখবর নেন কিংবা তাঁদের শিল্পসম্ভারের যদি ছবি তোলেন, তাহলে হয়ত আরও ঘণ্টা দুই লাগা সম্ভব। বিকেল ও সন্ধ্যার দিকে ফিরতি ট্রেনের অভাব নেই। সেজন্য রাত বেশী হবার আগেই কলকাতায় ফেরা সহজ। একদিনের মেয়াদে মোটেই কণ্টকর ভ্রমণ নয়। বিশেষ করে কৃষ্ণনগর ও রাণাঘাটে সাধারণ আহার্য-পানীয় ছাড়াও যখন সরভাজা, সরপুরিয়া ও পানতুয়ার অভাব নেই।

*

এখন মাত্র কয়েকঘর কারিগরের পরিচর্যাপুষ্ট হলেও ঘূর্ণির এ কুটিরশিল্পটি সর্ব-ভারতীয় বা জাগতিক মৃৎশিল্পের সুপ্রাচীন ধারা থেকে মোটেই বিযুক্ত নয়। আনন্দ কুমার-স্বামীর মতে পোড়ামাটির খেলনা-পুতুল সামান্য জিনিস হলেও, এগুলিতে মানুষের জীবনের প্রতিচ্ছবি বিধৃত। ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল থেকে হরপ্পা-মহেঞ্জোদারো অবধি এলাকায় একদা যেসব আদিম সভ্যতার উন্মেষ হয়েছিল, সেগুলির নানান পুরাতাত্ত্বিক



নিদর্শনের মধ্যে অসংখ্য পোড়ামাটির খেলনা-পুতুল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। যোগাযোগ ব্যবস্থার তৎকালীন অপ্রতুলতা সত্ত্বেও সুদূর ব্যবধানে অবস্থিত এ সকল কেন্দ্রে আবিষ্কৃত কিছু কিছু পুতুলের গঠন-সাদৃশ্য বিস্ময়কর। প্রাচীন মেমফিস নগরীর কারিগরপল্লীতে মাটির তৈরী ভারতীয় নারীমূর্তি ও কুবেরের উপবিষ্ট বিগ্রহ-প্রাপ্তির কথা বিখ্যাত প্রত্নবিৎ ফ্লিনডার্স পেত্রি উল্লেখ করেছেন। আর এক বিশ্ববিশ্রুত পুরাতাত্ত্বিক ডি. এইচ. গর্ডন মনে করেন, ভূমধ্যসাগরের পূর্বাঞ্চল থেকে বঙ্গদেশ অবধি ভূভাগ জুড়ে দূর অতীতে পোড়ামাটির যেসব খেলনা-পুতুল নির্মিত হত, তাদের আকারপ্রকারে বেশ মিল থাকায় এগুলির পারস্পরিক সম্পর্ক ও পশ্চাৎপটের সাংস্কৃতিক আদানপ্রদানের ইতিহাস যথাযথভাবে নির্ণীত হওয়া উচিত।

ভারতবর্ষে আবিষ্কৃত আদিমতম মাটির পুতুলগুলি থেকে দেখা যায় যে, উত্তরকালে কাঠ পাথর, ধাতু, হাতির দাঁত প্রভৃতি উপাদানের আবির্ভাবের পূর্বে আমাদের প্রাচীন শিল্পীরা সহজলভ্য ও অনায়াসে ব্যবহারযোগ্য মাটির সাহায্যেই তাঁদের শিল্পনৈপুণ্য প্রকাশ করে এসেছেন। হরপ্পা-মহেঞ্জোদরোর নজিরে প্রমাণ হয় যে সেই দূরবর্তী কালেও ভারতবর্ষে মাটির খেলনা-পুতুল তৈরির কারিগরি রীতিমত উন্নত স্তরে পৌঁছেছিল। ছাঁচের ব্যবহার না করে শুধু আঙুল ও সামান্য দু' একটি হাতিয়ারের সাহায্যে নির্মিত এই কারুকৃতিগুলি আমাদের আদিমতম এক লোকশিল্পের উৎকৃষ্ট নিদর্শন।

সিন্ধু-সভ্যতা কাল থেকে আজ অবধি ভারতবর্ষের বিভিন্ন এলাকায় মৃৎশিল্প বিকশিত হয়েছে ভিন্ন ভিন্ন আঞ্চলিক রীতিনীতি অনুসারে। উপকরণের সহজলভ্যতা, সামাজিক পরিবেশ, শিল্পীগোষ্ঠীর দক্ষতা প্রভৃতি বিবিধ কারণে এহেন আঞ্চলিক 'স্কুল'-এর সৃষ্টি হয়েছে। কোন কোন কেন্দ্রের প্রচেষ্টা আদিম পূজ্যবস্তুর ('কাল্ট অবজেক্ট') বা গ্রামীণ সরলতার স্তর অতিক্রম করতে পারেনি (বা চায়নি), আবার অল্প কিছু কেন্দ্রে পারিপার্শ্বিকতার প্রভাবে তা রূপ নিয়েছে চারপাশের আটপৌরে জীবনের চিত্রণে। বাঁকুড়া জেলার পাঁচমুড়া, মুরলু বা সোনামুখী গ্রামে নির্মিত পোড়ামাটির ঘোড়া

বর্তমান যুগেও লোকশিল্পের চিরাচরিত ধারাটিকে পরিত্যাগ করেনি বলে তাদের সঙ্গে সিন্ধু-সভ্যতাজাত খেলনা-পুতুলের মূলত কোন প্রভেদ নেই। বর্ধমান জেলার নতুনগ্রাম, নদীয়া জেলার নবদ্বীপ, মেদিনীপুরের নাড়াজোল, ২৪-পরগণার মজিলপুর প্রভৃতি মাটির পুতুল তৈরির ও কালীঘাট, নতুনগ্রাম, বিষ্ণুপুর প্রভৃতি কাঠের পুতুল তৈরির কেন্দ্রগুলিতে এখনও মোটামুটি এই সনাতন আদর্শই অনুসৃত। কিন্তু কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্পীরা দু'শ বছরেরও বেশী কাল যে বিশেষ রীতিটির চর্চা করে এসেছেন তা এই প্রাচীন ঐতিহ্য থেকে একেবারেই মুক্ত। ভারতবর্ষের চিরায়ত লোকশিল্পের সহজ সারল্য, অনাড়ম্বর স্ফূর্তি ও অনায়াস প্রকাশভঙ্গির পরিবর্তে কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্প-নিদর্শনগুলিতে পারিপার্শ্বিক জীবনের হুবহু প্রতিফলন এতই স্পষ্ট ও চেষ্টাকৃত যে তাদের সঙ্গে লোকায়ত শিল্পপদ্ধতির যোগসূত্র নেই বললেই চলে। উপমা প্রয়োগ করে হয়ত বলা যায়, এদেশের চিরাচরিত মৃৎশিল্পকে যদি পটচিত্রের বা যামিনী রায়ের ছবির তুল্য বলে মনে করি, তবে কৃষ্ণনগরের শিল্পনিদর্শনগুলিকে ফোটোগ্রাফের পর্যায়ে ফেলতে হয়। কিন্তু ফোটোগ্রাফিও আর্ট—বাস্তবানুগ আর্ট। কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্প সেজন্য উৎকৃষ্ট বাস্তবধর্মী শিল্পের অন্তর্গত। পাঁচমুড়ার পোড়ামাটির ঘোড়ার গলা জিরাফের মতো লম্বা, লেজ ছাগলের মতো ছোট বা কান পাতার মতো চ্যাপ্টা হলেও তা লোকশিল্পের উৎকৃষ্ট নিদর্শন এইজন্য যে, তাতে গ্রামীণ শিল্পীর নির্মল চিত্তাকাশের অনাবিল প্রতিবিম্ব, তার অশিক্ষিতপটুত্বের নিগড়হীন প্রকাশ দেখতে পাই। কৃষ্ণনগরের খেলনা-পুতুলের বেলায় কিন্তু ঠিক তার উলটো। বাস্তবের অনুকরণকে সেখানে এমন চূড়ান্ত পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে যে অবাস্তবের ছায়াটুকুও সেখানে পড়তে পায় না।

সিরাজউদ্দৌলার সমসাময়িক মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রকেই পূর্বতন ঐতিহ্য থেকে বিমুক্ত এই নবীন শিল্পকলাটির প্রবর্তক বলে মনে করা হয়ে থাকে। বর্তমান মৃৎশিল্পীদের পূর্বপুরুষেরা তাঁরই উৎসাহে নাকি নাটোর থেকে কৃষ্ণনগরে এসে বসতি করেন। নাটোরে থাকাকালীন তাঁরা কি পদ্ধতি অনুসরণ করতেন, তা এখন আর জানবার উপায় নেই। তবে কৃষ্ণনগর-পর্যায়ে তাঁরা যে শুরু থেকেই বাস্তবধর্মিতার প্রতি আকৃষ্ট হন এমন মনে করবার কারণ আছে। সেকালের বঙ্গদেশে অদূরের মুর্শিদাবাদই ছিল বিলাসপণ্যের বৃহত্তম বাণিজ্যকেন্দ্র ও সেখানকার অধিকাংশ ক্রেতাই ছিলেন মুসলমান। ভারতীয় শিল্পকলার সাবেক বা গ্রামীণ ঐতিহ্যের প্রতি তাঁদের কোন আগ্রহ বা মমত্ববোধ না থাকবারই কথা। চিরায়ত লোকশিল্পের বিশেষ আকর্ষণের কথা না বুঝে তাঁরা যে পারিপার্শ্বিক জীবনের হুবহু অনুকরণের দিকেই বেশী ঝুঁকবেন, তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই। সেকালের সাহেবসুবোরাও দেশে ফিরে গিয়ে পরিচিতজনদের ভারতীয় জীবনের প্রতিমূর্তি—কামার, কুমোর, জেলে, নাপিত, ছুতোর, মুচি, পুরোহিত, গুরুমশায় প্রভৃতির মডেল উপহার দেবার ব্যাপারে আগ্রহী ছিলেন। কয়েক বছর আগে পশ্চিমবঙ্গ শিল্প-অধিকার কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্পের এক প্রদর্শনীর আয়োজন করেছিলেন। সেখানে কৃষ্ণনগরের এক শিল্পীর কাছ থেকে সংগৃহীত তৃতীয় নেপোলিয়নের (১৮৪৮-৭০ খ্রীষ্টাব্দ) এক জীর্ণ প্রশংসাপত্র দেখানো হয়েছিল। কৃষ্ণনগরের কিছু পুতুল উপহার পাবার পর ফরাসী সম্রাট সে চিঠিতে কারিগরির যথেষ্ট সুখ্যাতি করেছিলেন। বিভিন্ন দিক থেকে আরোপিত এহেন নাগরিক মূল্যায়নের প্রেরণায় কৃষ্ণনগরের কারুকৃতি স্বভাবতই খুব বাস্তবঘেঁষা হয়ে পড়ে।

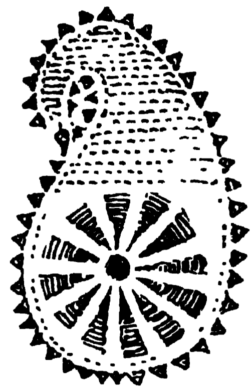
এসব প্রত্যক্ষ হেতু ছাড়াও আর একটি প্রভাব পশ্চাৎপটে উপস্থিত থেকে একই পরিণতির সহায়ক হয়েছিল বলে মনে হয়। পশ্চিমবঙ্গের প্রাচীন মন্দিরগুলিতে পোড়ামাটির যেসব মূর্তি-ফলক ব্যবহৃত হয়েছে তা প্রায়ই বাস্তবানুগ, সনাতন ঐতিহ্য-আশ্রিত

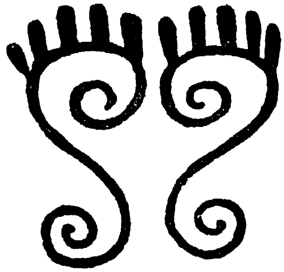
নয়। দেবালয়-অলংকরণের এই প্রাচীনতর ধারাটি এক্ষেত্রে হয়ত দিক-নির্দেশের কাজ করে থাকবে। পুতুল তৈরির পৃথক পরিবেশে কৃষ্ণনগরের শিল্পীরা সেটিকে আরও সূক্ষ্ম, আরও সমৃদ্ধ করেছেন।

সমকালীন বহু ইংরেজ চিত্রশিল্পীও সে সময়ে জল-রঙ ও তেল-রঙের মাধ্যমে কলকাতা অঞ্চলে তাঁদের নতুন আঙ্গিকের শিল্পচর্চা আরম্ভ করেছিলেন। বিদেশী রীতির এই চিত্রাংকন পদ্ধতির প্রভাবে কালীঘাটের পটুয়ারা যেমন ক্রমশই আধুনিকতার দিকে ঝুঁকে পড়েন, কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্পীরাও তাঁদের বাস্তবধর্মী কারিগরির স্বপক্ষে বেশ জোরালো এক সমর্থন পান। এই পরিবেশে, নানাবিধ সামাজিক চরিত্রের প্রায় জীবন্ত রূপায়ণ থেকে শুরু করে তাঁদের দুঃসাহসী শিল্প-পরিক্রমা যাবতীয় দেবদেবী, ফল-ফলারি, তরিতরকারি, বহুবিচিত্র পশুপক্ষীজগৎ প্রভৃতি অতিক্রম করে শেষ অবধি এসে উপস্থিত হয়েছে হালুইকরের নানাবিধ মিষ্টান্ন বা অতি-সূক্ষ্ম সুপারি-এলাচ-লবঙ্গ দারুচিনিতে। কি কারিগরি নৈপুণ্যে, কি স্বাভাবিক রঙের প্রয়োগে—এসব শিল্পনিদর্শন একান্তই বাস্তবানুগ। এছাড়াও তাঁদের তৈরি রুই-কাতলা-ইলিশ-চিংড়ি বা আরশুলা-টিকটিকি-ব্যাঙ-ফড়িং (দৃষ্টান্তের সংখ্যা অনায়াসেই আরও বহুগুণ বাড়ানো যেতে পারে) প্রভৃতি খুব খুঁটিয়ে না দেখলে মাটির তৈরি নকল খেলনা বলে বোঝাই যায় না। জামাই ঠকানোর জন্য যে কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্পীদের তৈরি নিমকি, সিঙাড়া, পানতুয়া বা পান, সুপারি, এলাচের একদা বহুল ব্যবহার ছিল, সেকথা সকলেই জানেন। এইখানেই কৃষ্ণনগরের কারিগরদের বৈশিষ্ট্য, আবার এইখানেই তাঁদের নিজস্ব শিল্পরীতি ভারতীয় লোকায়ত শিল্পশৈলী থেকে ভিন্ন।

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সময়েই বৃটিশ শাসনব্যবস্থা এদেশে কায়েম হয়। তারপর যে ইঙ্গ-বঙ্গ কালচারের সূত্রপাত হয় বঙ্গদেশে, সাধারণভাবে তা দেশী কুটিরশিল্পগুলির পরিপন্থী হলেও কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্পের খুব ক্ষতির কারণ হয়নি, এইজন্য যে, সেই নব্য সংস্কৃতির অঙ্গীভূত বাস্তবধর্মিতা আগে থেকেই এটিকে প্রভাবিত করেছিল। বিংশ শতকের মাঝামাঝি সময় অবধিও এ শিল্পের খ্যাতি ছিল দেশব্যাপী এবং কারিগরদের আর্থিক অবস্থাও এখনকার মতো শোচনীয় হয়ে ওঠেনি। দেশ-বিভাগের পর থেকেই শিল্পটির দারুণ দুরবস্থা চলছে। পূর্ববাংলার বিরাট বাজার হাতছাড়া হওয়াতে যে শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছে, দেশীয় চাহিদা তা পূরণ করতে পারেনি। তাছাড়া, লৌকিক ধরনের খেলনা-পুতুলে জীবন্ত নিদর্শনের সঙ্গে সাদৃশ্যবিধানের তাগিদ খুবই কম থাকায় সংশ্লিষ্ট কারিগরদের শুধু মাটি আর কিছু রং ও বার্নিশ হলেই বেশ কাজ চলে গেছে, কিন্তু কৃষ্ণনগরের শিল্পীদের এসব উপকরণ ছাড়াও পরচুলার জন্য ছোপানো পাটের গুছি (আধুনিক কালে সত্যিকারের চুল বা নাইলনের আঁশ), পরিধেয়ের জন্য নানারকম সুতী ও রেশমী কাপড়, জরি, পুঁতি, সলমা-চুমকি, রাংতা ও নকল গয়না ব্যবহার করতে হয়েছে। রং ও বার্নিশের মতই এসবের দামও এখন অসম্ভব বৃদ্ধি পেয়েছে। মাটি শুকিয়ে বা পুড়িয়ে তৈরি এসব শিল্পনিদর্শন নিতান্ত ভঙ্গুর বলে, চাহিদা থাকলেও বেশী দূরে পাঠানো খুবই ব্যয়সাধ্য। সেজন্য ভারতীয় বা বিদেশী বাজারও তেমন বাড়ানো যায়নি, ফলে, পরিবার প্রতিপালনের জন্য ঘূর্ণির কারিগরদের ছাঁচে-গড়া সুলভ জিনিসও যথেষ্ট তৈরি করতে হয়। কৃষ্ণনগরে দীর্ঘদিনব্যাপী যে বারদোলের মেলা বসে, তাতে কাছেপিঠের অন্যান্য মেলায় ও কলকাতার বাজারে প্রধানত এ পণ্য সস্তা দরে বিক্রি হয়। কারিগর পরিবারের শিক্ষানবিস ছেলেমেয়ে বা মহিলারা সাধারণত এজাতীয় কাজ করে থাকেন, আর পরিণত পুরুষশিল্পীরা জেলে, কুমোর, মুচি, তাঁতি, গুরু-মশায়, বাউল, সন্ন্যাসী প্রভৃতি সামাজিক চরিত্র বা অনুরূপ দক্ষতাসাপেক্ষ কাজের ভার

নেন। একদিক দিয়ে দেখতে গেলে, শ্রমবিভাগের এই চিরাচরিত রীতির সঙ্গে এ শিল্পটির ভবিষ্যৎ জড়িত। স্থানীয় শিল্পীদের সঙ্গে আলোচনা করে দেখেছি, বিপণনের ব্যবস্থা ছাড়া অন্য কিছু সরকারী সাহায্য তাঁরা বড় একটা চান না। তাঁদের মধ্যে যাঁরা শিল্পটির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বিশেষভাবে চিন্তা করেন তাঁদের ধারণা, সামাজিক চরিত্রের 'টাইপ' বা ওই জাতীয় উচ্চাঙ্গের ভাস্কর্য পুরুষানুক্রমিক দক্ষতা ও দীর্ঘকালের চর্চা ছাড়া সম্ভব নয় বলে তার চর্চা ও শ্রীবৃদ্ধিসাধন ঘূর্ণির অগ্রসর শিল্পীদের হাতে থাকাই শ্রেয়। কিন্তু ছাঁচে-ফেলা সহজতর কাজ পশ্চিমবঙ্গ বা ভারতবর্ষের যে কোন কেন্দ্রের মৃৎশিল্পীরা হয়ত ভালভাবেই করতে পারবেন। সেজন্য সরকারী প্রচেষ্টায় ঘূর্ণি থেকে যদি যথেষ্ট সংখ্যায় ছাঁচ তৈরি করিয়ে নিয়ে অন্যান্য মৃৎশিল্প কেন্দ্রে যোগান দেওয়া যায়, তাহলে সমস্ত দেশ জুড়ে এ শিল্পটির অগ্রগতির সূচনা হতে পারে।





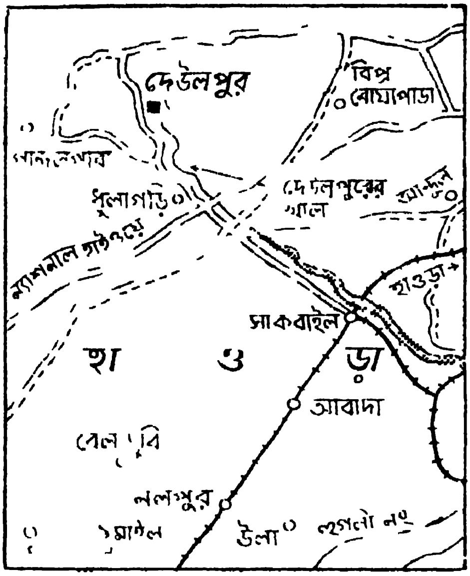
দেউলপুর

লোকগাথা, লোকগীতি, লৌকিক দেবদেবী, পাল-পার্বণ, ব্রতকথা, আলপনা প্রভৃতির মতই আমাদের কুটিরশিল্পগুলিও গ্রামীণ জনমানসকে যথেষ্ট পরিমাণে প্রকাশিত করে। অসামান্য কারিগরি দক্ষতার প্রয়োগে সহজলভ্য সামান্য উপাদানেও যে কত অভিনব কুটিরশিল্প একদা গ্রামবাংলার ইতস্তত পুষ্টিলাভ করেছিল ও আজও বর্তমান আছে, তার সর্বাঙ্গীণ বিবরণ এখনও সংগৃহীত বা লিখিত হয়নি। মসলিন, বালুচর শাড়ি, নকশী-কাঁথা, পটচিত্র, কাঁসা-পিতল শিল্প, প্রতিমা শিল্প, কৃষ্ণনগরের পুতুল, বাঁকুড়ার পোড়ামাটির ঘোড়া প্রভৃতি বিষয়ে অল্পবিস্তর আলোচনা হয়ে থাকলেও শোলার কাজ, ডাকের সাজ, কাঠ-খোদাইয়ের কাজ, পুতুলনাচের পুতুল তৈরির কাজ, শঙ্খ শিল্প, বাঁশ, বেত ও শরকাঠির নানাবিধ শিল্প, অসংখ্য রকমের মিষ্টান্ন প্রস্তুত শিল্প প্রভৃতি নানা বিষয়ে এখনও যথেষ্ট অনুসন্ধানের অবকাশ আছে। বলা বাহুল্য, প্রয়োজনীয় উপাদানের যোগান ও উৎপন্ন দ্রব্যের চাহিদা অনুযায়ীই এসব কুটিরশিল্প একদা গড়ে উঠেছিল বিভিন্ন কেন্দ্রে। তাদের মধ্যে আশ্চর্য এক কুটিরশিল্পের কথা আজ বলব যা সমগ্র বঙ্গদেশের একটিমাত্র গ্রামেই অনুসৃত হয়েছে। আমি হাওড়া জেলার পাঁচলা থানার অন্তর্গত দেউলপুর গ্রামের পোলো বল তৈরির কথা বলছি। 'ঘোড়ো' বাঁশ নামে যে বিশেষ শ্রেণীর বাঁশের শিকড় থেকে বলগুলি তৈরি হয়, তা শুধু এ অঞ্চলেই পাওয়া যায় আর বিক্রীর একমাত্র বাজার কলকাতা, এ গ্রাম থেকে তেরো-চোদ্দ মাইলের বেশী দূরে নয়। হাওড়া-খড়্গপুর রেলপথে, হাওড়া থেকে আট মাইল দূরে সাঁকরাইল স্টেশনে নেমে মাইলখানেক পিচের সড়ক ও সাড়ে-তিন মাইলের মত কাঁচা রাস্তা পার হয়ে এ গ্রামে পৌঁছানো যায়। এই পথের ধার বরাবর এক খাল আছে। বর্ষা-শরৎ-হেমন্তে সে খালে বহু শালতি (চ্যাপ্টা পাটাতনের ছোট নৌকা) চলে। তখন স্থানীয় অধিবাসীরা কর্দমাক্ত কাঁচা রাস্তার থেকে জলপথে যাতায়াতই পছন্দ করেন। ট্রেন-জার্নির সময় কুড়ি মিনিটের মত আর শালতিতে লাগে এক ঘণ্টার কিছু বেশী। তারপরে হাঁটাপথে যে আরও কিছুটা যেতে হয় তা ধরেও মোটামুটি ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে পানাপুকুরে আকীর্ণ, বাঁশবনে ঢাকা দেউলপুরের অজ পাড়াগাঁ থেকে প্রখর সভ্যতাদীপ্ত কলকাতা শহরের একেবারে কেন্দ্রস্থলে এসে উপস্থিত হওয়া কিছুই কঠিন নয়। এই পথে, এই ভাবেই পোলো বল শিল্পীরা গত সত্তর-আশি বছর যাবৎ তাঁদের উৎপন্ন দ্রব্য কলকাতার মহাজনদের কাছে পৌঁছে দিয়ে আসছেন।

এ অঞ্চলের আর পাঁচটা গ্রামে 'ঘোড়া' বাঁশ পাওয়া গেলেও, দেউলপুরে এ শিল্পটির উৎপত্তির কারণ কিছুটা আকস্মিক। স্থানীয় কারিগরদের মতে 'ঘোড়ো' বাঁশের গোড়ার

শিকড় যত ঘন ও দৃঢ়সংবদ্ধ হয়, 'তলতা', 'জাওয়া', 'বাঁশনি' প্রভৃতি জাতের বাঁশে নাকি তা হয় না। আর এহেন নিরেট অথচ হালকা উপাদানই পোলো বল তৈরির পক্ষে প্রশস্ত। জনশ্রুতি, কলকাতার সুরেন ব্যানার্জি রোডের খেলাধুলার সরঞ্জাম প্রস্তুতকারী প্রাচীন প্রতিষ্ঠান দত্ত-চৌধুরী কোম্পানীর এক কারিগর খ্রীষ্টীয় উনিশ শতকের শেষের দিকে মণিপুর রাজ্য থেকে নাকি এ শিল্পটি শিখে আসেন। দেউলপুরের ন'-দশ মাইল পশ্চিমে গোবিন্দপুরের (হাওড়া-আমতা লাইট রেলওয়ের মাজু স্টেশনের কাছে) জনৈক কাজী আছিমুদ্দিন তাঁর কাছে কাজ শিখে নিজ গ্রামে পোলো বল তৈরি শুরু করেন। তাঁর সহকারীদের মধ্যে দেউলপুরের দু'চারজন থাকায়, বর্তমান শতকের গোড়ার দিকে দেউলপুরে শিল্পটির সূত্রপাত হয়। তারপরে এত অল্প সময়ের মধ্যে শিল্পটি এতদূর শ্রীবৃদ্ধি লাভ করে যে, প্রথম মহাযুদ্ধের আগের কয়েক বছরে দেউলপুর গ্রামের প্রায় এক শ পরিবারের আনুমানিক তিন শ কারিগর এ কাজে নিযুক্ত ছিলেন। সে সময়ের বাড়-বাড়ন্তের কথা এখনও লোকের মুখে মুখে ফেরে। তখন নাকি বছরে ষাট লক্ষের মত পোলো বল তৈরি হত যা সুরেন ব্যানার্জি রোড ও ধর্মতলা স্ট্রীটের খেলার সরঞ্জাম ব্যবসায়ীরা সাগ্রহে কিনে নিয়ে প্রধানত ইউরোপ ও আমেরিকায় রপ্তানী করতেন। দেউলপুরেও সে সময়ে বাগ কোম্পানী নামে এক প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি হয়। তাঁরাও সরাসরি যথেষ্ট চালান দিয়েছেন বিদেশের বাজারে। প্রথম মহাযুদ্ধের কয়েকটা বছর রপ্তানি বাণিজ্য প্রায় ব[illegible] থাকে। দেশীয় চাহিদাও বরাবরই কম ছিল। যুদ্ধের অবসানে অবস্থার সামান্য উন্নতি হলেও সাবেক সমৃদ্ধি আর কখনোই ফিরে আসেনি। এই দুঃসময়ে লাভের অংশ বাড়ানোর জন্য কলকাতার মহাজনদের সংস্রব এড়ানো প্রয়োজন হয়ে পড়ে। সেজন্য আগেকার বাগ কোম্পানী ছাড়াও বাগ ব্রাদার্স, হাজরা ব্রাদার্স ও কোলে অ্যান্ড দাস কোম্পানী নামে আরও তিনটি স্থানীয় প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি হয়। তাঁদের অংশীদাররা সকলেই মাহিষ্য। এ'রা উপকরণ সরবরাহ করে ও কারিগর লাগিয়ে এখন বছরে মাত্র লাখ খানেক পোলো বল তৈরি করেন। ভারতের বাজারে ও বিদেশে চালান দেবার দায়িত্ব এখন বেশ কিছুটা এ'দেরই হাতে, যদিও কলকাতার ব্যবসায়ীদের সঙ্গেও তাঁদের যথেষ্ট লেনদেন আছে।

মূল উপকরণ সরবরাহের জন্য 'ঘোড়ো' বাঁশের রীতিমত চাষ হয় এ অঞ্চলে।। ঝাড়ের বাঁশ কেটে ফেলার সময় গোড়ার ঘন শিকড়-জাল সমেত শক্ত অংশটি আলাদা করে রাখা হয়। বছর দুই আগে, আমার পরিদর্শনের সময়, প্রতি গোড়ার জন্য মহাজনরা দাম দিতেন কুড়ি পয়সা। তা থেকে পোলো বল তৈরি হয় দু'টি। মহাজনদের গুদাম ঘরের কাছে খোলা জায়গায় রাশি রাশি বাঁশের গোড়া অন্তত ছ' মাস ফেলে রাখা হয় তাদের শক্তপোক্ত করবার জন্য। তারপর ফুরনের কারিগরেরা শতকরা পাঁচ টাকা দরে সেগুলিকে দা দিয়ে চেঁছে-ছুলে দেন। এরপরে আসেন দক্ষ শিল্পীরা। গোড়াগুলিকে দু'টুকরো করে কাটা থেকে শুরু করে বাটালি চালিয়ে সেগুলিকে গোল বলে পরিণত করতে তাঁরা নেন শতকরা কুড়ি টাকা। পায়ের আঙুলের নীচে আকৃতিহীন শিকড়ের টুকরোটিকে চেপে ধরে হাতের তেলো দিয়ে বাটালি ঠুকে ঠুকে যে আশ্চর্য নৈপুণ্য ও ক্ষিপ্রতায় তাঁরা বলগুলিকে নিখুঁত গোল আকারে পরিণত করেন, তা না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। শুধু গোল হলেই হয় না, বলগুলি আবার নির্দিষ্ট পরিধির হওয়া দরকার। সাইকেল পোলোয় ব্যবহৃত বলের পরিধি ন' ইঞ্চি আর ঘোড়ার পোলোর ব্যবহৃত বলের পরিধি যথাক্রমে দশ ইঞ্চি ('আমেরিকান সাইজ') ও সাড়ে-দশ ইঞ্চি ('ভারতীয় সাইজ')। এর পরের প্রক্রিয়াগুলিতে দক্ষতার বিশেষ প্রয়োজন হয় না। উকো ও শিরীষ কাগজ দিয়ে 'মাজতে' লাগে তিন টাকা শ আর 'হোয়াইটিং' রং বা এনামেল রং লাগাতে পড়ে চার টাকা শ।



কলকাতার মহাজনরা বিনা রঙের বলই পছন্দ করেন। স্থানীয় মহাজনরা বিদেশে সরাসরি রপ্তানির ক্ষেত্রে বা কিছু কিছু দেশীয় চাহিদা মেটাতে গ্রামের কারখানাতেই বলগুলিকে রং করিয়ে নেন। কারিগরদের যন্ত্রপাতি, শিরীষ কাগজ, রং প্রভৃতি সরবরাহ করা ও তৈরি পণ্য গ্রাম থেকে কলকাতার ব্যাপারীদের আড়তে নিয়ে আসা তাঁদেরই দায়িত্ব। এত ঝুঁকি পুইয়েও তাঁদের সামান্যই লাভ থাকে। রঙের প্রলেপহীন বলের শতকরা উৎপাদন খরচা প্রায় চল্লিশ টাকা: বিক্রী হয় পঞ্চাশ টাকায়। 'হোয়াইটিং' ও এনামেল রং লাগানো বলের শতকরা উৎপাদন ব্যয় যথাক্রমে ষাট ও একশো টাকা আর পাইকারী বিক্রীর দর সত্তর ও একশ' কুড়ি টাকা। এত অল্প লাভে ও বর্তমান সংকুচিত চাহিদায় এই অভিনব কুটিরশিল্পটি আর কতদিন টিকে থাকবে বলা শক্ত। দেশে বিদেশে বিক্রীর বাজার সম্প্রসারণের ব্যাপারে এই গ্রামীণ শিল্পীগোষ্ঠী বেশী কিছু করবার ক্ষমতা রাখেন না। সেক্ষেত্রে সরকারী সাহায্য সম্ভব কিনা সেকথা সংশ্লিষ্ট দপ্তর ভেবে দেখতে পারেন।

*

প্রধানত এই আশ্চর্য কুটিরশিল্পটি 'কভার' করতেই দেউলপুরে গিয়েছিলাম। কিন্তু কি পূর্ব কি পশ্চিমবঙ্গে এমন গ্রাম অল্পই আছে যেখানে ভ্রমণের নির্ধারিত উদ্দেশ্যকে নানাভাবে সম্প্রসারিত করা যায় না। পুরাকীর্তির সন্ধানে যেখানে গিয়েছি, সেখানে হঠাৎ মুখোমুখি হয়েছি অজানিত কোন লৌকিক দেবদেবীর; গ্রামীণ সমাজ-ব্যবস্থা বা কারু-কলার অন্বেষণকালে সহসা উত্তীর্ণ হয়েছি উৎসব-পার্বণের আঙিনায়। আবার কখনো বা কুটিরশিল্পের তল্লাসে ঘুরতে ঘুরতে অপ্রত্যাশিতভাবে সংগ্রহ করেছি অপূর্ব সব কিংবদন্তী, লোকগাথা, লোকগীতি। দেউলপুরেও তাই হল। খবর পেলাম, গ্রামের পশ্চিমপাড়ায় ঘোষ পরিবারের পূর্বপুরুষদের নির্মিত পোড়ামাটির অলংকরণযুক্ত বারোচালা এক শিবমন্দির আছে। তিন থাক ছাদযুক্ত বারোচালা ইঁটের মন্দির পশ্চিম-বঙ্গে খুবই বিরল; গ্রাম-গ্রামান্তরে অনেক ঘোরাঘুরি করেও অদ্যাবধি আমি দু'তিনটির বেশী দেখিনি। কালবিলম্ব না করে সেজন্য সেখানে গিয়ে হাজির হলাম। উত্তরমুখী ছোট মন্দির। দৈর্ঘ্যপ্রস্থ এগারো ফুট; উচ্চতা পঁচিশ ফুটের বেশী নয়। সামনের ও দু'পাশের

দেওয়ালে বাঁকানো কার্নিসের নীচ-বরাবর একসারি করে উৎকৃষ্ট 'টেরাকোটা' প্যানেল এখনও অক্ষত আছে। বিষয়বস্তু—রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনী, পৌরাণিক দেবদেবী, দশাবতার, কৃষ্ণলীলা, দু'একটি সামাজিক দৃশ্য ও তিনটি পশুর পৃথক রূপায়ণ, যথা—হাতি, ভালুক ও ঘোড়া। বাংলা-মন্দিরে ভ্রমণ, শিকার-দৃশ্য বা কুচকাওয়াজ দেখানোর প্রয়োজনে অনেক ক্ষেত্রে আনুসঙ্গিকভাবে পশু-ভাস্কর্য উৎকীর্ণ হয়েছে সত্য, কিন্তু এক-একটি টালিতে আলাদা আলাদা পশুমূর্তি খোদাই করা হয়েছে, এমন বড় একটা দেখা যায় না। ১২৫০ বঙ্গাব্দের কাছাকাছি কোন সময়ে জটিরাম ঘোষ এ মন্দির নির্মাণ করান। সাবেক প্রতিষ্ঠালিপিটি পরবর্তীকালে সংস্কারের সময় অপসৃত হয়েছে। তাতে নাকি নির্মাতার নাম যজ্ঞেশ্বর মিস্ত্রী ও তার নিবাস হাওড়া জেলার ডোমজুর থানার কেশবপুর গ্রাম বলে উল্লিখিত ছিল। মন্দিরের কাছেই ঘোষ পরিবারের জীর্ণ ভদ্রাসন। তাঁদের বিস্তীর্ণ জমিদারির আয় থেকে প্রাসাদতুল্য এই দোতলা বাড়িটি প্রায় দেড় শ বছর আগে নির্মিত হয়েছিল। এখন পলস্তারা উঠে গিয়ে লোনাধরা ইঁটের হাহাকার বেআব্রু হয়ে পড়েছে নানা স্থানে। লতাগুল্মে ছেয়ে গেছে চারিদিক। পঙ্কের কাজ করা প্রশস্ত ঠাকুরদালানটির সুন্দর সজ্জাগুলি খসে পড়েছে বহুকাল। একদা সেখানে মহা-সমারোহে দুর্গাপূজা ও জগদ্ধাত্রীপূজা হত। আজ সে সবই স্মৃতিকথা মাত্র। সে স্মৃতি-চারণ করবার জন্য, দু'বছর আগে আমার পরিদর্শনের সময়, এক বৃদ্ধা বেঁচে ছিলেন এ পরিবারে বিগত সমৃদ্ধির প্রতিনিধির মত। তিনি এই বাড়ি ও এ মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা জটিরাম ঘোষের ভ্রাতুষ্পুত্রী বগলাবালা মিত্র। আটানব্বুই বছরের রোগজীর্ণ শরীর নিয়ে এক প্রায়ান্ধকার ঘরে তিনি বিছানার সঙ্গে মিশে ছিলেন। যখন মা বলে ডেকে তাঁর কাছে গিয়ে বসলাম, লোলচর্ম, শীর্ণ হাতটি তুলে অতি ক্ষীণ কণ্ঠে শুধোলেন, আমাদের খাওয়া হয়েছে কিনা। হয়েছে, শুনে যেন পরম তৃপ্তি পেলেন। তবু কি কিছু মনস্তাপ তাঁর অবসন্ন মনে রয়ে গেল না? এই বৃহৎ একান্নবর্তী জমিদার পরিবারে কর্ত্রীর আসনে অধিষ্ঠিত থেকে অতিথিসৎকারে একদা তিনি সদাতৎপর ছিলেন। আমাদের মত কত শত আগন্তুক একদা এখানে সসম্মানে অভ্যর্থিত হয়েছেন, বিশেষ করে উৎসব-পার্বণের সময়। আজ জরাগ্রস্ত বার্ধক্যে নিজের হাতে অতিথিসৎকারের অক্ষমতায় কোন ক্ষোভ কি তাঁর মনে উঁকি দিয়ে গেল না? অতীতের দু'টো কথা শুনব ভেবে তাঁর পায়ের কাছে এসে বসেছিলাম। কিন্তু তাঁর এমন শারীরিক সামর্থ্য ছিল না যে আমায় বাধিত করেন। ভেবে-ছিলাম, আর একবার যাব দেউলপুরে; তিনিও হয়ত একটু সুস্থ হয়ে উঠবেন। কিছুদিন আগে খবর পেলাম তিনি আর ইহলোকে নেই। ঘোষ পরিবারের অতীতের সঙ্গে একটা বহুমূল্য যোগসূত্র চিরদিনের মত ছিন্ন হয়ে গেল। পশ্চিমবাংলার প্রাচীন যেসব পরিবার একদা সমাজের স্তম্ভস্বরূপ ছিলেন তাঁদের বিষয়ে অনুসন্ধান আমার কাছে মামুলি গবেষণামাত্র নয়, আনন্দের উৎসও বটে। একালের বাঙালীর সমস্যাজর্জরিত আবহাওয়া থেকে সেকালের বাঙালীর সরল জীবনযাত্রায় ফিরে যেতে পারলে—যতই অলীক হোক—যেন একটু মুক্তির স্বাদ পাই। আসলে, ভবিষ্যৎ যখন অন্ধকার, বর্তমান যখন যন্ত্রণায় নীল, তখন অতীতমুখী সেতুর দাম বেশী হওয়াই স্বাভাবিক।

ঘোষবাড়ির পুরনো দিনের, সম্পদের দিনের কথা ভাবতে ভাবতে খালের ঘাটে এসে শালতিতে চাপলাম। দু' লগি এগোতেই মন ফিরে এল বর্তমানে, আর এক আশ্চর্যসুন্দর পরিবেশের মধ্যে। দুই তীরের বড় বড় শিরীষ গাছ ডালপালায় জড়াজড়ি করে সবুজ চাঁদোয়া বিছিয়েছে খালের জলের উপর। এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে একটু আগে। গাছের পাতা থেকে টুপটাপ করে জলের ফোঁটা পড়ছে, বুদ্বুদ উঠছে, ছোট ছোট ঢেউ গোল হয়ে ছড়িয়ে পড়ছে চারদিকে। গলুই-এ দাঁড়িয়ে লগি ঠেলছে মাঝি। জল কেটে

তরতর করে এগিয়ে চলছে শালতি। বিকেল পড়ে আসছে। দু'পাশের উঁচু ডাঙায়, গাছের ছায়ায়, এখানে-সেখানে কুঁড়েঘর, লোকবসতি। নৌকা এসে ঠেকল এক ঘাটে। পাড়ের উপর ডুরে শাড়ি পরা এক কিশোরী দাঁড়িয়ে ছিল; নৌকোর মাঝি, তার বাবার হাতে সে একটা লণ্ঠন দিয়ে গেল। কত রাত অবধি বাবাকে শালতি ঠেলতে হবে কে জানে। কলকাতা থেকে ডেলি প্যাসেঞ্জাররা ফেরে সন্ধ্যার পর। তারাই প্রধান খদ্দের। যাবার সময়েও মেয়েটিকে দেখেছিলাম। গামছায় মোড়া সানকিতে করে ডালভাত দিয়ে গিয়েছিল বাবার জন্য। ঘাট থেকে মুখ ফিরিয়ে শালতি আবার খালের পথ ধরল। ফাঁকা মাঠে এসে পড়েছি এবার। উপরে নীল আকাশ। দু'পাশে সবুজ ধানক্ষেত। শরতের শুরুতে শাপলা ফুটেছে খালের জলে। হাত দিয়ে ধরা যায়, তুলে নেওয়া যায় সে ফুল। ধানক্ষেতের কাছে নৌকা ভিড়িয়ে ধানের শিষেও হাত বোলানো যায়। চলতি নৌকো থেকে খালের জলে পা ডুবিয়ে রাখা—সে তো এক স্বর্গসুখ! শরৎ-হেমন্তে এ ভ্রমণের তুলনা হয় না। কলকাতার এত কাছে প্রকৃতির সঙ্গে যে এতদূর অন্তরঙ্গ হওয়া যায়, তা না দেখলে বিশ্বাস করা শক্ত। অল্প আয়াসে, নামমাত্র খরচায় একটা পরিপূর্ণ ছুটির দিন উপভোগ করাই যদি অভিপ্রেত হয়, তবে দেউলপুর ভ্রমণ যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপায় তাতে সন্দেহ নেই।



বাজারবেড়িয়া

কিশোরী কর্মকারের খবর অনেকদিন পাইনি। বছর তিনেক আগে তার সংগে যখন দেখা হয়েছিল, তখনই তার বয়েস ষাটের উপর। অনেকক্ষণ তার কুঁড়েঘরের দাওয়ায় বসে-ছিলাম; অনেক কথা হয়েছিল তার সংগে। যখন চলে আসি, আবার যেতে বলেছিল। তা আর হয়ে ওঠেনি। ভগবান তাকে দীর্ঘজীবী করুন, কর্মক্ষম রাখুন। ছেলেরা তার বড় হয়েছে, রোজগারপাতি করছে। বার্ধক্যে শরীর যদি একেবারে ভেঙে না পড়ে, তা হলে আর্থিক বা সাংসারিক কষ্ট তাকে হয়ত পেতে হবে না। আমার বড় সাধ সে এখনও বেশ কিছুদিন বেঁচে থাকুক। না হলে গ্রাম-বাংলার একটি সুকুমার কুটিরশিল্প তার একজন একনিষ্ঠ সাধককে হারাবে।

বাজারবেড়িয়ার কথা, কিশোরী কর্মকারের কথা আমি প্রথম শুনি জয়নগর-মজিল-পুরনিবাসী শ্রীগোপেন্দ্রকৃষ্ণ বসু মহাশয়ের কাছে, যিনি 'বাংলার লৌকিক দেবতা' নামের উৎকৃষ্ট বইখানি লিখে কয়েক বছর আগে 'রবীন্দ্র পুরস্কার' পেয়েছেন। তাঁরও বয়স ষাটের উপর। কিন্তু এখনও কয়েকটা টাকা ও আর একপ্রস্থ ধুতি-পাঞ্জাবি সম্বল করে এবং নামমাত্র এক বেডিং ও তাঁর চির-সহচর ছাতাটি বগলে নিয়ে দীর্ঘ গ্রামপরিক্রমায় তিনি যেকোন সময়ে বেরিয়ে পড়তে পারেন অনায়াসে। তাঁর মতো সৎ, নিরলস ও আত্মপ্রচার-বিমুখ আরও কিছু 'ফিল্ড-ওয়ার্কার' পশ্চিমবঙ্গের জেলায় জেলায় নানাবিধ সরেজমিন অনুসন্ধানের কাজে ব্যাপৃত আছেন। ভরসা হয়, লাইব্রেরীতে হাত বাড়ালেই পাওয়া যায় এমন অনায়াসলভ্য সংবাদ ছাড়াও বাঙালীর বহুমুখী জীবনচর্যা সম্পর্কে আরও নতুন নতুন তথ্য তাঁদের দ্বারাই সংগৃহীত হবে।

গোপেনবাবুই পথ দেখিয়ে নিয়ে গেলেন বাজারবেড়িয়ায়। সেখানকার এক অভিনব অথচ ক্ষয়িষ্ণু কুটিরশিল্প সম্বন্ধে দেশের লোক জানতে পারুক এইটুকু শুধু তাঁর অভিপ্রায়। কলকাতার গড়িয়া থেকে জয়নগর-মজিলপুরগামী বাসে চেপে বেশ সকাল-সকালই তাঁর বাড়িতে গিয়ে হাজির হয়েছিলাম। তারপর জয়নগর-ডায়মণ্ডহারবার রুটের বাসে করে মাইল ছয়েক দূরের বাজারবেড়িয়ার মোড়ে নেমে শেষ আধ মাইলটাক পথ পায়ে হেঁটে উপস্থিত হয়েছিলাম কিশোরী কর্মকারের কুটিরে। সামনের চালার নীচ দিয়ে বাড়ির ভিতরে যাবার পথ। তার দু' পাশে গোবর-নিকানো উঁচু মাটির দাওয়া। তার একটিতে বসে, খুব ছোট কোদালের মত এক যন্ত্র দিয়ে এক কাঁচা কাঠের গুঁড়ির উপরকার ছাল তুলে ফেলছিল কিশোরী কর্মকার। আমাদের দেখে, কাঁধে গামছা ফেলে, দাওয়া থেকে নেমে এল সসম্ভ্রমে। তার কুটিরে শহুরে লোকের পায়ের ধুলো কদাচিৎ পড়ে। বললে সেকথা। তারপরে আমাদের উদ্দেশ্য শুনে একেবারে অবাক হয়ে গেল। তার শিল্পীজীবন



সম্বন্ধে খোঁজখবর করতে, ফটো তুলতে কলকাতার কোন বাবু যে মেহনত করে এত দূরে আসতে পারেন, সেকথা যেন সহসা বুঝে উঠতে পারল না। ততক্ষণে ছোট ছোট কয়েকটি ছেলেমেয়ে এসে জড়ো হয়েছে—কিশোরীর নাতিনাতনি বোধ হয়। বাড়ির ভিতর থেকে মাদুর এনে তারা চটপট বিছিয়ে ফেলল দাওয়ার উপর। গাছ থেকে ডাব পাড়বার জন্য মহা হাঁকডাক শুরু করে দিল কিশোরী। তার কাজের কথা, ফটো তোল্বার কথা, সব পরে হবে—আগে একটু জিরিয়ে নিই—কত কষ্ট করে কত দূর পথ এসেছি আমরা। নগর-সভ্যতার বাইরে আতিথেয়তার এই সহজ সরল ধারাটি এখনও অক্ষুণ্ণ আছে দূরের গ্রাম-গুলিতে। সামান্য উপচারে অপরিচিত আগন্তুককেও কাছে টেনে নেবার মধ্যে অমায়িকতা এতই স্পষ্ট যে সে অনুরোধ উপেক্ষা করা যায় না। ডাবের জল খেয়ে দাওয়ায় মাদুরের উপর সকলে গিয়ে বসলাম গুছিয়ে। তারপরে নোটবই হাতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু হল।

এ গ্রামে কিশোরীদের বসবাস বহুকালের। বাংলা ১১৯০ সালের পুরনো জরিপের কাগজপত্র নাকি এখনও তার কাছে আছে। সেসব দলিল তখনই আমাদের দেখাতে না পারলেও তার এ উক্তি ভ্রান্ত নাও হতে পারে। এ গ্রামের দু'তিন মাইলের মধ্যে মন্দির-বাজারের কেশবেশ্বর শিবের বৃহৎ আটচালা মন্দিরটি, উৎসর্গলিপি অনুসারে, ১১৫৫ বঙ্গাব্দে প্রতিষ্ঠিত। কাছাকাছি হাউড়ি-হাটেও একাধিক প্রাচীন মন্দিরের অবশেষ দেখা যায়। দু'শ বছর আগে ২৪-পরগণা জেলার এ অঞ্চলে সুন্দরবনের বিস্তার অনেক বেশী থাকলেও এতগুলি বড় বড় দেবালয়ের নজিরে প্রমাণ হয় যে, ঠিক এই এলাকাটিতে তখন রীতিমতো লোকবসতি ছিল। সেই স্বয়ংনির্ভর গ্রামীণ সমাজের এক পাশে এই কর্মকার পরিবারের হয়ত স্থান হয়েছিল। কিশোরীর আদি পুরুষেরা ঠিক কি ধরনের কাজ করতেন, সেকথা আজ আর কেউ সঠিক বলতে পারে না। তবে গত দু'তিন পুরুষ ধরে এ পরিবার প্রধানত কাঠ-খোদাই শিল্পী। রথের কাঠামো ও বিবিধ মূর্তি, দেবদেবীর কাঠের বিগ্রহ, বৃষকাষ্ঠ ও পুতুলনাচের কাঠের পুতুল বানানোই তাঁদের পৈতৃক পেশা।

আগে এহেন পরিবার আরও কয়েক ঘর ছিল এ গ্রামে। এখন কিশোরীই শিবরাত্রির সলতে। বৃষকাষ্ঠ ছাড়া অন্য জিনিসের অর্ডার বড় একটা পায় না বলে পুতুলনাচের পুতুল তৈরি করাই তার বর্তমান পেশা। বাজারবেড়িয়া থেকে মাইল দেড়েক দূরে চৈতন্যপুর গ্রামে এ শিল্পের আর একজন কুশলী কারিগর আছেন—সতীশচন্দ্র হালদার। তিনিও বয়সে প্রবীণ। এ দু'জন গত হলে এই অভিনব কুটিরশিল্পটি এ অঞ্চল থেকে লোপ পাবে।

প্রসঙ্গত, এই এলাকার কাছাকাছি কয়েকটি গ্রামে যে নানারকম কুটিরশিল্পীর বসবাস দেখা যায় সে এক আশ্চর্য ঘটনা। চৈতন্যপুরে কয়েক ঘর মৃৎশিল্পীও আছেন। তাঁরা মাটির খেলনা-পুতুল ও প্রতিমা নির্মাণ করেন। পটের কাজেও তাঁদের দক্ষতা আছে শুনেছি। বাজারবেড়িয়ার এক মাইল দক্ষিণে, মহেশপুরে, শোলা-শিল্পী পরিবারের সংখ্যা চল্লিশের কম নয়। দেড় মাইল উত্তরের সরদনায় তের-চোদ্দ ঘর মুসলমান পটুয়ার বাস। আর দু' মাইল দক্ষিণ-পূবে গোপালনগর তো কুম্ভকার ও মৃৎশিল্পীদের জন্য বিখ্যাত।

গ্রামীণ কারুশিল্পের এই নিবিড় পরিবেশের মধ্যে কিশোরী তার পৈতৃক পেশায় নিযুক্ত আছে সারা জীবন। ছেলেবেলায় বাপ-জ্যাঠার কাছে সেই যে হাতুড়ি-বাটালি ধরতে শিখেছিল, আজও তাতে বিরাম নেই। রথ তৈরির মতো বড় কাজ, দক্ষতাসাপেক্ষ কাজ আজকাল আর পাওয়া যায় না। পুরনো রথ মেরামতির কাজও কদাচিৎ আসে। এলে, রথের কাঠামো সারাই করা ছাড়াও কাঠ খোদাই করে ঘোড়া, সারথি, পরী প্রভৃতির নিরেট মূর্তি তৈরি করতে হয় বলে দক্ষতা দেখাবার কিছু অবকাশ পাওয়া যায়। কাছে-পিঠের চৈতন্যপুর, ভবানীপুর ও জয়নগর-মজিলপুরের তেলিপাড়ার কাঠের রথগুলি কিশোরী ও তার সহকর্মীদের তৈরি। এহেন শিল্পসৃষ্টির সুযোগ জীবনে আর হয়ত হবে না বলে সেগুলির উপর কিশোরীর মমত্ববোধ যে কত গভীর তা কথায় কথায় বেশ বোঝা যায়। এখন শেষ জীবনে তাকে এমন পথ ধরতে হয়েছে, যেখানে ধনীলোকের পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়াও চলতে পারে। কিশোরী তাই বাড়িতে বসে পুতুলনাচের কাঠের পুতুল বানায়, নানা রঙের সাজপোশাক পরিয়ে তাদের পালাগানের এক-একটি চরিত্রে পরিণত করে, তারপরে দু'চারজন সাগরেদ সঙ্গে নিয়ে উৎসব-পার্বণের জমায়েতে নাচ দেখাতে বেরিয়ে পড়ে।

২৪-পরগণার এ অঞ্চলে দক্ষ পুতুল-নাচিয়ে হিসেবে বেশ খ্যাতি আছে কিশোরীর। কোন কোন অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তারা প্রতি বছরই তার দলকে ডাকেন। জয়নগর-মজিলপুরের কার্তিক মাসের রাসমেলা, সেখান থেকে দু' মাইল পূবে তুলসীঘাটার মণ্ডলদের বৈশাখ মাসের গোষ্ঠমেলা, দেড় মাইল উত্তরের বহড়ুর বসুদের রাসমেলা, বজবজের ঘোষ-পরিবারের দুর্গোৎসব প্রভৃতিতে কিশোরীর উপস্থিতি নিয়মিত। কলকাতায় অনুষ্ঠিত গ্রামীণ সংস্কৃতি সম্মেলন থেকেও সে মাঝে মধ্যে আমন্ত্রিত হয়েছে। এছাড়া বায়না পেলে অন্যত্রও যায়।

তার এত সমাদর কিন্তু প্রধানত প্রাচীনপন্থীদের কাছে, যাঁরা গ্রাম-বাংলার এই শিল্প-নাট্যটিকে সনাতন রূপেই দেখতে চান। আধুনিক 'পাপেট্-শো'-র সঙ্গে তার তুলনা করতে যাওয়াটাই ভুল। প্রথমত, দু'ফুট-আড়াই ফুট উচ্চতার কাঠের পুতুলগুলির কোমরের নীচের অংশ খোদাই করা হয় না, বলে তাদের পা থাকে না। সেজন্য পা ফেলে হেঁটে-চলে বেড়ানোও তাদের দিয়ে দেখানো যায় না। কেবলমাত্র গলা, কোমর, কাঁধ ও কনুই-এর কাছে জোড় থাকে বলে এসব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সঞ্চালনই শুধু দেখানো যায়। কোন কোন ক্ষেত্রে বাঁ হাতের কনুই-এ কব্জা লাগানো হয় না; সেজন্য ডান হাতটিই শুধু

ঘোরাফেরা করতে পারে। 'পাপেট্-শো'-র পুতুলের মতো চোখের পাতা ফেলতে পারে না, মুখ খুলতে বা বন্ধ করতে পারে না, সাজপোশাকও অনেক নিকৃষ্ট শ্রেণীর। নানান বৈজ্ঞানিক সহায়তাপুষ্ট এই আধুনিক প্রতিযোগীর সঙ্গে তুলনা করে দেখলে কিশোরীর শিল্পসৃষ্টির চটক অনেক কম। তবু পল্লীগ্রামের দর্শকদের কাছে তা মনোহারী এইজন্য যে, নাচের পালাগুলি কালজয়ী রামায়ণ, মহাভারত ও পৌরাণিক উপাখ্যান থেকে আহৃত। গ্রামীণ জনতার কাছে সেসব কাহিনীর আকর্ষণ এখনও যে কত গভীর, তা শহুরে ফুলবাবু ছাড়া আর সকলেই জানেন। পুতুলগুলির অঙ্গভঙ্গি অপেক্ষাকৃত সীমিত হলেও সঙ্গে সঙ্গে পালাগান চলতে থাকে বলে দর্শকদের রসগ্রহণে বিশেষ বাধা হয় না।

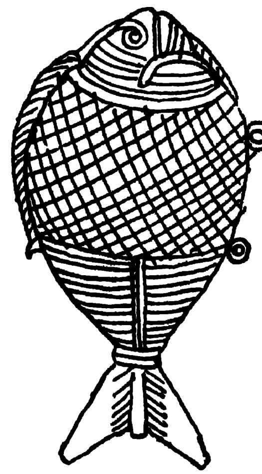
পুতুলের নিম্নাঙ্গ যে বাদ দিয়ে তৈরি হয় সেকথা আগেই বলেছি। মাথা, ধড়, দুই হাত ও কোমরের নীচের সামান্য একটু অংশ আলাদা কাঠের টুকরোয় তৈরি করে ধড়ের সঙ্গে শিক দিয়ে লাগিয়ে নেওয়া হয়। কাঁধ ও কনুই-এ কব্জা বসানো থাকে যাতে অদৃশ্য সুতো টেনে তাদের নড়ানো-চড়ানো যায়। মাথা ও ধড়ের নীচে যে শিক বসানো থাকে, সেগুলিকে মোচড় দিয়ে মাথা ও ধড়কে দু'পাশে ফেরানো যায়। পিঠের দিকের অংশ যতখানি সম্ভব খুবলে ফেলে দিয়ে পুতুলগুলিকে হালকা করে নেওয়া হয় ও নাচাবার দণ্ডটি কোমরের নীচের অংশের ভিতর দিয়ে এসে এই শূন্য স্থানটি অতিক্রম করে মাথার নীচে সংবদ্ধ হয়। 'চরিত্র' অনুযায়ী পরিচ্ছদ ছাড়াও শণের চুল, গোঁফ, দাড়ি ও অলংকার ব্যবহার করা হয়ে থাকে। মুখমণ্ডল বা অন্য অনাবৃত অংশে রং লাগানো হয়—যেমন কৃষ্ণের শ্যাম বা রাধিকার সোনালী। নাচের 'স্টেজ'ও যারপরনাই সাদাসিধে। একেবারে সামনে থাকে মাদুর বা দরমার এক অনুচ্চ বেড়া। পুতুল-নাচিয়ে ও গায়কেরা বসেন সেই বেড়ার পিছনে। তাদের পশ্চাতে, একটু তফাতে, খুব চটকদার রঙে আঁকা মালা-হাতে-পরী, ফুলে-ভরা-বাগান প্রভৃতির 'সিন' টাঙানো থাকে। কিশোরী এসব দৃশ্যপট হয় নিজেই এঁকে নেয় নয়ত সরদনা গ্রামের মুসলমান পটুয়াদের কাছ থেকে সংগ্রহ করে। মোটা 'মার্কিন' থানের এক পিঠে তেঁতুলবীচির গুঁড়ো সিদ্ধ-করা আঠার প্রলেপ লাগিয়ে যে জমিন তৈরি হয়, তার উপর সাধারণত জল-রং দিয়েই এসব 'সিন' আঁকা হয়ে থাকে। পালা শেষ হতে যে দু'তিন দিন সময় লাগে তার মধ্যে এ পশ্চাৎপট বড় একটা পালটানো হয় না।

জিজ্ঞাসাবাদ এতদূর অগ্রসর হবার পর কাঠ-খোদাই কাজটা ঠিক কিভাবে করা হয় সে কথায় এলাম। কিশোরী বললে, সে কাজেই তো বসেছিলাম বাবু, যখন আপনারা এলেন। চলুন হাতে-হাতিয়ারে দেখাই আপনাদের। দাওয়ার অপর অংশে সেই কাঠের গুঁড়িটার কাছে গিয়ে উবু হয়ে বসল কিশোরী। হাতিয়ার বলতে, ছাল ছাড়াবার জন্য খুব ছোট কোদালের মতো ধারালো ব্লেড-এর একটি যন্ত্র ও ছোট-বড় সাইজের দু'চার প্রস্থ হাতুড়ি-বাটালি। প্রথম যন্ত্রটি নিয়ে অবলীলাক্রমে সবটা বাকল সে ছাড়িয়ে ফেলল। সদ্য গাছ থেকে কাটা রসযুক্ত নরম জিউলী কাঠ ব্যবহার করাই রীতি। এবার হাতুড়ি-বাটালি তুলে নিয়ে খোদাই কাজ শুরু করল কিশোরী। বাটালি যে এত ক্ষিপ্র ও নির্ভুল-ভাবে চালানো যায়, তা চোখের উপর ঘটল বলেই বিশ্বাস করতে পারলাম। দেখতে দেখতে আট-দশ মিনিটের মধ্যে সেই নিরবয়ব কাঠের কুঁদোর গায়ে চুলের রেখা, কপাল, চোখ, নাক, মুখ, কান, চিবুক, গলা—সব ফুটে উঠল যেন মন্ত্রবলে। একমনে এতক্ষণ কাজ করে হাতুড়ি-বাটালি নামিয়ে রাখল কিশোরী। এপাশ-ওপাশ ঘাড় ফিরিয়ে ভাল করে দেখল তার সৃষ্টিকে। তারপরে সলজ্জ একটু হাসি টেনে এনে বললে—দেখলেন তো বাবু! এইভাবেই পুতুল গড়তেছি বহুকাল। আমি মনে মনে ভাবলাম—বহুকাল নয়, বহু পুরুষ। আমাদের অধিকাংশ কুটিরশিল্পের দক্ষ কারিগরদের যে অসামান্য নৈপুণ্য তা

বংশানুক্রমিকভাবে অর্জিত বলেই আমার স্থির বিশ্বাস। অনেক ক্ষেত্রেই সে অতুলনীয় পারদর্শিতা এক পুরুষে সম্ভব নয়। সহজ করে কথাগুলো বললাম কিশোরীকে। অনেকক্ষণ সে কোন কথা বলল না—যেন আমার উক্তির তাৎপর্যটা ভাল করে বিশ্লেষণ করে দেখছে মনে হল। তারপরে ধীরে ধীরে যেন নিজের মনেই বললে—তাই যদি হবে বাবু, তবে আমাদের এত পুরুষের এই পেশা আমার ছেলেরা নিলে না ক্যানে? তারা যে কি কাজকাম করে তা দেখাই বাবু আপনাদেরকে। গভীর পরিতাপে কিশোরীর গলাটা যেন ধরে এল।

কিশোরীর ছেলেরা এক-আধবার বাড়ির বাইরে এসে আমাদের আলোচনা শুনে গেছে, কিন্তু তাতে যোগ দেয়নি, কোন উৎসাহও দেখায়নি। এইবার কিশোরীর আমন্ত্রণে বাড়ির ভিতরে ঢুকে দেখি, উঠনের পাশে যে কামারশালা, তার হাপরের আশপাশে ছেলেরা তার নানা কাজে ব্যস্ত। দেখে অবাক হয়ে গেলাম, একরাশ অস্ত্র-চিকিৎসার যন্ত্রপাতি তারা ইতিমধ্যেই তৈরি করেছে, আরও বানানোর কাজ চলছে। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে কিশোরী শুধু বললে—দেখুন বাবু, আপনারাই দেখুন; আমার ইসব দেখে কাজ নাই।

ছেলেদের সঙ্গে কথা বললাম কিছুক্ষণ। তাদের যুক্তি তীক্ষ্ন ও সংক্ষিপ্ত। পুতুল-নাচের কারিগর ও পালা-গাইয়ে হিসেবে তাদের বাবা মাসে যা উপার্জন করেছে এতদিন, তাতে সামান্য জমিজমার আয় যোগ করে আগে হয়ত কোনগতিকে সংসার চলে গেছে। এখন বর্ধিত পরিবারের খরচ মেটানো অসম্ভব। শুধু এখন কেন, অনেক দিন আগে থেকেই অসম্ভব। কর্মকার পরিবারের জাতিগত বৃত্তি তাই তারা ছাড়েনি; শুধু তার অর্থকরী দিকটার চর্চা করে বর্তমান দুর্দিনে সংসার রক্ষার চেষ্টা করেছে মাত্র। শল্য-চিকিৎসার এসব যন্ত্রপাতি বারুইপুরের সরকারী কারখানা থেকে ইলেকট্রোপ্লেটিং করিয়ে নিয়ে তারা ভাল দামে কলকাতার বাজারে বিক্রী করে। স্বীকার করতে বাধা নেই, তাদের আমি দোষী করতে পারিনি, বিমর্ষ কিশোরীকেও সান্ত্বনা দিতে পারিনি। এ সেই অমোঘ আর্থনীতিক ও সামাজিক সংকট, যার কবলে পড়ে আমাদের আরও অনেক গ্রামীণ চারু-শিল্প হয় ইতিপূর্বেই লোপ পেয়েছে নয়ত অন্তিম দিনগুলি গুনছে। পরাজিতের মনো-ভাব নিয়ে আমি সেজন্য চাই কিশোরী কর্মকার আরও অনেক দিন বেঁচে থাকুক; আরও অনেক দিন ধরে এ কুটিরশিল্পটির সেবা করুক। কিন্তু চিরজীবী সে কখনই হতে পারে না। আজ হোক, কাল হোক, তার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই বাজারবেড়িয়া পুতুলনাচের ইতি-কথায় যে ছেদ পড়বে, তাতে আর সন্দেহ নেই।



আঁটপুর

'মার্টিন রেল' বন্ধ হওয়ায়, প্রত্যহ যাঁরা এ রেলপথ ব্যবহার করতেন, তাঁদের থেকে আমি কিছু কম দুঃখিত হইনি। কলকাতার কাছাকাছি নিরুদ্দেশ ভ্রমণের অতি মনোরম এক উপায় আমার হাতছাড়া হয়েছে। সে যে কী আপসোস কি করে বোঝাই! কলকাতার দিকের প্রান্তিক স্টেশন হাওড়া ময়দানে কতবার গিয়ে ট্রেনে চেপে বসেছি। আমতা, শিয়াখালা, চাঁপাডাঙ্গা—গন্তব্যস্থল যা-ই হোক না কেন, কিছু এসে যায়নি। ঘন-বসতি শহরতলির বাড়িঘর ছুঁয়ে ছুঁয়ে, পল্লীঅঞ্চলের নিকনো উঠোন, পানাপুকুর, হাটতলা ডাইনে-বাঁয়ে রেখে, গ্রামপ্রান্তের খেজুর-নারকেল-আম-কাঁঠালের বাগান পার হয়ে, উদারপ্রসার প্রান্তরে গিয়ে পেঁছনোর মধ্যে যে অভীষ্টহীন এক রোমাঞ্চ ছিল তার স্বাদ আর পাব না একথা ভাবতেই খারাপ লাগে। রোমাণ্টিক অনুভূতি ছাড়াও হাওড়া-হুগলী জেলার মেহনতী মানুষের একেবারে কাছাকাছি আসবার সিংহদ্বারও ছিল এই মার্টিনের রেল। নিম্নমধ্যবিত্ত জনতার সুখদুঃখের সমভাগী হবার—আপনজনের মতো দু'দণ্ড তাঁদের পাশে গিয়ে বসবার এর চেয়ে আর ভাল উপায় ছিল না। আজ সেসব স্মৃতিকথা মাত্র।

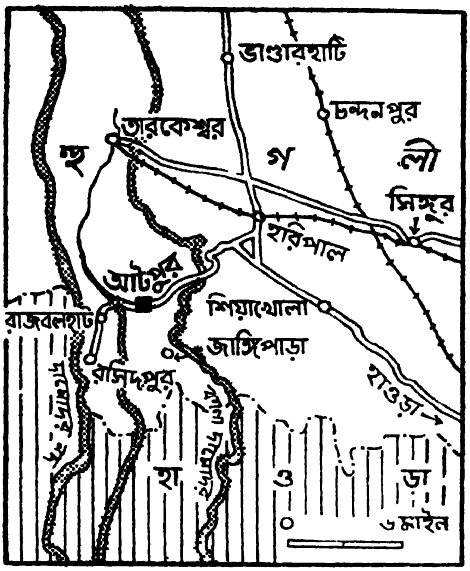
আঁটপুরের বিষয়ে লিখতে বসে মার্টিন রেলের অন্ত্যেষ্টি দিয়ে শুরু করবার একটু কৈফিয়ত আছে। কলকাতা-হাওড়াবাসীদের পক্ষে আঁটপুরে যাবার সহজতম সড়ক ছিল এই রেলপথ। হাওড়া ময়দান স্টেশনে রেলে চেপে, বিচিত্র অভিজ্ঞতার ভিড় ঠেলতে ঠেলতে, ঘণ্টা দুই-আড়াই পরে আঁটপুরে নেমে গেলেই সেখানকার অপূর্ব মন্দিরগুলির একেবারে কাছে গিয়ে পেঁছনো যেত। বাকি পথটুকু হেঁটে যাবার কোন অসুবিধাই ছিল না। পাঠকদের এ রাস্তায় নিয়ে যেতে পারলে, আমার অভিজ্ঞতার বেশ কিছু অংশ তাঁদের সঙ্গে ভাগ করে নিতে পারতাম। কিন্তু তা আর হবার নয়। আঁটপুর যেতে হলে এখনকার সহজতম পন্থা—হাওড়া থেকে তারকেশ্বর লোকালে চেপে হরিপাল স্টেশনে পেঁছে সেখান থেকে রসিদপুরগামী বাসে ন'মাইল দূরে আঁটপুর গ্রামে এসে নামা। সময় লাগে কমবেশি দু'ঘণ্টা। মধ্যাহ্নভোজনের জন্য কিছু খাবার সঙ্গে নিয়ে সকাল ন'টায় কলকাতার বাড়ি থেকে বার হলে সন্ধ্যার আগে অনায়াসেই যথাস্থানে ফিরে আসা সম্ভব। দুপুরের জলযোগের আসর বসতে পারে মন্দির-চত্বরের কাছেই অতি প্রাচীন এক বকুল গাছের ঘনশীতল ছায়ায় অথবা অদূরের কাজল-দীঘির পরিচ্ছন্ন সান-বাঁধানো ঘাটে।

কিছুদিন আগেও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পর্যটন বিভাগ ছুটিছাটার দিনে কলকাতা থেকে আঁটপুর অবধি এক টুরিস্ট বাস চালাতেন। সে সুযোগে অনেকেই হয়ত সেখানকার বিখ্যাত 'টেরাকোটা' মন্দির ও বাঁশ-কাঠ-খড়ের চণ্ডীমণ্ডপটি দেখে থাকবেন। পোড়া-

মাটির অলংকরণ ও কাঠ-খোদাইয়ের উৎকর্ষের দিক থেকে তারা যে পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পুরাকীর্তি তাতে সন্দেহমাত্র নেই। কিন্তু এ ছাড়াও দ্রষ্টব্য আছে আঁটপুরে। মন্দির, রাসমঞ্চ, দোলমঞ্চ প্রভৃতি মিলিয়ে ইঁটের দেবায়তনের সংখ্যা এখানে অন্তত ন'টি, যার মধ্যে পাঁচটিই 'টেরাকোটা'-অলংকৃত। একত্রে এতগুলি 'টেরাকোটা' দেবালয় হুগলী জেলার বালী-দেওয়ানগঞ্জ, বৈঁচিগ্রাম, রাজবলহাট ও হরিপাল ছাড়া আর কোথাও আছে কিনা সন্দেহ। সেদিক থেকেও আঁটপুরের গুরুত্ব কম নয়। চণ্ডীমণ্ডপটির কাঠের কারু-কার্যও এত অপরূপ যে তা না দেখলে বিশ্বাস করা শক্ত। কাঠ-খড় দিয়ে দেবগৃহ নির্মাণের এই বিশিষ্ট রীতিটির নিদর্শন এখন প্রায় লুপ্ত হয়েছে বলে আঁটপুর এ বিষয়েও প্রায় অনন্য। তাছাড়া, শ্রীরামকৃষ্ণদেব, শ্রীমা, স্বামী বিবেকানন্দ ও স্বামী প্রেমানন্দের স্মৃতি-বিজড়িত এ গ্রাম তাঁদের স্মারকচিহ্নগুলির জন্যও দ্রষ্টব্য। বস্তুত, এত সুগম ও এত আকর্ষণীয় আর কোন জনপদ কলকাতার এত কাছে আছে বলে আমার জানা নেই। পথে বেরিয়ে পড়বার আনন্দই যাঁদের কাছে যথেষ্ট নয়, পথের শেষে অভিনব কিছু না দেখে ঘরে ফেরাকে যাঁরা পণ্ডশ্রম মনে করেন, তাঁরা আঁটপুরে রকমারি এবং আকর্ষণীয় অনেক কিছুর একত্র সমাবেশ দেখতে পাবেন।

আঁটপুরের দেবালয়গুলির মধ্যে রাধাগোবিন্দজীউর মন্দিরটিই প্রধান। প্রতিষ্ঠা-লিপি অনুসারে স্থানীয় মিত্র বংশের পূর্বপুরুষ কৃষ্ণরাম মিত্র ১৭০৮ শকাব্দে (১৭৮৬-৮৭ খ্রীষ্টাব্দে) এটি নির্মাণ করান। এ পরিবারে রক্ষিত এক পুঁথি থেকে দেখা যায় যে আদিশূরের সময় কান্যকুব্জ থেকে যে পাঁচজন ব্রাহ্মণ ও পাঁচজন কুলীন কায়স্থ গৌড়দেশে এসেছিলেন, তাঁদের মধ্যে কালিদাস মিত্র এ বংশের প্রতিষ্ঠাতা। এ পরিবারের তিনটি অংশ বিভিন্ন সময়ে ২৪-পরগণা জেলার বড়িশা, হুগলী জেলার কোন্নগর ও তৎকালীন ভুরিশ্রেষ্ঠ রাজ্যের অন্তর্গত আঁটপুরে বসতি স্থাপন করে যথাক্রমে সেখানকার মিত্র-বংশ নামে প্রসিদ্ধিলাভ করেন। আঁটপুরের শাখাটির আদি-পুরুষ কন্দর্প মিত্র। এ গ্রামে তাঁর আগমনের কাল আনুমানিক ১০৯০ বঙ্গাব্দ (১৬৮৩-৮৪ খ্রীষ্টাব্দ)। তাঁর পৌত্র কৃষ্ণরাম মিত্র ১১২৫ বঙ্গাব্দে (১৭১৮-১৯ খ্রীষ্টাব্দে) জন্মগ্রহণ করেন ও নিজ গুণে বর্ধমানরাজ কীর্তিচন্দ্রের দেওয়ানের পদই শুধু উন্নীত হননি, কীর্তিচন্দ্রের মৃত্যুর পর তাঁর নাবালক পুত্রের অভিভাবক হিসাবেও বহুদিন সে জমিদারি পরিচালনা করেন। একদিকে তিনি যেমন প্রভূত বিত্তের অধিকারী হয়েছিলেন, অন্যদিকে দানধ্যানেও তাঁর দেশব্যাপী খ্যাতি ছিল। কুলপঞ্জীতে উল্লেখিত তাঁর জন্ম-সালটি (১১২৫ বঙ্গাব্দ) যদি নির্ভুল হয়, তবে আলোচ্য মন্দিরটি তিনি প্রতিষ্ঠা করেন তাঁর জীবনসায়াহ্নে, ৬৮ বছর বয়সে।

সরেজমিনে পশ্চিমবাংলার কয়েক হাজার মন্দির-মসজিদ ও অন্যান্য পুরাকীর্তি পর্যবেক্ষণ করবার যে দুর্লভ সৌভাগ্য আমার হয়েছে, সহৃদয় পাঠক তার উল্লেখকে যেন শ্লাঘার প্রকাশ বলে মনে না করেন। নানা কারণে এটা সম্ভব হয়েছে; এতে ব্যক্তিগত কৃতিত্ব হয়ত বিশেষ কিছুই নেই। তবু অর্জিত অভিজ্ঞতার মূল্য কম নয় এবং সে অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই আঁটপুরের রাধাগোবিন্দজীউর মন্দিরটিকে, কি স্থাপত্য কি 'টেরাকোটা' ভাস্কর্যের বিচারে, পশ্চিমবঙ্গের এজাতীয় দেবালয়ের মধ্যে সর্বোচ্চ শ্রেণীতে স্থান দিতে আমার দ্বিধা নেই। প্রথমে স্থাপত্যের কথাই বলি। দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ৩০ ফুট কি তারও বেশী আয়তনের 'টেরাকোটা' মন্দির পশ্চিমবাংলায় খুব বেশী নেই। সে নিরিখে এ দেবালয়টিকে রীতিমত বড়ই বলতে হবে, কেননা দৈর্ঘ্যে এটি ৪৭ ফুট ৩ ইঞ্চি ও প্রস্থে ৩৮ ফুট ৯ ইঞ্চি। প্রায় ৬০ ফুট উচ্চতার দৃষ্টান্তও সহজলভ্য নয়। দেবসৌধটি আটচালা শৈলীতে (কালীঘাটের মন্দিরের মতো) নির্মিত হলেও এর



সামনের দিকে দোচালা ছাদের যে আর একটি দালান সংযুক্ত হয়েছে তাও খুবই অভিনব। বর্ধমানরাজকুল নির্মিত কালনা শহরের আর দুটি দেবালয়েও এহেন অতিরিক্ত দালানের সমাবেশ হয়েছে সত্য, কিন্তু সেগুলি বহুচূড় রত্ন-মন্দির (দক্ষিণেশ্বরের কালী মন্দিরেব মতো), আটচালা মন্দির নয়। ভিতরের গঠনপ্রকরণে আটচালা মন্দির খুব কম ক্ষেত্রেই দ্বিতল হয়। আঁটপুরের মন্দিরটি শুধু দোতলাই নয়, উপরে যাবার সিঁড়িও আছে দুটি। এ সবরকম স্থাপত্যরীতিই বেশ বিরল।

মন্দিরের সামনের দেওয়ালে আট-লাইনের প্রতিষ্ঠালিপিটি আংশিক ক্ষয়িত ও বেশ উঁচুতে নিবদ্ধ বলে ভালভাবে পড়া যায় না। মিত্র পরিবারে রক্ষিত একটি ছাপ-তোলা প্রতিলিপি ও টেলিফোটো লেন্স-এ গৃহীত আলোকচিত্র মিলিয়ে যেটুকু পাঠোদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে তা নিম্নরূপ ঃ "শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দো/জয়তি ব্রজপুরনিধি/রাধা রাধা গোবিন্দধাম/কৃত বহুশুভ ঃ শোভারাম মিত্রস্য।...সুগু সুকৃতি/কৃষ্ণ...পুত্রো সমাপ্তঃ/.../শক ১৭০৮।" অর্থাৎ রাধাগোবিন্দের এই মন্দির শোভারাম মিত্রের পুত্র কৃষ্ণ মিত্র ১৭০৮ শকে (১৭৮৬-৮৭ খ্রীষ্টাব্দে) সমাপ্ত করেন। সামনের অতিরিক্ত দালানটির সংযোজনের জন্য পোড়ামাটি-সজ্জার প্রদর্শনের ক্ষেত্র অনেকখানি প্রসারিত হয়েছে এবং ভাস্করেরা সে সুযোগের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করেছেন। আজ থেকে ১৮৬ বছর আগে নির্মিত এ দেবালয়ের 'টেরাকোটা' অলংকরণের অজস্রতা, প্রতিষ্ঠাতার অমিত বিত্ত সূচিত করে সন্দেহ নেই কিন্তু তাদের কারিগরি উৎকর্ষ এ শিল্পের তৎকালীন উচ্চ মানেরই পরিচায়ক। কথাটা আর একটু বুঝিয়ে বলি। পশ্চিমবঙ্গে এখনও যেসব 'টেরাকোটা' মন্দির বর্তমান, সামান্য কয়েকটি ব্যতিক্রম ছাড়া, তাদের সবই চৈতন্য-পরবর্তীকালের অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় ষোল শতকের শেষার্ধ বা তার পরের। এদের বিস্তৃত সমীক্ষা থেকে মন্দির-অলংকরণ শিল্পের আদি, মধ্য ও অন্ত্য-যুগ মোটামুটিভাবে নির্ণয় করা সম্ভব। সে শ্রেণীবিভাগ অনুসারে আঁটপুরের এ মন্দিরটি মধ্যযুগে নির্মিত, যখন সংশ্লিষ্ট ভাস্করেরা বিষয়বস্তু নির্বাচনের বৈচিত্র্যে ও কারিগরি দক্ষতায় শিল্পপ্রতিভার উচ্চ স্তর স্পর্শ করেছিলেন। তখন পূর্ব-অনুসৃত পুরাণ, কৃষ্ণলীলা ও রামায়ণ-মহা-

ভারতাশ্রিত কাহিনী অনাদৃত না হলেও অজস্র সমাজচিত্র, বিশেষত ফিরিঙ্গী-জীবন-চিত্র ক্রমশই অধিক সংখ্যায় রূপায়িত হতে আরম্ভ করেছে। এ দেবালয়ে সেজন্য সনাতন-রীতির চিত্রকল্পের যেমন অভাব নেই, তেমনি সমকালীন ইংরেজ সমাজের অগণিত দৃশ্যও স্থান পেয়েছে। শুধু সামনের দেওয়াল ও ঢাকা বারান্দা দু'টির ভিতরের গায়ে ব্যবহৃত হলেও এ মন্দিরে নকাশি টালির সংখ্যা এতই অগণিত যে তাদের বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া সম্ভব নয়। তবে বাইরের দালানের দক্ষিণ দিকের প্রবেশপথের ঠিক উপরে রণ-রঙ্গিনী কালীমূর্তিটি, সামনের খিলানশীর্ষে দেবীযুদ্ধ, লঙ্কাযুদ্ধ, কুরুক্ষেত্রযুদ্ধের প্যানেলগুলি এবং পশ্চিম অংশে নিবদ্ধ বহু ফিরিঙ্গীচিত্র ও সামাজিক দৃশ্য খুবই সুন্দর। প্রথম দালানের ভিতরের দেওয়ালে 'টেরাকোটা' পদ্মগুলিও লক্ষণীয়; সংখ্যায় অজস্র হলেও তাদের প্রত্যেকটির প্যাটার্ন ভিন্ন। দুটি দালানের ছাদেই যে ফ্রেসকো অলংকরণ আছে তাও অভিনব, কেননা এজাতীয় সজ্জা বাংলা-মন্দিরে খুব কমই দেখা যায়।

যে প্রাচীর-ঘেরা অঙ্গনে মূল মন্দিরটি অবস্থিত তার বাইরে প্রায় সামনাসামনি প্রতিষ্ঠালিপিবিহীন পশ্চিমমুখী আটচালা গঙ্গাধর শিবমন্দিরটি ছোট হলেও তার ফুলকারি নকাশি টালিগুলির মধ্যে পশু-পাখির মূর্তিবিন্যাস অনুরূপ মুঘল অলংকরণরীতির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। আর কিছু দক্ষিণে, পূবমুখী আটচালা রামেশ্বর ও দক্ষিণমুখী আটচালা বাণেশ্বর শিবমন্দির এবং তাদের মাঝামাঝি জায়গায় এক পঞ্চরত্ন দোলমঞ্চ আছে। পোড়ামাটির অলংকরণ সব ক'টিতে থাকলেও বাণেশ্বর মন্দিরের কারুকার্যই শ্রেষ্ঠ। দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ১৯ ফুট ৭ ইঞ্চি × ১৭ ফুট ও উচ্চতায় প্রায় ৩০ ফুট, ত্রিখিলানযুক্ত এ দেবালয়টি প্রতিষ্ঠালিপি অনুসারে ১৬৯৫ শকাব্দে (১৭৭৩-৭৪ খ্রীষ্টাব্দে), অর্থাৎ প্রধান মন্দিরটি থেকে ১৩ বছর আগে নির্মিত। সামনের দেওয়ালে নিবদ্ধ রামায়ণ, কৃষ্ণলীলা, ফুলকারি, পৌরাণিক, সামাজিক ও ফিরিঙ্গী-জীবনচিত্রের অসংখ্য সজ্জার মধ্যে কোন কোন প্যানেল রাধাগোবিন্দ মন্দিরের থেকে হীন নয়। দোলমঞ্চের কারুকার্য সাধারণ, তবে প্রায় দেড় ফুট উচ্চতার কয়েকটি দ্বারপালের মূর্তি লক্ষণীয়। বাণেশ্বর শিবমন্দিরটি ছোট—দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ১৩ ফুট ৯ ইঞ্চি × ১২ ফুট ৪ ইঞ্চি ও উচ্চতায় অনধিক ২৫ ফুট। কিছু সাধারণ ফুলকারি নকশা ছাড়া এটিতে অন্য অলংকরণ নেই।

এ দেবালয়গুলির সামান্য দক্ষিণে, রেল স্টেশনে যাবার পিচের রাস্তার ওপারে, স্বচ্ছ জলের সেই কালো দীঘি। তার সান-বাঁধানো ঘাটের দু'পাশে ফুলেশ্বর ও জলেশ্বর শিবমন্দির দুটি খুব ছোট ও অলংকরণবিহীন হলেও প্রথমটির প্রতিষ্ঠালিপি থেকে প্রকাশ, সেটি ১৬৯১ শকাব্দে (১৭৬৯-৭০ খ্রীষ্টাব্দে) নির্মিত ও সেজন্য আঁটপুরের প্রাচীনতম দেবালয়। হিসাব মিলিয়ে দেখছি, এসব পুরাকীর্তির প্রতিষ্ঠাতা কৃষ্ণরাম মিত্র তাঁর ৫১ বছর বয়সে এই অকিঞ্চিৎকর দেবালয়টি দিয়ে শুরু করে, ৫৫ বছর বয়সে রামেশ্বর শিবমন্দির ও ৬৮ বছর বয়সে বৃহৎ রাধাগোবিন্দ মন্দিরটি নির্মাণ করান। শেষোক্ত দেবালয়টি তাঁর সর্বোত্তম কীর্তি তো বটেই, পশ্চিমবঙ্গেরও অন্যতম শ্রেষ্ঠ 'টেরাকোটা' মন্দির।

আঁটপুরে আমি বহুবার গিয়েছি; দর্শনীয় বস্তুর সমারোহে কখনও ক্লান্তি অনুভব করিনি। পরিক্রমার শেষে প্রতিবারই এসে বসেছি সেই কালো দীঘির ঘাটে আর কেন জানি, সেই কাকচক্ষুজল সরোবরকে আমার 'কৃষ্ণকান্তের উইল'-এর বারুণী পুষ্করিণী বলে মনে হয়েছে। দীঘির পশ্চিম পাড়েই মার্টিন রেলের আঁটপুর স্টেশন। ফিরতি ট্রেনের জানালার ধারে বসে, গাড়ি ছাড়া অবধি একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকেছি সেই

বারুণী পুষ্করিণীর দিকে। না, রোহিণীর দেখা কোনদিনই পাইনি।

*

পশ্চিমবাংলার গ্রাম ও মফস্বল শহরে পারিবারিক দুর্গাপুজো এখনও সাধারণ চণ্ডীমণ্ডপ বা ঠাকুরদালানেই অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে, যেগুলিকে বাৎসরিক এই শুভ উৎসবের জন্য শুচিতার সঙ্গে রক্ষণাবেক্ষণ করা হয় সংবৎসর। একই মণ্ডপে কালী, জগদ্ধাত্রী প্রভৃতি অন্যান্য শাক্ত দেবীর উপাসনাতেও কোন বাধা নেই এবং নির্দিষ্ট তিথিতে একই চণ্ডীমণ্ডপে তাঁদেরও পুজা হয়ে থাকে বহুক্ষেত্রে। সামনের দিকে অবারিত, ইঁটের তৈরি, তিন বা পাঁচ খিলানের ঠাকুরদালান পশ্চিমবঙ্গের ধনী বা মধ্যবিত্ত পরিবারের একদা এত অধিক সংখ্যায় নির্মিত হয়েছে যে, তার কোন-না-কোন নিদর্শন অনেকেই দেখে থাকবেন। শাক্ত দেবীর আরাধনার জন্য এজাতীয় ইমারতের ব্যবহার কিন্তু পরবর্তীকালের। আদিতে তাঁরা যে বাঁশ-কাঠ-খড়ের চণ্ডীমণ্ডপেই উপাসিত হয়েছেন তাতে সন্দেহ নেই। বস্তুত ইঁটের তৈরি যাবতীয় বাংলা-মন্দিরের বাঁকানো কার্নিস ও ঢালু ছাদ থেকে পণ্ডিতেরা অনুমান করেন যে, বাঁশ ও খড়ের তৈরি কুটিরই ছিল বঙ্গদেশের আদিমতম মন্দির। কুটিরের আদল বজায় রেখেই যে ইঁটের (বিরল ক্ষেত্রে পাথরের) মন্দিরগুলি পরে নির্মিত হয়েছে, সেকথা পাশাপাশি অবস্থিত আঁটপুরের রাধাগোবিন্দজীউ মন্দির ও প্রাচীনতর চণ্ডীমণ্ডপটি থেকে যত সহজে ও নিঃসংশয়ভাবে প্রতীয়মান হয়, এমন আর কোথাও হয় কিনা সন্দেহ। উভয় বাংলার মন্দিরস্থাপত্যের ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে যাঁরা জানতে ইচ্ছুক, আঁটপুর তাঁদের কাছে অবশ্য-দর্শনীয় স্থান। কেননা, মন্দিরটির দোচালা ছাদ-ঢাকা সামনের অংশ ও চণ্ডীমণ্ডপের গঠনসাদৃশ্যে এই ধারাবাহিকতার সাক্ষ্য খুবই স্পষ্ট।

স্থানীয় মিত্র পরিবারে কুলপরম্পরায় প্রবাহিত জনশ্রুতি অনুসারে সে বংশের কন্দর্প মিত্র আনুমানিক ১০৯০ বঙ্গাব্দে (১৬৮৩-৮৪ খ্রীষ্টাব্দে) আঁটপুরে এসে প্রথম বসতি করেন ও কুলদেবতা শালগ্রাম শ্রীধরজীউর জন্য এক সাধারণ দালানমন্দির ও বাৎসরিক দুর্গাপুজোর জন্য এই চণ্ডীমণ্ডপটি নির্মাণ করেন। তাঁর পৌত্র কৃষ্ণরাম মিত্র ১৭৮৬-৮৭ খ্রীষ্টাব্দে আটচালাশৈলীর বর্তমান 'টেরাকোটা' মন্দিরটি প্রতিষ্ঠা করলেও চণ্ডীমণ্ডপটির সংস্কার বা পরিবর্তন করেছিলেন কিনা সে সম্বন্ধে নির্ভরযোগ্য কোন প্রমাণ নেই। মিত্র পরিবারে রক্ষিত পারিবারিক ইতিহাসের এক পুঁথি থেকেও মনে হয়, মাঝে মধ্যে সংস্কার ছাড়া পরবর্তীকালে চণ্ডীমণ্ডপটির বিশেষ অদলবদল হয়নি। সে-জন্য এটি যে প্রায় ২৮৮ বছরের প্রাচীন এমন অনুমান করা হয়ত অসঙ্গত নয়। আশ্চর্যের বিষয়, এই সুদীর্ঘ কাল ধরে এখানে একাদিক্রমে বাৎসরিক দুর্গাপুজো হয়ে এসেছে, কোন ছেদ পড়েনি। প্রধান মণ্ডপটির সামনে নাটমণ্ডপ হিসাবে ব্যবহৃত আর একটি বাঁশ-কাঠ-খড়ের চালাঘর ছিল, যেটি ১২৭১ বঙ্গাব্দের প্রবল ঝড়ে ভূমিসাৎ হয়। সাবেক শিল্পরীতি অনুযায়ী সেটির পুনর্নির্মাণ সম্ভব হয়নি বলে সেখানে পরে এক ইঁটের নাটমণ্ডপ স্থাপিত হয়েছে। লুপ্ত চালাঘরটির নকাশি কাঠের কিছু কিছু নমুনা নাকি কলকাতার আশুতোষ সংগ্রহশালায় রক্ষিত আছে।

দক্ষিণমুখী বর্তমান চণ্ডীমণ্ডপটির আচ্ছাদিত এলাকার মাপ পুব-পশ্চিমে ৩৬ ফুট ৬ ইঞ্চি ও উত্তর-দক্ষিণে ১৪ ফুট ৪ ইঞ্চি। মেঝে থেকে চালাশীর্ষের উচ্চতা প্রায় ২০ ফুট। সামনের দিকে চালার ভাররক্ষার জন্য সূক্ষ্ম কারুকার্যমণ্ডিত আটটি কাঠের খুঁটি আছে; অন্য তিনদিকে ইঁটের দেওয়াল গাঁথা হয়েছে চালের বক্ররেখার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে। কিন্তু শুধু সামনের খুঁটি ও পিছনের দেওয়ালের উপরই এতবড় চালার ভার রক্ষিত হতে পারে না বলে, খুঁটিগুলির শীর্ষ থেকে পিছনের দেওয়াল অবধি

আটটি কাঠের বরগা লাগানো হয়েছে, যেগুলির ওপর খাড়া কাঠের অনেকগুলি খুঁটি বসিয়ে আর এক সারি সমান্তরাল বরগার বিন্যাস করা হয়েছে, যাদের উপর আবার অনুরূপভাবে রক্ষিত আছে আর এক প্রস্থ খাড়া খুঁটি ও সমান্তরাল বরগা। চালের ভারবাহী এই গোটা কাঠামোকে জোরদার করবার জন্য প্রধান জোড়গুলির মুখে আলাদা যেসব সহায়ক কাঠের টুকরো ব্যবহৃত হয়েছে, সেগুলি অপরূপ কারুকার্যে মণ্ডিত। বরগা ও খুঁটিগুলির সর্বাঙ্গে ফুলকারি বা অন্যরূপ নকাশি কাজ। এই উচ্চস্তরের কারুকৃতি যে অসংখ্য সুদক্ষ দারুশিল্পীর দীর্ঘদিনের পরিশ্রমের ফল সেকথা বলাই বাহুল্য।

কারিগরি সুবিধার জন্য নকাশি কাজে কাঁঠাল কাঠই চিরকাল আদৃত। আঁটপুরের চণ্ডীমণ্ডপেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। সামনের থামগুলির মধ্যের অংশ গোল কিন্তু মূল ও শীর্ষদেশ চারকোণা এবং এই দুই প্রান্তেই ফুলকারি ও জ্যামিতিক নকশার যথেষ্ট প্রয়োগ দেখা যায়। সুদীর্ঘকালের রোদবৃষ্টিতে নীচের অংশের কারুকার্য বেশ ক্ষয়িত হলেও, চালার আবরণের জন্য উপরের অংশের নকশাগুলি এখনও বেশ সজীব। বরগা ও খুঁটিগুলি সাধারণত পদ্মফুলের অনুকৃতি ও লতাপল্লব বা জ্যামিতিক নকশায় মণ্ডিত—যেগুলিকে আদিতে রঙের প্রয়োগে আরও মনোহর করবার চেষ্টা হয়েছিল: এখানে-সেখানে রঙের ছোপ এখনও দেখা যায়। কিন্তু স্তম্ভশীর্ষে ও কড়ি-বরগার জোড়ের মুখে খোদাই-কাঠের পূর্ণাবয়ব যেসব দেবদেবীমূর্তি নিবদ্ধ আছে, সেগুলিই এ চণ্ডীমণ্ডপের শ্রেষ্ঠ অলংকরণ। 'টেরাকোটা' মন্দিরের বিগ্রহ যাই হোক না কেন, দেওয়ালের অলংকরণে যেমন শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব ধর্মমতের যা পৌরাণিক ও সামাজিক বিষয়বস্তুর একত্র সহাবস্থান দেখা যায়, এখানকার পূর্ণাবয়ব মূর্তিগুলির ক্ষেত্রেও সেই একই রীতি অনুসৃত হয়েছে। একদিকে যেমন কৃষ্ণ-রাধিকা-গোপিনী, শিব-পার্বতী-গণেশ, দুর্গা-কালী-জগদ্ধাত্রী বা ব্রহ্মা-ইন্দ্র-নারায়ণ প্রভৃতি রূপায়িত, অন্যদিকে তেমনি ময়ূর-কোলে সুন্দরী বা সাহেব-মেম মূর্তিরও অভাব নেই। আর এক শ্রেণীর খোদাই কাজও বিশেষভাবে লক্ষণীয়। সামনের খুঁটিগুলির ঠিক উপরে খড়ের চালের বাঁকানো কার্ণিস-অনুসারী এক কাঠের পটির গায়ে, পাশাপাশি প্যানেলে, 'বা-রিলিফ' পদ্ধতিতে যেসব দেবদেবীমূর্তি ও শিকারদৃশ্য উৎকীর্ণ আছে, অনুরূপ 'টেরাকোটা' অলংকরণের সঙ্গে তাদের সাদৃশ্য খুবই নিকট। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী সেকালের 'সূত্রধর' পদবীর শিল্পীরা যে একাধারে কাঠ-খোদাই ও 'টেরাকোটা' অলংকরণের কাজ করতেন, এই প্যানেলগুলি তার স্বপক্ষে প্রায় অকাট্য প্রমাণ।

চণ্ডীমণ্ডপের দৃষ্টিকটু খড়ের চাল নীচ থেকে যাতে না দেখা যায়, সেজন্য ছাদের ভিতরের দিক ময়ূর-পালকের সাদা ডাঁটি অথবা রঙে ছোপানো শরকাঠি বা বেতের চিল্‌তে দিয়ে একেবারে ঢেকে দেওয়াই সাবেক রীতি ছিল। রঙিন কাঠির টানাপোড়েনে নানা রকম জ্যামিতিক বা ফুলকারি নকশার সৃষ্টি করা হত, যার নাম ছিল 'রূপসী কাজ'। এজাতীয় চারুশিল্পের কোন অক্ষত নিদর্শন পশ্চিমবঙ্গে আর কোথাও আছে কিনা জানি না। আঁটপুর ছাড়াও হুগলী জেলার শ্রীপুর-বলাগড়ে ও নদীয়া জেলার উলা বা বীরনগরে একদা ছিল, কিন্তু এখন আর নেই। 'রূপসী কাজ' যে কতদূর নয়নাভিরাম হত, সে বিষয়ে উলায় এক কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। সেখানকার প্রাচীন চণ্ডীমণ্ডপে দুর্গাপূজার সময় দর্শনার্থী জনতা প্রতিমা না দেখে চালের দিকেই তাকিয়ে থাকত বলে দেবীর স্বপ্নাদেশে পূজার ক'দিন ছাদের নীচে চাঁদোয়া টাঙিয়ে দেওয়াই রীতি ছিল।

আঁটপুরের খ্যাতির আর এক কারণ এ গ্রাম শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সাক্ষাৎ শিষ্য স্বামী

প্রেমানন্দের (গার্হস্থ্যাশ্রমে বাবুরাম ঘোষ) জন্মস্থান। রাধাগোবিন্দজীউ মন্দিরের সামান্য উত্তর-পূবে, রামকৃষ্ণ মিশন এখন যেখানে এক দেউলরীতির আধুনিক মন্দির নির্মাণ করিয়ে দিয়েছেন সেখানে, তাঁর মাতুলালয়ে, তিনি ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই ডিসেম্বর ভূমিষ্ঠ হন। নবনির্মিত এ মন্দিরটিতে পরমহংসদেব, শ্রীমা, স্বামী বিবেকানন্দ ও স্বামী প্রেমানন্দের প্রতিকৃতি উপাসিত হয়। রামকৃষ্ণ মিশন এখানে একটি দাতব্য হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসালয় ও একটি গ্রন্থাগারও পরিচালনা করেন।

এখান থেকে সিকি মাইল পূবে বাবুরাম ঘোষের পৈত্রিক ভদ্রাসন। পিচ রাস্তার ধারে (উত্তরে) ঘাট-বাঁধানো পুকুর ও এক আটচালা শিবমন্দির ডাইনে রেখে সে বাড়িতে গিয়ে ঢুকতে হয়। সেকালের সম্পন্ন গৃহস্থের দালানকোঠা থেকে বিশেষ পার্থক্য চোখে পড়ে না, কিন্তু এ বাড়ির উঠোনেই যে আজকের বিশ্ববিশ্রুত রামকৃষ্ণ মিশনের জন্ম হয়েছিল, সেকথা সুবিদিত নয়। শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রেমানন্দ আশ্রম কর্তৃক প্রকাশিত 'পুণ্যতীর্থ আঁটপুর' নামক পুস্তিকাটি থেকে কিছু অংশ উদ্ধৃত করে বিষয়টি পরিস্ফুট করবার চেষ্টা করছি। "...কলিকাতায় কাশীপুর উদ্যানবাটীতে অসুস্থ ঠাকুরের সেবায় উৎসর্গীকৃতপ্রাণ দ্বাদশটি যুবককে শ্রীশ্রীঠাকুর নিজভাবে অনুপ্রাণিত করিয়া সঙ্ঘবদ্ধ করিয়াছিলেন এবং নরেন্দ্রনাথের উপর সেই সঙ্ঘ পরিচালনার ভার ন্যস্ত হইয়াছিল। কিন্তু সন ১২৯৩ সালের ৩১শে শ্রাবণ (ইংরাজী ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই আগস্ট) শ্রীশ্রীঠাকুরের মহাসমাধির পর আগস্ট মাসের শেষে কাশীপুর উদ্যানবাটী ছাড়িয়া দেওয়া হয়; অধিকাংশই বাড়ি ফিরিয়াছেন। বিচ্ছিন্ন সেই সঙ্ঘের পুনর্গঠনের চিন্তায় নরেন্দ্রনাথ তখন ব্যাকুল ও দিশাহারা। এমন সময় ঐ বৎসরেই ডিসেম্বর মাসের শেষার্ধে মাতঙ্গিনী দেবী (স্বামী প্রেমানন্দের মাতা) নরেন প্রভৃতিকে আঁটপুরে আসিবার সাদর আমন্ত্রণ জানাইলেন। নরেন্দ্রনাথ প্রভৃতি নয়জন...পরদিবসই আঁটপুরে আসিয়া পেঁৗছিলেন।...এই সময়ে এক সন্ধ্যারাত্রে প্রজ্বলিত ধুনির চতুর্দিকে ঘিরিয়া বসিয়া নরেন্দ্রনাথ দিব্যভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া যীশুর ত্যাগ, বৈরাগ্য, পবিত্রতা ও প্রেমের কথা বলিতে বলিতে সন্ন্যাসীর জীবনের তপশ্চর্য্যা, আত্মনিবেদন, কষ্টসহিষ্ণুতা ইত্যাদির আদর্শ ও আশঙ্কা সকলের মনে এরূপ দৃঢ়বদ্ধ করিয়া দিলেন যে তাঁহাদের সকলের বৈরাগ্য-অনল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল এবং ইহাকে শ্রীশ্রীঠাকুরের নির্দেশ জ্ঞান করিয়া নিজেরা ঐ জীবন যাপন করিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের কার্যে আত্মনিয়োগ করিবেন—এইরূপ চরম সঙ্কল্প গ্রহণ করিলেন। পরে জানা গেল, ঐদিন ছিল যীশুর আবির্ভাবের রাত্রি, ২৪শে ডিসেম্বর। নরেন্দ্রনাথের সহিত দ্বিতীয় বারে ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দের প্রথমেই নিম্নলিখিত দুই গুরুভ্রাতা আঁটপুরে আসিয়াছিলেনঃ—শ্রীরাখালচন্দ্র ঘোষ (স্বামী ব্রহ্মানন্দ) ও শ্রীগোপালচন্দ্র ঘোষ (স্বামী অদ্বৈতানন্দ)। মোট এই এগারো জনই ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দের প্রথমভাগে বরাহনগর মঠে বিরজা হোম অনুষ্ঠানপূর্বক আনুষ্ঠানিকভাবে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের সন্ন্যাসিসঙ্ঘ দৃঢ়বদ্ধ করিলেন। এই সঙ্ঘই ক্রমে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন নামে পরিচিত হইয়া জনসেবার বিপুল কার্যভার লইয়াছেন।"

অসংখ্য শাখাপ্রশাখায় বিভক্ত আজকের রামকৃষ্ণ মিশন এক বিরাট জগদ্‌ব্যাপী প্রতিষ্ঠান। কিন্তু তার জন্মস্থান যে এই নিভৃত পল্লীর ঘোষ-বাড়ির প্রাঙ্গনে, সেকথা ভাবতে আশ্চর্য লাগে। সে মহাপুণ্যভূমিকে চিহ্নিত করবার জন্য রামকৃষ্ণ মিশন পরে এখানে যে স্মৃতিস্তম্ভটি নির্মান করিয়ে দিয়েছেন তার কাছে দু'দণ্ড বসলে মনের পর্দায় সেই ন'জন অমিতবীর্য, সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীর ছবি ভেসে ওঠে, যাঁদের অগ্নি-সাক্ষী-করা শপথ থেকে এক মহান সেবা-প্রতিষ্ঠানের সূত্রপাত হয়। শ্রীমা ও স্বামী

বিবেকানন্দও বিভিন্ন সময়ে ঘোষ-পরিবারের এ ভদ্রাসনে এসে থেকে গেছেন। যে কক্ষগুলিতে তাঁরা ছিলেন তার দেওয়ালে মর্মরফলকে সেকথা লেখা আছে। পরমহংস-দেবের ব্যবহৃত একজোড়া চটি, মোজা ও দাঁতনকাঠি এখনও সযত্নে রক্ষিত আছে এ পরিবারে। সাধারণ পর্যটকের কাছেও এসবের মূল্য কম নয়। আর যাঁরা রামকৃষ্ণ-জীবনাদর্শের প্রতি শ্রদ্ধাশীল তাঁদের কাছে আঁটপুরের ঘোষ-বাড়ি তো এক পরম পবিত্র তীর্থস্থান।



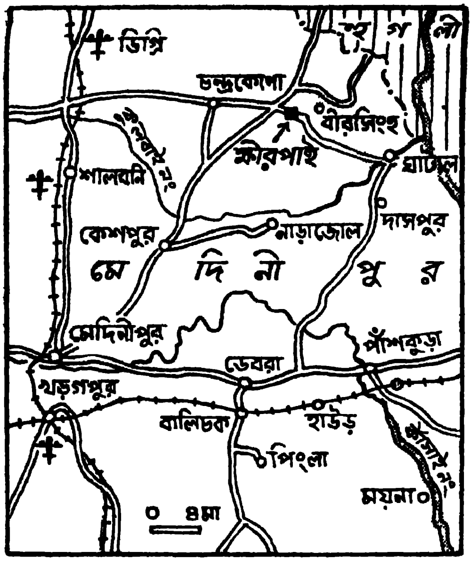
ক্ষীরপাই

দোচালা কুঁড়েঘর ও সে আদলে নির্মিত দোচালা মন্দিরের পাশাপাশি নিদর্শনের কথা 'আঁটপুর' নিবন্ধে উল্লেখ করেছি। আটচালা কুটির ও আটচালা মন্দিরের আশ্চর্য সহাবস্থান দেখা যায় মেদিনীপুর জেলার ক্ষীরপাই-এ। বাংলা-মন্দিরের স্থাপত্যরীতির ক্রমবিকাশ প্রসঙ্গে এসব প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত খুবই মূল্যবান। সে বিষয়ে পরে আসছি। আগে ক্ষীরপাই-এর ইতিবৃত্তের কথা বলি। ক্ষীরপাই নানাদিক দিয়ে বেশ উল্লেখযোগ্য গ্রাম। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলে তো বটেই, পূর্ববর্তী মুসলমান আমলেও সুতী ও রেশমবস্ত্রের কেন্দ্র হিসাবে ক্ষীরপাই-এর খ্যাতি ছিল দূরবিস্তৃত। ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটিশের দেওয়ানী লাভের আগেই ১৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দে ফরাসীরা এখানে এক বাণিজ্যিক কুঠি স্থাপন করে। ১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দে সে কুঠি উঠে গেলেও একাদিক্রমে দশ-এগারো বছর ফরাসীরা এখানে ফলাও কারবার করে গিয়েছে। ইংরেজদের কুঠিও কম যায়নি। এই দুই কুঠি থেকে আবার ওলন্দাজরা দালাল মারফত পণ্য খরিদ করত। আঠারো শতকেব শেষ ও ঊনিশ শতকের প্রথম দিকে ক্ষীরপাই-এর স্বর্ণযুগ গিয়েছে বলা যায়। আট মাইল পশ্চিমের চন্দ্রকোণা ব্যবসায়কেন্দ্র হিসাবে অনেক বড় হলেও তার সমৃদ্ধি যে অনেকাংশে ক্ষীরপাই-এর উপর নির্ভরশীল ছিল, সেকথা মেদিনীপুর জেলা গেজেটিয়ারে (১৯১১) বেশ স্পষ্টভাবেই উল্লেখিত হয়েছে। "বাহান্ন বাজার তিপ্পান্ন গলি/তবে বুঝবি চন্দ্রকোণায় এলি"—এই প্রবচনটি থেকেই সে জনপদের সমৃদ্ধির আভাস পাওয়া যায়। সে সমৃদ্ধি কাছাকাছি আর যেসব উৎপাদনকেন্দ্রের সহযোগিতায় পুষ্টিলাভ করেছিল, তার মধ্যে ক্ষীরপাই একটি। চন্দ্রকোণার সুতী ও রেশমী বস্ত্র, ঘি, বাসনকোসন, চিনি প্রভৃতি নানান জিনিসের ব্যবসায়ে শুধু প্রথমটির ক্ষেত্রে 'স্যাটা-লাইট টাউন'-এর স্থান অধিকার করে ক্ষীরপাই রীতিমতো ধনী শহরে পরিণত হয়েছিল। ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে মিউনিসিপ্যালিটি বলে ঘোষিত হবার সময়ে ক্ষীরপাই-এর জনসংখ্যা ছিল মাত্র আট হাজার বা তার কিছু বেশী। এত অল্প লোকবসতি নিয়ে পৌর প্রতিষ্ঠানের পত্তন কদাচিৎ হয়ে থাকে। কিন্তু ক্ষীরপাই-এর ক্ষেত্রে যে তা হয়েছিল, তার প্রধান কারণ এখানকার অধিকাংশ বাসিন্দাই তাঁতশিল্পের প্রসাদে যথেষ্ট বিত্ত ও প্রতিপত্তিশালী ছিলেন।

সে ধনাঢ্যতার কাহিনী এখনও লোকের মুখে মুখে ফেরে। চন্দ্রকোণা-ক্ষীরপাই-এ তখন লক্ষপতির ছড়াছড়ি। তাঁদের একজন—চন্দ্রকোণার ধনকুবের গুরুদাস করদত্ত—তাঁর ছেলের বিয়ে দিলেন ক্ষীরপাই-এর আর এক শিল্পপতির মেয়ের সঙ্গে। সময়টা বর্ষাকাল। বরের শোভাযাত্রায় যাতে কোন ব্যাঘাত না ঘটে, সেজন্য চন্দ্রকোণা থেকে ক্ষীরপাই

অবধি আট মাইল পথ শুধু চালা দিয়ে ঢেকে দেওয়াই হল না, মাঝে মাঝে ঝাড়লণ্ঠনও টাঙিয়ে দেওয়া হল। হাতিঘোড়া, পাইক-বরকন্দাজ, বাজনাবাদ্যি, আলোকসজ্জায় উজ্জ্বল সে শোভাযাত্রার জাঁকজমক এখন কষ্টেসৃষ্টে কল্পনা করা যায় মাত্র। আজ চন্দ্রকোণা, ক্ষীরপাই-এর তন্তুবায়পল্লীর ভগ্ন, পরিত্যক্ত, লতাগুল্ম-আকীর্ণ অট্টালিকাগুলির নীরব হাহাকারের ওপার থেকে সেসব মহাসমারোহের কাহিনী স্বপ্নের মতো ভেসে আসে।

অতীত সমৃদ্ধির স্মারক আর প্রায় সবই গেছে এ দুটি জনপদের; আছে শুধু অনেকগুলি উৎকৃষ্ট মন্দির—কালস্রোতে বিলীন এক মুখর মিছিল থেকে পিছিয়ে-পড়া যেন একদল ক্লান্ত, অবসন্ন পদাতিক। চন্দ্রকোণায় তারা এতই অগণিত যে পশ্চিমবাংলায় এক বিষ্ণুপুর ছাড়া আর কোথাও সমসংখ্যক পুরাকীর্তি আছে কিনা সন্দেহ। অন্যদিকে ক্ষীরপাই-এ আছে তিনটি 'টেরাকোটা' মন্দির, যার মধ্যে একটি এহেন অলংকরণ-চর্চার শেষ পর্বের এক উৎকৃষ্ট নিদর্শন বলে আমার ধারণা। গ্রামের পুব প্রান্তে, মালপাড়ায়, চন্দ্রকোণা-ঘাটাল সড়কের পাশে, পুবমুখী পঞ্চরত্ন এ দেবালয়টি সাধারণের কাছে রাধাদামোদর মন্দির নামে পরিচিত। দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ১৫ ফুট ৪ ইঞ্চি ও উচ্চতায় প্রায় ২৫ ফুট এ ইমারতের সামনের ঢাকা বারান্দাটির ছাদ 'ভল্ট'-এর ও গর্ভগৃহের ছাদ কোণে লহরাযুক্ত গম্বুজের উপর স্থাপিত। ঠাকুরঘরে প্রবেশের জন্য উত্তরদিকের দেওয়ালে যে অতিরিক্ত দরজাটি আছে, তার দু'পাশে প্রায় আড়াই ফুট উচ্চতার দুই 'টেরাকোটা' বেহালাবাদিকার মূর্তি। পোড়ামাটির এহেন বৃহদাকার দ্বাররক্ষী মূর্তি একদা মেদিনীপুর জেলার উত্তর-পূর্ব ও সংলগ্ন হুগলী জেলার দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে যথেষ্ট ব্যবহৃত হয়েছে দেখা যায়। নিরেট গড়নের এ মূর্তিগুলির হাঁটু, কোমর ও গলার কাছে জোড় থাকত ও পৃথক অংশগুলি ভাটিতে পোড়াবার সময় আলাদা করেই পোড়ানো হত। হুগলী জেলার গোঘাট থানার বালী-দেওয়ানগঞ্জ ও মেদিনীপুর জেলার পাঁশকুড়া থানার শ্যামসুন্দর-পাটনা, মাংলোই প্রভৃতি গ্রামে এজাতীয় নিদর্শন প্রচুর দেখা যায়। পোড়ামাটির সজ্জা মন্দিরটির কেবল সামনের দিকেই নিবদ্ধ, কিন্তু তাও প্রথানুযায়ী সর্বত্র নয়। ভিত্তির সমান্তরাল এক বা একাধিক সারিতে সামাজিক চিত্র বা শিকার-দৃশ্য ইত্যাদি এখানে অনুপস্থিত। থামের গায়েও বিশেষ কোন অলংকরণ নেই। অথচ বহুল-অলংকৃত অধিকাংশ মন্দিরের এসব অংশে 'টেরাকোটা' টালির প্রচুর সমাবেশই সাধারণ রীতি। কিন্তু সজ্জা-প্রকরণের এই আপেক্ষিক অভাব বহু গুণে পূরণ করে দিয়েছে তিনটি ফুলকাটা খিলানশীর্ষের বিশদ প্যানেলগুলি ও তাদের উপরের ও দু'পাশের দেওয়ালে নিবদ্ধ দশাবতার, কৃষ্ণলীলা, রামায়ণ-মহাভারতের উপাখ্যান, পৌরাণিক কাহিনী, সামাজিক দৃশ্য ও ফুলকারি নকশার অজস্র সমারোহ। মন্দিরটির প্রতিষ্ঠাকাল ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দ, অর্থাৎ আজ থেকে মাত্র ১৫৫ বছর আগে। অলংকরণগুলি সেজন্য এখনও যথেষ্ট সজীব আছে, ক্ষয়ে যেতে আরম্ভ করেনি। খুব সাধারণভাবে একথা হয়ত বলা যায় যে খ্রীষ্টীয় উনিশ শতক থেকেই পশ্চিমবঙ্গের কোন কোন অঞ্চলে মন্দির-'টেরাকোটা' শিল্পের অবনতির সূত্রপাত হয়। কিন্তু সে অবনতি যে যুগপৎ সর্বব্যাপী হয়নি, তার প্রমাণ ক্ষীরপাই-এর এ মন্দিরটি ও মেদিনীপুর জেলার রামচন্দ্রপুরের পরিত্যক্ত মন্দির, মাংলোই গ্রামের আটকোণা রসমঞ্চ এবং লাওদা গ্রামের বাঁকারায় মন্দির; হাওড়া জেলার কল্যাণপুরের পাল-পরিবারের মন্দির; হুগলী জেলার আরামবাগের অদূরে পারুল গ্রামের বিশালাক্ষী মন্দির, বালী-দেওয়ানগঞ্জের দামোদর মন্দির ও ডিহি-বয়রার স্বরূপনারায়ণ মন্দির; বর্ধমান জেলার কালনার প্রতাপেশ্বর শিবমন্দির; বাঁকুড়া জেলার সোনামুখীর শ্রীধর



মন্দির এবং বীরভূম জেলার হেতমপুরের মন্দির ও ইলামবাজারের লক্ষ্মীজনার্দন মন্দির ইত্যাদি। তালিকা অনাবশ্যকভাবে আর না বাড়িয়ে একথা বলা যায় যে, মন্দির-'টেরাকোটা' শিল্পের অবনতির যুগেও এগুলি (ও আরও অনেক মন্দির) উৎকৃষ্ট কারিগরি দক্ষতার সাক্ষ্য বহন করে। সেজন্য কুশলী 'টেরাকোটা'-শিল্পীদের 'গিল্ড'-গুলি যে উনিশ শতকের প্রায় শেষ অবধি এখানে-সেখানে সক্রিয় ছিল তাতে সন্দেহ নেই। একথা হয়ত সত্য যে 'টেরাকোটা' অলংকরণের এই শেষ যুগে, আদি বা মধ্য পর্যায়ে অনুসৃত ঋজু ও সুকুমার প্রকাশভঙ্গির পরিবর্তে নিরেস কারিগরির বাস্তব-ঘেঁষা ভাস্কর্যই স্ফূর্তিলাভ করেছে বেশী। কিন্তু সে সাধারণ প্রবণতাকে অতিক্রম করে কিছু কিছু অসাধারণ 'টেরাকোটা' মন্দিরও নির্মিত হয়েছে সেকালে। ক্ষীরপাই-এর দেবালয়টি সেই অসাধারণত্বেরই নিদর্শন।

এ মন্দিরের কেন্দ্রীয় খিলানের কিছু উপরে পোড়ামাটির ফলকে যে প্রতিষ্ঠালিপিটি নিবন্ধ আছে তার পাঠ হুবহু নিম্নরূপ :

শ্রীশ্রী রাধা	শ্রীশ্রী জীউ
দামোদর :	সিতলা মাতা
তব চরণ	তব চরণ ভ
ভরসা	রসা গো

শকাব্দা ১৭৩৯ সন ১২২৪
সাল তারিখ ১৮ বৈসাখ
শ্রীমদনমোহন দত্ত।

লিপির তিনটি অংশ পৃথকভাবে সাজানোর পদ্ধতিটি লক্ষণীয়। মেদিনীপুর জেলার আরও কিছু মন্দিরে লিপিবিন্যাসের এই বিশেষ রীতিটি দেখা যায়। কিন্তু শ্রদ্ধেয় শ্রীবিনয় ঘোষ মহাশয় তাঁর বহুলপঠিত 'পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি' গ্রন্থে (পৃঃ ৩৯১) লিপিটির নিম্নলিখিত একটানা পাঠোদ্ধার করেছেন :

"শ্রীশ্রী রাধা শ্রীশ্রী কৃষ্ণদামোদর
শীতলা মাতা চরণ তব চরণ ভরসা গো
শকাব্দা ১৭৩৯, সন ১২২৪ সাল
তারিখ ১০ বৈশাখ শ্রীমদনমোহন দত্ত।"

ফলে, প্রথম লাইনের "জীউ'-র পরিবর্তে 'কৃষ্ণ' কথাটি প্রক্ষিপ্ত ও দ্বিতীয় লাইনের গঠন বিশৃঙ্খল হয়ে পড়েছে। তাছাড়া, পাঠোদ্ধারের সময় বানান, পংক্তিসংস্থান প্রভৃতির পরিবর্তন না করাই বোধ হয় বাঞ্ছনীয়। কেননা, তাহলে সমকালীন বানান ও পংক্তি সাজানোর রীতির ভুল ধারণা হবার সম্ভাবনা। সে যাই হোক, দত্ত পদবীধারী এ দেবালয়ের প্রতিষ্ঠাতা যে স্থানীয় বণিককুলের বিত্তশালী কেউ ছিলেন এমনই মনে হয়। আমার অনুসন্ধান অনুসারে সে পরিবার লুপ্ত হবার পর, এই উৎকৃষ্ট মন্দিরটি যখন অবহেলায় জীর্ণ হচ্ছিল, তখন স্থানীয় হেল্‌থ সেণ্টারের জনৈকা নার্স এটির সংস্কার করিয়ে, বিগ্রহের নিত্যপূজার জন্য এক পুরোহিত নিযুক্ত করে, অন্যত্র বদলি হয়ে যান। এই মহানুভব মহিলার আমি সন্ধান পাইনি। পেলে, নিজে গিয়ে সাধুবাদ করে আসতাম। আর দশজনে তাঁর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করলে পশ্চিমবাংলার অন্তত কিছু মন্দির হয়ত রক্ষা পেত।

এ মন্দিরের প্রতিষ্ঠালিপির সঠিক পাঠোদ্ধার ও খুব কাছ থেকে অলংকরণগুলির ছবি তোলবার জন্য সদয় পড়শীরা যেসব টেবিল, চেয়ার, মই প্রভৃতি যোগাড় করে এনেছিলেন, তা তাঁদের বুঝিয়ে দিয়ে চন্দ্রকোণা-ঘাটাল সড়ক বরাবর উত্তরদিকে পা বাড়াতেই এক অভিনব দৃশ্য চোখে পড়ল। অদূরেই আটচালা খড়েশ্বর শিবমন্দির আর তার গা ঘেঁষে খড়ে-ছাওয়া এক আটচালা কুটির। আমাদের চিরকালের দোচালা, চারচালা ও আটচালা কুটিরের আদলেই যে বাঙালীর নিজস্ব চালা-মন্দিরগুলি নির্মিত হয়েছে, সেকথা বোঝাবার জন্য ইতিপূর্বে (যেমন, আমার 'বাঁকুড়ার মন্দির' গ্রন্থে) এক জেলার চালাঘরের ছবির সঙ্গে দূরবর্তী আর এক জেলার চালা-মন্দিরের ছবি ব্যবহার করতে বাধ্য হয়েছি, যেহেতু একই আদলের কুটির ও মন্দিরের সহাবস্থান খুবই বিরল। কিন্তু এখানে, ক্ষীরপাই-এর এই পথের ধারে, আটচালা রীতির এক কুঁড়েঘর ও সেই রীতিরই এক দেবালয় একেবারে পাশাপাশি দেখে অবাক হয়ে গেলাম। বাংলা-মন্দিরের স্থাপত্যের ক্রমবিকাশ প্রসঙ্গে এহেন বিরল দৃষ্টান্ত খুবই মূল্যবান।

খড়েশ্বর শিবমন্দিরটির স্থাপত্য-ভাস্কর্যও আকর্ষণীয়। দৈর্ঘ্য প্রস্থ ২৩ ফুট ২ ইঞ্চি ও ২১ ফুট ৪ ইঞ্চি ও উচ্চতায় প্রায় ৩৫ ফুট, এ দেবালয়ের প্রতিষ্ঠালিপিটি নিম্নরূপঃ—

"শ্রীশ্রী খড়কে
সর শিবঠাকুর
শকাব্দা ১৭৮৩।৫।২১
সন ১২৬৮ সাল
শ্রীগঙ্গাধর দত্ত।"

শ্রীযুত বিনয় ঘোষ মহাশয় তাঁর 'পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি' পুস্তকে (পৃঃ ৩৯১) লিপিটির পাঠোদ্ধার এইভাবে করেছেন ঃ—

"শ্রীখড়কেশ্বর শিবঠাকুর
শকাব্দা ১৭৮৩।৫।২১
সন ১২৬৮ সাল শ্রীগঙ্গাধর দত্ত।"

বিনয়বাবুর বর্ণিত লিপিতে সাল-তারিখের কোন ভুল না থাকলেও পাঁচ লাইনের লিপিটিকে তিন লাইনে পরিবর্তন ও প্রাচীন বানানের নবীকরণের বিরুদ্ধে ইতিপূর্বেই

যে যুক্তি দেখিয়েছি তা এখানে প্রযোজ্য।

১৭৮৩ শকাব্দের পঞ্চম মাসের ২১ তারিখে উৎসর্গীকৃত এ দেবালয়ের ইংরেজী মতে প্রতিষ্ঠাকাল ১৮৬১ খৃষ্টাব্দের মাঝামাঝি নাগাদ হবার কথা। এটি সেজন্য প্রায় ১১১ বছরের মতো প্রাচীন প্রথম মন্দিরটি থেকে ৪৪।৪৫ বছর পরে নির্মিত। এই নূতনত্বের ফলস্বরূপ এ মন্দিরের 'টেরাকোটা' অলংকরণ পরিমাণে অনেক কম, কারিগরি নৈপুণ্যেও নিরেস। তাছাড়া পোড়ামাটি ও পঙ্কের অলংকরণের যুগপৎ ব্যবহারও বিশেষভাবে লক্ষণীয়। মন্দির-'টেরাকোটা' শিল্পের অবনতির কালে যে এই দ্বিতীয় শ্রেণীর সজ্জার যথেষ্ট প্রচলন হয়েছিল, সেকথা সকলেই জানেন। কিন্তু সাধারণ-ভাবে বলতে গেলে, মেদিনীপুর জেলা ছাড়া অন্যত্র এই দুরকম অলংকরণপদ্ধতি কম ক্ষেত্রেই একই দেবালয়ে নিবদ্ধ হয়েছে। 'টেরাকোটা'-সজ্জার বিষয়বস্তু প্রথাগত— কৃষ্ণলীলা, দশাবতার, পৌরাণিক কাহিনী, সামাজিক দৃশ্য প্রভৃতি। খিলানশীর্ষের অলংকরণগুলিকে ঘিরে ছোট ছোট খোপের মধ্যে বসানো হুবহু একই গড়ন ও মাপের যে ৬৪টি 'টেরাকোটা' গোপিনীমূর্তি নিবদ্ধ আছে তাও অভিনিবেশযোগ্য। কেননা, পোড়ামাটির টালিগুলি সাধারণত খোদাই করে তৈরি করা হলেও একই রকমের বহু টালির যখন প্রয়োজন হয়েছে, তখন যে সেগুলিকে ছাঁচে ফেলে তৈরি করা হত, এই নিদর্শন থেকে তা প্রমাণ হয়।

গ্রামের হাটতলার উত্তরে, দক্ষিণমুখী আটচালা শিবমন্দিরটি অন্য দু'টি দেবালয়ের তুলনায় হীন। প্রতিষ্ঠালিপি থেকে দেখা যায়, শ্রীশীতলানন্দ জীউর স্মরণে জনৈক অদ্বৈতচরণ পানি ১২৪৬ বঙ্গাব্দে (১৮৩৯-৪০ খৃষ্টাব্দে) এটি নির্মাণ করেন। পঙ্কের অলংকরণ নেই, 'টেরাকোটা'-সজ্জাও অপেক্ষাকৃত কম। প্রথম মন্দিরটি থেকে ২২ বছর পবে নির্মিত হলেও পোড়ামাটির কারুকার্য ইতিমধ্যেই যথেষ্ট ক্ষয়িত হয়েছে। অন্যদিকে দ্বিতীয় দেবালয়টি থেকে ২২ বছর আগে প্রতিষ্ঠিত হলেও এ মন্দিরের 'টেরাকোটা'-ভাস্কর্য তুলনায় অনেক অমার্জিত। এ থেকে হয়ত আর এক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। আজকের দিনের যাত্রার দলের মতো, সেকালের 'টেরাকোটা'-'গিল্ড'গুলিরও নৈপুণ্যের তারতম্য ছিল এবং বিভিন্ন দক্ষতার তিনটি পৃথক দল সম্ভবত ক্ষীরপাই-এর এ মন্দির তিনটি নির্মাণ করে থাকবেন।

আর একটি পাথরের প্রাচীন মন্দির ছিল এ গ্রামে। কিন্তু খেয়ালখুশি মতো আমূল সংস্কারের ফলে তার বর্তমান চেহারা এতই ঐতিহ্যবর্জিত যে এ আলোচনা থেকে সেটিকে বাদ দিলে কিছুমাত্র ক্ষতি হবে না।

মন্দির-'টেরাকোটা'য় সাহেব

ইতালীয় শব্দ 'টেরাকোটা', পোড়ামাটির সৌধসজ্জা অর্থে, বাঙালী পাঠকদের কাছে এখন বেশ সড়গড় হয়ে উঠেছে। 'টেরাকোটা' অলংকরণ বলতে যে প্রধানত ধর্মীয় ইমারতের গায়ে উৎকীর্ণ পোড়ামাটির সজ্জাকে বোঝায় সেকথা এখন আর সবিস্তারে বলবার প্রয়োজন হয় না। তবে পোড়ামাটির অন্য ব্যবহারের কথাও এ প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার। আবহমানকাল মাটি পুড়িয়ে যেসব হাঁড়ি, কলসী বা অজস্র প্রকারের মূর্তি ও খেলনা-পুতুল তৈরি হয়েছে তারাও 'টেরাকোটা' বস্তু এবং সে জাতীয় প্রাচীন সংগ্রহ যেকোন মিউজিয়মে গেলেই দেখতে পাওয়া যায়। বর্তমান প্রবন্ধে এ শ্রেণীর 'টেরাকোটা' বস্তুর আলোচনার অবকাশ নেই। আজকের আলোচনা সেজন্য সাধারণভাবে মন্দির-'টেরাকোটা' ও বিশদভাবে তার একটি বিশেষ বিভাগের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে।

প্রধানত পাথরের অভাবের জন্যই যে উভয় বাংলার প্রায় যাবতীয় মন্দির-মসজিদ ইঁটে তৈরি হয়েছে এবং এই একই কারণে তাদের অলংকরণের জন্য যে পাথরের বদলে 'টেরাকোটা'র ব্যবহার করতে হয়েছে তা ঐতিহাসিকভাবে সত্য। এ অঞ্চলে মুসলমান-পূর্ব যুগেও যে পোড়ামাটির ইমারত-সজ্জার যথেষ্ট প্রচলন ছিল, তার নিদর্শন পাওয়া যায় পাহাড়পুর, ময়নামতী, লালমাই, বাণগড়, চন্দ্রকেতুগড়, ভরতপুর, পুণ্ড্রবর্ধন, কোটিবর্ষ, কর্ণসুবর্ণ প্রভৃতি প্রাচীন নগরের ধ্বংসাবশেষ থেকে। শ্রদ্ধেয় রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় তাঁর 'বাংলাদেশের ইতিহাস (প্রাচীন যুগ)' পুস্তকে বলেছেন, (পৃঃ ২২৮)—"বাংলায় প্রস্তর তেমন সুলভ না হওয়ায় মৃৎশিল্প খুব বেশী জনপ্রিয় ছিল এবং লোক-শিল্প হিসাবে পালযুগে এবং সম্ভবত তাহার পূর্বেও বিশেষ উন্নতি-লাভ করিয়াছিল। মধ্য যুগেও বাংলার এই জাতীয় শিল্প প্রতিভার কিছু কিছু নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায়।" আমার বিবেচনায় মধ্যযুগের 'টেরাকোটা'-অলংকৃত মন্দির-মসজিদের দৃষ্টান্ত "কিছু কিছু" নয়, ভূরি ভূরি। মোসলেম আবির্ভাবের অব্যবহিত পরের কিছুকাল সহজবোধ্য কারণেই হিন্দুর মন্দির নির্মাণে ভাটা পড়েছিল। সে সময়ের খুব কম দেবালয় পরবর্তীকালের জন্য রক্ষিত হয়েছে বলে কোন কোন গবেষক মত প্রকাশ করেছেন যে, 'টেরাকোটা' সৌধের দ্বিতীয় পর্যায় শুরু হয় পোড়ামাটির সজ্জায় মণ্ডিত মসজিদ বা অন্যান্য মুসলমানী ইমারত থেকে এবং সে নিদর্শনগুলির আদর্শ সামনে রেখেই হিন্দু মন্দির-ভাস্কররা নতুন করে এ অলংকরণ পদ্ধতিটি সম্বন্ধে শিক্ষালাভ করেন। এ মতবাদ সঠিক নয় বলেই আমার ধারণা। মন্দির-'টেরাকোটা' শিল্পের ধারাটি বাধাবিপত্তি সত্ত্বেও মোটামুটি অবিচ্ছিন্নভাবেই প্রবাহিত হয়ে এসেছে। মুসলমান আমলের প্রথম দিকে নির্মিত হিন্দু মন্দিরের সংখ্যাল্পতা থেকে একথা

চূড়ান্তভাবে প্রমাণিত হয় না যে সুদীর্ঘকালের এই শিল্পটি সে সময়ে একেবারে উৎখাত হয়ে গিয়েছিল। বরঞ্চ এমন হওয়াই অনেক বেশী সম্ভব যে হিন্দু আমলের শেষ দিকে ও মোসলেম আমলের প্রথমে নির্মিত বহু হিন্দু-মন্দিরে চিরাচরিত পদ্ধতিতে পোড়ামাটির সজ্জা উৎকীর্ণ করার রীতি ছিল। কিন্তু প্রাকৃতিক ও ধর্মীয় কারণে তার প্রায় সবই বিনষ্ট হয়েছে বলে একথা বলা যায় না যে, সে রীতিতে সহসা ছেদ পড়েছিল এবং মোসলেম নজির দেখে হিন্দু ভাস্কররা আবার নতুন করে এ শিল্পটি আয়ত্ত করেন।

যুগে যুগে কী জাতীয় অলংকরণ ব্যবহৃত হয়েছে এসব 'টেরাকোটা' মন্দির আর মসজিদে? প্রথমে মসজিদের কথাই বলি। শাস্ত্রীয় নিষেধের জন্য মানুষ, পশু, পাখি বা অন্য কোন রকম মূর্তি মুসলমানী ইমারতে উৎকীর্ণ করা যায়নি। জ্যামিতিক ও ফুলকারি নকশারই সেখানে একাধিপত্য। কিন্তু হিন্দুর স্বর্গে তেত্রিশ কোটি দেব-দেবীর বাস। তার রামায়ণ, মহাভারত ও অগণিত পুরাণ-উপপুরাণ-কিংবদন্তীর জগতে অজস্র চিত্রকল্পের ছড়াছড়ি। তার ক্ষেত্রে দেবদেবী, নরনারী বা পশুপাখির মূর্তি অথবা ফুলকারি বা জ্যামিতিক মোটিফের রূপায়ণে কখনই কোন বিধিনিষেধ আরোপিত হয়নি। ফলে, উভয় বাংলার 'টেরাকোটা' মন্দিরগুলিতে কী বিচিত্র ও বিপুল পরিমাণ ভাস্কর্য যে উৎকীর্ণ হয়েছে, তা ভাবলে আশ্চর্য হতে হয়। সে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রায় ধর্মের পতাকাবাহীরা শুধু পুরোভাগেই নয়, অধিকাংশ স্থান অধিকার করে থাকলেও ধর্মনিরপেক্ষ বিষয়কে মন্দিরের দেওয়াল থেকে একেবারে নির্বাসিত করা হয়নি। প্রবেশ-পথের দু'পাশের ও উপরের দেওয়ালে, থামগুলির গায়ে ও খিলানশীর্ষে রামায়ণ-মহাভারত ও পুরাণের কাহিনী, কৃষ্ণলীলা, দশাবতার, নানাবিধ লৌকিক ও শাস্ত্রীয় দেব-দেবীমূর্তি, ফুলকারি নকশা প্রভৃতির যেমন স্থান হয়েছে, তেমনি ভিত্তির সমান্তরাল একটি বা ততোধিক সারিতে সাধারণত নিবদ্ধ হয়েছে নানাপ্রকার সামাজিক দৃশ্যের ভাস্কর্য। সমাজের নীচু তলার অধিবাসী, দরিদ্র ভাস্কররা সমসাময়িক কালকে কিভাবে দেখেছেন এগুলি তার অমূল্য দলিল। নারীদের প্রসাধন, বিবাহের সময় কন্যাসম্প্রদান, বেদে-বেদেনীদের কসরত বা পাশাখেলা প্রভৃতির অন্তরঙ্গ দৃশ্য তাঁদের দৃষ্টি না এড়ালেও, তাঁদের বেশী করে নজরে পড়েছে সমাজের উপরতলার চিত্রকল্প। এ দুর্বলতা সর্বদেশে সর্বকালের। রাজা-মহারাজারা কি করেন, কি খান, রথী-মহারথীরা কিভাবে জীবন-যাপন করেন, সে বিষয়ে সাধারণের কৌতূহল এখনও কিছুমাত্র কমেনি। সমাজশীর্ষের এই বুর্জোয়াদের জীবনালেখ্যই সেজন্য প্রাধান্য পেয়েছে এই ভিত্তি-অনুভূমিক ভাস্কর্যের সারিগুলিতে। আর একথা কে না জানেন যে আঠারো ও উনিশ শতকের বঙ্গদেশে বড় বড় জমিদাররা যে বিলাসে কাল কাটিয়েছেন, তার থেকে অনেক বেশী চোখ-ধাঁধানো জীবনযাপন করেছেন সে সময়ের ইউরোপীয়েরা। তাদের অত্যাচার, দম্ভ, বিজাতীয় রীতিনীতি সবই 'টেরাকোটা' ভাস্করদের কৌতূহল ও অভিনিবেশকে শাণিত করেছে। এবং সেই কারণেই তাদের অসংখ্য ভাস্কর্য উৎকীর্ণ হয়েছে 'টেরাকোটা' মন্দিরের দেওয়ালে। তাদের মধ্যে কোন্‌গুলি পর্তুগীজ আর কোন্‌গুলিই বা অন্যান্য ইউরোপীয় জাতির তা সঠিকভাবে বলা না গেলেও বেশী প্রাচীন মন্দিরে রণতরীবাহিত যেসব ইউরোপীয়দের দেখা যায়, তারা পর্তুগীজ হওয়াই সম্ভব। কেননা তারাই এ অঞ্চলে এসে পৌঁছেছিল সকলের আগে আর তাদের জলদস্যুতার নির্মম কাহিনী এখনও মুছে যায়নি লোকের মন থেকে।

দুই বাংলায় মধ্যযুগ ও শেষ-মধ্যযুগের যেসব 'টেরাকোটা' মন্দির এখনও বর্তমান তাদের মধ্যে খ্রীষ্টীয় আঠারো ও উনিশ শতকে প্রতিষ্ঠিত দেবালয়ের সংখ্যাই সমধিক। সতের শতকের মন্দির খুব বেশী নেই; ষোল শতকের আরও অনেক কম এবং পনের

শতকের একটি মাত্র মন্দিরের খবর আমি জানি—১৪৯০ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত ঘাটালের সিংহবাহিনী মন্দির। বলা বাহুল্য, শেষোক্ত দেবালয়ে কোন ইউরোপীয়ের মূর্তি নেই। ষোল শতকের কোন মন্দিরেও, যেমন গোকর্ণ মন্দিরে (১৫৮০ খ্রীঃ), সাহেব-ভাস্কর্য দেখা যায় না। সতের শতকের বিখ্যাত 'টেরাকোটা' মন্দিরগুলির মধ্যে বিষ্ণুপুরের শ্যাম রায় (১৬৪৩ খ্রীঃ) ও জোড়বাংলা (১৬৫৫ খ্রীঃ) এবং বাঁশবেড়িয়ার বাসুদেব মন্দিরে (১৬৭৯ খ্রীঃ) সাহেব-ভাস্কর্য নেই বললেই চলে। যাও বা কয়েকটি আছে তা জাহাজ-আরোহী সাহেবদের। পরবর্তী দুই শতাব্দীর মন্দিরে ইউরোপীয় জীবনের বিভিন্ন দিক উদ্‌ঘাটিত করবার যেরকম চেষ্টা হয়েছে, প্রাচীনতর মন্দিরগুলিতে তা অনুপস্থিত। পর্তুগীজদের পর ওলন্দাজ ফরাসী ও ইংরেজরা তখন এদেশে এসে পেঁাছলেও হয়ত এতদূর প্রতিপত্তিশালী বা বিখ্যাত হয়ে ওঠেনি যাতে 'টেরাকোটা' ভাস্করদের অভিনিবেশ আকৃষ্ট করতে পারে। বিষ্ণুপুরের জোড়বাংলা বা বাঁশবেড়িয়ার বাসুদেব মন্দিরের নৌযুদ্ধের দৃশ্যগুলি সেজন্য হার্মাদ রণতরীর সঙ্গে দেশীয় জলযানের সংঘর্ষের চিত্র হওয়াই সম্ভব।

আঠারো শতক, এদেশের মাটিতে আর সব ইউরোপীয় শক্তিকে পরাজিত করে ইংরেজদের জয়জয়কারের যুগ। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বণিকরা সুড়ঙ্গ পথের অন্ধকারে রাজসিংহাসন এনেই রেখেছিল সঙ্গোপনে। তারপরে "বণিকের মানদণ্ড, পোহালে শর্বরী দেখা দিল রাজদণ্ডরূপে।" বাংলাদেশে বণিক অভিযানের সেই প্রথম যুগে, কি রকম জীবনযাপন করত প্রবাসী ইংরেজরা? নানান পুস্তক-পুস্তিকা ও সাময়িকপত্রে এ বিষয়ে ইতিপূর্বেই এত তথ্য প্রকাশিত হয়েছে যে বর্তমান সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধে আমি তার ধার দিয়েও যাব না। শুধু ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর এক কুঠিয়াল সাহেব ও 'কমার্শিয়াল রেসিডেণ্ট' জন চীপ-এর উল্লেখ করব, সমকালীন সমাজে যিনি 'চীপ দি ম্যাগনিফিসেণ্ট' নামে খ্যাত ছিলেন ও উইলিয়ম উইলসন হাণ্টার তাঁর 'অ্যানাল্‌স অব রুরাল বেঙ্গল' গ্রন্থে যাঁকে অমর করে রেখে গেছেন। আঠারো শতকের শেষ দিকে ও উনিশ শতকের প্রথমে তিনি বাঁকুড়া, বীরভূম প্রভৃতি জেলার অনেকগুলি কুঠির কর্তা ছিলেন ও কোম্পানীর কর্মচারী হিসাবে যে বেতনাদি পেতেন, তার চেয়ে বহুগুণ বেশী উপার্জন করতেন ব্যক্তিগত ব্যাবসা থেকে। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সকলেই এই একই সুবিধা ভোগ করতেন। ফলে, সেই অবিশ্বাস্য রকম সস্তাগণ্ডার বাজারে এসব কর্মচারীদের হাতে এত কাঁচা টাকা এসে জমা হত যে, অমিতব্যয়িতার চূড়ান্ত করেও তা শেষ হত না। জন চীপ সম্বন্ধে হাণ্টার সাহেব লিখেছেন, বিভিন্ন কুঠিতে তিনি প্রাসাদোপম অট্টালিকায় বাস করতেন। কৃত্রিম জলাশয় ও বাগানঘেরা সে-সব বাড়ি দেখলে চোখ জুড়িয়ে যেত। তাঁর চাকরবাকর পাইক-বরকন্দাজের সীমাসংখ্যা ছিল না। স্থানীয় বিবাদ-বিসংবাদ, মামলা-মোকদ্দমার তিনিই নিষ্পত্তি করতেন। বাকিটুকু হাণ্টারের অননুকরণীয় ভাষাতেই বলি—

"The whole industrial classes were in his pay and in his person Government appeared in its most benign aspect. A long unpaid retinue followed him from one factory to another, and as the procession defiled through the hamlets, mothers held aloft their children to catch a sight of his palanquin, while the elders bowed low before the providence from whom they derived their daily bread. Happy was the infant on whom his shadow fell."

এ বর্ণনায় জন চীপের ছবিটিই শুধু উজ্জ্বল হয়ে ফোটেনি, সমকালীন জনসমাজ

তাঁকে ও তাঁর সগোত্রদের কী বিমূঢ়বিস্ময়ে দেখত তাও পরিস্ফুট হয়েছে। নবাবী আমল গত হয়ে আঠারো-উনিশ শতকে যে নতুন আমলের পত্তন হল তার শোভাবর্ধন করবার জন্য দলে দলে এগিয়ে এলেন আর এক নতুন নবাবের দল। পাঁচ শ' বছরের সাহচর্যে মুসলমান শাসকেরা তবু কিছুটা গা-সহা হয়ে এসেছিলেন। কিন্তু এই সমুদ্র-পারের বিদেশীরা তাঁদের চমকপ্রদ জীবনযাত্রায় স্থানীয় জনজীবনে এমন আলোড়ন তুললেন যে 'টেরাকোটা'-শিল্পী ইস্তক সকলের চোখ একেবারে ধাঁধিয়ে গেল। এসব ক্ষণজন্মারা সেজন্য অনায়াসেই 'টেরাকোটা' মন্দিরের দেওয়ালে নিজেদের স্থান করে নিতে পেরেছেন প্রতাপশালী দেবতাদের আশেপাশে।

সপ্তগ্রাম, হুগলী, চন্দননগর, শ্রীরামপুর প্রভৃতিকে কেন্দ্র করেই যে ইউরোপীয় বণিকরা বঙ্গদেশে প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করেন, সেকথা সকলেরই জানা। এসব বাণিজ্যিক ঘাটির কাছাকাছি হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগণা, নদীয়া বা বর্ধমান জেলার মন্দির-'টেরাকোটা'য় সেজন্য সাহেব-ভাস্কর্যের বেশ প্রাচুর্য দেখা যায়। বাঁশবেড়িয়ার বাসুদেব মন্দিরের কথা আগেই বলেছি। এবার ওই একই জেলার জাঙ্গিপাড়া থানার হরিরামপুর গ্রামের ১৭৩৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত এক শিবমন্দিরের উল্লেখ করব, যে দেবালয়ে সাহেব-ভাস্কর্য শুধু ভিত্তির কাছের সমান্তরাল সারিতেই নেই, সামনের দেওয়ালের অন্যান্য অংশেও উৎকীর্ণ আছে। কোম্পানীর সাহেবদের তখন খুব রবরবা। মাটিতে তখন তাঁদের পা পড়ে কি পড়ে না। যাতায়াতের জন্য যেসব সুসজ্জিত পালকি তাঁরা ব্যবহার করতেন, তা দেখে গ্রামবাসীরা থ মেরে যেত। হরিরামপুরের এই মন্দিরে সাহেবদের সুখ-ভ্রমণের নানান দৃশ্য দেখানো হযেছে। পালকি-বেহারাদের আগে-পরে পাইক-বরকন্দাজ-হুঁকাবরদারদের দীর্ঘ সব শোভাযাত্রা উৎকীর্ণ আছে। হাণ্টারের বর্ণনার সঙ্গে এ সুখ-ভ্রমণের মিল এত নিকট যে, সন্দেহ হয় এ মন্দিরের ভাস্কররা স্বয়ং জন চীপকে অথবা অন্য কোন পদস্থ সাহেবকে এভাবে স্থানান্তরে যেতে দেখে থাকবেন। ঘোড়ায়-টানা জুড়ি-গাড়ি এমন কি বলদে-টানা গাড়িতেও সাহেবদের ভ্রমণ-দৃশ্য দেখানো হয়েছে অনেক মন্দিরে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই চাঁদোয়া-ঢাকা বসবার আসনে সাহেব বসে আছেন এক যুবতী সঙ্গিনীর থুতনি ধরে। কোথাও কোথাও বা সইসের পিছনের পাটাতনের উপরে স্বল্পবসনা নর্তকী নাচছে ঢোলক বাদ্যের তালে তালে।

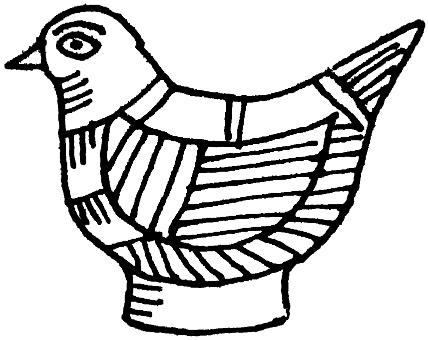
হাওড়া জেলার আমতা থানার অমরাগড়িতে অবস্থিত দধিমাধব মন্দিরেও সাহেব-ভাস্কর্যের ছড়াছড়ি। এ দেবালয়ের ভিত্তি-অনুভূমিক সারিগুলিতে সাহেবী জীবনের যেসব ভাস্কর্য খোদিত আছে, তা শুধু সংখ্যায় নয়, উৎকর্ষেও সারা পশ্চিমবঙ্গে এ-জাতীয় 'টেরাকোটা'-সজ্জার শীর্ষস্থান অধিকার করবার যোগ্য। ১৭৬৪ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত এ সৌধের এখন বেশ জীর্ণ দশা বলে রাজ্য সরকারের পূর্ত বিভাগ প্রায় তিন বছর আগে সিদ্ধান্ত নেন সরকারী ব্যয়ে এটির সংস্কার করা হবে। প্রধানত ক্ষয়িষ্ণু পুরাকীর্তি সংরক্ষণের জন্য (সংশ্লিষ্ট আইন অন্তত সে কথাই বলে) যে দপ্তরটি বারো-তেরো বছর ধরে বহাল আছে, তাঁরাই বলতে পারবেন এ মূল্যবান কৃষ্টিসম্পদটিকে (অথবা অনুরূপ অসংখ্য পুরাকীর্তিকে) রক্ষা করবার জন্য তাঁরা সত্যিকারের কাজ অদ্যাবধি কতটুকু করেছেন। এই পূর্ত দপ্তর থেকে প্রকাশিত 'বাঁকুড়া জেলার পুরা-কীর্তি' গ্রন্থের ভূমিকায় ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় বেশ স্পষ্টভাবেই বলেছেন, রাজ্য সরকারের প্রচেষ্টায় পুরাকীর্তি সংরক্ষণের মত জরুরী কাজে এখনও হাত পড়েনি বললেই চলে। অথচ 'টেরাকোটা' মন্দিরগুলি যে বঙ্গসংস্কৃতির অমূল্য সম্পদ সে বিষয়ে দ্বিমত নেই। সে যাই হোক, এ মন্দিরে এবং অন্যত্র শিকারী সাহেবদের সাধারণত হাতি বা ঘোড়ার পিঠে আরূঢ় অবস্থাতেই দেখানো হয়েছে। আক্রান্ত পশু প্রায়ই বাঘ

ও ব্যবহৃত অস্ত্র প্রধানত বন্দুক বা বর্শা। পাইক-বরকন্দাজপরিবৃত সাহেবী শিকারের এসব ভাস্কর্য এক অপসৃত যুগের চিত্তাকর্ষক আলেখ্য।

দীর্ঘ প্রবাসকালে সাহেবরা এদেশের যেসব সুখপ্রদ অভ্যাস রপ্ত করেছিলেন, তারই এক অন্তরঙ্গ দৃশ্য দেখা যায় হুগলী জেলার জাঙ্গিপাড়া থানার দ্বারহাটা গ্রামে অবস্থিত ও ১৭২৮ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত রাজরাজেশ্বর মন্দিরের দেওয়ালে। এ ভাস্কর্যটি আগের আমলের নবাবদের সঙ্গে পরবর্তীকালের সাহেব-প্রভুদের যোগসূত্র নির্ণয়েও সাহায্য করে। বস্তুত 'টেরাকোটা' মন্দিরের দেওয়ালে বিশ্রামরত সাহেবদের প্রায়ই ফরসির নল হাতে ও তাকিয়ায় হেলান দেওয়া অবস্থায় দেখা যায়। কোনখানেই হুঁকাবরদার ও পার্শ্বচরদের অভাব নেই। অতি বংশবদ ভঙ্গীতে তারা সর্বত্রই কাছা-কাছি উপস্থিত।

মদ্যপানের কৃতিত্ব কিন্তু অনেকাংশে সাহেবদের নিজেদেরই প্রাপ্য। উৎসবে-পার্বণে লালপানিতে তাঁদের সাঁতার কাটার কেচ্ছাকাহিনী সমকালীন সমাজে এতই সুবিদিত ছিল যে 'টেরাকোটা'-শিল্পীরাও সে বিষয়ে রীতিমত অবহিত ছিলেন। এজাতীয় অলংকরণের ব্যবহার দেখা যায় হুগলী জেলার দাদপুর থানার অন্তর্গত কেষ্টপুর গ্রামের এক পরিত্যক্ত মন্দিরে। পলাশীর যুদ্ধের পরে, ১৭৬২ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত এ দেবালয়ের ভাস্করেরা সেই সময়ের লোক, যখন দীর্ঘকালের সহাবস্থানের ফলে তাঁরা সাহেবদের অন্তরঙ্গ জীবন সম্বন্ধে বেশ ওয়াকিবহাল হয়ে উঠেছেন। সাহেবদের মদ্য-পানের দৃশ্য অন্যত্রও আছে। কিন্তু সামনের চেয়ারে উপপত্নীকে বসিয়ে, দাসী ও ভৃত্যকে অবারিত সরবরাহে নিযুক্ত করে ও স্বয়ং দু'হাতে কুঁজোর মত বিরাট দুই বোতল ধরে এহেন ইলাহী মদ্যপানের ভাস্কর্য আর কোথাও দেখেছি বলে মনে পড়ে না।

এদেশীয় রমণীর সঙ্গে সাহেবদের মেলামেশার নানান দৃশ্যও উৎকীর্ণ হয়েছে অপেক্ষাকৃত আধুনিক 'টেরাকোটা' মন্দিরগুলিতে। স্বজাতীয় ললনাদের সঙ্গবিহীন প্রবাসজীবন বড় কষ্টে কেটেছে সেকালের সাহেবদের। হুগলী জেলার কামারপুকুরে রামকৃষ্ণ মিশন এলাকার অদূরে লাহা পরিবারের এক দোতলা দালান-মন্দিরে এজাতীয় ভাস্কর্য দেখা যায়। প্রতিষ্ঠালিপি না থাকলেও অন্য সাক্ষ্যপ্রমাণ থেকে মনে হয়, সেটি উনিশ শতকের মাঝামাঝি নাগাদ নির্মিত। অর্থাৎ, বর্তমান নিবন্ধে উল্লেখিত অন্যান্য দেবালয়ের মধ্যে এটিই সবচেয়ে অর্বাচীন। 'টেরাকোটা' মন্দিরের বয়ঃক্রমের সঙ্গে সাহেব-ভাস্কর্য যে কিছুটা সম্পর্কিত, সে বিষয়ে এখন কিছু বলা যেতে পারে। আগেই বলেছি, প্রাচীনতম 'টেরাকোটা' মন্দিরগুলিতে এজাতীয় ভাস্কর্য একেবারেই দেখা যায় না। অব্যবহিত পরের দেবালয়গুলিতে ইউরোপীয়দের যুদ্ধবিগ্রহ ও শৌর্য-বীর্যের দিকগুলিই বেশী প্রকাশিত। অতঃপর বাণিজ্যে লক্ষ্মীলাভ ও শাসনক্ষমতা হস্তগত হবার সঙ্গে তাদের বিলাসব্যসন ও অমিতাচার যেমন বেড়েছে, তেমনি তা প্রতিফলিত হয়েছে 'টেরাকোটা' মন্দিরের দেওয়ালে। কামমোহিত সাহেবের ভাস্কর্যও অনেক মন্দিরেই আছে। কিন্তু সেসব দেবালয় অপেক্ষাকৃত আধুনিককালের অর্থাৎ, মোটামুটিভাবে উনিশ শতকের। প্রাচীনতর মন্দিরে সাহেব-জীবনের এমন খোলাখুলি ভাস্কর্য আছে বলে মনে হয় না। ক্রমবিকাশের এই সাধারণ ধারাটি রক্ষা করবার জন্য তাবৎ শিল্পীসমাজ যে কোন বাঁধাধরা নিয়ম মেনে চলেছেন এমন নয়। তবু কালক্রম অনুসারে তাঁরা যে পোশাকী ভাস্কর্য থেকে অন্তরঙ্গ সাহেব-ভাস্কর্যের দিকে ক্রমশই বেশী ঝুঁকেছেন, স্থূলভাবে সেকথা হয়ত বলা চলে।



ধামতোড়

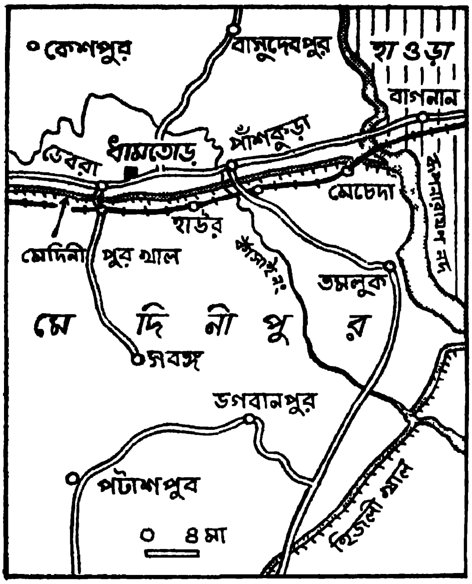
ভারতবর্ষে পোড়ামাটির খেলনা-পুতুল বা মূর্তি তৈরির প্রথম উন্মেষ যে প্রাগৈতিহাসিক কালের সেকথা কুল্লি, ঝোব, হরপ্পা, মোহেঞ্জোদারো প্রভৃতি স্থানেব প্রাচীন সভ্যতার নজিরে প্রমাণিত হয়েছে। পরে দেব-উপাসনার জন্য যখন ইঁটের মন্দির নির্মিত হতে আরম্ভ করল তখন তাদের অঙ্গসজ্জার জন্য পোড়ামাটির অলংকরণেরও সূত্রপাত হল। কিন্তু কালোত্তীর্ণ দৃষ্টান্তের অভাবে, ঠিক কোন্ সময়ে এই রীতি প্রথম প্রবর্তিত হয়েছিল সেকথা আজ আর বলা সম্ভব নয়। পূর্বভারতের পাহাড়পুর, মহাস্থানগড় প্রভৃতি স্থানের বৌদ্ধ বিহারগুলিতে এজাতীয় অলংকরণের ব্যবহার দেখতে পাওয়া যায়। মন্দিরসজ্জার এ রীতিটি পাল-সেন যুগের শেষ অবধি যে ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল তা অনুমান করবার জন্য বেশ কয়েকটি ইঁটের মন্দির এখনও অবশিষ্ট আছে পশ্চিমবঙ্গে। পূর্বভারতে মোসলেম আবির্ভাবের পর, সহজবোধ্য কারণে, এ অঞ্চলে মন্দির নির্মাণে বেশ কিছুটা ভাটা পড়ে থাকবে। তখন পূর্বতন কারিগরি দক্ষতাকে নতুন রূপে ব্যবহার করে মুসলমান শাসক সম্প্রদায় তাঁদের ইঁটের মসজিদগুলিকে জ্যামিতিক অথবা ফুললতাপাতার বিমূর্ত নকশায় মণ্ডিত করেছেন। সেসব শিল্পকর্মের বহু নিদর্শন এখনও দেখা যায় মালদহ জেলার গৌড়, পাণ্ডুয়া ও আদিনায়, মুর্শিদাবাদ জেলার খেড়ুরে, বীরভূম জেলার রাজনগরে ও বর্ধমান জেলার নতুনহাট প্রভৃতি স্থানে। তারপরে সুলতানী বা নবাবী আমলে আবার যখন হিন্দু-মন্দির তৈরি হতে শুরু করল তখন মুসলমানী বিমূর্ত নকশা ছাড়াও হিন্দু দেবলোকের অজস্র মূর্তিভাস্কর্য দেখা দিল মন্দিরের গায়ে। কোন কোন গবেষক এই পর্বের হিন্দু-'টেরাকোটা' সজ্জাকে পূর্ববর্তী মোসলেম রীতির সম্প্রসারণ বলে মনে করেন। আমি তাঁদের সঙ্গে একেবারেই একমত নই। 'টেরাকোটা'-অলংকৃত ধর্মীয় ইমারতের ক্রমবিবর্তনের যে ইতিহাস উপরে বর্ণনা করেছি, খুব সংক্ষিপ্ত হলেও তা থেকে প্রমাণ হয় যে, এ বিষয়ে মোসলেম রীতির থেকে হিন্দু ঐতিহ্য অনেক বেশী প্রাচীন এবং মুসলমানদের বঙ্গবিজয়ের পর তাতে কিছুদিনের জন্য আংশিক ছেদ পড়েছিল মাত্র। চৈতন্য-পরবর্তী কালে 'টেরাকোটা'-সজ্জিত ইঁটের মন্দির নির্মাণের যেন এক বন্যা এল বঙ্গদেশে। সমকালীন ভারতবর্ষে এজাতীয় শিল্পকৃতি আর কোথাও অনুসৃত হয়নি বলে এগুলি বঙ্গসংস্কৃতির অমূল্য সম্পদ। সে সময়কার, অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় ষোল থেকে উনিশ শতকের মধ্যে স্থাপিত, হাজার হাজার 'টেরাকোটা' মন্দির অল্পবিস্তর ভগ্নদশায় পূব ও পশ্চিম বাংলায় এখনও বিদ্যমান আছে। তাদের অধ্যয়ন থেকে মোটামুটিভাবে মনে হয়, চলতি শতকের প্রথমে বা গত শতকের শেষ দিকে এই বিশেষ অলংকরণ পদ্ধতিটির অবনতি ঘটতে শুরু করে। কিন্তু

ঠিক কোন্ সময়ে এ শিল্পরীতিটি একেবারে লুপ্ত হয় সে বিষয়ে নানা মুনির নানা মত।

১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দের লোকগণনার রিপোর্টগুলির সঙ্গে শ্রীঅশোক মিত্র সম্পাদিত ও ১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 'দি ট্রাইব্‌স অ্যান্ড কাস্টস্ অব ওয়েস্ট বেঙ্গল' নামক ইংরেজী গ্রন্থে (পৃঃ ৩২১) শ্রীসুধাংশুকুমার রায়ের লেখা 'দি আর্টিজান কাস্টস্ অব ওয়েস্ট বেঙ্গল অ্যান্ড দেয়ার ক্রাফট্'-শীর্ষক প্রবন্ধটির সংশিলষ্ট অংশের বাংলা অনুবাদ নিম্নরূপ ঃ "আশ্চর্যের বিষয়, ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত (ছয় লক্ষ টাকা ব্যয়ে নির্মিত ও ১২৬১ বঙ্গাব্দের ১৮ই জ্যৈষ্ঠ অর্থাৎ ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দের জুনের শেষ সপ্তাহে উৎসর্গীকৃত) রাণী রাসমণির দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে কোন 'টেরাকোটা' অলংকরণ নেই, কেননা, মনে হয় ১৭৫০ খ্রীষ্টাব্দের পরে দুর্বোধ্য কারণে এ শিল্পরীতিটি সহসা ও দ্রুত অবনতিগ্রস্ত হয়।" শ্রীযুত রায় অতএব অনুমান করেন, প্রায় ২২২ বছর আগে থেকেই মন্দির-'টেরাকোটা' শিল্পের দ্রুত অবনতি আরম্ভ হয়ে ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ তা সম্পূর্ণ লুপ্ত হয়।

শ্রীবিনয় ঘোষ মহাশয় ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত তাঁর 'পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি' গ্রন্থে (পৃঃ ৮৯) লিখেছেন—"বর্ধমানের মহারাজারা যেসব মন্দির তৈরি করিয়েছিলেন, সাল তারিখ অনুসারে দেখা যায়, অষ্টাদশ শতাব্দীর কোন কোন মন্দিরে কারুকার্যের নিদর্শন কিছু কিছু আছে এবং ক্রমে ঊনবিংশ শতাব্দীতে এসে সেগুলি একেবারে লুপ্ত হয়ে গেছে। তখন কেবল মন্দিরের সংখ্যা (যেমন ১০৮ মন্দির) ও চুড়ো বেড়েছে, শিল্পৈশ্বর্য একেবারে লুপ্ত হয়ে গেছে। ভূস্বামীদের মধ্যে সাবর্ণ চৌধুরীদের মতন দেবালয় প্রতিষ্ঠা বোধ হয় আর কেউ করেননি। তাঁদের প্রতিষ্ঠিত অষ্টাদশ শতাব্দীর অনেক দেবালয়ে পোড়ামাটির কাজের নিদর্শন রয়েছে দেখা যায়, যেমন হালিশহরের মন্দিরগুলিতে। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীতে এসে দেখা যায়, মন্দিরের গায়ে বালির ও চুনের পলেস্তারা ছাড়া আর কিছু নেই। এমন কি কালীঘাটের বিখ্যাত মন্দিরেও না। ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি রাণী রাসমণি যখন দক্ষিণেশ্বরের বিখ্যাত মন্দিরটি নির্মাণের জন্য ছয় লক্ষ টাকা ব্যয় করেছিলেন, তখন তিনি নিশ্চয় পোড়ামাটির কারু-কাজের জন্য কোন শিল্পীর খোঁজ পাননি। যদি পেতেন তাহলে তার সামান্য নিদর্শনও কোথাও থাকত।" শ্রীযুত ঘোষ ঊনবিংশ শতাব্দীতে এসে মন্দির 'টেরাকোটা' শিল্প যে "একেবারে লুপ্ত হয়ে গেছে" একথা বেশ জোরের সঙ্গেই একাধিকবার বলেছেন। অতএব ধরে নেওয়া যায় যে তাঁর মতে ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ এ শিল্পটি বঙ্গ-সংস্কৃতিমণ্ড থেকে বিদায় নিয়েছে।

ঊনিশ শতকের মাঝামাঝি বা তারও আগে এ শিল্পটির সম্পূর্ণ বিলোপ সম্বন্ধে শ্রীযুত ঘোষ ও শ্রীযুত রায় যে সিদ্ধান্ত করেছেন, সে বিষয়ে আরও বিচার-বিবেচনার অবকাশ আছে। তাঁরা দু'জনেই পশ্চিমবঙ্গের মন্দিরাদি নিয়ে গবেষণা করেছেন, সরেজমিনে কিছু কিছু অনুসন্ধানও করেছেন। কিন্তু পূর্ব ও পশ্চিম বঙ্গে, বিশেষত রাঢ় অঞ্চলে, 'টেরা-কোটা' মন্দিরের সংখ্যা এতই অগণিত যে তার অধিকাংশ তো দূরের কথা, নিশ্চিত কোন সিদ্ধান্তে আসবার মতো অধিকসংখ্যক দেবালয় তাঁদের হয়ত দেখবার সুযোগ হয়নি। এটা আদপেই তাঁদের অক্ষমতা নয়, মন্দিরের অপরিসীম সংখ্যাধিক্যই এর কারণ। আমার 'বাঁকুড়ার মন্দির' গ্রন্থে সে সময় অবধি আমার অনুসন্ধানের ভিত্তিতে মন্দির-'টেরাকোটা' শিল্পের অবনতি ও বিলুপ্তি সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করেছি। সেখানে (পৃঃ ১২২-২৩) আরামবাগের অদূরে পারুল গ্রামের ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত বিশালাক্ষী মন্দির ও ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত ছাতনার



সর্বাধুনিক বাসুলী মন্দিরের নজিরে অনুমান করেছিলাম, এ শিল্পটি ৭০।৭৫ বছর আগেও সক্রিয় ছিল এবং "বাণী রাসমণির মন্দিরের 'টেরাকোটা'-সজ্জার অভাব শিল্পীদের তৎকালীন অনুপস্থিতির জন্য নিশ্চয়ই নয়; এর অনুসন্ধানযোগ্য স্বতন্ত্র কোন কারণ ছিল বলে মনে হয়।" 'বাঁকুড়ার মন্দির'-এর প্রকাশকালের পরে গত ছ'সাত বছরে পশ্চিমবঙ্গের আরও অসংখ্য মন্দির দেখবার আমার সুযোগ হয়েছে। সে অনুসন্ধানের ভিত্তিতে বলতে পারি, উনিশ শতকেও, বিশেষ করে সে-শতকের দ্বিতীয়ার্ধে, বহু উৎকৃষ্ট 'টেরাকোটা' মন্দির নির্মিত হয়েছে পশ্চিমবঙ্গে। যথা, মেদিনীপুর জেলার চন্দ্রকোণা থানার ক্ষীরপাই গ্রামের রাধাদামোদর মন্দির (১৮১৭) (শ্রীযুত ঘোষ নিজেই তাঁর 'পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি' গ্রন্থের ৩৯১ পৃষ্ঠায় এ দেবালয়ের প্রতিষ্ঠালিপিটি উদ্ধৃত করেছেন), চন্দ্রকোণা শহরের শান্তিনাথ শিবমন্দির (১৮২৮), ডেবরা থানার লোয়াদা গ্রামের পরিত্যক্ত দেউল (১৮৪৩), পাঁশকুড়া থানার মাংলোই গ্রামের আটকোণা রাসমঞ্চ (১৮৫৯) ও ময়না থানার রামচন্দ্রপুরের নবরত্ন মন্দির (আনুমানিক ১৮৬০); হাওড়া জেলার বাগনান থানার কল্যাণপুর গ্রামের পাল পরিবারের মন্দির (১৮২২); হুগলী জেলার গোঘাট থানার বালী-দেওয়ানগঞ্জ গ্রামের দামোদর মন্দির (১৮২২); বর্ধমান জেলার ভাতার থানার কামারপাড়া গ্রামের আটকোণা শিবমন্দির (১৮২৬), কালনা শহরের প্রতাপেশ্বর শিবমন্দির (১৮৪৯) ও গলসি থানার গোহোগ্রামের রাধাদামোদর মন্দির (১৮৭১); বাঁকুড়া জেলার কোতুলপুরের ভদ্র পরিবারের শ্রীধর মন্দির (১৮৩৩), কোতুলপুর থানার জিবটা গ্রামের রায় পরিবারের দামোদর মন্দির (১৮৩৩) ও সোনামুখী শহরের শ্রীধর মন্দির (১৮৪৫) প্রভৃতি। এ তালিকায় প্রতিষ্ঠালিপিযুক্ত উৎকৃষ্ট 'টেরাকোটা' মন্দিরগুলিরই কেবল উল্লেখ করেছি, নিরেস অলংকরণের দেবগৃহের কথা ধরলে, আমার অদ্যাবধি অনুসন্ধানের ভিত্তিতে উনিশ শতকে নির্মিত শতাধিক মন্দিরের নাম করা যেতে পারে। অতএব উনিশ শতকের আগাগোড়াই যে মন্দির-'টেরাকোটা' শিল্পীরা বেশ সক্রিয় ছিলেন, সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই। সেজন্য যদি বলি শ্রীযুত রায় ও শ্রীযুত ঘোষ আংশিক অনুসন্ধানের ভিত্তিতেই তাঁদের

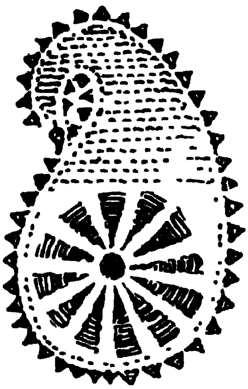
পূর্বোক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হতে বাধ্য হয়েছিলেন, তাহলে তাঁদের প্রতি অবিচার করা হয় না। সীমিত সমীক্ষা ছাড়া তাঁদের পক্ষে অন্য কিছু করাও অসম্ভব ছিল। কেননা, পূব ও পশ্চিম বাংলায় এজাতীয় দেবালয় এতই অগণিত ও তাদের অধিকাংশই আবার এমন দুর্গম গ্রামাঞ্চলে অবস্থিত যে তাদের সম্বন্ধে একটা সন্তোষজনক অনুসন্ধান করা দীর্ঘ সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। আমি এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ যে উভয় বাংলার গ্রামগ্রামান্তরে বহু অনাবিষ্কৃত 'টেরাকোটা' মন্দির এখনও গবেষকদের জন্য অপেক্ষা করে রয়েছে। কিছুদিন আগে সেরকম এক অজ্ঞাত দেবালয়ের হঠাৎ সন্ধান পেয়ে বুঝলাম, উনিশ শতক তো দূরের কথা, ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দ অবধি 'টেরাকোটা' মন্দির নির্মিত হয়েছে পশ্চিমবঙ্গে।

*

চৈত্রের এক তপ্ত দুপুরে ছ'নম্বর জাতীয় সড়ক ধরে পাঁশকুড়া থেকে মেদিনীপুরের দিকে চলেছিলাম। মাইল আষ্টেক যাবার পর ডেবরার মাইল দুই আগে রাস্তার অদূরে ধামতোড় গ্রামের গাছপালার উপর দিয়ে এক পঞ্চরত্ন মন্দিরের চূড়া দেখা গেল। চুন-বালির পলস্তারা-করা ছোট মন্দির। এহেন দেবসৌধ বাংলাদেশের গ্রামে গ্রামে আছে; সেজন্য না থেমে চলে যাবারই ইচ্ছা হয়েছিল প্রথমে। কিন্তু পাঁচ মিনিটের বেশী সময় লাগবে না ভেবে সেই সামান্য মন্দিরের সামনে উপস্থিত হয়ে বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে গেলাম। উৎসর্গলিপি অনুসারে ১৩৩৭ সালের ২০শে ফাল্গুন (১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দের মার্চের প্রথম দিকে) যে-মন্দির নির্মিত তার সামনের দেওয়ালে, বিভিন্ন খোপে, অন্তত ৭৪টি 'টেরাকোটা' মূর্তি-ভাস্কর্য নিবদ্ধ। আধুনিকতার জন্যই প্রতিষ্ঠাফলকটি হয়ত চিৎপুরের শ্বেতপাথরের কারিগরদের কাছ থেকে তৈরি করানো—সাবেক পদ্ধতির নয়, কিন্তু 'টেরাকোটা' মূর্তিগুলির বিষয়বস্তু সনাতন রীতির। যথা—দশাবতার, পৌরাণিক দেবদেবী, কৃষ্ণলীলার দৃশ্য ও বেশ কয়েকটি সামাজিক চরিত্র। আরও আশ্চর্য ব্যাপার—পোড়ামাটির অলংকরণগুলির গায়ে একদা বিভিন্ন রকমের রং লাগানো হয়েছিল; তার অধিকাংশ উঠে গেলেও কিছু কিছু চিহ্ন এখনও নজরে পড়ে। মন্দির-'টেরাকোটা' শিল্পের অবনতির কালে পঙ্কের অলংকরণ যে অল্পবিস্তর তার স্থলাভিষিক্ত হয় তার প্রমাণস্বরূপ এই আধুনিক মন্দিরের তিনটি খিলানের উপরের অংশে ও গর্ভগৃহে প্রবেশদ্বারের শীর্ষে কিছু পঙ্কের নকাশি কাজ ও এক গজলক্ষ্মী মূর্তি দেখা যায়। প্রতিষ্ঠাতা শ্রীঅধরচন্দ্র শাসমলের পরলোকগমনের পর তাঁর ভাইপো শ্রীসুরেন্দ্রনাথ শাসমল এখন এ পরিবারের কর্তা। একচল্লিশ বছর আগে এ মন্দির নির্মাণের সময় তাঁর বয়স ছিল বাইশ-তেইশ বছর। সেজন্য স্থপতি ও কারিগরদের কাজের খুঁটিনাটি তাঁর বেশ মনে আছে। তাঁর বিবরণ অনুসারে, মেদিনীপুর জেলার দাসপুর থানার চেতুয়া-দাসপুর গ্রামের জনৈক দেবেন্দ্রনাথ চন্দ্র এ মন্দিরের প্রধান মিস্ত্রী। পনের-ষোলজন কারিগরের এক দলের সে ছিল 'অধিকারী'। তাদের দেড় বছর ধরে প্রাত্যহিক চালডালের 'সিধা' ও থাকবার জায়গা দেওয়া হয়েছিল। কাছেপিঠের এঁটেল মাটি দিয়ে ইঁট তৈরির জন্য স্থানীয়ভাবে কিছু সাওতাল মজুর নিযুক্ত করা হয়। কিন্তু 'টেরাকোটা'-সজ্জার জন্য আর একটু দোআঁশ জাতীয় মাটি সংগ্রহ করা হয় কিছু দূরের গ্রাম আষাঢ়িয়া-বাঁধ থেকে। মন্দিরের ভিত্তি প্রায় ছ'হাত গভীর ও তার সবটাই ইঁট দিয়ে ভরাট। পোড়া-মাটির অলংকরণগুলি সবই ছাঁচ থেকে তৈরি এবং এসব ছাঁচ কারিগররা সঙ্গে করেই এনেছিল। ছাঁচ থেকে বার করবার পর নরুন বা বাঁশের চাঁচাড়ি দিয়ে সূক্ষ্ম নকশাগুলি খোদাই করে 'টেরাকোটা' টালিগুলি খড় ও শুকনো পাতা প্রভৃতির সাহায্যে ভাটিতে পুড়িয়ে নেওয়া হয়। মন্দির তৈরির সময় সামনের দেওয়ালের যে খোপগুলি ছেড়ে

যাওয়া হয়েছিল, পোড়ামাটির টালিগুলিকে অতঃপর সেখানে বসিয়ে দেওয়া হয় চুন-বালির অস্তর দিয়ে। রঙের ব্যবহার হয়েছিল একেবারে শেষ পর্যায়ে—টালিগুলি দেওয়ালে নিবন্ধ হবার পরে। কাজ শেষ হবার তিন মাসের মধ্যে প্রধান মিস্ত্রী দেবেন্দ্র-নাথ চন্দ্র তার নিজ গ্রাম চেতুয়া-দাসপুরে মারা যায়।

এ মন্দিরের অলংকরণ যে খুবই স্থূল প্রকৃতির সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। সম্ভবত দোআঁশ মাটি ব্যবহারের জন্য বেশ কিছু 'টেরাকোটা' টালি ইতিমধ্যেই ক্ষয়ে গিয়েছে। এ থেকেও সে সময়ের কারিগরি বিদ্যার অবনতি আঁচ করা যায়। কিন্তু এসব সত্ত্বেও মূল কথা হল, একচল্লিশ বছর আগেও পোড়ামাটির মন্দির-অলংকরণ পশ্চিমবঙ্গে একেবারে লুপ্ত হয়নি। বিশ শতকে নির্মিত এহেন আর কোন মন্দির আমি নিজে এখনও দেখিনি, তবে মেদিনীপুর জেলার চন্দ্রকোণায় আনুমানিক পঞ্চাশ বছরের প্রাচীন আর একটি আছে বলে শুনেছি। ধামতোড় থেকে চন্দ্রকোণার পাখি-ওড়া দূরত্ব পঁচিশ মাইলের বেশী নয়। তাছাড়া মেদিনীপুর জেলার উত্তর-পূর্ব অংশে চন্দ্রকোণা, ঘাঁটাল, দাসপুর, পাঁশকুড়া, ডেবরা প্রভৃতি থানায় 'টেরাকোটা' মন্দিরের সংখ্যা এতই অগণিত যে যথেষ্ট পরিমাণ অনুসন্ধান হলে বর্তমান শতকে নির্মিত আরও দু'দশটি 'টেরাকোটা' মন্দির আবিষ্কৃত হওয়া অসম্ভব নয়। আজ হোক, কাল হোক, এহেন বিস্তৃততর সমীক্ষা অবশ্যই হবে। তখন আরও সঠিকভাবে বলা যাবে, মন্দির-'টেরাকোটা' শিল্পীবা আনুমানিক কোন্ সময়ে বঙ্গসংস্কৃতিক্ষেত্র থেকে বিদায় নিয়েছেন।

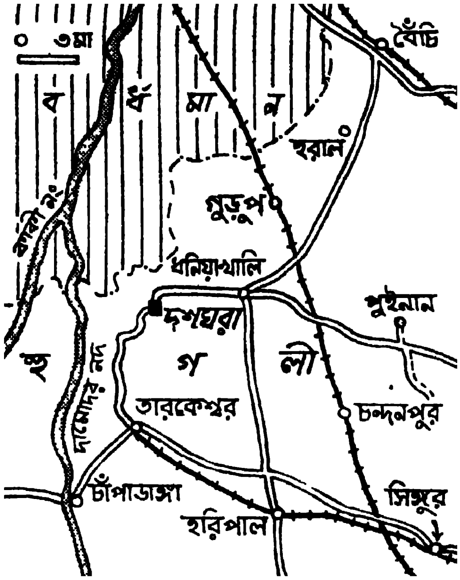


দশঘরা

গ্রামের নাম দশঘরা। হুগলী জেলার আর পাঁচটা সাধারণ গ্রামের মতই বৈচিত্র্যহীন। বিশেষত্ব যেটুকু, তা বিশ্বাস উপাধিধারী স্থানীয় জমিদার পরিবার ও তাঁদের পুরাবৃত্তকে ঘিরে। পূর্ব ও পশ্চিম বাংলার বহু জেলায় ছড়ানো এক বিস্তৃত জমিদারির আয় থেকে এ পরিবার বংশানুক্রমিকভাবে নানাবিধ লোকহিতকর কাজ করে এসেছেন। তাঁদের "ক্রিয়াকর্ম যজ্ঞ-খাগে, বহু খ্যাত ছিল আগে, আজ কিছু নাই।" দেশ-বিভাগ ও জমিদারি-বিলোপ আইনের যুগপৎ আঘাত থেকে দশঘরার বিশ্বাস পরিবার আবার কখনো তাঁদের পূর্ব সমৃদ্ধির স্তরে উঠতে পারবেন এমন আশা নিতান্তই দুরাশা। তবু দূর ভবিষ্যতে বঙ্গসংস্কৃতির ইতিহাস যদি কোনদিন বিস্তৃতভাবে লেখা হয়, তা হলে এ বংশের একটি বিশেষ অবদানের কথা যে সগৌরবে কীর্তিত হবার যোগ্য বলে বিবেচিত হবে তাতে আমার অন্তত কোন সন্দেহ নেই। সে বিষয়ে বিস্তৃতভাবে পরে বলছি।

দশঘরার বিশ্বাস পরিবারে রক্ষিত এক কুলপঞ্জী অনুসারে—"এই বংশের জগমোহন দেব-বিশ্বাস পরম ধার্মিক ও রাজকার্যকুশল থাকায়, পূর্ব রাজধানী দশঘরার রাজা মহাত্মা রামনারায়ণ পালচৌধুরী তাঁহাকে আনয়নপূর্বক মন্ত্রিপদে অভিষিক্ত করেন এবং কুলপুরোহিতসহ দশঘরায় বাস করান। তৎপুত্র রামমোহন দে · বিশ্বাস তৎপদারূঢ় হইয়াছিলেন। রাজা রাজ্যচ্যুত হইলে পর তদীয় সুত রামনারায়ণ দেব-বিশ্বাস বর্ধমানাধিপতি রাজার নিকট ইজারা গ্রহণান্তর স্থানে স্থানে দেবসেবা, ব্রাহ্মণদিগকে ভূম্যাদি দান ইত্যাদি বহু সৎকার্য করিয়া দশঘরা সমাজের কর্তৃত্ব গ্রহণ করেন। তাঁহার পুত্র সহস্ররাম, ভৃগুরাম, আনন্দীরাম ও নিধিরাম দেব-বিশ্বাস চারি সহোদরে বহু গ্রাম ইজারা লইয়া কনিষ্ঠের লোকান্তে, তিন সহোদরে শ্রীবৃন্দাবনধাম হইতে তিনটি শ্রীবিগ্রহ মূর্তি আনিয়া নিজ বাটিতে এক এবং ব্রাহ্মণভবনে অন্নভোগের নিমিত্ত দুই মূর্তি প্রকাশ করেন। আনন্দীরামের আত্মজ শ্যামসুন্দর দেব-বিশ্বাস দিনাজপুর জেলার কালেক্টরীর কোষাধ্যক্ষ ছিলেন। তাঁহার পুত্র রাইকিশোর, ব্রজকিশোর, রাজকিশোর ও যুগলকিশোর দেব-বিশ্বাস দশসালা বন্দোবস্তের পর ক্রমশ আরও তালুক ক্রয় ও বিবিধ কারবার দ্বারা জমিদার পদবাচ্য হইয়া পৈতৃক বিষয়-বৈভব, ধর্মকর্মাদি বৃদ্ধি, সমাজ-রক্ষা, দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন ও নানা তীর্থ পর্যটন করেন। তৃতীয় পুত্র রাজকিশোর ও কনিষ্ঠ যুগলকিশোর ১৭৪৯ শকাব্দে এক বৃহৎ রথ প্রতিষ্ঠা করেন। সেই রথ পুরাতন হওয়ায় ১৭৮৫ শকাব্দে অতি সুরম্য গঠন হইয়া চলিতেছে। ইহা দশঘরার প্রসিদ্ধ রথ বলিয়া খ্যাত।"

বিশ্বাস পরিবার প্রবর্তিত রথযাত্রার উৎসব দশঘরায় এখনও অব্যাহত আছে।



বস্তুত, হ্‌গলী জেলার অধিবাসীদের কাছে দশঘরার নামডাক প্রধানত এই উৎসবের জন্যই। প্‌রাতন কাঠামো জীর্ণ হওয়ায, ১৯৪৮ খ্‌রীষ্টাব্দে ইস্পাতের ফ্রেম দিয়ে রথটির সংস্কার করা হয়েছে। ১৯৪৭ খ্‌রীষ্টাব্দে দেশ-বিভাগের ফলে প্‌র্ববঙ্গের যাবতীয় জমিদারি হাতছাড়া হওয়াব পরেও রথটির সংস্কারের জন্য অর্থব্যয় পিতৃ-প্‌র্‌ষপ্রবর্তিত এক সামাজিক অন্‌ষ্ঠানের প্রতি বিশ্বাস পরিবারের মমত্বেরই পরিচায়ক। এই জমিদার বংশের লোকহিতৈষণার আর একটি নিদর্শন—১৮৫৮ খ্‌রীষ্টাব্দে স্থাপিত দশঘরা উচচ ইংরাজী স্কুল। পশ্চিমবাংলায় এত প্রাচীন বিদ্যালয় সংখ্যায় খ্‌ব বেশী নয়। বিশ্বাস মহাশয়রা এটির জন্য শ্‌ধ্‌ অর্থসাহায্য করেই ক্ষান্ত হননি, পরিচালনাব ব্যাপারেও বরাবর সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছেন।

কুলপঞ্জীতে উল্লেখিত সহস্ররাম, ভৃগ্‌রাম ও আনন্দীরাম কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত গৃহ-দেবতার মন্দিরটি বর্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়। কোন জনহিতকর প্রচেষ্টার সঙ্গে সরাসরি য্‌ক্ত না হলেও, এ দেবালয়প্রসঙ্গে বিশ্বাস পরিবার এমন এক অভাবনীয় কীর্তি স্থাপন করেছেন যা সর্বসমক্ষে প্রচারিত হওয়া উচিত।

দশঘরার বিশ্বাস বংশ বহ্‌ প্‌র্‌ষে বৈষ্ণব। গৃহদেবতার নাম রাধাগোপীনাথজীউ। তাঁর মন্দিরটি ছোট: উচচতা আন্‌মানিক ত্রিশ ফ্‌ট। কৃষ্ণম্‌র্তিটি কষ্টিপাথরের ও রাধিকা-ম্‌র্তিটি ধাতুনির্মিত। আজ থেকে ২৪৩ বৎসর প্‌র্বে, ১৬৫১ শকাব্দে (১৭২৯-৩০ খ্‌রীষ্টাব্দে) দেবালয়টি নির্মিত হয়েছিল বলে প্রতিষ্ঠাফলকে উল্লেখিত আছে। কুল-পঞ্জীর বিবরণ অন্‌সারে—"এই দেববংশটি শ্রীচৈতন্যদেবের প্রিয় মোহন্ত শ্রীজগদীশ পন্ডিতের শিষ্য। . মহাপ্রভ্‌র অবতারাবধি বিষ্ণ্‌মন্ত্রাস্থিত। অকপটে বৈষ্ণবাচার ও স্বীয় বাটীতে শ্রীগোপীনাথজীউর সেবা আছে। প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন, সায়ং ত্রিসন্ধ্যা, সপরিবারে আরতিদর্শন, নাম-সংকীর্তন, চরণাম্‌তধারণ এবং প্রায় অনেকেই লক্ষ হরিনাম করিয়া থাকেন। ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণবে অচলা ভক্তি ও অন্য দেবতা বা অন্য উপাসকে দ্বেষ নাই। শারদীয়া প্‌জা ভক্তি সহকারে করা আছে এবং নিত্যনৈমিত্তিক সম্‌দয় যাত্রা, মহোৎসব, অতিথিসেবা ইত্যাদি করিয়া আসিতেছেন।"

বিশ্বাস পরিবারের ভদ্রাসনের দেউড়ি পার হলেই বহুস্তম্ভশোভিত প্রশস্ত চণ্ডী-মণ্ডপ। প্রকাশ, এখানে প্রায় ১৮০ বছর ধরে একাদিক্রমে শারদীয়া দুর্গাপুজো হয়ে আসছে। দুর্গাপ্রতিমা নির্মাণের জন্য কলকাতার কুমোরটুলির এক কুম্ভকার পরিবারের সঙ্গে বিশ্বাস মহাশয়দের বহুদিনের বন্দোবস্ত। সে পরিবারের শ্রীতারাপদ পাল গত ৪০ বৎসর কি তারও কিছু বেশী সময় প্রতি বৎসর দশঘরায় এসে নিজের হাতে প্রতিমা তৈরি করে দিয়ে যান। ১৯৩৭-৩৮ খ্রীষ্টাব্দে এই কারিগরটি এক অভিনব প্রস্তাব করেন এবং আশ্চর্যের বিষয়, বিশ্বাস-বংশের তৎকালীন কর্তারা তাতে সানন্দে রাজী হন। গৃহ-দেবতা রাধাগোপীনাথজীউর মন্দিরটির দক্ষিণ এবং পশ্চিমের দেওয়াল পোড়ামাটির নকাশি টালিতে আবৃত। কালের প্রকোপে অনেকগুলি 'টেরাকোটা' অলংকরণ অতিশয় জীর্ণ হওয়ায়, শ্রীতারাপদ পাল প্রস্তাব করেন, সেগুলির পরিবর্তে মূর্তিখচিত নতুন টালি তিনি নির্মাণ করে দিতে পারবেন। আগেই বলেছি, প্রস্তাবটি অভিনব। এজাতীয় ভাস্কর্যে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ জনৈক কুম্ভকারের পক্ষে এহেন প্রয়াস অসমসাহসিকতা ও নিজ কর্মকুশলতার প্রতি গভীর আস্থার পরিচায়কও বটে। এ বিষয়ে দেবালয়ের মালিক-দের সম্মতিও বিস্ময়কর এইজন্য যে, সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে আমার-দেখা কয়েক হাজার 'টেরাকোটা' মন্দিরের কোনটিতে জীর্ণ পোড়ামাটির অলংকরণের বদলে নতুন নকাশি টালি এত প্রচুর সংখ্যায় লাগানো হয়েছে বলে আমার জানা নেই। বিশ্বাস পরিবারের বর্তমান কর্তা শ্রীবীরেশ্বর বিশ্বাস মহাশয়ের উৎসাহ ও প্রযত্নে, কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর, শ্রীতারাপদ পাল এই অসাধ্যসাধনে সক্ষম হয়েছেন। তাঁর তৈরি একটি 'টেরাকোটা' টালির ছবি এ বই-এর অন্যত্র মুদ্রিত হল। এরকম প্রায় পঞ্চাশটি নতুন টালি জীর্ণ নকশাগুলির পরিবর্তে মন্দিরগাত্রে লাগানো হয়েছে। শ্রীপাল 'চৌরাশি থাক'-এর কুম্ভকার। 'থাক' কথাটির অর্থ একটু বিস্তৃতভাবে বলা প্রয়োজন। মধ্যযুগ ও উত্তর-মধ্যযুগে বঙ্গদেশের মন্দির নির্মাণ ও অলংকরণ-শিল্পীরা গোষ্ঠীবদ্ধভাবে 'গিল্ড' প্রথায় কাজ করতেন। এক-এক অঞ্চলের এক-একটি গোষ্ঠীকে, মৃৎশিল্পের (অথবা অন্য শিল্পের) ক্ষেত্রে 'থাক' নামে অভিহিত করা হত। ইংরেজীতে 'স্কুল' বলতে যা বোঝায়, 'থাক' বলতেও তাই বোঝাত। শতাব্দীকাল পূর্বেও বঙ্গদেশে 'বর্ধমান থাক', 'অষ্টকুল থাক', 'চৌরাশি থাক' প্রভৃতি নামের মৃৎশিল্পী ও 'টেরাকোটা' মন্দির-নির্মাতাদের ভিন্ন ভিন্ন 'স্কুল' ছিল। পূর্বতন ঐতিহ্য অনুসারে প্রতিটি 'থাক' বা শিল্পী-সম্প্রদায় নিজ নিজ বিশিষ্ট পদ্ধতি অনুসরণ করতেন। আবার, কারিগরের ব্যক্তিগত কৃতিত্বের হেরফেরের উপরও শিল্পসৃষ্টির ইতরবিশেষ হত। শ্রীতারাপদ পাল 'চৌরাশি থাক'-এর কুম্ভকার হলেও এই গোষ্ঠীর পূর্ব-আচরিত পোড়ামাটির মন্দির-ভাস্কর্যকলার সঙ্গে তাঁর কোনই পরিচয় নেই। তাঁর জন্মের পূর্বেই সে বিদ্যা বাংলার শিল্পলোক থেকে মোটামুটিভাবে অন্তর্হিত হয়েছে।

শ্রীপাল যে বংশের সন্তান, তাঁদের আদি নিবাস নদীয়া জেলার গোয়াড়ী-কৃষ্ণনগরে। তাঁর পিতা ৺দুখীরামচন্দ্র পাল মধ্য বয়সে পৈতৃক গ্রাম ছেড়ে কলকাতার কুমোরটুলিতে এসে বসবাস শুরু করেন। তারাপদবাবুর বর্তমান বয়স ৭০ বছরের কিছু বেশী হবে। তাঁর কর্মজীবন কুমোরটুলিতে আরম্ভ হলেও, অনেককাল পর্যন্ত গোয়াড়ী-কৃষ্ণনগরের সঙ্গে তাঁর সংযোগ অবিচ্ছিন্ন ছিল। দশঘরার রাধাগোপীনাথজীউ মন্দিরের নতুন 'টেরাকোটা' টালি নির্মাণের জন্য যে চারজন সাহায্যকারীকে তিনি বেছে নিয়েছিলেন, তাঁরা সকলেই গোয়াড়ী-কৃষ্ণনগরের অধিবাসী, কুমোরটুলির নয়।

আমাদের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারের সময় শ্রীপাল বলেন, বর্তমানে তাঁর পরিবারের যৌথ পেশা প্রতিমা নির্মাণ ও কাঁচা-মাটির অন্যান্য মূর্তি ও পুতুল গড়া। তাঁর জীবনে

দশঘরার ব্যতিক্রম ছাড়া তিনি কখনও পোড়ামাটির মন্দির-অলংকরণের কাজ করেননি। পুতুল ও প্রতিমার কাজ বরাবরই তাঁর পরিবারের অবলম্বন। পিতা *দুখীরামচন্দ্র পাল সুদক্ষ মূর্তিশিল্পী ছিলেন, কিন্তু 'টেরাকোটা'-ভাস্কর্যে তাঁর কোন অভিজ্ঞতা ছিল বলে তারাপদবাবু জানেন না। পিতামহ *মতিচন্দ্র পাল পোড়ামাটির মন্দির-অলংকরণের কাজ যে কিছু কিছু করেছিলেন, সেকথা তারাপদবাবুর কাছে জনশ্রুতি মাত্র। তিনি কোথায় কোন্ দেবালয়ের কাজ করেছিলেন, কি পদ্ধতিতে কাজ করতেন, অথবা এই বিশেষ শিল্প-প্রক্রিয়ায় কি কি সাজসরঞ্জাম ব্যবহার করতেন, সে সম্বন্ধে তারাপদবাবুর কোনও ধারণা নেই। দশঘরা মন্দিরের নতুন 'টেরাকোটা' টালি নির্মাণের কৃতিত্ব সেজন্য সম্পূর্ণ-রূপে তাঁর নিজস্ব এবং এ বিষয়ে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে তিনি অন্য কারও কাছে শিক্ষা পাননি। অজস্র রকমের খেলনা-পুতুল ও প্রতিমা তৈরির অভিজ্ঞতা আর প্রবল আত্ম-বিশ্বাস সম্বল করে তিনি দশঘরা মন্দিরের সংস্কারের কাজে হাত দিয়েছিলেন।

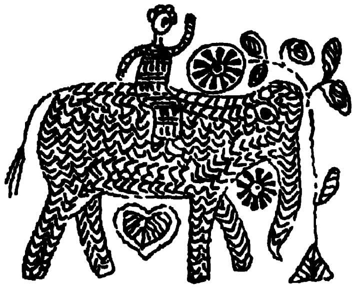
হাতেকলমে কিভাবে কাজ করেছিলেন তার বিবরণ দিতে গিয়ে তারাপদবাবু আমা-দের বলেন, দশঘরা-মন্দিরের 'পুতুলগুলি' (তাঁর নিজের ভাষায়) একটি একটি করে হাতে গড়া। কাঁচা-মাটির দুর্গাপ্রতিমা প্রভৃতি নির্মাণের জন্য ছোটখাট যেসব যন্ত্রপাতি ব্যবহৃত হয়, তাছাড়া অন্য কোন হাতিয়ার তিনি ব্যবহার করেননি। কয়েকটি বড় পুতুলের মুখ তৈরির সময় সেগুলি কেবল ছাঁচে ফেলে তৈরি করা হয়েছিল। ছাঁচগুলি স্বকপোল-কল্পিত উপায়ে তিনি সিমেণ্ট অথবা প্লাস্টার দিয়ে তৈরি করে নিয়েছিলেন। ছাঁচ থেকে বার করবার পর, বাঁশের চাঁচাড়ির সাহায্যে কাঁচা অবস্থাতেই 'মডেল'গুলির উপর সূক্ষ্ম নকাশি কাজ করা হয়েছিল।

অতীতকালের মৃৎশিল্পীরা কোন্ বিশেষ প্রক্রিয়ায় কাঁচা-মাটির মূর্তিগুলিকে পোড়াতেন, সেবিষয়ে তারাপদবাবুর কোন প্রত্যক্ষ জ্ঞান নেই। কুল কাঠের আগুনে অল্প আঁচে দীর্ঘ সময় ধরে পোড়ানোর যে প্রথা নাকি একদা প্রচলিত ছিল, তারাপদবাবুর কাছে তা জনশ্রুতি মাত্র। দশঘরায় তাঁর রচিত পুতুল ও নকশাগুলি গ্রামপ্রান্তের সাধারণ ছাদ-ছাওয়া টালি তৈরির 'পোয়ান'-এ (টালি তৈরির জন্য ব্যবহৃত বিশেষ ধরনের চুল্লিকে মৃৎশিল্পীদের গ্রাম্য ভাষায় 'পোয়ান' বলা হয়) পোড়ানো হয়। এজন্য বিশেষ কোন প্রকারের চুলা বা জ্বালানি ব্যবহার করা হয়নি। সাধারণত যে উত্তাপে টালি পোড়ানো হয়ে থাকে, এই 'টেরাকোটা' মূর্তিগুলিকেও সেই একই উত্তাপে পোড়ানো হয়েছিল। তবে তাপপ্রয়োগ চলেছিল অপেক্ষাকৃত বেশী সময় ধরে, অর্থাৎ এগুলিকে চুল্লিতে আরও কিছু বেশী সময় রাখা হয়েছিল। বলা বাহুল্য, প্রথম চেষ্টাতেই তিনি যে মূর্তিগুলি নিখুঁতভাবে গড়তে পেরেছিলেন এমন নয়। পরীক্ষা-নিরীক্ষায় তাঁর বেশ কিছুদিন কেটেছে; প্রাথমিকভাবে তৈরি অনেক অব্যবহার্য মূর্তি ও নকশাকে বাতিলও করতে হয়েছে। কিন্তু তিনি হাল ছাড়েননি। বঙ্গশিল্পকলার অধুনালুপ্ত এক অপরিচিত জগতে একাকী প্রবেশ করে দ্বিধাগ্রস্তচিত্তে পিছু হটে আসেননি। তাঁকে উৎসাহ ও উদ্দীপনা যুগিয়েছেন, দশঘরার বিশ্বাস পরিবারেব তৎকালীন কর্তা শ্রীবীরেশ্বর বিশ্বাস। এই অভিনব প্রচেষ্টায় কৃতিত্ব সেজন্য উভয়েরই সমভাবে প্রাপ্য। পশ্চিমবাংলার আর কোথাও পোড়ামাটির মন্দির-ভাস্কর্য যে এত যত্নে ও এত প্রচুর সংখ্যায় সংস্কৃত হয়নি, সেকথা আগেই বলেছি। সর্বত্রই দেখেছি, 'টেরাকোটা' দেবালয়গুলি ক্ষয়ে খসে পড়ছে; মালিক-দের ও জনসাধারণের উদাসীনতার সুযোগ নিয়ে লোভী ব্যবসায়ীর দল চোরাবাজারে বিক্রয়ের জন্য অমূল্য অলংকরণগুলি ছাড়িয়ে নিচ্ছে নির্দয়ভাবে। সংশ্লিষ্ট সরকারী দপ্তরও এবিষয়ে সম্পূর্ণ নীরব থেকে চরম অযোগ্যতার পরিচয় দিচ্ছেন। এই লুটপাটের আবহাওয়ায় নিজেদের চেষ্টায় মন্দির-সংস্কারের যে দৃষ্টান্ত দশঘরার বিশ্বাস পরিবার

স্থাপন করেছেন তা যে উচ্চ প্রশংসার যোগ্য তাতে সন্দেহমাত্র নেই।

প্রায় সাত বছর আগে প্রকাশিত আমার 'বাঁকুড়ার মন্দির' গ্রন্থে বিস্তৃত আলোচনার পর সিদ্ধান্ত করেছিলাম যে, ৭০।৮০ বছর পূর্বেও পশ্চিমবঙ্গে পোড়ামাটির মন্দির-ভাস্কর্যকলা অবসাদগ্রস্ত হলেও একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়নি। পরবর্তী অনুসন্ধানের ভিত্তিতে জেনেছি, ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দ অবধি 'টেরাকোটা' মন্দির নির্মিত হয়েছে পশ্চিম-বাংলায় ('ধামতোড়' নিবন্ধ দ্রষ্টব্য)। কিন্তু তারপর বাঙালীর শিল্পজগৎ থেকে দেবালয়-অলংকরণের এই বিশেষ ধারাটি সম্ভবত একেবারে লুপ্ত হয়ে গিয়েছে। এই সময়ের ব্যবধানে বাঙালী-জীবনে যে সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তন দেখা দিয়েছে, তাতে ভরসা হয় না যে এই শিল্পশৈলীটি আবার কোনদিন স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত হবে। গত শতাব্দীর জমিদারতন্ত্রের যুগে মন্দির প্রতিষ্ঠা, জলাশয় উৎসর্গ, অতিথিশালা নির্মাণ প্রভৃতি মহৎ পুণ্যকর্ম বলে স্বীকৃত ছিল। অর্থবান ভূস্বামীরা প্রধানত এই সকল উপায়েই নিজেদের সমাজে স্মরণীয় হবার প্রয়াস পেতেন। বর্তমানকালে অর্থস্বাচ্ছল্য গ্রামবাসী, সমাজ-সচেতন জমিদারকুলের পরিবর্তে নাগরিক বণিককুলের নিকট স্থানান্তরিত হয়েছে। শহুরে সভ্যতার অনিবার্য ফলস্বরূপ তাঁরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আত্মকেন্দ্রিক, সমাজ-মুখাপেক্ষী নন। তাঁদের বদান্যতার স্রোত যে আর কোনদিন মন্দির নির্মাণের দিকে উল্লেখযোগ্যভাবে প্রবাহিত হবে এমন মনে হয় না। তবু, এবিষয়ে হয়ত ভুল নেই যে দুই বাংলার গ্রামগ্রামান্তরে এখনও এমন বহুসংখ্যক মন্দির আছে, যেগুলির মালিকরা পৈতৃক পুণ্যকীর্তি রক্ষার ব্যাপারে একেবারে উদাসীন নন। ইচ্ছা করলেই তাঁরা ক্ষয়িষ্ণু দেবালয়গুলির সংস্কার সাধন করতে পারেন। দশঘরার দৃষ্টান্ত থেকে বলতে পারি, এটি খুব ব্যয়বহুল ব্যাপারও নয়। অর্থ এক্ষেত্রে ততটা প্রতিবন্ধক নয়, যতটা দক্ষ মৃৎশিল্পীর অভাব। সে ক্ষেত্রেও সাহসী ও কুশলী কারিগর যে একেবারে অলভ্য এমন কথা বলা যায় না। কুমোরটুলির শ্রীতারাপদ পাল এ বিষয়ে এক উজ্জ্বল উদাহরণ। আর একজনের কথা জানি; তিনি কুমোরটুলির শ্রীপটলচন্দ্র পাল। কোন দেবালয় সংস্কারের কাজ না করলেও নিজের চেষ্টায় তিনি 'টেরাকোটা'-মন্দিরভাস্কর্যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন বলে শুনেছি। উপযুক্ত সাহায্য ও উৎসাহ পেলে এরকম আরও অনেক মৃৎশিল্পী যে পোড়ামাটির মন্দিরভাস্কর্যকলার দিকে আকৃষ্ট হবেন তাতে সন্দেহ নেই।

দশঘরা মন্দিরের সাবেক ও আধুনিক 'টেরাকোটা' মূর্তিগুলির শিল্পশৈলীতে যথেষ্ট পার্থক্য আছে। এরকম হওয়াই স্বাভাবিক। কেননা, তারাপদ পাল মহাশয়ের নবীন প্রচেষ্টায় দুঃসাহসী অভিনিবেশ থাকলেও পূর্ব ঐতিহ্যের সঙ্গে সংযোগ ছিল না। অতীত কালের শিল্পিগোষ্ঠীগুলি দীর্ঘ চর্চায় যে রীতিনীতি বা 'স্টাইল'-এ অভ্যস্ত ছিলেন, বহুদিন পরের এক নতুন পথিকৃৎ-এর কাছে তা হুবহু আশা করা যায় না। বঙ্গদেশে 'টেরাকোটা' ভাস্কর্যের সূচনাকালে তখনকার প্রবর্তক-কর্মীরাও পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে এক-একটি বিশেষ শৈলী গড়ে তুলেছিলেন। শ্রীতারাপদ পালের মতো আরও কিছু কল্পনাশক্তিসম্পন্ন মৃৎশিল্পী যদি উপযুক্ত উৎসাহ পান, তাহলে পোড়ামাটির মন্দিরভাস্কর্যকলার একটি নতুন 'স্কুলের' হয়ত পত্তন হতে পারে। শুরুতে এ গোষ্ঠীর কারুকৃতির ধরন অবশ্যই বিগত দিনের আদর্শ থেকে পৃথক্ হবে। কিন্তু এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, চর্চা কিছুকাল অব্যাহত থাকলে, একটি সাবলীল শৈলী আপনিই রূপ পরিগ্রহ করবে। এই নতুন রীতি পুরাতনপন্থী না হলেও স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং সুদৃশ্য হতে বাধা নেই। অধুনা সামান্য বিত্তের এক প্রাক্তন জমিদার পরিবার দশঘরার মতো এক দূরবর্তী গ্রামে যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন, অন্যত্র তা ব্যাপকভাবে অনুসৃত হবে এমন আশা নিতান্তই দুরাশা কিনা কে জানে!



ভাস্কুর

একটা প্রশ্ন প্রায়ই শুনি—পশ্চিমবঙ্গের দূরদূরান্তে যেসব জায়গায় আমি গিয়েছি, সেখানে দর্শনীয় কিছু আছে কিনা সেকথা আগেভাগে জানতে পারি কি করে? আমার উত্তর—'দর্শনীয়' কথাটার কে কি রকম অর্থ করেন তার উপরই এজাতীয় প্রশ্নের জবাব নির্ভর করে। অনেককে জানি, যাঁরা মনোরম প্রাকৃতিক দৃশ্য বা প্রাচীন ইমারতকেই এক-মাত্র দর্শনীয় বস্তু বলে মনে করেন। সেজন্য ছুটিছাটায় অশেষ ক্লেশ স্বীকার করে তাঁরা যান কুলু, কাশ্মীর, কন্যাকুমারী, উটিতে অথবা আগ্রা, ফতেপুর সিক্রী, ভুবনেশ্বর, কোনারকে। সেসব জায়গার মতো 'দর্শনীয়' জিনিস পশ্চিমবাংলার কম গ্রামেই আছে, যদিও ভিন্ন স্বাদের নিসর্গশোভা মোটেই বিরল নয়। আমার অভিনিবেশের ক্ষেত্র যেহেতু সংকীর্ণ নয়, সেজন্য একেবারে কিছুই দেখবার নেই এরকম গ্রাম পশ্চিমবঙ্গে আমি কমই দেখেছি। অতএব আগেভাগে খবর না পেলেও আমার খুব যায় আসে না। যেখানেই যাই না কেন, চোখ আর মন দুই-ই খোলা রাখলে, কিছু-না-কিছু প্রায়ই জুটে যায়।

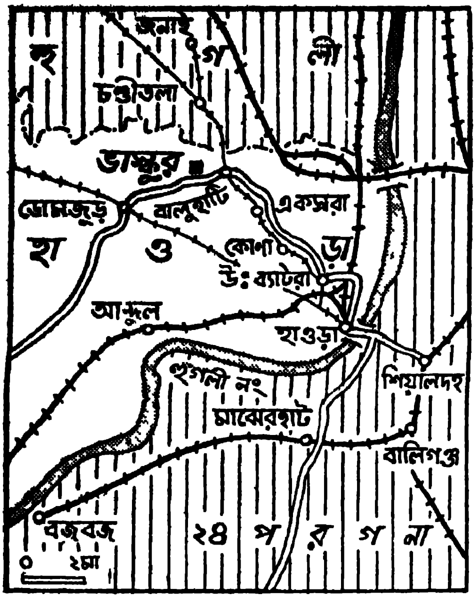
কোন কোন জায়গার খবরাখবর অবশ্য রওনা হবার আগেই পেয়ে থাকি। সেসব সংবাদের কিছু আসে বইপত্র থেকে আর কিছুর যোগান দেন একই পথের পথিক সহকর্মীরা। বলা বাহুল্য, তুলনামূলকভাবে তাদের মূল্য কম। কেননা, নতুন নতুন স্থান বা বিষয়বস্তু আবিষ্কার করাই বেশী দরকার যা অন্যে এখনও দেখেননি বা সে বিষয়ে লেখেননি। চর্বিতচর্বন সোজা ব্যাপার হওয়ায় অনেকেই সেপথ বেছে নেন সত্য, কিন্তু আশার কথা, এমন পরিশ্রমী গবেষকও কিছু কিছু আছেন, যাঁরা লাইব্রেরীর বাইরে বহু-বিচিত্র লোকসমাজ থেকেই তাঁদের অভিনিবেশের বস্তু খুঁজে বার করতে ভালবাসেন। নতুন বিষয়ের পরিবেশন তাঁদের দ্বারাই সম্ভব। পুরাতন জ্ঞান অবশ্যই পরিত্যাজ্য নয় এবং তার আহরণের জন্য গ্রন্থাগার অপরিহার্য। কিন্তু নতুন জ্ঞানের সংযোজনে সাবেক জ্ঞানভাণ্ডার যদি চক্রবৃদ্ধিহারে না বাড়ে, তবে দেশের দুর্দিন বলতে হবে। প্রতি বছরই গোলায় যদি কিছু ধান না তোলা যায়, তবে পুরানো সঞ্চয়ে—তা সে যত বিশালই হোক না কেন—গৃহস্থের আর কতদিন চলতে পারে? আমাদের ইতিহাস ও লোকসংস্কৃতির জ্ঞানভাণ্ডারকে সতত সমৃদ্ধ রাখবার একমাত্র উপায় অনুসন্ধানীদের পথে নেমে পড়া। সেপথ বাঙালীর বিচিত্র জীবনচর্যার দিকে দিকে প্রসারিত। এসব পথিকদের কেউ যে খালি হাতে ফিরবেন না, সেকথা আমি নিশ্চয় করে বলতে পারি। তারপর, তাঁদের নতুন আবিষ্কারগুলি সম্বন্ধে উত্তম-অধম যেরকম আলোচনাই পত্রপত্রিকায় বা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হোক না কেন, বাঙালীর সর্বাঙ্গীণ ইতিহাস রচনার জন্য সেগুলিই হবে বহুমূল্য উপকরণ। আজ হোক, কাল হোক, এসব ছড়ানো-ছিটানো উপাদান থেকেই ভবিষ্যতের

গবেষকরা তাঁদের বৃহৎ কর্মের মালমশলা সংগ্রহ করতে পারবেন।

আগেভাগে যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ করে কোন স্থান পরিদর্শন করাটা সাবধানীর কাজ হতে পারে, খাঁটি অনুসন্ধানীর কাজ নয়। এই সংকীর্ণ নিয়ম মেনে চললে শুধু সেসব জায়গাতেই যাওয়া সম্ভব যেখানে আগে আর কেউ গিয়েছেন অথবা যেখানকার দর্শনীয় বস্তু সম্বন্ধে মুদ্রিত বিবরণ পাওয়া যায়। আমি শুধু ম্যাপ দেখে বহু জায়গায় গিয়েছি এবং ইতিপূর্বে অজ্ঞাত সেখানকার দর্শনীয় বস্তু দেখে বিস্মিত হয়েছি। অনেক সময় এক 'চেনা' গ্রাম থেকে আর এক 'চেনা' গ্রামে যাবার পথে হুমড়ি খেয়ে পড়েছি অচেনা বিষয়-বস্তুর গায়ে। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে এক বিষয়ের অনুসন্ধান করতে গিয়ে, একই স্থানে সম্পূর্ণ ভিন্ন অথচ চিত্তাকর্ষক জিনিসের মুখোমুখি হয়েছি। মেদিনীপুর জেলার এক অসামান্য কুটিরশিল্প 'গয়না-বড়ি' এভাবে আবিষ্কার করি এক অখ্যাত গ্রামে, যেখানে গিয়েছিলাম আসলে পুরাকীর্তির সন্ধানে। পুরাকীর্তি ছাড়াও সেখানে বাড়তি লাভ হয়েছিল এই 'গয়না-বড়ি'। তারপরে, সেই প্রথম সূত্র ধরে আরও কিছু অনুসন্ধান চালিয়েছি। আশা করি, এ বিষয়ে মোটামুটি একটা পূর্ণাঙ্গ কভারেজ অদূর ভবিষ্যতে খাড়া করা যাবে। তখন অকস্মাৎ-আবিষ্কৃত এই অনুপম গৃহশিল্পটি সম্বন্ধে আমার অনুসন্ধানের অংশীদার হবেন সেই সব আদর্শ গবেষক, যাঁরা ভবিষ্যতে বাঙালী জাতির পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনা করবেন।

বিনা [illegible] হঠাৎ-পাওয়া আর একটি বিষয়ের অবতারণা করব বর্তমান প্রবন্ধে। হাওড়া থেকে মার্টিন কোম্পানীর যে রেল-লাইন গিয়েছে শিয়াখালায়, তার প্রায় পাশা-পাশি এক পিচের রাস্তা আছে ব্যাঁটরার কাছ থেকে শিয়াখালা অবধি। ব্যাঁটরা, কোণা ও একসারা স্টেশন ছাড়িয়ে বালুহাটি। সেখান থেকে বাঁহাতি এক শাখাপথ—সেটিও পিচের—গেছে ডোমজুড়ের দিকে। এ পথেই ৫৭-এ নম্বর বাস কলকাতার এসপ্লানেড থেকে ছেড়ে হাওড়া শহর হয়ে ডোমজুড় পর্যন্ত যাতায়াত করে। কিছুটা নিরুদ্দেশ ভ্রমণের মতো এ রাস্তায় চলেছিলাম একদিন। গন্তব্যস্থল অবশ্য ছিল একটা—নার্না। ডোমজুড় থানার উত্তর সীমার এ গ্রামে অবস্থিত পঞ্চানন্দ ঠাকুরের খ্যাতি দূরবিস্তৃত। ম্যাপে দেখানো ছিল বালুহাটি-ডোমজুড় সড়কের কিছু উত্তরে সে গ্রাম, কিন্তু পথঘাটের কোন স্পষ্ট নিশানা ছিল না। নার্নার পঞ্চানন্দ এ অঞ্চলের এতই প্রসিদ্ধ লৌকিক দেবতা যে পথঘাটের সঠিক খবর ছাড়াও আমরা বেরিয়ে পড়েছিলাম; ভরসা ছিল, স্থানীয় লোকজনদের জিজ্ঞাসা করতে করতে পিচের রাস্তা থেকে নার্নায় পেঁছনো সম্ভব হবে।

বালুহাটি থেকে চলেছি ডোমজুড়ের দিকে। মাঝে মধ্যে পথচারীদের জিজ্ঞাসা করছি নার্নার কথা। এমন সময় এক গ্রামে এসে উপস্থিত হলাম, প্রথম দর্শনে যাকে কুম্ভকারদের গ্রাম বলে মনে হল। রাস্তার দু'পাশে কুমোরদের বাড়ির আনাচে-কানাচে পোড়ামাটির রাশি রাশি কুয়োর পাট, গামলা, হাঁড়ি প্রভৃতি শুকোতে দেওয়া হয়েছে রোদ্দুরে। অভিনব কিছু নয়; পশ্চিমবঙ্গের অজস্র গ্রামে এরকম কুম্ভকারপল্লী দেখা যায়। তবু পথের দু'দিকে চোখ রেখে চলেছিলাম। আর ঠিক তখনই সেই অপ্রত্যাশিত ঘটনাটা ঘটল; হঠাৎ গিয়ে পড়লাম এক নতুন অভিজ্ঞতার মুখোমুখি। রাস্তার পাশে এক টালি-ছাওয়া বাড়ির দাওয়ায় এক প্রৌঢ় চেয়ারে বসে ছিলেন। একটু নজর করতেই বুঝলাম, কাঠের তৈরি চেয়ারের মতো দেখতে হলেও চেয়ারটি আগাগোড়া পোড়ামাটির তৈরি। 'টেরাকোটা' চেয়ার! জন্মে কখনো দেখিনি, শুনিওনি। কলকাতা থেকে সরাসরি বাসে যেখানে আসা যায়, সেরকম হাতের কাছের গ্রামে এহেন তাজ্জব জিনিস কল্পনাতীত। বেশ অশোভন দ্রুততায় ধেয়ে গেলাম সেই প্রৌঢ়ের দিকে। তারপরে, তাঁর ও কুম্ভকারপল্লীর আরও কয়েকজনের সঙ্গে আলাপ করে 'টেরাকোটা' চেয়ারের রহস্য উদ্ঘাটন করলাম কিছুক্ষণ



বাদে।

গ্রামের নাম ভাস্কুর। ডোমজুড়-বালুহাটি সড়কে ডোমজুড় থেকে প্রায সাড়ে তিন মাইল ও বালুহাটি থেকে দেড় মাইল দূরে অবস্থিত। লোকসংখ্যা—আনুমানিক এক হাজার। তার মধ্যে ব্রাহ্মণ, সদ্‌গোপ ও মাহিষ্যই প্রধান। গ্রামীণ নেতৃত্ব প্রথম সম্প্রদায় দু'টির হাতে। কুম্ভকার পবিবার দশ-বারো ঘবেব বেশী নয়। তাঁদের উপাধি—পাল; পেশা—প্রধানত কুয়োর পাট, হাঁড়ি ও গামলা তৈরি কবা।

প্রৌঢ় তাঁর নাম বললেন কানাই পাল। এখানেই বহু পুরুষের বাস। কুয়োর পাট, হাঁড়ি, গামলা প্রভৃতি তৈরি করাই তাঁর পৈতৃক পেশা বটে, তবে চেয়ারটি বানিয়েছেন নিছক ব্যক্তিগত শখের জন্য। মাটি নিয়েই তাঁদের কারবার, মাটি পুড়িয়েই তাঁদের দু' বেলা দু' মুঠো জোটে। মাঝে মাঝে খেয়াল যায় নতুন কিছু করতে। সে খেয়ালেরই ফসল এই চেয়ার। তাঁর গৃহস্থালীর প্রয়োজনে আরও দু' চারটি তৈরি করে নিয়েছেন। সেগুলি আছে বাড়ির অন্দরে। পোড়ামাটির চেয়ার বানাতে ছাঁচের ব্যবহার হয় না। হাত দিয়েই পায়া, হাতল, বসবার আসন ও হেলান দেবার পাটাতন তৈরি করে পরস্পরের সঙ্গে জুড়ে ভাটিতে পুড়িয়ে নেওয়া হয়। কুয়োর পাট পোড়াবার ভাটি খুব বড় আকারের হয়। তার মধ্যে চেয়ার তো দূরের কথা, গোটা একখানা 'টেরাকোটা' খাটও ঢুকে যেতে পারে। খাট অবশ্য এ গ্রামের কেউ এখনও তৈবি করেননি। তবে তাতে কোন বাধা আছে বলেও মনে হয় না। সে যাই হোক, শখের চেয়ারের রং যাতে সুন্দর ও উজ্জ্বল হয় সেজন্য পোড়াবার আগেই তাতে দু'প্রস্থ গোলা রং মাখিয়ে নেওয়া হয়। প্রথমটি তৈরি হয় 'বেলি-বনক' নামের হলুদ রঙের এক বিশেষ জাতের মাটি গুলে যা এখানকার কারিগররা আমদানি করেন মেদিনীপুর জেলার চন্দ্রকোণা থেকে। দ্বিতীয় প্রলেপের উপাদান কালো রঙের এক শ্রেণীর মাটি যা পাওয়া যায় হুগলী জেলার মশাট, জঙ্গলপাড়া প্রভৃতি অঞ্চলে। ভাটিতে পুড়ে এই প্রলেপের আবরণ পরিণত হয় উজ্জ্বল, মসৃণ 'টেরাকোটা'র রঙে। শুধু মনোরম রং হলেই হয় না। শখের জিনিস কিনা তাই কিছু কারিগরিরও

প্রয়োগ হয়ে থাকে। কানাই পাল মশায়ের 'টেরাকোটা' চেয়ারে হাতে-তৈরি দু'টি ভারবাহী মানুষের মূর্তি সামনের পায়া দু'টির স্থান অধিকার করেছে আর হাতল দু'টির নীচে বসানো হয়েছে আর দু'টি বেঁটেখাটো মানুষ যারা দু'হাত তুলে হাতলের ভার বহন করছে। কিন্তু সহজেই বোঝা যায় নকাশি কাজের পরিধি অনায়াসেই আরও বহুদূর বিস্তৃত করা সম্ভব। পায়ায় ব্যবহৃত ঢ্যাঙা মানুষগুলি অনায়াসেই রূপলাবণ্যবতী যুবতীতে পরিণত হতে পারে। হাতলের সামনের দিকে দু'টি সিংহের মুখ থাকতেও বাধা নেই। আবার হেলান দেবার পাটাতনে যদি ময়ূরের ছড়ানো পেখম মোলায়েমভাবে উৎকীর্ণ হয় তাতেই বা ক্ষতি কি! বসবার আসনের ঠিক নীচে চারদিকে যে প্লেন পটি লাগানো আছে, তার গায়ে মন্দির-'টেরাকোটা'র অনুকরণে কৃষ্ণলীলা বা বাবু-বিবি-বিলাসের দৃশ্যও দেখানো যেতে পারে। আর, ঠিক সেই সঙ্গে যদি বঙ্গকৃষ্টিপ্রাণ ও বঙ্গ-কৃষ্টিপ্রাণাদের মধ্যে একটু প্রচার অভিযান চালানো যায়, তাহলে 'বাঁকুড়ার ঘোড়া'র মতোই এ 'টেরাকোটা' চেয়ার চক্ষের নিমিষে 'স্ট্যাটাস সিম্বল'-এ পরিণত হয়ে অগণিত ড্রয়িং-রুমের শোভাবর্ধন করবে। কানাই পাল মহাশয় বলেছিলেন, পোড়ামাটির কেদারা তিনি কখনো বিক্রি করবার চেষ্টা করেননি। সেজন্য অতশত অলংকরণের কথা তাঁর মাথায় আসেনি। তবে পোড়ামাটির মোড়া কিছু কিছু বিক্রি হয়েছে। সেগুলিও সাদাসিধাভাবে তৈরি ও দেখতে অনেকটা বাঁশ-বেতের মোড়ার মতোই। তবে তুলনায় অনেক বেশী ভারী। (চেয়ারখানা প্রায় এক মণের মতো ভারী মনে হয়েছিল)। ওজনের অসুবিধাটাই 'টেরাকোটা' আসবাবের ঘোরতর বিপক্ষে। তবে সুবিধার দিকও আছে। কাঠের আসবাবে ঘুণ ধরে, ছারপোকা হয়, টেকেও কম। পক্ষান্তরে—ভেবে দেখুন—এক প্রস্থ পোড়ামাটির আসবাব বানাতে পারলে দু' চার পুরুষের মতো নিশ্চিন্দি। তাছাড়া ছিঁচকে চোরের সাধ্যি নেই তা তুলে নিয়ে যায়।

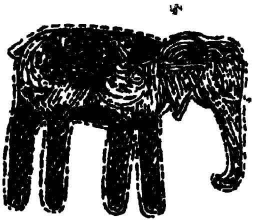
কানাই পাল মশায়ের কাছে বিদায় নিয়ে গেলাম কাছাকাছি শিবনারায়ণ পালের বাড়ি। তিনি বয়সে ছোট, কিন্তু এ শিল্পে তাঁর অভিজ্ঞতা কম নয়। বললেন, তাঁর স্বর্গত পিতা উপেন্দ্রনাথ পাল প্রথম এজাতীয় শিল্পকর্মের উদ্ভাবন করেন। তাঁর আমলের এক প্লেন 'টেরাকোটা' চেয়ার এখনও এ পরিবারে রক্ষিত আছে। শিবনারায়ণবাবু তাছাড়া পোড়া-মাটির যে আটচালা মন্দিরটি দেখালেন, তা উচ্চতায় প্রায় তিন ফুট ও দৈর্ঘ্যপ্রস্থে দেড় ফুটের মতো। ভিতরটা ফাঁপা হওয়াতে ওজন খুব বেশী নয়। কিন্তু শূন্যগর্ভ এ শিল্প-বস্তুটির নির্মাণে যে প্রচুর কারিগরি দক্ষতার প্রয়োজন হয়েছে তা সহজেই বোঝা যায়। শিবনারায়ণবাবুর ঝোঁকটা সূক্ষ্মতর শিল্পকর্মের দিকে। অনেক দিন আগে তিনি বুদ্ধ-গয়া মন্দিরের বেশ বড় একটি 'টেরাকোটা' মডেল তৈরি করে কুমোরটুলির এক প্রদর্শনীতে দিয়েছিলেন, যেখান থেকে এক সাহেব সেটি কিনে নিয়ে যান চড়া দামে। এছাড়া দু' দিকে চাকাওয়ালা এক কামানও তিনি বানিয়েছিলেন। সেটিও বিক্রি হয়ে গিয়েছে। চেয়ার, গোল টেবিল, মোড়া প্রভৃতি 'টেরাকোটা' আসবাব তৈরি করে থাকলেও সূক্ষ্ম মডেলই তাঁর বেশী প্রিয়। এজন্য ছবি বা আলোকচিত্র দেখে কাজ করতে তাঁর কোনো অসুবিধা হয় না। বুদ্ধগয়ায় মন্দির বা কামান তিনি ছবি দেখেই তৈরি করেছিলেন। কিন্তু তাঁর বংশগত পেশা বছরের পর বছর রাশি রাশি কুয়োর পাট, হাঁড়ি ও গামলা উৎপাদন করা। তাতে তাঁর পেট ভরে, কিন্তু মন ভরে না। অল্প আলাপেই বুঝলাম, জীবিকার প্রসঙ্গে বেশ ক্ষোভ জমে আছে তাঁর মনে। যে শিল্পকর্ম তাঁর আয়ত্ত তা তিনি পুরোপুরি অবলম্বন করতে পারেন না; যে দক্ষতা তাঁর অধিগত তার প্রয়োগের কোন উপায় নেই। পরিবারের অন্নসংস্থানের জন্য তাঁকে মামুলি জিনিস বানিয়ে মরতে হচ্ছে চিরকাল। এ মনস্তাপ শুধু তাঁর একার নয়; জীবনের বিস্তৃত ক্ষেত্রে এই একই ক্ষোভ কত যে দেখেছি তার

ইয়ত্তা নেই। প্রতিকূল অবস্থার চাপে এক দিকে উজ্জ্বল সব প্রতিভা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে আর অন্য দিকে অনুকূল পৃষ্ঠপোষকতায় কতশত ভুঁইফোড় খ্যাতিপ্রতিপত্তিতে সমাজের শীর্ষস্থান অধিকার করছে' একটু অপ্রাসঙ্গিক হলেও, তীক্ষ্ন ব্যঙ্গে দ্যুতিমান, 'লিমেরিক'ধর্মী ছোট্ট একটি বাংলা কবিতার এখানে উল্লেখ না করে পারছি না। 'বনফুল' না সজনী দাসের রচনা ঠিক মনে নেই। এ কবিতার যাঁরা উদ্দিষ্ট, এত ঘন ঘন তাঁদের দেখা পেয়েছি (ও ভবিষ্যতেও পাব বলে আশঙ্কা করি) যে বহুদিন-আগে-পড়া এ কবিতা আমার পক্ষে ভোলা সম্ভব হয়নি।

"ঘোড়া খায় হিমশিম
এ খবর সাঁচ্চা,
কিছুতে হয় না ডিম
হয় খালি বাচ্চা।
অথচ বাজারময়,
ঘোড়ার ডিমেরই জয়,
চিন্তিত ঘোড়া কয়—
এ আপদ আচ্ছা,
যতই চেষ্টা করি, হয় খালি বাচ্চা।"

'ঘোড়ার ডিমের' এই জয়জয়কারের যুগে 'ঘোড়ার বাচ্চা'দের কি গতি হচ্ছে সেকথা একবার স্থিরভাবে ভেবে দেখা দরকার। আলোচ্য প্রসঙ্গে ফিরে এসে সঙ্গতভাবেই প্রশ্ন করা যায়—এসব কুশলী 'টেরাকোটা' শিল্পীদের কুয়োর পাট অথবা গামলা বানানোর দায় থেকে উদ্ধার করে তাঁদের প্রতিভাবিকাশের পথ কি খুলে দেওয়া যায় না?

যেসব নকাশি আসবাব ও শিল্পবস্তুর উল্লেখ করেছি, তা তাঁদের দক্ষতা ও সম্ভাবনার সূচক মাত্র। তৈরী বাজার নেই বলে এজাতীয় আর পাঁচ রকম মডেলে হাত দিতে তাঁরা ভরসা পান না। সমস্ত শিল্পকর্মটি এখনও তাঁদের কাছে ব্যক্তিগত শখের পর্যায়েই রয়ে গেছে। একমাত্র সহৃদয় পৃষ্ঠপোষকতায় তাঁদের প্রতিভা আরও বিকশিত হতে পারে। সরকারী ও বেসরকারী ক্ষেত্রে এহেন সমর্থন খুবই সম্ভব। দেশের সর্বত্র প্রতিদিনই যে অসংখ্য পাকা বাড়ি তৈরি হচ্ছে তার অলংকরণের জন্য কিছু কিছু 'টেরাকোটা' প্যানেল ব্যবহার করলে কেমন হয়? রৌদ্রবৃষ্টির হাত থেকে বাঁচাবার সামান্য ব্যবস্থা করলে তাদের সাধারণ পাকা বাড়ির মতোই আয়ু হতে পারে। কলকাতার বিড়লা প্ল্যানেটোরিয়ামের চক্রাকার দেওয়ালে কিছু দূর দূর অন্তর অনেকগুলি প্রস্ফুটিত পদ্মের 'বা রিলিফ' উৎকীর্ণ আছে। 'টেরাকোটা' পদ্মের অনুরূপ এই পরিচ্ছন্ন অলংকরণে ইমারতটির বহিরঙ্গের শোভা যে বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। এহেন সজ্জা আরও নানা প্রকারের হতে পারে এবং গৃহস্থাপত্যে তাদের প্রয়োগ অভিনন্দিত হবার যোগ্য। ইঞ্জিনিয়ার ও গৃহস্বামীরা যদি এ বিষয়টি সহৃদয়তার সঙ্গে ভেবে দেখেন তবে বর্তমান প্রবন্ধে আলোচিত 'টেরাকোটা' শিল্পীদের হয়ত বা একটা গতি হতে পারে।



মন্দিরদ্বার

শিরোনামটি নিছক আক্ষরিক অর্থে—মন্দিরের দরজা—এই অর্থে ব্যবহৃত; হরিদ্বার, নাথদ্বার বা স্বর্গদ্বারের মতো কোন জায়গার নাম নয়। কিন্তু সে বস্তু তো আর পাঁচটা দরজার মতোই অতি সাধারণ মামুলি জিনিস—তা নিয়ে প্রবন্ধ হয় কি করে? অধিকাংশ মন্দিরদ্বার সম্বন্ধে হয় না সত্য; কিন্তু কিছু কিছু নিদর্শন সম্বন্ধে হয়, কেননা তারা রীতিমত অসাধারণ। যদি বলি বঙ্গসংস্কৃতির একটা বিশেষ দিক তাদের মধ্যে প্রতি-ফলিত, তবে কিছুমাত্র অত্যুক্তি করা হয় না। কথাটা বুঝিয়ে বলি।

সম্প্রতিকালে, পশ্চিমবঙ্গের, বিশেষ করে রাঢ় অঞ্চলের, 'টেরাকোটা' মন্দির সম্পর্কে সাধারণের মধ্যে কিছু কৌতূহল এমন কি আগ্রহের সৃষ্টি হয়েছে। মুষ্টিমেয় কয়েকজন অনুরাগী সে বিষয়ে গভীরভাবে অনুসন্ধানও করছেন। কিন্তু পূর্ববঙ্গে এ শ্রেণীর যে বহুসংখ্যক দেবালয় আছে, তাদের সম্বন্ধে প্রকাশিত তথ্য এখনও খুবই কম। যে পরিশ্রমী গবেষকটি এ বিষয়ে সরেজমিনে বেশ ভাল কাজ করেছিলেন—আমি ডেভিড ম্যাক্‌কাচনের কথা বলছি—তাঁর অকালমৃত্যুতে এ বিদ্যা সাধারণের গোচরে আসতে অবশ্যই কিছু দেরী হবে। তবে আজ হোক, কাল হোক, পশ্চিমবঙ্গের অনুসন্ধানকারীরা বা বাংলা-দেশের সংস্কৃতিপ্রেমী গবেষকরা এ বিষয়ে নিশ্চয়ই অন্বেষণ করে তথ্যাদি প্রকাশ করবেন। ততদিন বাংলাদেশের (অর্থাৎ পূর্ববঙ্গের) মন্দিরে পোড়ামাটির অলঙ্করণ সম্পর্কে বিশদ বিবরণের জন্য আমাদের অপেক্ষা করে থাকতে হবে।

এ তো গেল আঞ্চলিক অধ্যয়নের ব্যাপার, যদিও বাংলা-মন্দিরের সর্বাঙ্গীণ সমীক্ষার ক্ষেত্রে তার গুরুত্ব কিছুমাত্র কম নয়। কিন্তু অধ্যয়ন যেখানে বেশ কিছুটা অগ্রসর হয়েছে—যেমন পশ্চিমবঙ্গে—সেখানেও অধীত বিষয়ের কোন কোন শাখা সম্পর্কে প্রকাশিত তথ্যের এখনও খুব অভাব। মন্দির-'টেরাকোটা' সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলে, কি গবেষক কি সাধারণ পাঠক, সেদিকে যতদূর আগ্রহী, দেবালয় নির্মাণ-প্রকরণ সম্বন্ধে ততদূর আগ্রহী কিনা সন্দেহ। তুলনামূলকভাবে মন্দিরস্থাপত্যবিদ্যা অবশ্যই বেশী দুরূহ বিষয়। পোড়ামাটির সজ্জার মতো তাতে সহজেই চোখ ভোলে না। বিষয়বস্তুটি বুঝতেও অসুবিধা হতে পারে, যদি স্থপতির কাজ বা বাস্তুবিদ্যা সম্পর্কে মোটামুটি একটা জ্ঞান না থাকে। সেজন্য আজ অবধি মন্দিরকলার এই নীরস দিকটি সম্বন্ধে অপেক্ষাকৃত অল্প অভিনিবেশ নিযুক্ত হয়েছে। পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত নানান প্রবন্ধ থেকে অন্তত তা-ই মনে হয়। সেসব লেখায় পোড়ামাটির সজ্জার উপরে সচরাচর যতটা গুরুত্ব আরোপিত হতে দেখি, দেবালয়ের গঠনপদ্ধতির উপর ততটা দেখি না। এই অসম মনোযোগ চিরদিনই অপরিবর্তিত থাকবে এমন হওয়া সম্ভব নয়। কেননা, সংখ্যায় নগণ্য হলেও কিছু খাঁটি

গবেষক এই শেষোক্ত বিষয়টির চর্চা করছেন। আশা করা যায়, তাঁদের প্রকাশিত তথ্যে সাধারণ অনুসন্ধিৎসুরাও যথেষ্ট পরিমাণে শিক্ষিত হয়ে উঠবেন ও আজকের ঘাটতি যথাসময়ে পূর্ণ হবে।

মন্দিরকলার আর একটি দিক সম্বন্ধেও অদ্যাবধি যথেষ্ট অনুসন্ধান বা অধ্যয়ন হয়নি। সেটি মন্দিরদ্বার বা মন্দিরের দরজা সম্পর্কে। 'টেরাকোটা' মন্দিরের বহিরঙ্গ সজ্জার মতোই গর্ভগৃহে প্রবেশের কপাট দু'টিও যে কোন কোন ক্ষেত্রে অপরূপ কাঠ-খোদাইয়ের কাজে মণ্ডিত হত, সেকথা সুবিদিত নয়। এর প্রধান কারণ এজাতীয় নিদর্শনের স্বল্পতা। পশ্চিমবঙ্গের হাজার হাজার 'টেরাকোটা' মন্দিরের মধ্যে শ'খানেকেও এহেন অলংকরণ ব্যবহৃত হয়েছে কিনা সন্দেহ; আমি নিজে এখনও পনের-কুড়িটির বেশী দেখিনি। অন্য গবেষকদের কাছ থেকে আরও কিছুর খবর পেয়েছি। তবে উভয় বাংলায় দেবালয়ের সংখ্যা এতই অগণিত ও তাদের অধিকাংশের অবস্থান এমন দূর পল্লীঅঞ্চলে যে, কোন ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে তাদের সবগুলি দেখা নিতান্তই অসম্ভব। সেজন্য অলংকৃতদ্বার মন্দিরের সঠিক সংখ্যা কত তা না বলা গেলেও আমাদের কয়েকজনের দীর্ঘ-কালের অনুসন্ধানের ভিত্তিতে মোটামুটি একটা হিসাবে উপনীত হওয়া যেতে পারে।

হাওড়া, হুগলী ও মেদিনীপুর—এ তিনটি জেলাতেই যে এজাতীয় মন্দির প্রধানত কেন্দ্রীভূত তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই কেননা, সেখানেই কাঠ-খোদাই শিল্পীরা একদা যথেষ্ট সংখ্যায় কাজ করেছেন। এখনও তাঁদের দু'চারজন অবশিষ্ট আছেন, তবে পৃষ্ঠ-পোষকতার অভাবে তাঁদের সংখ্যা খুবই হ্রাস পেয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য জেলা-গুলিতে কাঠের ভাস্কর্যের অনুশীলন এখন একরকম লোপই পেয়েছে বলা চলে, যদিও অলংকৃতদ্বার দেবালয়ের কয়েকটি নিদর্শন বীরভূম, বাঁকুড়া, নদীয়া, ২৪-পরগণা প্রভৃতি জেলাতেও দেখা যায়। কাঠের কারিগররা আগে কোথায় কোথায় কেন্দ্রীভূত ছিলেন তা জানা যায় কাছেপিঠের প্রাচীন রথ, বৃষকাষ্ঠ বা কাঠের দেবদেবীমূর্তি থেকে। কাঠের বিগ্রহ উত্তরবঙ্গে এতই দুর্লভ যে সেখানকার অধিবাসীরা এজাতীয় নিদর্শন হয়ত খুব কমই দেখে থাকবেন। বিখ্যাত কাঠের রথও সেখানে নেই বললেই চলে। পক্ষান্তরে, হুগলী জেলার গুপ্তিপাড়া, চন্দননগর, মাহেশ ও দশঘরা; হাওড়া জেলার অমরাগড়ি ও মেদিনীপুর জেলার মহিষাদল, রামবাগ, নাড়াজোল প্রভৃতি স্থানের কাঠের রথগুলি আকার ও কারুকার্যের জন্য প্রসিদ্ধ। এ তিনটি জেলায় কাঠের কালী, ভৈরবী প্রভৃতি দেবদেবীমূর্তিও এত অধিক সংখ্যায় বর্তমান যে তাদের নির্মাণে যে একদা অগণিত 'সূত্রধর' শিল্পী নিয়োজিত হয়েছিলেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকে না।

এই কারিগরগোষ্ঠীর একটি শাখা হাওড়া জেলার আমতা থানার থলিয়া-রসপুর (চলতি কথায় থলে-রসপুর) গ্রামে এখনও সক্রিয় আছেন। তাঁদের পূর্বপুরুষদের নামাঙ্কিত বহু কাঠের রথ ও বিগ্রহ এখনও নানা স্থানে দেখা যায়। বছর দুই-তিন আগে এ গ্রামটি পরিদর্শনের সময় ৭০ বছরের বৃদ্ধ এক কাঠের কারিগরের সাক্ষাৎ পেয়েছিলাম। তিনি তখনও কর্মঠ ছিলেন ও পুরনো দিনের নানান খবরাখবর দিয়েছিলেন আমায়। মন্দিরের অলংকৃত দরজার কাজ তাঁর বাপ-জ্যাঠার আমলে যথেষ্ট হয়েছে; তিনি নিজেও কিছু কিছু করেছেন। তিনিই একমাত্র প্রাচীন শিল্পী যাঁর এ বিষয়ে নিজস্ব অভিজ্ঞতার কথা আমাদের শোনবার সুযোগ হয়েছিল। সেগুন কাঠই নাকি সচরাচর ব্যবহৃত হত। পুরু তক্তার উপর প্রার্থিত নকশাটি ছু'চলো কাঠকয়লা দিয়ে এ'কে নিয়ে খোদাই কাজ শুরু করা হত। হাতুড়ি, করাত, র‍্যাঁদা, তুরপুন, উকো ও কয়েক প্রস্থ ছোট-বড় বাটালি—চিরাচরিত এই সামান্য হাতিয়ারে অর্ধ-চিত্র বা 'বা-রিলিফ' পদ্ধতিতে নকশাগুলিকে রূপায়িত করার মতো কঠিন কাজ সম্পন্ন হত প্রধানত বংশগত দক্ষতার

কল্যাণে। তারপরে, অন্তর্বর্তী স্থানে পুরু কাঠের নকাশি পাটি লাগিয়ে খোদাই-করা প্রধান প্যানেলগুলিকে একত্র করে নেওয়া হত কপাটের আকারে। পাটিগুলিতে কেবল লতা বা ফুলকারি নকশাই থাকত, মূর্তি-ভাস্কর্য সাধারণত থাকত না। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নকাশি অংশের উপরের দিকের আকৃতি হত খিলানের মতো এবং সেই বাঁকানো শীর্ষের ঠিক নীচে, প্রতি কপাটে একটি ও তার নীচের সমান্তরাল সারিগুলিতে দু'টি করে প্যানেল উৎকীর্ণ করা হত। মন্দিরের কাঠের দরজায় উৎকীর্ণ এসব অর্ধ-চিত্রের সঙ্গে 'টেরাকোটা' সজ্জার অতি নিকট সাদৃশ্য বিশেষভাবে লক্ষণীয়। এতে আশ্চর্যের কিছু নেই এইজন্য যে শেষ-মধ্যযুগের বাঙালী 'সূত্রধর' শিল্পীরা একাধারে "কাষ্ঠ, পাষাণ, মৃত্তিকা ও চিত্র" এই চারটি মাধ্যমেই কাজ করতে অভ্যস্ত ছিলেন। থলে-রসপুর গ্রামের যে বৃদ্ধ কারিগরটির কথা আগেই উল্লেখ করেছি তাঁর কাছে শুনেছিলাম, তিনি কাছে-পিঠের অনেকগুলি কাঠের রথ (মায় ঘোড়া, সারথি, পরী প্রভৃতির নিরেট মূর্তি) নির্মাণ করা ছাড়াও সেগুলির গায়ে পট আঁকার পদ্ধতিতে বহু রঙিন পৌরাণিক চিত্র প্রভৃতিও এঁকেছিলেন। পুতুল ও প্রতিমা তৈরির কাজেও একদা তাঁর দক্ষতা ছিল, যদিও পাথরের ভাস্কর্য তিনি কখনও করেননি। তাঁর ক্ষেত্রে পাথরের দুষ্প্রাপ্যতাই নাকি ছিল এর প্রধান কারণ। সে যাই হোক, 'টেরাকোটা' মন্দিরে পোড়ামাটি ও কাঠের প্রায় একই রকম ভাস্কর্য থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে একই শিল্পিগোষ্ঠী এ দু'টি ভিন্ন উপাদানে কাজ করতেন। তা না হলে উভয় শ্রেণীর শিল্পসৃষ্টির মধ্যে এত নিকট সাদৃশ্য সম্ভব হত না।

'টেরাকোটা' ও কাঠ-খোদাই শিল্পে যে কারিগরি দক্ষতার প্রয়োজন হত, তার একটু তুলনামূলক আলোচনা এখানে হয়ত অপ্রাসঙ্গিক হবে না। সকলেই জানেন, নরম মাটির তাল ছাঁচে ফেলে নয়ত কাঁচা মাটির টালির গায়ে নরুন জাতীয় হাতিয়ার দিয়ে নকশা বা 'বা-রিলিফ' ভাস্কর্য উৎকীর্ণ করে 'টেরাকোটা' সজ্জা তৈরী হত। ছাঁচ ব্যবহারের বেলায় ভাস্কর্যের অঙ্গহানি হবার সম্ভাবনা প্রায় থাকত না বললেই চলে। পোড়ানো টালি পরে চোট লেগে বা হাত থেকে পড়ে গিয়ে হয়ত ভাঙচুর হতে পারত, কিন্তু সাধারণ সাবধানতা অবলম্বন করলেই এরকম ঝুঁকি এড়ানো যেত। খোদাই-করা প্যানেলগুলির বেলায় খোদাই করবার সময়ে কোন অংশ ভেঙে গেলে বা মনোমত না হলে, বাড়তি কাঁচা মাটি জুড়ে দিয়ে বা আবার খোদাই করে তাদের প্রার্থিত রূপায়ণে কিছুমাত্র অসুবিধা হত না। তারপর ভাটিতে পোড়ানোর সময় একটু হুঁশিয়ার থাকলেই কাজ শেষ হত ভাল-ভাবে। কিন্তু কাঠ-খোদাইয়ের বেলায় ছাঁচ ব্যবহারের প্রশ্ন ওঠেই না। প্রযুক্ত উপকরণও কাঁচা বা আধ-শুকনো মাটির থেকে অনেক নিরেট ও শক্ত হওয়ার দরুন কোথাও কোন ভাঙচুর হলে তা সংশোধন করা অসম্ভব হত। বিজ্ঞানের অগ্রগতির কারণে আজকের মিস্ত্রীরা বজ্রলেপ জাতীয় আঠার সাহায্যে কাঠের সঙ্গে কাঠ জুড়তে পারেন। কিন্তু দেড় শ দু'শ বছর আগেকার 'সূত্রধর' শিল্পীরা এজাতীয় সুবিধার অধিকারী ছিলেন বলে মনে হয় না। ফলে, কাঠের ভাস্কর্যে অনেক বেশী অভিনিবেশ ও সাবধানতার প্রয়োজন হত। অপেক্ষাকৃত শক্ত উপাদানের জন্য মেহনতও পড়ত অনেক বেশী। এমনও হতে পারে, এসব প্রতিবন্ধকের জন্যই হয়ত এত অল্পসংখ্যক 'টেরাকোটা' মন্দিরে নকাশি কাঠের দরজা নিবদ্ধ হয়েছে।

আরও এক গুরুতর অসুবিধা ছিল কাঠের ভাস্কর্যের। উই ধরে, জলে ভিজে বা অন্যভাবে এজাতীয় শিল্পকৃতিগুলি যত সহজে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে পোড়ামাটির অলঙ্করণ তা হয়নি। বহুক্ষেত্রে দু-তিন শ বছরের পুরানো 'টেরাকোটা' সজ্জা যে এখনও সজীব আছে তার কারণ মাটি নির্বাচনের সময় যথেষ্ট বাছবিচার করা ছাড়াও টালিগুলিকে সম্ভবত অল্প আঁচের আগুনে অতি যত্নের সঙ্গে পোড়ানো হত। অধিকাংশ 'টেরাকোটা'

মন্দিরেই পোড়ামাটির প্যানেলগুলি রৌদ্রবৃষ্টিতে অবারিত থেকেছে সুদীর্ঘকাল। কিন্তু খুব খেলো কারিগরি ছাড়া অন্য ক্ষেত্রে তাদের বিশেষ ক্ষতি হয়নি। কিন্তু তুলনায় মন্দিরের দরজার কাঠের কারুকার্য অনেক স্বল্পস্থায়ী হয়েছে। উভয় বাংলার জলবায়ুর অত্যধিক আর্দ্রতা ও উই, ভোমরা, ইঁদুর প্রভৃতির উপদ্রবই তার কারণ। সম্ভবত আরও বড় কারণ উপযুক্ত রক্ষণাবেক্ষণের অভাব। কি পূব কি পশ্চিম বঙ্গে এসব মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতারা গত হবার পর তাঁদের বংশধরদের আর্থিক অবস্থা ক্রমশই খারাপ হয়েছে। প্রতি পরিবারে শরিকের সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাওয়াটাও সংরক্ষণের সহায়ক হয়নি। ধর্মীয় আসক্তিও হ্রাস পেয়েছে সেই সঙ্গে। ফলে, চোখের উপর নকাশি কাঠের এই অপরূপ নিদর্শনগুলি নষ্ট হতে দেখেও কেউ কিছু প্রতিবিধান করেননি। অলঙ্কৃতদ্বার মন্দিরের সংখ্যা এখন শ'খানেকের মতো বলে আমি যে অনুমান করেছি, তা হতাবশিষ্টগুলির পরিসংখ্যান মাত্র। আগে যে এজাতীয় দেবালয় আরও বেশী ছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই এইজন্য যে, বহু মন্দিরের সেবায়েত বা পুরোহিতদের কাছে শুনেছি, কারুকার্যখচিত পুরানো কপাট অব্যবহার্য হওয়ায় তাঁরা নতুন সাদাসিধা দরজা তৈরি করে নিতে বাধ্য হয়েছেন। এমন মন্দিরও দেখেছি যার একটি কপাট অলঙ্কৃত, অন্যটি আধুনিক।

এসব পরিত্যক্ত শিল্পসম্ভারের কিছু কিছু নিদর্শন আমাদের কয়েকটি সংগ্রহশালাতেও রক্ষিত আছে। তাদের মধ্যে কলকাতার আশুতোষ মিউজিয়ম ও রাজবলহাটের (হুগলী জেলা) অমূল্য প্রত্নশালার নামোল্লেখ করা যেতে পারে। 'টেরাকোটা' অলঙ্করণের থেকেও বেশী মূল্যবান এজাতীয় কারুকৃতি গ্রামগ্রামান্তরে ঘুরে যাঁদের পক্ষে দেখা সম্ভব নয়, তাঁরা এসব মিউজিয়ম পরিদর্শন করতে পারেন। প্রসঙ্গত, কলকাতার কেওড়াতলা শ্মশানের পাশে 'মহীশূর উদ্যানে' দ্রাবিড় রীতির মন্দিরটির কাঠের কপাট দু'টিও বহুল-অলঙ্কৃত। তবে সেগুলির কারিগর মহীশূরদেশীয়, বাঙালী নন।

কি ধরনের ভাস্কর্য উৎকীর্ণ হত এসব দেবালয়ের দরজায়? এখানেও 'টেরাকোটা' সজ্জার সঙ্গে আশ্চর্য সাদৃশ্য লক্ষণীয়। রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনী, পৌরাণিক উপাখ্যান, কৃষ্ণলীলা, দশাবতার, বিবিধ সামাজিক আলেখ্য মায় ফিরিঙ্গী-জীবনচিত্র, শিকার-দৃশ্য, রাশি রাশি ফুলকারি নকশা প্রভৃতি সবই ব্যবহার করা হয়েছে মন্দির-'টেরাকোটা'র অনুকরণে। কপাটের উপর প্যানেলগুলি সাজানোর সময় কি কোন ক্রম বা বিধিবদ্ধ বিন্যাসরীতি অনুসরণ করা হত? এ প্রশ্নের উত্তরেও 'টেরাকোটা' সজ্জার সঙ্গে সাদৃশ্যের উল্লেখ করা যেতে পারে। এ বিষয়ে নির্দিষ্ট কোন পদ্ধতি ছিল না। পোড়া-মাটির অলঙ্করণ অনেক বেশী জায়গা জুড়ে নিবদ্ধ হত বলে সেখানে হয়ত বা এহেন সংস্থানবিধি কার্যকর করবার উপায় ছিল। কিন্তু উচ্চতায় অনধিক ছ' ফুট ও প্রস্থে কমবেশি তিন ফুট জায়গা জুড়ে মাত্র দু'টি কপাটের ক্ষেত্রে সুসমঞ্জস কোন পর্যায় অনুসরণ করার অসুবিধা ছিল বেশী। দৃষ্টান্তস্বরূপ, হুগলী জেলার জাঙ্গিপাড়া থানার অন্তর্গত কোতলপুর গ্রামের হাজরা পরিবারের পরিত্যক্ত লক্ষ্মীজনার্দন মন্দিরের কাঠের প্যানেলগুলির উল্লেখ করতে পারি। সর্বোচ্চ সারির বাঁ দিকে এক শিবলিঙ্গপূজারী ও ডান দিকে এক উপবিষ্ট শঙ্খবাদিকা। মধ্যের সারির বাঁ দিক থেকে, যথাক্রমে কৃষ্ণ, ষড়ভুজ গৌরাঙ্গ, ঢোলবাদক ও দৈহিক কসরত দেখানোয় নিযুক্ত এক বেদেনী। নীচের সারিতে, অনুরূপ পরম্পরায়, গণেশ, কার্তিক, কালী ও হুঁকাসেবী এক বাবুর সামনে আভূমি-প্রণত এক ভৃত্য। এ মন্দিরের দরজায় মোট আট সারি ভাস্কর্যে কৃষ্ণলীলা, পৌরাণিক ও সামাজিক কাহিনী ছাড়াও ফিরিঙ্গীদের শিকার ও যুদ্ধযাত্রার দৃশ্য এবং লৌকিক দেবতা পঞ্চানন্দের মূর্তি রূপায়িত হয়েছে। অল্প জায়গায় এত বিভিন্ন বিষয়ের সন্নিবেশ করতে

গিয়ে তাদের বিন্যাসে সুশৃঙ্খল কোন ক্রম অনুসরণ করা যায়নি। অনুরূপ অন্যান্য দরজার নজিরে একথা বলা যায়, এ বিষয়ে বিধিবন্ধ কোন নিয়মের অভাবই ছিল নিয়ম।

বীরভূম জেলার নানুর থানায় অবস্থিত উচকরণ গ্রামের চাঁদরায় (ধর্মরাজ) মন্দিরের কাঠের কাজও খুবই প্রশংসনীয়। সেখানকার কপাট ছাড়াও দরজার দু'পাশের ও উপরের ফ্রেমেও বহু ভাস্কর্য ও নকশা উৎকীর্ণ হয়েছে। বিষয়বস্তু—প্রধানত কৃষ্ণলীলা, রামায়ণ ও পৌরাণিক কাহিনী এবং ফুলকারি নকশা।

মেদিনীপুর জেলার দাসপুর থানার অন্তর্গত রাণাপাড়ায় প্রামাণিক পরিবারের ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত এক নবরত্ন মন্দিরের দরজায় আটটি সারিতে মোট তিরিশটি ভাস্কর্যের প্যানেল আছে; বিষয়বস্তু—প্রধানত কৃষ্ণলীলা। প্রায় ১৭১ বছর আগেকার এ মন্দিরদ্বারটির ভাস্কর্যের সজীবতা বিস্ময়কর।

হাওড়া জেলার শ্যামপুর থানার বরদাবাড় গ্রামের চাউলে পরিবারের লক্ষ্মীজনার্দন মন্দিরের সামনের কপাট দু'টিও বহুলঅলংকৃত। মাটির দেওয়াল ও টালির চালাযুক্ত এ দেবালয়ের প্রতিষ্ঠাকাল অনিশ্চিত। কাঠের প্রধান দরজাটি ছাড়াও পাশের দেওয়ালে আর একটি অনুরূপ দরজা আছে। দু'টি দরজায় ভাস্কর্যের বিষয়বস্তু—প্রধানত কৃষ্ণলীলা ও অজস্র সামাজিক দৃশ্য। পৌরাণিক কাহিনী ও ফুলকারি নকশারও অভাব নেই। ওই একই গ্রামের আদক পরিবারের লক্ষ্মীজনার্দন মন্দিরটিরও মাটির দেওয়াল ও টালির ছাদ, তবে দরজা একটি। আর সে দরজায় উৎকীর্ণ কৃষ্ণলীলা, সামাজিক ও পৌরাণিক ভাস্কর্য-গুলি খুবই উচ্চ স্তরের।

হুগলী জেলার সিঙ্গুর গ্রামের অদূরে অবস্থিত 'ডাকাতে কালী'র মন্দিরের প্রবেশ-দ্বারটিও কাঠের সুনিপুণ ভাস্কর্যে সমৃদ্ধ। সেখানকার কপাটে মোট ন'টি সারি থাকলেও নীচের তিনটিতে শুধু বড় বড় পদ্ম উৎকীর্ণ আছে; মূর্তি-প্যানেলগুলি ওপরের ছ'টি সারিতে নিবদ্ধ। বিষয়বস্তু মোটামুটি প্রথাগত হলেও সামাজিক দৃশ্যের কয়েকটি বিশেষ-ভাবে লক্ষণীয়। এ মন্দিরের পাশ দিয়েই তারকেশ্বরে যাবার প্রাচীন রাস্তা। অতি দীর্ঘকাল বৈদ্যবাটির নিমাইতীর্থের ঘাট থেকে বাঁকে করে গঙ্গাজল নিয়ে অগণিত ভক্ত সেপথ দিয়েই গিয়েছেন তারকেশ্বরের মন্দিরে শিবের মাথায় ঢালতে। এহেন এক ভক্তের খুব সুন্দর একটি কাঠের ভাস্কর্য উৎকীর্ণ আছে এ মন্দিরের দরজায়। কন্যাসম্প্রদান, মহিলাদের প্রসাধন বা সন্তানকে স্তন্যদান প্রভৃতি সাধারণ সামাজিক 'মোটিফ'ও এ মন্দিরদ্বারে ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু বাঁকে করে জল নিয়ে যাবার মতো অভিনব এক ধর্মীয় রীতি যে কাঠ-খোদাই কারিগরদের দৃষ্টি এড়াতে পারেনি, সেকথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

'টেরাকোটা' মন্দির সম্বন্ধে অদ্যাবধি অল্পবিস্তর চর্চা হয়েছে সত্য, কিন্তু বর্তমান প্রবন্ধে আলোচিত বিষয়টি সম্বন্ধে এখনও যথেষ্ট অনুসন্ধান বাকি। সে অধ্যয়নের সুবিধার জন্য আমার-দেখা অলঙ্কৃতদ্বার দেবালয়ের অবস্থাননির্দেশক এক তালিকা পেশ করছি। হাওড়া জেলায়—শ্যামপুর থানার বরদাবাড় ও রাধাপুর। হুগলী জেলায়—শ্রীরামপুর মিউনিসিপ্যালিটির অন্তর্গত বল্লভপুর; জাঙ্গিপাড়া থানার কোতলপুর; আরামবাগ থানার ভেলিয়া ও সিঙ্গুর থানার পুরুষোত্তমপুর। মেদিনীপুর জেলায়—দাসপুর থানার রাণাপাড়া, রাধাকান্তপুর ও দাসপুর; চন্দ্রকোণা থানার রামজীবনপুর; মেদিনীপুর শহরের দু'টি মন্দির; পাঁশকুড়া থানার শ্যামসুন্দর পাটনা; পিংলা থানার রাজবল্লভ; সবং থানার দুবরাজপুর ও কেশিয়াড়ি থানার বাদাড়-গোপীনাথপুর। বীরভূম জেলায়—নানুর থানার উচকরণ। বাঁকুড়া জেলায়—পাত্রসায়ের থানার বালসি। নদীয়া জেলায়—হরিণঘাটা থানার বিরহী এবং ২৪-পরগণায়—আমডাঙ্গা থানার আমডাঙ্গা প্রভৃতি।

মন্দির-'টেরাকোটা': নব পর্যায়

শান্তিনিকেতন সম্বন্ধে নতুন কিছু লেখা বেশ দুরূহ ব্যাপার। সেখানকার যাবতীয় বিষয়ের উপর অগণিত লেখক ইতিপূর্বেই এত আলোকপাত করেছেন যে সেখানে আরও আলো ফেলবার চেষ্টা করা বাতুলতা। তবু, অনেক ভেবেচিন্তে, একটা বিষয় আবিষ্কার করেছি, যে প্রসঙ্গে এখনও কেউ কলম ধরেননি বলেই বিশ্বাস। কিন্তু আমার এ লেখা প্রকাশিত হবার আগে একই বিষয়ের উপর আর কেউ যদি লিখে বসেন তাহলেই সর্বনাশ। কেননা, শান্তিনিকেতন প্রসঙ্গে এটিই আমার একমাত্র সম্বল।

ঠিক আমার মতো নিরুপায় অবস্থায় একবার পড়েছিলেন প্রমথনাথ বিশী মহাশয়। তাঁর 'রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন' গ্রন্থে সেকথার বিশদ উল্লেখ আছে। বহুকাল আগে, শান্তিনিকেতনে ছাত্রাবস্থায় লেখা তাঁর কয়েকটি যাত্রার পালা বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠলে, রবীন্দ্রনাথ একদিন তাঁকে ডেকে বললেন—"দেখ্ এবার কয়েকটা যাত্রার পালা লিখব ভাবছি।" সর্বনাশ সমুৎপন্ন দেখে, গুরুদেবের প্রায় পা জড়িয়ে ধরে কেঁদে পড়লেন তিনি। বললেন—"এই একটা মাত্র গলিপথ খোলা রেখেছেন আর সকলের জন্যে; আপনি যদি সেখানেও ঢোকেন তবে তারা সব যায় কোথায়?" দয়া হল রবীন্দ্রনাথের; সাহিত্যের সর্বক্ষেত্রে সম্রাটের মহিমায় বিচরণ করলেও যাত্রার পালা তিনি লেখেননি। তাঁর অনুকম্পায় যাত্রার পালা-লিখিয়েরা বেঁচে গিয়েছেন। না হলে তাঁদের যে কী দুরবস্থা হত ভাবাই যায় না। বিশ্বভারতী বা শান্তিনিকেতন সম্বন্ধে যাঁদের লিখবার সামর্থ্য আছে তাঁরা প্রায় সকলেই রবীন্দ্র-আদর্শের অনুগামী। অতএব, ভরসা হয়, গুরুদেবের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে, আমার এই গলিপথে বিচরণটুকুতে বাদ সাধবেন না; শান্তিনিকেতন সম্পর্কে একটা-কিছু লিখবার সুযোগ তাঁরা আমায় করে দেবেন।

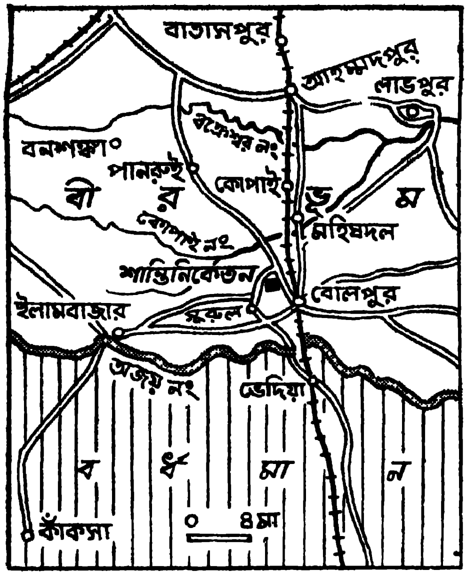
*

পূর্ববর্তী 'ধামতোড়' প্রবন্ধে, ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত সেখানকার মন্দিরটিকে 'টেরাকোটা' শৈলীর আপাতত সর্বাধুনিক নিদর্শন বলে সাব্যস্ত করেছি। তাহলে কি ধরে নিতে হবে, পশ্চিমবঙ্গে এজাতীয় ইমারতের মৃত্যু-বৎসর ১৯৩১ সাল? সম্ভবত তাই। আরও সাক্ষ্য প্রমাণের অভাবে এখনই এ বিষয়ে অন্য সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু, প্রায় দেড় হাজার বছরের প্রাচীন এই শিল্পপ্রবাহ কি ওই বছরটিতে এসে একেবারে শুকিয়ে গেল? নতুন কোন সজ্জায়, নতুন কোন আঙ্গিকে কি সে অলংকরণ-রীতি উত্তরকালের দিকে প্রসারিত হয়নি? আমার বিবেচনায়, রবীন্দ্রনাথের বসবাসের জন্য তাঁর শেষ বয়সে নির্মিত শান্তিনিকেতনের 'শ্যামলী' নামের মাটির বাড়িটির দেওয়াল-ভাস্কর্যগুলির মধ্য দিয়ে নতুন পদ্ধতিতে মন্দির-'টেরাকোটা' শৈলীর পুনরু-

জ্জীবনের একটা চেষ্টা করা হয়েছিল। আঙ্গিক সম্পূর্ণ পৃথক—পোড়ামাটির বদলে কাদামাটি ; তামাটে-লাল রঙের বদলে আলকাতরার প্রলেপ-বোলানো কালো রং ; ছোট ছোট টালির বদলে বেশ বড় বড় একক প্যানেল। যাঁদের প্রেরণায় এই পুনরুজ্জীবনের চেষ্টা হয়েছিল তাঁরা শ্রীনন্দলাল বসু ও তাঁর সুযোগ্য সহকারী শ্রীসুরেন্দ্রনাথ কর। এই দুই মহান শিল্পীকে যাঁরা দেখেছেন তাঁরা জানেন, গ্রামীণ ঐতিহ্য ও দেশজ শিল্প-রীতির প্রতি তাঁদের নাড়ীর টান কত প্রবল ছিল। এ বই-এর অন্যত্র 'বনকাটি' নিবন্ধে লিখেছি, আচার্য নন্দলাল তাঁর ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে বর্ধমান জেলার দুর্গম গ্রাম বনকাটিতে গিয়ে সেখানকার পিতলের রথের গায়ের অপরূপ নকশাগুলি কিভাবে কপি করে এনে শান্তিনিকেতনের মাটির ছাত্রাবাসের দেওয়ালে ব্যবহার করেছিলেন। এ দু'জন শিল্পীর স্বদেশচিন্তার এরকম দৃষ্টান্ত আরও অনেক আছে। সেজন্যই শান্তিনিকেতনের আশপাশের 'টেরাকোটা' মন্দিরগুলির অপূর্ব ভাস্কর্য তাঁদের নজরে পড়েনি এমন হতেই পারে না। আর, চিরায়ত গ্রামীণ শিল্পের এত উৎকৃষ্ট ও এত পরিণত প্রকাশ দেখেও তাঁরা নিশ্চেষ্ট থাকবেন সেকথাও অচিন্তনীয়। উদ্ভাবনী প্রতিভা না থাকলে উঁচুদরের শিল্পী হওয়া যায় না। আচার্য নন্দলাল ও সুরেন কর উভয়েরই এ গুণটি পুরো মাত্রায় ছিল। তাই দু'মাইল দূরের সুরুল বা মাইল চারেক দূরের সুপুর অথবা আর একটু বেশী দূরের ইলামবাজারের চমৎকার অথচ জীর্ণ 'টেরাকোটা' মন্দিরগুলি দেখে (বীরভূমের মতো অজস্র 'টেরাকোটা' মন্দিরের জেলায় তাঁরা নিশ্চয়ই আরও দৃষ্টান্ত দেখে থাকবেন) তাঁদের উদ্ভাবনী শক্তি নিশ্চয়ই তৎপর হয়ে থাকবে। তারই ফলশ্রুতি 'শ্যামলী'র দেওয়ালে নিবদ্ধ সম্পূর্ণ নতুন গঠনপদ্ধতির এই ভাস্কর্যগুলি। সে সম্পর্কে বিশদ আলোচনায় আসবার আগে রবীন্দ্রনাথের এই মাটির বাড়ির পরিকল্পনা ও নির্মাণ সম্বন্ধে দু'চার কথা বলে নিই।

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁর 'রবীন্দ্র জীবনী' (চতুর্থ খণ্ড) গ্রন্থে লিখেছেন (পৃঃ ৬)—"উত্তর ভারত ঘুরিয়া (৬ ফেব্রু—৩ মার্চ) কলিকাতায় বরানগরে প্রশান্ত-চন্দ্রের বাসায় কয়েক দিন থাকিয়া কবি শান্তিনিকেতনে ফিরিলেন (৪ মার্চ ১৯৩৫)। শান্তিনিকেতনে তাঁহার মাটির বাড়ি 'শ্যামলী' নির্মিত হইতেছে। মাটির বাড়ি—তার ছাদ মাটির সঙ্গে আলকাতরা মিশাইয়া শক্ত করা হইবে—ঘরের মেঝেও হইবে সেই উপাদানে। এই গৃহ পরিকল্পনার উদয় হয় গত বৎসর নন্দলাল-নির্মিত অনুরূপ উপাদানে গঠিত মঞ্চ হইতে। মঞ্চটি আছে ভোজনশালার সম্মুখে রাস্তার মোড়ে। এই উপাদানেই 'শ্যামলী' গৃহ নির্মিত হইতে থাকিল।" এ গ্রন্থের অন্যত্র (পৃঃ ৯—১০) আছে— "এই দিন (২৫ বৈশাখ ১৩৪২) উৎসবান্তে 'শ্যামলী'র গৃহপ্রবেশ অনুষ্ঠান হইল। মাটির ঘর করার ফরমাইশ কবির, স্থাপত্য পরিকল্পনা সুরেন্দ্রনাথের, ভাস্কর্য নন্দলালের।...তবে আসলে এই কার্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিবার কৃতিত্ব সুরেন্দ্রনাথ করের।...'শ্যামলী'র গৃহপ্রবেশ হইয়া গেলে কবি রথীন্দ্রনাথকে বিলাতে লিখিতেছেন—'মাটির বাড়িটা খুব সুন্দর দেখতে হয়েছে। নন্দলালের দল দেয়ালে মূর্তি করবার জন্য কিছুকাল ধরে দিনরাত পরিশ্রম করেছে।...' এই নূতন মৃৎকুটির যখন নির্মিত হইতেছে তখন কবি ইহারই উদ্দেশ্যে লেখেন—

> আমার শেষ বেলাকার ঘরখানি
> বানিয়ে রেখে যাব মাটিতে
> তার নাম দেব শ্যামলী।
> ও যখন পড়বে ভেঙে
> সে হবে ঘুমিয়ে পড়ার মতো,



মাটির কোলে মিশবে মাটি,
ভাঙা থামের নালিশ উঁচু করে
বিরোধ করবে না ধরণীর সঙ্গে;
ফাটা দেওয়ালের পাঁজর বার করে
তার মধ্যে বাঁধতে দেবে না
মৃত দিনের প্রেতের বাসা।

('শেষ সপ্তক')"

'শ্যামলী' সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের ভাবকল্পনা অনবদ্য সন্দেহ নেই। কিন্তু আমার আজকের আলোচ্য বিষয়, এ বাড়ির দেওয়ালে যেসব মাটির ভাস্কর্য নিবন্ধ হয়েছে তারা মন্দির-'টেরাকোটা'র উত্তরসূরি কিনা তা নির্ণয় করা। প্রথমেই বলা যেতে পারে, অদ্যাবধি আবিষ্কৃত আধুনিকতম 'টেরাকোটা' মন্দিরের প্রতিষ্ঠাকাল ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দ আর 'শ্যামলী' তৈরী হয় ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসের প্রথম দিকে। অতএব, 'শ্যামলী'র দেওয়াল-ভাস্কর্যগুলি পূর্বতন মন্দির-'টেরাকোটা' শৈলীকে এগিয়ে নিয়ে গেছে আরও প্রায় চার বছর। নন্দলাল ও সুরেন্দ্রনাথ ধামতোড়ের সর্বশেষ মন্দিরটির ভাস্কর্য পদ্ধতিকেই ভবিষ্যতের দিকে অভিক্ষেপ করবার চেষ্টা করেছেন এমন ধারণা নিতান্তই হাস্যকর হবে। কেননা, 'টেরাকোটা' শিল্পের সেই অন্তিম যুগে ধামতোড় মন্দিরের কারিগরির মান যে খুবই নীচু স্তরে নেমে এসেছিল সেকথা সংশ্লিষ্ট প্রবন্ধেই বলেছি। নন্দলাল ও সুরেন্দ্রনাথের মতো প্রতিভাবান শিল্পী যে এত নিকৃষ্ট উদাহরণ থেকে প্রেরণা পাবেন তাও হতে পারে না। তাছাড়া, ধামতোড়ের মন্দির বা বিশ শতকে নির্মিত অন্যান্য 'টেরাকোটা' মন্দির (তাদের সব ক'টিই আবার মেদিনীপুর জেলায় অবস্থিত) তাঁরা খুব সম্ভব দেখেনওনি। কিন্তু শান্তিনিকেতনের অদূরে অবস্থিত যেসব 'টেরাকোটা' মন্দির তাঁরা নিশ্চয়ই দেখেছিলেন তার বেশ কয়েকটির ভাস্কর্যের মান পশ্চিমবঙ্গের এজাতীয় শ্রেষ্ঠ মন্দিরগুলি থেকে হীন নয়। সেসব উৎকৃষ্ট ভাস্কর্য থেকেই যে তাঁরা প্রেরণা পেয়েছিলেন তাতে সন্দেহ নেই। শুধু তাই নয়, আমার

দৃঢ় ধারণা, লুপ্ত মন্দির থেকে আহৃত 'টেরাকোটা' টালির বেশ ভাল একটা সংগ্রহও তাঁদের ছিল। কলাভবন মিউজিয়মে এখনও যে অল্প কয়েকটি পোড়ামাটির ফলক দেখা যায় তা সম্ভবত সেই সংগ্রহের হৃতাবশেষ। এসব নকাশি টালি সামনে রেখেই যে 'শ্যামলী'র দেওয়াল-ভাস্কর্যের অনেকগুলি প্যানেল রচিত হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। 'শ্যামলী'র প্রবেশদ্বারের দু'পাশে যে দু'টি দ্বাররক্ষীমূর্তি আছে তার সঙ্গে 'টেরাকোটা' মন্দিরের এহেন সজ্জার বিশেষ সাদৃশ্য নেই। এ মূর্তি দু'টির পরিকল্পনা আচার্য নন্দলালের নিজস্ব বলেই মনে হয়। কিন্তু এ বাড়ির পূবের ও উত্তরের (পিছনের) দেওয়ালে যেসব অলংকরণ আছে, প্রাচীনতর পোড়ামাটির নকশার সঙ্গে তাদের কয়েকটির সাদৃশ্য বিস্ময়কর।

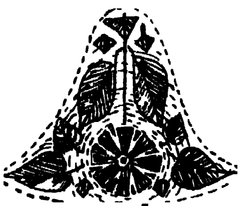
প্রথমে পূবের দেওয়ালে লড়াই-এর ঘোড়ার ভাস্কর্যটির প্রসঙ্গে আসা যাক। এ বই-এর অন্যত্র সুসজ্জিত ঘোড়ার যে দু'টি ছবি সন্নিবিষ্ট হয়েছে তার প্রথমটির প্রাপ্তিস্থান, হুগলী জেলার গোঘাট থানার অন্তর্গত বালী-দেওয়ানগঞ্জ গ্রামের এক ভগ্নপ্রায় মন্দির। সেখানে যাওয়া এতই কণ্টকর যে আমি নির্বিবাদে ধরে নিতে পারি, আচার্য নন্দলাল কখনও সে মন্দির দেখেননি। কিন্তু যেহেতু এই বিশেষ 'মোটিফ'টি একদা এক প্রথাগত (stylized) নকশায় পরিণত হয়েছিল, সেজন্য এর অনুকৃতি দূরদূরান্তরের মন্দিরেও দেখা যায়। বীরভূম জেলার কোন কোন দেবালয়ে আমি নিজেও দেখেছি ; 'শ্যামলী'র ভাস্কররাও দেখে থাকবেন। এ দু'টি ভাস্কর্যের সাদৃশ্য এতই নিকট যে তা প্রমাণ করবার জন্য ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয় না। এমন কি, প্রথম নিদর্শনটি সামনে রেখে (বা অনুরূপ কোনো প্যানেলের রেখাচিত্র দেখে) যে দ্বিতীয়টি রচিত, এমন ইঙ্গিত একটুও অত্যুক্তিদুষ্ট না হতে পারে। আচার্য নন্দলালের প্রতিভার স্পর্শে মন্দির-'টেরাকোটা'র প্রাচীন শৈলীটি যে এভাবে, নবরূপে, উত্তরকালের জন্য রক্ষিত হতে পেরেছে, সেকথা এ ছবি দুটিকে মিলিয়ে দেখলেই বোঝা যায়।

'রাসমণ্ডল' নামের আর একটি প্রথাগত নকশা বীরভূম বা অন্যান্য জেলার অসংখ্য 'টেরাকোটা' মন্দিরে ব্যবহৃত হয়েছে। গোপিনীরা একবার কৃষ্ণের কাছে অনুযোগ করলেন যে তিনি যখন রাধিকার সঙ্গে নৃত্য করেন তখন তাঁরা তাঁর সঙ্গ থেকে বঞ্চিত হন। মায়াবলে অতি সহজেই এ সমস্যার সমাধান করলেন গোপীবল্লভ। অতঃপর যখনই কৃষ্ণ, রাধিকা ও এক প্রধানা সখীকে দু'পাশে নিয়ে নৃত্য করতেন তখনই নৃত্যরতা গোপিনীরা সবিস্ময়ে দেখতেন যে, তাঁদের প্রত্যেকেরই হাত ধরে কৃষ্ণও নাচছেন। 'রাসমণ্ডল' প্যানেলে কৃষ্ণ, রাধিকা ও প্রধানা গোপিনীকে কেন্দ্রীয় এক ফলকে উৎকীর্ণ করে সেটিকে ঘিরে একাধিক সমকেন্দ্রিক বৃত্তের পরিধি-বরাবর প্রতি দু'জন গোপিনীর মধ্যে একটি করে কৃষ্ণের মায়ামূর্তি দেখানো থাকে। 'শ্যামলী'র নির্মাতারা বীরভূমে বসেই হয়ত এহেন নকশা দেখে থাকবেন। কেন্দ্রীয় কৃষ্ণ-রাধিকা-গোপিনী প্যানেলটির কারিগরি উৎকর্ষ সাধারণত বেশ উচ্চাঙ্গের হত বলে তাঁরা সম্ভবত এজাতীয় নকশার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে থাকবেন। 'শ্যামলী'র পিছনের দেওয়ালে 'রাসমণ্ডল' নকশার এই কেন্দ্রীয় প্যানেলের এক হুবহু প্রতিরূপ উৎকীর্ণ আছে। আকারে অনেক বড় হলেও সেটি যে এজাতীয় প্রথাগত 'টেরাকোটা' ভাস্কর্যের অনুপ্রেরণাপ্রসূত তাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নেই।

'শ্যামলী'র পূবের দেওয়ালে ভীতচকিত একদল হরিণের ভাস্কর্যটিও 'টেরাকোটা'-শৈলী দ্বারা অনুপ্রাণিত বলে আমার বিশ্বাস। প্রায় অনুরূপ একটি পোড়ামাটির ফলক গুরুসদয় দত্ত মহাশয় ফরিদপুর জেলার মথুরাপুরের এক ভগ্ন মন্দির থেকে একদা সংগ্রহ করেছিলেন। এখন সেটি কলকাতার দক্ষিণ উপকণ্ঠে ঠাকুরপুকুরের

গুরুসদয় মিউজিয়মে রক্ষিত আছে। হঠাৎ ভয় পেয়ে কাচ্চাবাচ্চা সমেত একদল হরিণ-হরিণী পালাচ্ছে; তাদের উৎকণ্ঠা, তাদের গতিবেগ, এই পোড়ামাটির টালিতে এত বাস্তবানুগভাবে খোদিত হয়েছে যে, তার তুলনা মেলা ভার। তাছাড়া, অত্যন্ত অপরিসর জায়গায় (টালিটির মাপ আনুমানিক ১০"×৮") এতগুলি পশু-ভাস্কর্য উৎকীর্ণ করা কম কারিগরি মুনশীয়ানার পরিচায়ক নয়। গুরুসদয়বাবু একাধিকবার বীরভূমের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। সে সময়ে, বিশ্বভারতীর গণ্যমান্য-দের সঙ্গে তাঁর যে সখ্যতা স্থাপিত হয়েছিল, তা অনুমানের অপেক্ষা রাখে না। ভাবতে ভাল লাগে, এই সূত্রেই হয়ত আচার্য নন্দলাল তাঁর সংগ্রহের অন্তর্ভুক্ত এই অপূর্ব 'টেরাকোটা' টালিটি দেখে থাকবেন। সে যাই হোক, নন্দলাল-পরিকল্পিত 'শ্যামলী'র ভাস্কর্যটিতে সব রকম বাহুল্য বর্জন করে মাত্র তিনটি ধাবমান হরিণের সাহায্যে এক তীব্র গতিবেগের সৃষ্টি করা হয়েছে। বিষয়বস্তু ও তার সফল রূপায়ণের দিক থেকে এ দু'টি ভাস্কর্য যে একই গোষ্ঠীর তাতে সন্দেহ নেই।

স্থানাভাবে, বর্তমান প্রবন্ধের সঙ্গে সম্পর্কিত মাত্র দু'টি ছবি ব্যবহার করা গেল। তবে এ ধারণা আমার মনে বদ্ধমূল যে, আচার্য নন্দলাল ও সুরেন কর মশায় 'শ্যামলী'র দেওয়াল-ভাস্কর্যের অনেকগুলি সম্পর্কে অনুপ্রেরণা পেয়েছিলেন প্রাচীনতর মন্দির-'টেরাকোটা' শিল্প থেকে। সে শিল্প লুপ্ত হয়েছে বহুকাল। কিন্তু তাকে নব পর্যায়ে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে শান্তিনিকেতনের এই দুই মহান শিল্পী যে একদা ব্রতী হয়েছিলেন, সেকথা হয়ত সুবিদিত নয়।



মাটির বাড়ি

মৃত্যুর বছর ছয়েক আগে রবীন্দ্রনাথ তাঁর বসবাসের জন্য এক মাটির বাড়ি তৈরি করিয়েছিলেন শান্তিনিকেতনে। ইচ্ছা ছিল সেখানেই শেষ ক'টা দিন কাটাবেন। রথীন্দ্রনাথ তখন বিলেতে। তাঁকে চিঠি লিখলেন—"বাড়িটা খুব সুন্দর দেখতে হয়েছে।..গ্রামের লোকদের ঔৎসুক্য সবচেয়ে বেশি। মাটির ছাদ হতে পারে এইটেতেই ওদের উৎসাহ। পাড়াগাঁয়ে খড়ের চাল উঠে গেলে সব দিক দিয়ে ওদের সুবিধে।" খড়ের চালের বাড়িতে আগুন লেগে প্রতি গ্রীষ্মে অসংখ্য গ্রামবাসী সর্বস্বান্ত হন। কিছুদিন অন্তর চাল মেরামতিও ব্যয়সাধ্য ব্যাপার। সেজন্য মাটির ছাদওয়ালা বাড়ির এক্সপেরিমেন্টটা সফল হলে গ্রাম-বাংলার একটা উপকার করতে পারবেন এ ধারণাও হয়ত তাঁর মনে ছিল। কিন্তু সুরেন কর ও নন্দলাল বসুর তত্ত্বাবধানে আলকাতরা মেশানো মাটি দিয়ে 'শ্যামলী'র ছাদ তৈরি হলেও দু'একটা বর্ষার বেশী তা টিকলো না। সেখানকার বাস তুলে দিতে হল রবীন্দ্রনাথকে। মাটির বাড়ির মাটির ছাদ নিয়ে আর কোথাও কেউ পরীক্ষা করেছেন কিনা জানি না। ক'রে থাকলেও বৃষ্টিবহুল অঞ্চলে তার সাফল্যের সংবাদ শুনিনি। পল্লীগ্রামে এখনও সেজন্য শতকরা একশটি মাটির বাড়ির ছাউনিই হয় খড়ের, টিনের নয় টালির। উলু, তালপাতা বা গোলপাতার ব্যবহার এখন কদাচিৎ দেখা গেলেও তা ধর্তব্যের মধ্যে নয়।

টিন বা টালির চাল এতই আধুনিক ও বিশেষত্ববর্জিত যে তা নিয়ে আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু বাঁশের ফ্রেম ও তার উপরে খড়ের আচ্ছাদনের ঐতিহ্য প্রাগৈতিহাসিক কালের। দোচালা, চারচালা, আটচালা প্রভৃতি বিভিন্ন আকারে এসব খড়ের চাল নির্মিত হয়েছে। আঞ্চলিকভাবেও তাদের প্রাচুর্যের তারতম্য দেখা যায়। পূর্ববঙ্গে দোচালা কুটিরের সংখ্যা যেমন বেশী, পশ্চিমবঙ্গে, বিশেষত রাঢ় অঞ্চলে, তেমনি চারচালা ও আটচালার। সব ক্ষেত্রেই কিন্তু ঢালু চালের নিম্নরেখা রচিত হয়েছে অর্ধবৃত্তাকারে। আধুনিককালে অনেক স্থানে এ রীতির ব্যতিক্রম দেখা গেলেও বাঁকানো কার্নিস সাবেক প্রথায় নির্মিত কুটিরের আবশ্যিক অঙ্গ। প্রাচীনতর এসব দৃষ্টান্ত অনুসরণ করেই পরবর্তীকালে বাঁকানো কার্নিসযুক্ত দোচালা, চারচালা, আটচালা বা 'রত্ন'-শৈলীর ইঁটের মন্দিরগুলি নির্মিত হয়েছে।

সাধারণ কুঁড়েঘরে দু'টি বা চারটি বাঁশের মাচার উপরে চালাগুলি বিন্যস্ত থাকে। ঘরের মেঝে থেকে খড়ের আচ্ছাদনের কর্কশতা চোখে পড়ে বলে ধনীগৃহে ও চন্ডীমন্ডপে রঙিন কাঠি বা রঙে-ছোপানো বেতের চিলতে দিয়ে ছাদের ভিতরের দিকটি আগাগোড়া ঢেকে দেওয়াই সাবেক রীতি ছিল। কোন কোন ক্ষেত্রে ময়ূরপুচ্ছের সাদা

ডাঁটিও এজন্য ব্যবহৃত হয়েছে। বিভিন্ন রঙের শরকাঠি বা বেতের চিলতের টানা-পোড়েনে নানারকম ফুলকারি বা জ্যামিতিক নকশারও সৃষ্টি করা হত। এজাতীয় অলংকরণের বর্ণনা দিতে গিয়ে শ্রীসুজননাথ মুস্তৌফী তাঁর 'উলার মুস্তৌফী বংশ' গ্রন্থের এক জায়গায় লিখেছেন—"এই গৃহের (উলার চণ্ডীমণ্ডপের) চালের ভিতরের দিকে সরু সুতার ন্যায় সূক্ষ্ম বেতের কারুকার্য ছিল। তদ্ব্যতীত অভ্র ও ময়ূরপুচ্ছের চন্দ্রকের এবং রঙিন সরু বাঁশের শলা বা কাঠির দ্বারা নির্মিত চিকের আচ্ছাদন দ্বারা চালের ভিতরের দিকের খড় ঢাকা ছিল। ১২৭১ সালের আশ্বিন মাসের ঝড়ে চাল উড়িয়া যাওয়ায় ঐ সকল কারুকার্য নষ্ট হইয়াছে।" সাহিত্যিক অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় এরকম আর এক প্রাচীন চণ্ডীমণ্ডপের চালের সজ্জা সম্বন্ধে লিখেছিলেন—"চণ্ডীমণ্ডপের ভিতরে দাঁড়াইয়া উপরের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে আর নয়ন মন ফিরাইয়া আনা ভার হইত। আমি বালক, সৌন্দর্যপ্রিয়, আমার কিছুতেই তৃপ্তি হয় না। শেষে আমার রক্ষকেরা আমাকে যৎকিঞ্চিৎ বলপূর্বক লইয়া চলিল।" ('সাহিত্য': ভাদ্র, ১৩২০)। খড়ের চালের এহেন নকাশি আবরণকে বলা হত 'রূপসী কাজ' এবং সে কারুকার্য যে কতদূর সুদৃশ্য হত তার বিবরণপ্রসঙ্গে নদীয়া জেলার উলা বা বীরনগরে এক কিংবদন্তী প্রচলিত ছিল। দুর্গাপূজার সময় প্রতিমা-দর্শনার্থী জনতা অধিকাংশ সময় ছাদের অপরূপ শোভার দিকেই তাকিয়ে থাকত বলে দেবী নাকি একদা স্বপ্নাদেশ করেছিলেন যে, পূজার ক'দিন চাঁদোয়া টাঙিয়ে ছাদের কারুকার্য যেন আড়াল করে দেওয়া হয়।

প্রচুর অর্থব্যয়ে ধনীর বসতবাটি বা চণ্ডীমণ্ডপ এহেন অলংকরণে ভূষিত হলেও গ্রামীণ জনসাধারণের ব্যবহার্য শতকরা প্রায় একশটি বাড়িই তৈরি হত কাদামাটির দেওয়াল ও খড়ের চালা দিয়ে। সেখানেও শিল্পকর্মের যে অল্পবিস্তর প্রয়োগ হত সেকথা পরে বলছি। আগে দেওয়াল তৈরির পদ্ধতির বিবরণ দিয়ে নিই। সে বিবরণে আমি হাওড়া জেলায় অনুসৃত প্রণালীর কথাই প্রধানত বলব, যদিও তা অন্যান্য জেলায় প্রচলিত রীতি থেকে বিশেষ ভিন্ন নয়।

প্রথমত, মাটির দেওয়াল ইঁটের দেওয়ালের থেকে অনেক বেশী পুরু করে গড়তে হয়। চাল যদি হয় টিন বা টালির তাহলে দশ-ইঞি ইঁটের দেওয়ালে ভালভাবেই কাজ চলে যেতে পারে। কিন্তু খড়ের চালের গুরুভার—বিশেষত বর্ষাকালে ভিজে অবস্থায়—বহন করবার জন্য মাটির দেওয়াল খুব পুরু না করে উপায় নেই। দু'তিন হাত পুরু মাটির দেওয়াল সেজন্য মোটেই বিরল নয়। পুরনো আমলের কিছু কিছু মাটির বাড়িতে চার হাত পুরু দেওয়ালও দেখা যায়। এসব বিশাল গড়নের দেওয়াল তৈরি হয় কি উপায়ে? খাবলা খাবলা কাদামাটি তুলে এনে পর্যায়ক্রমে সাজিয়ে গেলেই দেওয়াল তৈরি হয় না; কাজটি ঠিকভাবে সম্পন্ন করতে হলে বহুদিনের অভিজ্ঞতাপ্রসূত দক্ষতার প্রয়োগ চাই। পাকাবাড়ির মতো মাটির বাড়িরও ভিত খোঁড়া হয়, তবে সাধারণত তার গভীরতা হয় অপেক্ষাকৃত অল্প। সেই ভিতের তলমাটি প্রথমে ভালভাবে জলে ভিজিয়ে 'জাবকিয়ে' নেওয়া হয়; তারপরে শুরু হয় দেওয়াল তোলার কাজ। যেখান থেকে মাটি সংগ্রহ করা হয় তাকে বলে 'জাবখানা'। 'জাবখানা'র মাটি দো-আঁশ হলেই ভাল, কেননা, এঁটেল মাটিতে ফাট ধরে। সে মাটিতে যথেষ্ট জল ঢেলে একটানা ভিজিয়ে রাখা হয় চার-পাঁচ দিন। ইতিমধ্যে ভিতের কাছাকাছি কিছু সমতল জমি পরিষ্কার করে নিয়ে সেখানে 'জাবখানা' থেকে তুলে আনা ভিজে মাটি পাতলা পাতলা স্তরে বিছিয়ে দেওয়া হয়। তারপরে মাটিকে শক্ত ও ভারবহনক্ষম করবার জন্য আরম্ভ হয় এক পরিশ্রমসাধ্য কাজ। বাবলা কাঠের তৈরি চ্যাপ্টা গড়নের মুগুরের মতো 'পিঠ্নে' দিয়ে অতঃপর সেই

বিছানো মাটিকে দুরমুশ করা হয় অনেকক্ষণ পিটিয়ে। তারপরে কোদাল দিয়ে চেঁছে, সে মাটি স্তর-স্তর করে সাজানো হয় দেওয়ালের আকারে। কিন্তু একই সঙ্গে হাত খানেক উচ্চতার বেশী দেওয়াল গাঁথা হয় না। ততখানি গেঁথে দেওয়ালকে শুকোতে দেওয়া হয় কয়েকদিন। এইভাবে কয়েক খেপে, দেওয়াল তোলা শেষ হয় বটে, কিন্তু তখন তার বাইরের ও ভিতর দিকের দু'পিঠই খুব এবড়োখেবড়ো থাকে। কিন্তু তাকে সমতল করবার কাজে তখনই হাত দেওয়া হয় না। দেওয়ালের সব অংশ, বিশেষত ভিতরের অংশ, শুকিয়ে খটখটে হবার জন্য অপেক্ষা করা হয় বেশ দীর্ঘকাল। তা না হলে বিশেষভাবে তৈরি যে কাদার প্রলেপ পরে দেওয়ালের দু'পিঠে লাগানো হয় তা ফেটে যাবার বা ফুলে উঠবার সম্ভাবনা থাকে।

প্রলেপ লাগানোর কাজটি বেশ কঠিন ও অভিজ্ঞতাসাপেক্ষ। তার কয়েকটি পর্যায় ও প্রতি পর্বের পৃথক কারিগরি নাম আছে। পচা পুকুরের এঁটেল পাঁক তুলে এনে ছায়াশীতল জায়গায় একদিন রাখবার পর রাশি রাশি উলুখড়ের কাঠি দু'ইঞ্চির মতো দৈর্ঘ্যে কেটে নিয়ে প্রথমে তাতে মেশানো হয়। হাওড়া জেলায় উলুখড় যে সহজলভ্য তা উলুবেড়িয়া, কুশবেড়িয়া প্রভৃতি স্থানীয় জনপদের নাম থেকেই প্রকাশ। উলুকাঠির বিশেষত্ব—খড়ের কাঠির মতো তা ফাঁপা নয়, নিরেট। সেজন্য পচে বা ক্ষয়ে না গিয়ে তা বহুদিন অটুট থাকে। এজাতীয় উপকরণ পাঁকের সঙ্গে মেশাবার উদ্দেশ্য তার 'অ্যাধেসিভনেস' বা দেওয়ালের গায়ে লেপটে থাকবার ক্ষমতা বৃদ্ধি করা। পাঁক আর উলুকাঠির এই মণ্ড দিয়ে প্রলেপ লাগানোকে হাওড়া জেলার কারিগররা বলেন, 'উলুটি'র কাজ। অনুরূপভাবে পাঁকের সঙ্গে তুষ মেশানো হলে 'তুষুটি', পাটের আঁশ মেশালে 'পাটুটি' আর তুলোর আঁশ মেশালে হয় 'তুলুটি'। মিশ্রিত উপকরণ যত সূক্ষ্ম হবে, প্রলেপের 'অ্যাধেসিভনেস' তত বাড়বে ও তাকে পালিশ করা তত সহজ হবে।

মাটিতে খোঁড়া এক গর্তের মধ্যে পাঁক ও এসব উপকরণ মেশানোর কাজটি পা দিয়ে চটকে চটকেই করা হয়। তারপর, কোদাল দিয়ে ছুলে-ফেলা দেওয়ালে শুরু হয় সে মণ্ডের প্রলেপ লাগানো। প্রথমে 'উলুটি', কেননা সেটাই সব থেকে কর্কশ। সে প্রলেপ বেশ শুকিয়ে গেলে উলুবিহীন পাতলা পাঁকের আর এক আস্তরণ বুলিয়ে, পৃথকভাবে কাটা আরও অনেক উলু-কাঠি সে কাদার ওপর ঘন করে বসিয়ে দেওয়া হয়। তারপরে চ্যাপটা পাটাতনের 'উসো' ঘষে মিস্ত্রিরা দেওয়ালকে মোটামুটি সমতল করে ফেলে। সাধারণ গৃহস্থঘরে, ব্যয়সংক্ষেপের জন্য দেওয়াল মাজার কাজ 'উলুটি' পর্যায়ের বেশী অগ্রসর হয় না। কিন্তু অপেক্ষাকৃত সচ্ছল গৃহস্বামীরা অতঃপর 'তুষুটি'র ফরমাশ করেন। দ্বিতীয় পর্বের প্রক্রিয়া একই। 'উলুটি'র প্রলেপ ঠিকমত শুকিয়ে গেলে, তার উপর তুষ মেশানো পাঁকের আস্তরণ লাগিয়ে আবাব 'উসো' দিয়ে মেজে চৌবস করে নেওয়া হয়। এই পর্যায়ের কাজ শেষ হলে দেওয়াল অনেক বেশী মসৃণই শুধু হয় না, তার গায়ে বেশ একটা ঔজ্জ্বল্যও দেখা দেয়।

কমবেশি তিন হাত পুরু দেওয়ালের সাধারণ একটি মাটির বাড়িতে—অনেক ক্ষেত্রে যা আবার দোতলা হয়—কী বিপুল পরিমাণ মাটি যে লাগে তা সহজেই অনুমেয়। তার সঙ্গে সহজলভ্য উলু বা তুষ পরিমাণমত মিশাল দিতে খরচ হয়ত খুব বেশী হয় না। কিন্তু খুব ছোট করে কাটা পাট বা তুলোর আঁশের ক্ষেত্রে যে ব্যয় হয় তা কেবল বিত্তবানরাই বহন করতে পারেন। 'পাটুটি' পর্যায়ে পাট-তন্তুর কুচি ছাড়াও পাঁকের সঙ্গে এক ধরনের সাদা বালি মেশানো হয়। সে মণ্ড তৃতীয় প্রলেপ হিসেবে লাগিয়ে আবার 'উসো' দিয়ে মাজতে হয়। বলা বাহুল্য, তাতে দেওয়ালের মসৃণতা ও ঔজ্জ্বল্য 'তুষুটি' স্তর থেকে আরও বেশী বেড়ে যায়। অর্ধ-চিত্র বা 'বা-রিলিফ' পদ্ধতিতে কোন কোন

ক্ষেত্রে মাটির বাড়ির দেওয়ালে যেসব মূর্তি বা নকশা উৎকীর্ণ করা হয়, তার প্রাথমিক ভিত্তি রচিত হয় 'উলুটি'র কাজের সময়, 'তুষুটি'র সময় তা মোটামুটি রূপ নেয় এবং 'পাটুটি'র স্তরে তা শেষ পরিণতি লাভ করে। এসব অলংকরণে কখনও কখনও রঙের প্রয়োগও দেখা যায়। কুঁড়েঘরের দেওয়ালে এহেন মাটির সজ্জা সুবিদিত নয় বলে পরে সে বিষয়ে বিস্তৃতভাবে বলছি।

'তুলুটি' পর্যায়ে পাঁকের সঙ্গে তুলোর কুচি ও রেড়ীর তেল মেশানোই রীতি। চতুর্থ বা শেষ প্রলেপ হিসেবে সে মণ্ড লাগিয়ে 'উসো' দিয়ে ভাল করে মাজলে দেওয়াল নাকি এত মসৃণ হয় যে, তার গায়ে পিঁপড়ে অবধি চলাফেরা করতে পারে না। এত পিচ্ছিল মাটির দেওয়াল আমি নিজে দেখিনি। তবে হাওড়া জেলার একাধিক বিশ্বাসভাজন গ্রামবৃদ্ধের কাছে শুনেছি, আগে 'তুলুটি'র কারিগররা একটা অগ্রিম অঙ্গীকার করত যে তাদের পরিমার্জিত দেওয়ালে যদি পিঁপড়ে হাঁটতে পারে তাহলে তাদের মজুরি দিতে হবে না। এসব এখন গল্পকথা বলে মনে হওয়াই স্বাভাবিক। পঙ্কের পলস্তারাও যে একদা হাতির দাঁতের আস্তরণের মতো দেখাত তাও এখন এক অনুরূপ 'অলীক' কাহিনী। কোনটাই কিন্তু অবিশ্বাস্য নয়। শুধু এদু'টি ক্ষেত্রেই নয়, অতীতে মসলিন, নকশী-কাঁথা, বালুচর শাড়ি, কষ্টিপাথরের মূর্তি-খোদাই প্রভৃতি বিবিধ শিল্পে বাঙালীর মনীষা ও দক্ষতা এত উচ্চ স্তর স্পর্শ করেছিল যে আজ তা আমাদের ধারণার বাইরে।

এত ধাপে ধাপে, এত দীর্ঘ পরিশ্রমে মাটির বাড়ি তৈরি করার মূল উদ্দেশ্য ছিল তার স্থায়িত্ব বৃদ্ধি করা। ভাল মিস্ত্রির হাতে নির্মিত 'উলুটি' বা 'তুষুটি'-করা সাধারণ মাটির বাড়িও যে দৈব-দুর্বিপাকে না পড়লে প্রায় একশ বছর টেকে সেকথা আশ্চর্য শোনালেও সত্যি। কিন্তু গৃহস্থালীর সর্বক্ষেত্রে শুধু ব্যবহারিক প্রয়োজনটুকু মিটিয়েই বাঙালীর মন ভরেনি কোনদিন। সামান্য শ্রম ও সামান্যতর ব্যয়ে তার গৃহসজ্জা অপরূপ হয়ে উঠেছে তার রূপসন্ধানী চিত্তের স্পর্শে। কুঁড়েঘরের বেলাতেও তাই। উপকরণ যেখানে মাটি আর খড়ের বেশী কিছু নয়, সেখানেও রূপারোপের অভাব হয়নি। দেওয়ালে রঙিন 'ফ্রেসকো' আঁকবার প্রথাটি এখন প্রধানত সাঁওতাল রমণীদের (তারাও বাঙালী) মধ্যে সীমাবদ্ধ হলেও গ্রামীণ সমাজের অন্যান্য অংশে এজাতীয় অলংকরণ যে চিরকালই অনাদৃত ছিল এমন মনে হয় না। খুব সম্প্রতিকালে হাওড়া জেলার আমতা থানার অন্তর্গত থলে-রসপুর গ্রামের কুম্ভকার-পল্লীতে দে পদবীধারী এক মৃৎশিল্পী পরিবারের কুঁড়েঘরের দেওয়ালে সমুদ্রমন্থনের যে বিরাট রঙিন 'ফ্রেসকো'টি দেখেছি তার তুলনা মেলা ভার। 'ফ্রেসকো' আঁকবার রীতিটি এখন সর্বত্রই—এমন কি সাঁওতালদের মধ্যেও—অনেক কমে এসেছে। তবে অতীতে গৃহ-অলংকরণের এই সুলভ পদ্ধতিটি যে আরও ব্যাপক ছিল তাতে সন্দেহ নেই।

মাটির দেওয়ালে মাটি দিয়েই যে কী অপরূপ সজ্জার প্রয়োগ হতে পারে তা এ বই-এর অন্যত্র ব্যবহৃত ছবি দু'টি থেকে হয়ত কিছুটা পরিস্ফুট হবে। ঘোড়ার 'বা-রিলিফ'টি, আমার মতে, লোকশিল্পের এক উৎকৃষ্ট নিদর্শন হিসাবে গণ্য হবার যোগ্য। হাওড়া জেলার শ্যামপুর থানার অন্তর্গত মুকুন্দপুর গ্রামের এক ভগ্নপ্রায় কুঁড়েঘরের দেওয়ালে কোন্ অজ্ঞাত লোকশিল্পীর এই কারুকৃতিটি একদা দেখেছিলাম। পশুপক্ষীর আরও কিছু অর্ধ-চিত্র সেখানে উৎকীর্ণ হয়েছিল। কিন্তু বাকিগুলি ঝড়-বাদলে নষ্ট হয়েছে। অপর ছবিটির প্রাপ্তিস্থান পশ্চিম দিনাজপুর জেলার কুশমণ্ডী থানার মানিকোড় গ্রাম। নকশাটি দরজার ঠিক উপরের অংশে কাদামাটির ভিত্তির উপরে কাদা দিয়েই রচিত। প্রায় একই রকম অলংকরণ বাঁকুড়া জেলার কোতুলপুর থানার অন্তর্গত কোঙারপুর গ্রামেও দেখেছি। যে তিনটি জেলার উল্লেখ করলাম তাদের অবস্থান বিশেষভাবে

লক্ষণীয়। তা থেকে প্রমাণ হয় যে পশ্চিমবঙ্গের উত্তর, পশ্চিম, দক্ষিণ—সর্বত্রই কু'ড়েঘরে কাদামাটির এহেন 'বা-রিলিফ' সজ্জার একদা প্রয়োগ হত, হাওড়া জেলায় যাকে বলা হয় 'উলুটির কাজ'। এসব অর্ধ-চিত্রে গৃহস্বামীর অভিরুচি অনুযায়ী অনেক সময় রঙের প্রয়োগ হয়েছে, অনেক সময় হয়নি। দরজার দু'পাশে সাধারণত জোড়া ময়ূর বা জোড়া পে'চা (লক্ষ্মীর বাহন) অথবা অন্যান্য পশুপাখি আর দরজার ঠিক উপরে ফুলকারি বা ওই জাতীয় নকশা নিবদ্ধ হত। এ শিল্পের কারিগররা অধিকাংশই এখন উৎসন্ন হয়েছেন নয়ত পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে অন্য পেশা অবলম্বন করতে বাধ্য হয়েছেন। শুধু হাওড়া জেলায় তাঁরা বেশ কিছু সংখ্যায় এখনও সক্রিয় আছেন বলে শুনেছি।





সাঁওতালী 'ফ্রেস্কো'

ইংরেজী 'ফ্রেস্কো' কথাটির বাংলা প্রতিশব্দ কি? দেওয়াল-চিত্র কথাটি কোন কোন ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হতে দেখেছি। কিন্তু 'ফ্রেস্কো' যে শুধু দেওয়ালেই আঁকা হবে এমন কোনো বাঁধাধরা নিয়ম নেই। থামের গায়ে অথবা ছাদ কি খিলানের তলপৃষ্ঠে অনায়াসেই এজাতীয় চিত্র অঙ্কিত হতে পারে। হয়েওছে অনেক প্রসিদ্ধ ক্ষেত্রে, যেমন অজন্তায়। সেখানে গুহার দেওয়ালগুলি এবিষয়ে প্রধান স্থান অধিকার করলেও ছাদও 'ফ্রেস্কো'-সমৃদ্ধ। সিংহলের সিগিরিয়ায় এক গ্রানিট পাহাড়ের গায়ে, মাটি থেকে কয়েক শ ফুট উঁচুতে, অনেকগুলি যুবতী-চিত্র অঙ্কিত আছে, যাদের খ্যাতি আন্তর্জাতিক। অবশ্য, পাহাড়ের দেওয়াল সেখানে সিধা খাড়া নয়। তাহলে বর্ষাবাদলে এই প্রাচীন 'ফ্রেস্কো'-গুলি বহুদিন আগেই নষ্ট হত। প্রাকৃতিক কারণে, পাহাড়ের গায়ে সেখানে, অনেকখানি জায়গা জুড়ে এক সমান্তরাল খাঁজ বা বলির সৃষ্টি হয়েছে। রৌদ্রবৃষ্টির আক্রমণ থেকে নিরাপদ এই জায়গাটুকুতে সিগিরিয়ার 'ফ্রেস্কো'গুলি অঙ্কিত।

দেওয়াল-চিত্র শব্দটিকে সেজন্য 'ফ্রেস্কো' কথাটির যথার্থ প্রতিশব্দ বলা যায় না। কেননা, দেওয়াল তো দূরের কথা, ইমারতের কুত্রাপি ব্যবহৃত না হয়ে এই চিত্রশৈলী পর্বতপৃষ্ঠকেও অবলম্বন করতে পারে। আসলে, রৌদ্রবৃষ্টি বা অন্যান্য রকম প্রাকৃতিক ক্ষয়ক্ষতির সম্ভাবনা যেখানে কম এরকম যেকোন সমতলেই 'ফ্রেস্কো' অঙ্কিত হতে পারে, তা সে ইমারত বা গুহার মধ্যেই হোক কিংবা বাইরেই হোক। এই সব কারণে মনে হয় 'ফ্রেস্কো' কথাটিকে বাংলা ভাষায় প্রবিষ্ট বৈদেশিক শব্দ বলে মেনে নেওয়াই হয়তো উচিত। তাতে অর্থবোধের জন্য এত ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয় না।

নাতিদীর্ঘ এ ভূমিকার অজুহাত এই যে, বর্তমান প্রবন্ধে 'ফ্রেস্কো' কথাটিকে ভাষান্তরিত না করেই আগাগোড়া ব্যবহার করা হয়েছে। ভাষান্তর যেখানে পূর্ণ ভাব-প্রকাশের অন্তরায় সেখানে মূল বিদেশী শব্দটিকে গ্রহণের স্বপক্ষে এ এক রকম ওকালতি।

ইউরোপের প্রসিদ্ধ গির্জাগুলির অভ্যন্তরে, বিশেষ করে ভ্যাটিকানে, এবং অজন্তার গুহাগাত্রে যে বিখ্যাত ফ্রেস্কোগুলি অঙ্কিত আছে, অসংখ্য পুস্তক-পুস্তিকার মাধ্যমে সেগুলি এখন সর্বজনবিদিত। কিন্তু এই মহৈশ্বর্যময় শিল্পশৈলীটির এক দীন জ্ঞাতি যে বাংলা-বিহারের দরিদ্র গ্রামগুলিতে এখনও টিকে আছে সেকথা সকলে জানেন কিনা সন্দেহ। কোন সম্রাটের বিত্ত অথবা রাষ্ট্রের প্রতাপ কখনও এই দীন জ্ঞাতিটির সাহায্যে অগ্রসর হয়নি; কোন খ্যাতনামা শিল্পসাধকও কখনও এই অবহেলিত শৈলীটির চর্চা করেছেন বলে শোনা যায়নি। নিছক গ্রাম্য চিত্রকলা হিসেবে, প্রধানত পল্লীরমণীদের

পরিচর্যায়, এই লোকশিল্পটির সৃষ্টি ও পরিপুষ্টি। দেশদেশান্তরের দৃষ্টি আকর্ষণ করার সাধ্য এর নেই। কিন্তু গ্রামীণ শিল্পীদের সীমায়িত শিল্পসাধ মেটাবার ক্ষমতা আছে যথেষ্ট পরিমাণেই।

আমি বাংলা-বিহার সীমান্তের উভয় দিকের বিস্তীর্ণ অঞ্চলের কথা বলছি, যেখানকার সাঁওতাল পল্লীগুলিতে মাটির কুটিরের দেওয়াল ফ্রেস্কো-শোভিত করা এক প্রচলিত প্রথা। পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম, বর্ধমান, বাঁকুড়া ও মেদিনীপুর জেলার পশ্চিমাঞ্চলে বহু সাঁওতালের বাস। সংখ্যাবৃদ্ধির দরুন, আদিভূমি সাঁওতাল-পরগনা থেকে এখন তাঁরা চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়েছেন। তাঁদের প্রধান অংশ এখনও বিহার ও উত্তর-উড়িষ্যায় রয়ে গেলেও, পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিম প্রান্তবর্তী এলাকায় সাঁওতালদের সংখ্যা অগণিত। পাহাড়-অরণ্যের নিভৃত স্নেহাঞ্চল ছেড়ে সভ্যতার সংস্পর্শে এসে তাঁদের রীতিনীতির, তাদের জীবনযাত্রার অনেক পরিবর্তন ঘটেছে সত্য। কিন্তু দূর অতীতকালে লব্ধ এই শিল্পচেতনা তাঁরা আজও বিস্মৃত হননি। সামান্য বিত্তে, সামান্যতর দক্ষতায় এই শিল্পসাধটুকু তাঁরা মিটিয়ে আসছেন এখনও, যেমন মিটিয়ে এসেছেন আবহমানকাল।

কত যুগ আগে অনার্য সাঁওতাল সভ্যতায় এই শিল্পচেতনার প্রথম উন্মেষ হয়েছিল তার কালনির্ণয় এখন আর সম্ভব নয়। তবে মোটামুটিভাবে একথা হয়তো বলা যায় যে, এই উন্মেষ সাঁওতালদের বনজীবী সমাজব্যবস্থা থেকে কৃষিজীবী সমাজব্যবস্থায় উত্তরণের সমসাময়িক। এখনও সাঁওতালরা কিছু পরিমাণে বনজীবী। অরণ্যের ফলমূল আহরণে ও বন্যজন্তু শিকারে তাঁদের চিরাচরিত উৎসাহ। কিন্তু সেটা বর্তমান কৃষি-ভিত্তিক জীবনের ঐচ্ছিক পরিপূরক মাত্র। বাংলা-বিহারে এখন এমন সাঁওতালগোষ্ঠী নেই বললেই চলে যাঁরা জীবনধারণের জন্য প্রধানত অরণ্যের উপর নির্ভরশীল। কৃষি-জীবনে কর্মব্যস্ততা ও কর্মবিরতির কতগুলি নির্ধারিত সময় আছে বনজীবনে যা অনুপস্থিত। সেখানে প্রাত্যহিক আহরণ, প্রাত্যহিক শিকার সংবৎসরের। কৃষিজীবনে ফসল রোপণের সময় ঘোর কর্মব্যস্ততা। আবার ফসল ঘরে উঠলেও তাই। কিন্তু এই দুইয়ের মাঝামাঝি সময়ে, শরৎ-হেমন্তের নির্মল আকাশের নীচে শস্যভারে অবনত মাঠের দিকে তাকিয়ে বিশ্রাম নেওয়া যায় কিছুদিন। এ-ই প্রকৃষ্ট কাল উৎসবের, এ-ই উপযুক্ত সময় উদরপূর্তিপ্রয়াসের অতিরিক্ত কিছু করবার। আর্য-ব্রাহ্মণ্য সভ্যতার যাবতীয় প্রধান ধর্মীয় উৎসব এই কৃষিবিরতির কালেই একত্রিত, কেননা, কি উৎসব কি শিল্প-প্রচেষ্টা, অবসর না হলে হয় না। আর, এই অবসরের কাল ভারতের কৃষিভিত্তিক সভ্যতায় যেমন সুনির্দিষ্ট, পূর্ববর্তী আরণ্য-সভ্যতায় তা ছিল না। সেজন্য অবসরপ্রসূত এই শিল্পসাধ যে সাঁওতালদের জীবনে, তারা কৃষিজীবী হবার পরে উন্মেষিত হয়েছে এমন অনুমান অসঙ্গত নয়।

সেই দূর অতীতকাল থেকে অদ্যাবধি সাঁওতালী ফ্রেস্কো-পদ্ধতিতে যে অল্প-বিস্তর পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলেছে তাতে সন্দেহ নেই কিন্তু বিবর্তনের ধারাটি সঠিকভাবে নির্ণয় করা এখন আর সম্ভব নয়। সূচনার কাল থেকে বিবর্তনও যে স্বল্পমেয়াদী নতুন নতুন আঙ্গিকের আবর্তে প্রবাহিত হয়ে এসেছে এমন মনে হয় না। কেননা, এই মুহুর্মুহু পরিবর্তন যাবতীয় লোকশিল্পের মূল প্রকৃতির পরিপন্থী। গ্রামীণ শিল্পকলা স্বভাবতই ধীরগতি, বংশানুক্রমিক ধ্যান ধারণা ও দক্ষতার ঐতিহ্য রক্ষায় যত্নশীল। 'অ্যাংরি-ইয়ংমেন'দের নিত্যনবীন উদ্ভাবনী প্রতিভা এখনও এই নিভৃত অঙ্গনে প্রবেশ করেনি। ফল ভাল হয়েছে কি মন্দ হয়েছে, পাঠকসাধারণ সেকথা বিবেচনা করবেন। তবে এই অস্থিরচিত্ততার অনুপস্থিতি যে আর পাঁচটা লোকশিল্পের মতোই, সাঁওতালী ফ্রেস্কো-পদ্ধতিকে প্রায় আদি যুগের সরলতা ও সততার সঙ্গে আমাদের

সামনে উপস্থিত হবার সুযোগ করে দিয়েছে তাতে সন্দেহ নেই।

ডিজাইন বা অঙ্কনরীতির কথাই প্রথমে ধরা যাক। এবিষয়ে একটু অভিনিবেশ প্রয়োগ করলেই দেখা যাবে যে সাঁওতালী ফ্রেসকোর ক্ষেত্রে হামেশাই এমন কিছু যুগান্তর ঘটেনি বলে আদিম শৈলীটি এখনও অনেকাংশে অবিকৃত আছে। চিত্রশিল্পীরাও প্রায় সকলেই সাঁওতাল রমণী। যথাযথ অঙ্কনবিদ্যায় তাঁদের কাউকেই খুব পারদর্শী বলা যায় না। তাই, তাঁদের শক্তি অনুযায়ী, অঙ্কনরীতিটিকেও খুব সরল করে আনতে হয়েছে। বহুক্ষেত্রে সাঁওতালী ফ্রেস্‌কো নানা রঙের আয়তক্ষেত্রের সমাবেশ ছাড়া আর কিছুই নয়। বিকল্পে, ত্রিভুজ, বর্গক্ষেত্র, সমান্তরিক বা ট্রাপিজিয়মের ব্যবহারও হয়েছে। এদের চিত্ররূপ জ্যামিতিকভাবে ত্রুটিহীন না হলেও সেগুলির প্রতীতি উৎপাদন করে সহজেই।

পারিপার্শ্বিকের প্রভাব লোকশিল্পের উপর অল্পবিস্তর পড়তে বাধ্য। আরণ্যক জীবনের ঐতিহ্যের জন্য সাঁওতালরা যে পশুপাখি, তরুলতা, ফুলফলের প্রতি অনুরক্ত হবেন ও নিজস্ব চিত্রাঙ্কণপদ্ধতির মধ্যে তাদের সগৌরবে স্থান ক'রে দেবেন তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই। কেশসজ্জার উপকরণ হিসেবে সাঁওতাল রমণীদের রঙিন ফুলের ব্যবহার সর্বজনবিদিত। ময়ূরপুচ্ছ ও ফুলের প্রাচুর্য ছাড়া কোনো সাঁওতালী নাচের আয়োজনই সম্পূর্ণ হয় না। সন্নিহিত প্রকৃতির সঙ্গে হৃদ্যতা, সহজবোধ্য কারণেই, সাঁও-তালী ফ্রেসকো-পদ্ধতিকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে। সেজন্য জ্যামিতিক নকশার পরেই যে 'মোটিফ্'টি সর্বাধিক ব্যবহৃত হয় তা হল কুসুমিত তরু। এ বিষয়বস্তুটিকে রূপায়িত করবার জন্য কোনো বাঁধাধরা নিয়ম নেই। তবে মাঝখানের কাণ্ড থেকে দু'পাশে-বার-হওয়া সমান্তরাল শাখায় রাশি রাশি ফুলের অনুকৃতির চিত্র অনেক ক্ষেত্রে দেখেছি। আঁকিয়েদের দক্ষতার তারতম্য অনুসারে এগুলির উৎকর্ষের পার্থক্য হতে পারে। কিন্তু এমন চিত্র কমই দেখা যায় যেখানে লোকশিল্পের বলিষ্ঠ সরলতা অনুপস্থিত। এহেন চিত্রকল্পে বাস্তব কোন বৃক্ষের সঙ্গে বিন্দুমাত্র সাদৃশ্য না থাকলেও শিল্পী যে কী ভাব প্রকাশ করতে চেয়েছেন তা বুঝতে একটুও কষ্ট হয় না, আর আশ্চর্য হতে হয় এজাতীয় নকশার গ্রাম্য-বলিষ্ঠতা ও সারল্যে।

সাঁওতাল জীবনের সঙ্গে যুক্ত অন্যান্য বিষয়বস্তুও সাঁওতালী ফ্রেস্‌কোর উপজীব্য। বাঁকুড়ার পশ্চিম সীমায় এক গ্রামে মুরগির লড়াই ও সাঁওতালী নাচের কতগুলি অপরূপ ফ্রেস্‌কো একদা দেখেছিলাম। স্ফীতকেশর মুরগিদের উত্তেজনা ও পুরুষ বাজিয়েদের মাদলের তালে তালে সাঁওতাল যুবতীদের নাচের দোলা বৈদগ্ধ্যবর্জিত সারল্যে অতি সুন্দরভাবে অঙ্কিত হয়েছিল। কোনো গাছের সঙ্গে যুক্ত নয় এরকম একক ফুলের ছবিও প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। সে ফুল যে কোন্ ফুল তা বলা যায় না, কেননা জ্ঞানগম্য কোনো ফুলের সঙ্গে তার সাদৃশ্য নেই। ফুলগুলি সর্বত্রই পূর্ণপ্রস্ফুটিত, বিকশিতদল। কিন্তু দলগুলির প্রত্যেকটির রঙ ভিন্ন হতে কোনো বাধা নেই। ঘরে ঢোকবার দরজার দু'পাশের দেওয়ালে—যেখানে ব্যাপকভাবে হয়তো ফ্রেস্‌কো অঙ্কিত হয়নি—এরকম দু'চারটি কল্পনাশ্রয়ী ফুল অনেক সাঁওতাল কুটিরেরই শোভা বর্ধন করে।

ফ্রেস্‌কো অলংকরণের রংগুলি কিভাবে তৈরি হয়? এ ক্ষেত্রেও লোকশিল্পের অনা-ড়ম্বর ধারাটি সমানভাবে অব্যাহত। প্রধানত চার রকম রঙের ব্যবহার হয়—সাদা, কালো, গেরুয়া ও নীল। ঘনত্ব অনুসারে এদের গাঢ়ত্বের প্রকারভেদ হতে পারে কিন্তু মিশ্রিত রং ব্যবহৃত হয় বলে মনে হয় না। গেরুয়া ও নীলের সমন্বয়ে একরকম বিকৃত সবুজ পাওয়া হয়ত সম্ভব ছিল, কিন্তু এরকম সংকর রঙের ব্যবহার বড় একটা দেখিনি। সাদা রং তৈরি হয় কালিচুন থেকে। নকশায় ব্যবহার ছাড়াও মাটির দেওয়ালের উপর প্রথম প্রলেপ ('অন্তর') হিসাবে এটি কার্যকর। খড়কুটো পুড়িয়ে সেই ছাই জলে গুলে গাঢ় ছাই

রং বা ফিকে কালো রং তৈরি হয়। যেসব সাঁওতাল কুটিরে ফ্রেস্‌কোর চিহ্নমাত্র নেই, সেখানেও অন্তত ভিত্তিবেদী অবধি—কোনো কোনো ক্ষেত্রে দেওয়ালের সর্বাংশই—এই গাঢ় ছাই রঙে লেপা থাকে। প্রসঙ্গত, বাইরের দেওয়ালে বা ভিত্তিতে এই রঙের বা ফ্রেসকোর ব্যবহার দেখেই সাঁওতাল কুটিরগুলিকে নির্ভুলভাবে চেনা যায়। বঙ্গ-বিহার সীমান্তের সন্নিহিত অঞ্চলে যাঁরা ভ্রমণ করেছেন তাঁরাই জানেন স্থানীয় বাগ্‌দী বাউড়ী প্রভৃতি উপজাতির কুঁড়েঘরের থেকে সাঁওতালদের আবাসগুলিকে পৃথক করতে হলে এই নিশানাই অভ্রান্ত। ছাই-গোলা রঙের থেকে গাঢ় কালোর প্রয়োজন হলে কাঠকয়লার খুব মিহি গুঁড়ো জলে গুলে নেওয়া হয়। কালোর মতো গেরুয়া রঙও তৈরি হয় বিনামূল্যে। সাঁওতাল পরগনা বা রাঢ় অঞ্চলে গিরিমাটির অভাব নেই; জলের সঙ্গে তা ঘষে বা গুঁড়ো করে মিশিয়ে নিলেই হল। নীল রঙের বেলায় অবশ্য হাটে-বাজারে যাওয়া প্রয়োজন হয়, কেননা কাপড় কাচার জন্য ধোপারা যে-নীল ব্যবহার করে থাকে, ফ্রেস্‌কো অলংকরণের জন্য সেই একই নীল ব্যবহৃত হয়।

দেওয়ালের গায়ে রং ধরানোর একটু বিশেষ পদ্ধতি আছে। ন্যাতার সাহায্যে কাদা-গোলা জলের ঘন প্রলেপ মাখিয়ে প্রথমে দেওয়ালটিকে যতদূর সম্ভব মসৃণ করে নেওয়া হয়। তারপরে, ভিজে অবস্থাতেই, দেওয়ালের উপর আঙুলের ডগা দিয়ে অভীষ্ট নকশাটি এঁকে নেওয়া হয় মোটামুটিভাবে। দেওয়াল শুকিয়ে গেলে, আঙুলের দাগ তখনও চোখে পড়ে। সেই ড্রইং বরাবর আঙুল বা ন্যাকড়ার সাহায্যে রংগুলি লাগানো হয়। যেখানে কলিচুনের 'অন্তর' পড়ে কাদার প্রাথমিক প্রলেপের উপর, সেখানে এভাবে আঙুলের সাহায্যে প্রাথমিক ডিজাইনটি করা হয় না। 'অন্তর' শুকিয়ে সাদা হ'য়ে উঠলে একেবারে চূড়ান্ত নকশাটি এঁকে ফেলা হয়। এতে ড্রইং-এর কিছু হানি হয় হয়তো, কিন্তু তাতে বিশেষ কিছু এসে যায় না। একথা আগেই বলেছি যে লোকশিল্পের যথার্থ উৎকর্ষ তার গ্রাম্য সরলতার বলিষ্ঠ বিকাশে, নিখুঁত ড্রইং-এ নয়।

প্রসঙ্গত, আর এক প্রকারের ফ্রেস্‌কোর উল্লেখ করা প্রয়োজন, যেখানে রঙের কোনো ব্যবহারই হয় না। ভিজে দেওয়ালের উপর প্রাথমিক নকশা আঁকবার যে পদ্ধতিটির উল্লেখ এইমাত্র করলাম সেই একই উপায়ে খুঁটিনাটি সমেত সম্পূর্ণ নকশাটি আঁকা হয় সিক্ত সমতলে। পরে, দেওয়াল শুকিয়ে গেলে, ফিকে মাটি-রঙের আলপনা আঙুলের দাগ-বরাবর ফুটে ওঠে দেওয়ালের গায়ে। অতি অপূর্ব 'লেস'-এর মতো দেখায় এই ফ্রেস্‌কো-গুলিকে। ব্যক্তিগতভাবে, সাঁওতালী ফ্রেস্‌কোর বিভিন্ন দৃষ্টান্তের মধ্যে এগুলিকেই আমি শ্রেষ্ঠ মনে করি তাদের কোমল রমণীয়তার জন্য। কিন্তু এগুলিকে ফোটোগ্রাফ করে পাঠকদের সামনে উপস্থিত করা দুঃসাধ্য। যত্ন করে আলোকচিত্র যদিও বা তোলা যায়, প্রতিলিপিতে তার সূক্ষ্মতার অনেকখানি হানি হবার কথা।

দু'বছর আগে, হেমন্তের শিশিরভেজা কয়েকটি দিনে, বঙ্গ-বিহার সীমান্তের গ্রাম-গ্রামান্তরে একাকী ঘুরে বেড়িয়েছিলাম সাঁওতালী ফ্রেস্‌কোর সন্ধানে। ফসল ঘরে আসবার আগের সেই স্বল্প অবসরটুকুতে—কার্তিক-অঘ্রানে—ফ্রেস্‌কো আঁকবার বড় ধুম দেখেছিলাম অনেক পল্লীতে। নতুন চিত্র আঁকা হচ্ছে কোথাও, পুরানো ছবি নব-কলেবর পাচ্ছে অন্যত্র। আজ, আর এক অঘ্রানে, সেসব গ্রাম থেকে প্রায় দু'শ মাইল দূরে বসে এ প্রবন্ধ লিখছি। মন পড়ে আছে নির্মল আকাশের নীচে সেই রৌদ্রস্নাত গ্রামগুলিতে। মন পড়ে আছে সাঁওতালদের পরিচ্ছন্ন কুটিরগুলির আঙিনায়। মন পড়ে আছে কৌতূহলী সাঁওতাল জনতার সরল, হাস্যমুখরিত কলরোলে। হেমন্তের এই অলস দিনে, আজও নিশ্চয়ই নানা রঙের নানা চিত্র অঙ্কিত হচ্ছে সেইসব কুঁড়েঘরের দেওয়ালে দেওয়ালে। শুধু আমি আজ সেখানে নেই।...



বহড়ু

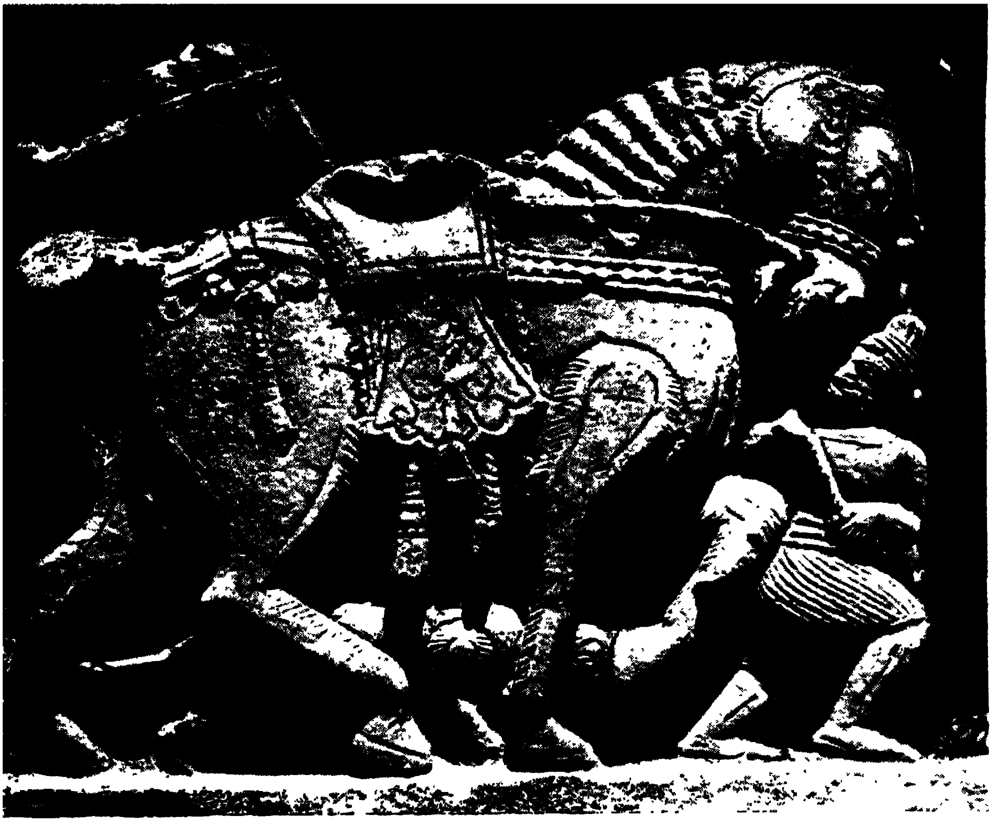
কলকাতা-বারুইপুর-মথুরাপুর পিচের সড়কে, কলকাতা থেকে প্রায় ৩০ মাইল দক্ষিণে (জয়নগর-মজিলপুরের মাইল দুই আগে), বহড়ু গ্রাম। ঘড়ি ধরে শেয়ালদা থেকে ট্রেনে চাপা যাঁদের পক্ষে অসুবিধাজনক তাঁরা ৫ কি ৬ নম্বর বাসে গড়িয়া টার্মিনাসে নেমে জয়নগরগামী অন্য বাসে যেতে পারেন। তাতে বাড়তি সুবিধা, আজকের গন্তব্য-স্থলের একেবারে কাছে গিয়ে পেঁছনো যায়। এপথে অহরহ বাস চলে ব'লে বেশীক্ষণ অপেক্ষাও করতে হয় না। আবার বাস জার্নি'র কথা চিন্তা করলেই যাঁদের জ্বর আসে (কার না আসে?) তাঁরা একটু সময় হাতে রেখে শেয়ালদা থেকে যেকোন লক্ষ্মীকান্ত-পুর লোকাল ধরলে তৃতীয় শ্রেণীতেও আরামে বসে যেতে পারেন। ছুটিছাটার দিনে খুব একটা ভীড়ও থাকে না। সময় লাগে কমবেশি সওয়া এক ঘণ্টার মতো। ভাড়া, তৃতীয় শ্রেণীতে আনুমানিক এক টাকা কুড়ি পয়সা; প্রথম শ্রেণীতে সাড়ে পাঁচ টাকা। বহড়ুর বসু-পরিবারের ভদ্রাসন রেল স্টেশন থেকে বেশী দূরে নয়। আবহাওয়া ভাল থাকলে এ পথটুকু মহিলাদের পক্ষেও হেঁটে যাওয়া সম্ভব। সাইকেল রিকশাও পাওয়া যায়।

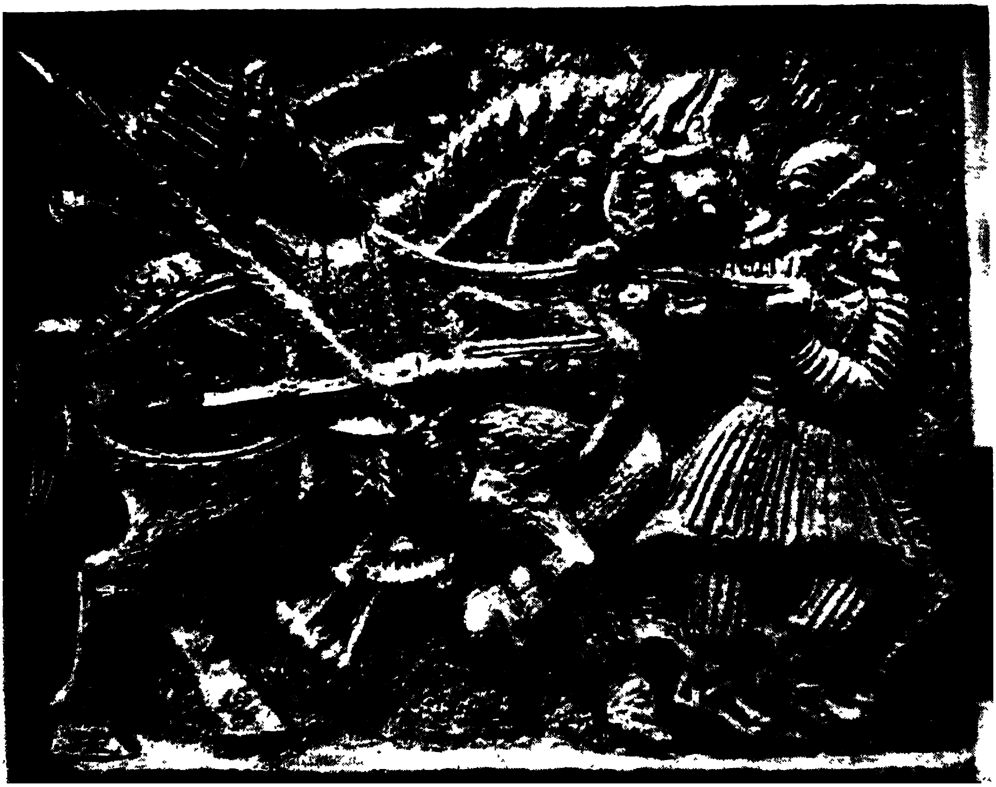
যে পথেই আসা যাক না কেন, পিচের সড়কের উপর বহড়ু-বাজার (স্থানীয় উচ্চারণে 'বড়ু-বাজার') হয়েই আসতে হবে। সেখানে দু'পাশে কিছু দোকানপাট, বাজার, হাটতলা। তার সংলগ্ন পুবে পাকা ঘাটবাঁধানো এক পুরনো দীঘি। এখন শৈবালদামে ছেয়ে গেলেও ঘাটের কাছে পরিষ্কার জল। সেখানে হাতমুখ ধুয়ে দুপুরের আহার ঘাটের চাতালে বসেই সারা যেতে পারে। পাশের হাটতলায় নলকূপ আছে।

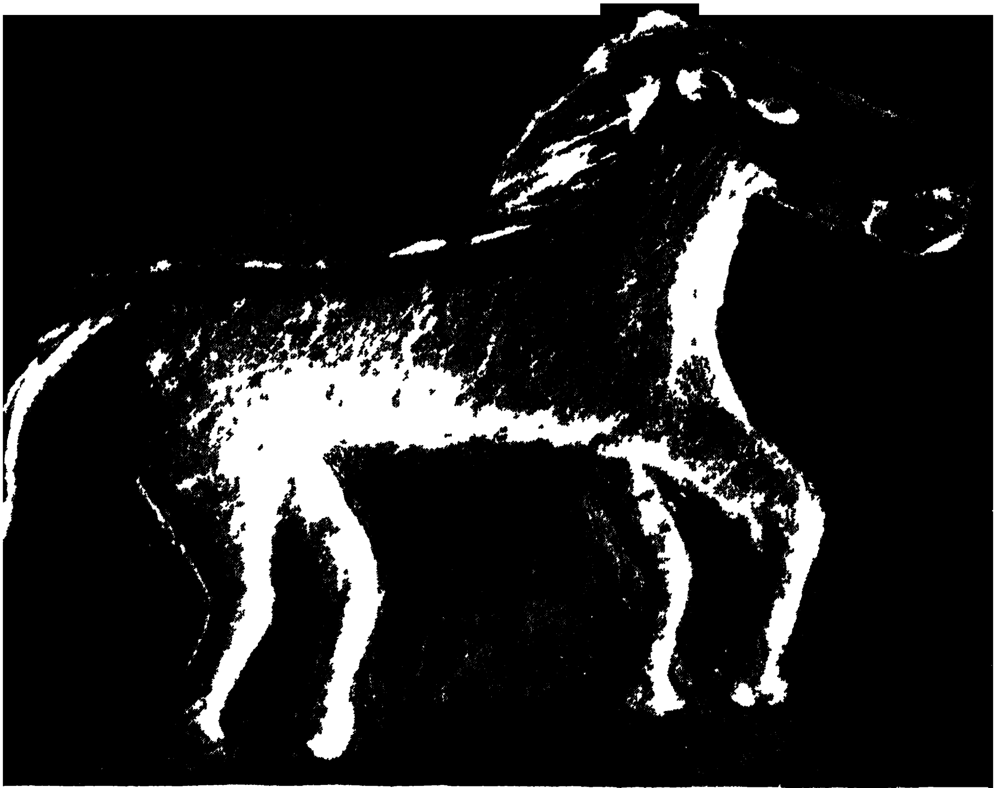
দীঘির পাড়ে পাশাপাশি পাঁচ-ছ'টি ছোট ছোট আটচালা শিবমন্দির। জলাশয় ও তার পাড়ে এহেন মন্দির উৎসর্গ করবার রীতি একদা পুণ্যকামী হিন্দুদের মধ্যে বেশ প্রচলিত ছিল। একটি দেবালয়ের প্রতিষ্ঠালিপি থেকে দেখা যায়, শতাধিক বছর আগে বসু-পরিবারের পূর্বপুরুষেরা এগুলি নির্মাণ করিয়েছিলেন। কিন্তু নোনাধরা ইঁট, অপহৃত কপাট, চূড়াশ্রয়ী গাছপালা ও তাদের নিম্নমুখী শিকরজাল থেকে বুঝতে কষ্ট হয় না যে এগুলির রক্ষণাবেক্ষণের জন্য আজ আর তেমন কেউ নেই।

বহড়ু-বাজার থেকে খোয়া-ওঠা ইঁটের যে রাস্তা বসুবাড়ির দিকে গিয়েছে তার দু'পাশে একটানা প্রাচীন দেবদারুর সারি। সংক্ষিপ্ত হলেও এত সুন্দর পথ পশ্চিম-বঙ্গের গ্রামাঞ্চলে বড় একটা দেখা যায় না। তার শেষ প্রান্তে, খোলা জায়গায়, উঁচু ভিত্তিবেদীর উপর প্রতিষ্ঠিত এক প্রকাণ্ড দোলমঞ্চ। উৎসবের সময় বসু-পরিবারের গৃহদেবতা শ্যামসুন্দর ও রাধিকাকে আনুষ্ঠানিকভাবে এখানে এনে রাখা হয়। সামনেই কাঠের কপাটের গায়ে লোহার গজাল-বসানো উঁচু সিং-দরজা—বসুবাড়ির প্রধান প্রবেশ-







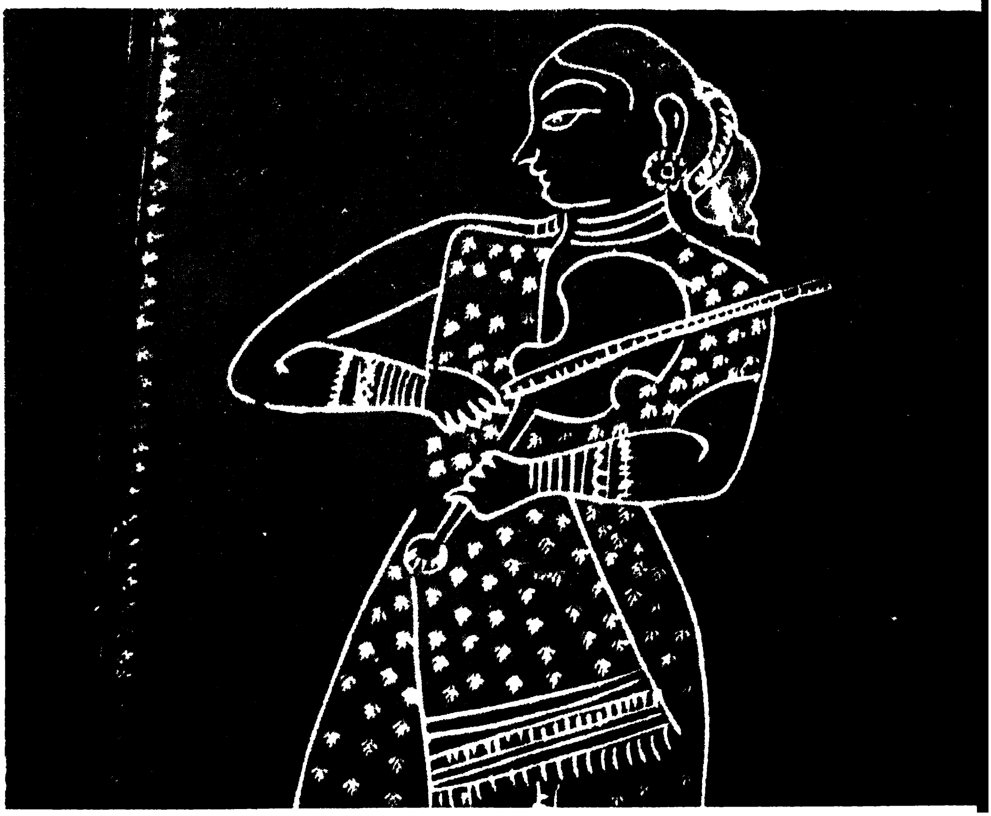




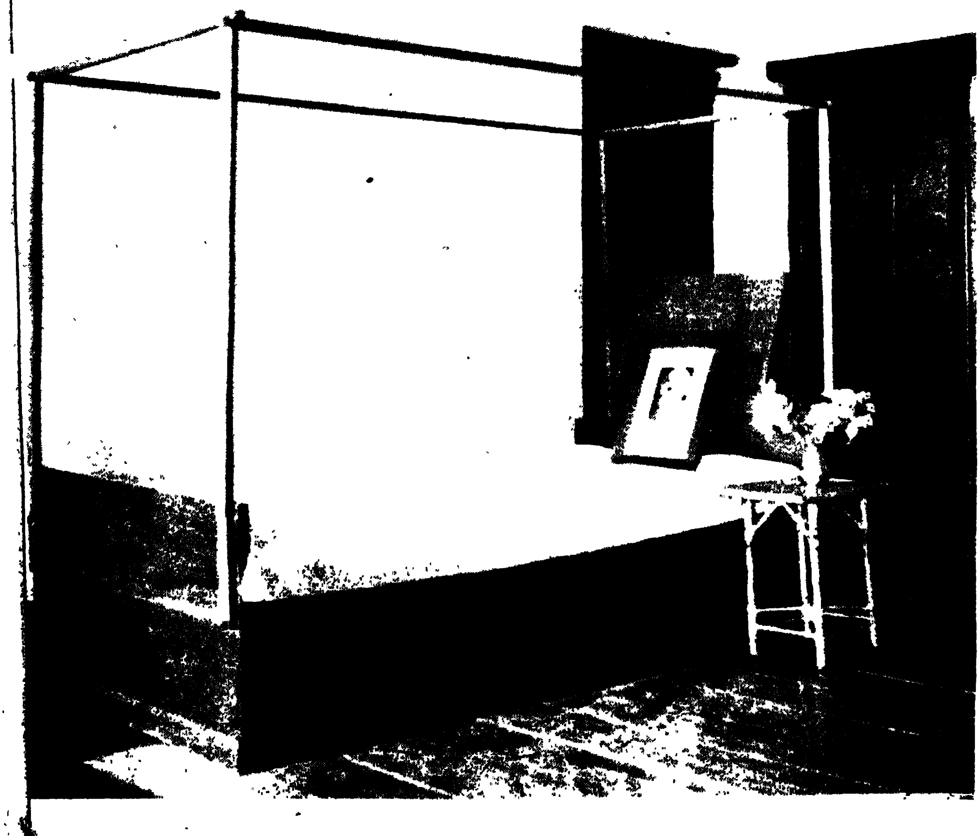






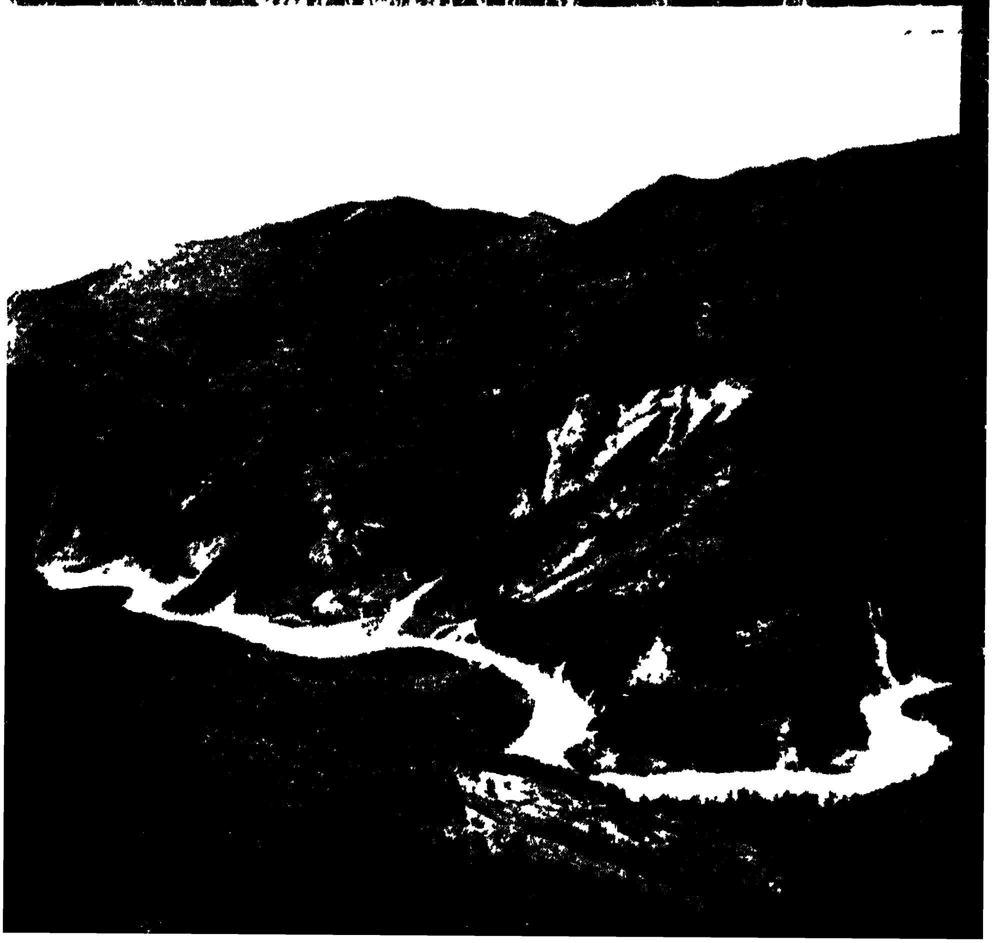


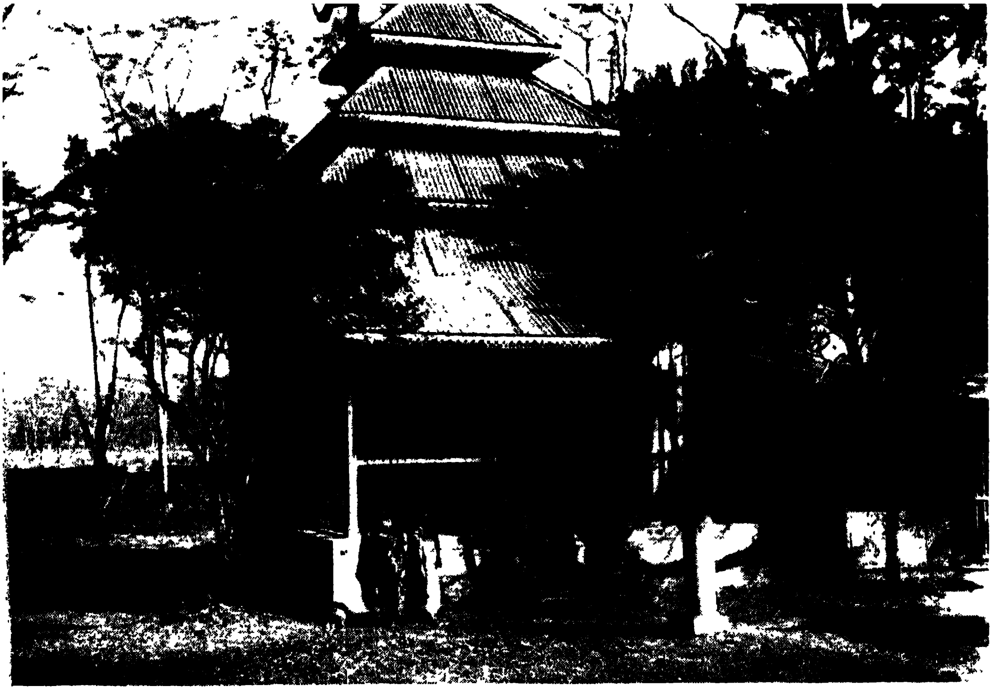




॥ মংপু ॥ রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিপূত আবাস ও শয্যা



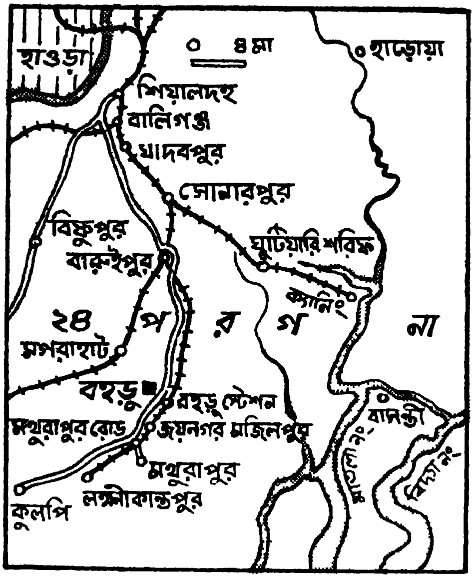






দ্বার। ভিতরে ঢুকলে মনে হয় যেন কোনো দুর্গে প্রবেশ করেছি। আশেপাশে দেউড়ি ও নানান মহল। অন্ধকার ঘুরপথে সেসব পার হয়ে এক প্রশস্ত ঠাকুরদালানের সামনে এসে পেঁছনো যায়, যার বর্তমান জীর্ণদশার মধ্য দিয়েও সাবেক ঐশ্বর্য অনুমান করতে কষ্ট হয় না। আগাছায় ঢাকা বিস্তৃত অঙ্গন থেকে সিঁড়ি উঠে গেছে সামনের চওড়া চাতালে। তারপর গোল থামের গুচ্ছ দিয়ে তৈরি বড় বড় স্তম্ভের উপর পাঁচটি প্রশস্ত খিলান। দালানের ভিতরেও আর এক সারি এরকম খিলান আছে। অজস্র পঙ্কের কাজে দেওয়ালগুলি একদা সজ্জিত ছিল। এখন তা অনুমান করা যায় মাত্র। উঠনের আর তিন দিকে ঢাকা দালান; দোতলায়ও অনুরূপ বারান্দা। যাত্রাগান ইত্যাদি অনুষ্ঠানের সময় সম্ভ্রান্তেরা বসতেন উঠনের সাজানো আসরে, অন্যান্য পুরুষেরা একতলার বারান্দায় ও মহিলারা দোতলার দালানে, চিকের আড়ালে। এখন দোতলার বারান্দার দূরের দিকের অনেকখানি অংশ ভেঙে পড়েছে; শূন্য আকাশের নীচে অবলম্বনহীন কয়েকটি থাম দাঁড়িয়ে আছে, বসুবংশের বর্তমান অসহায়তার প্রতীকের মতো। এই ঠাকুরদালানে মহাসমারোহে একাদিক্রমে প্রায় দেড় শ বছর দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হয়ে সে উৎসবে ছেদ পড়েছে মাত্র গত কয়েক বৎসর। কথাপ্রসঙ্গে গৃহস্বামী শৈলেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় ১২৩২ বঙ্গাব্দে অনুষ্ঠিত দুর্গাপূজার কিছু হিসাবপত্র এনে দেখালেন। পুরনো তুলট কাগজের উপর ভুসো কালির অক্ষরগুলো এখনও বেশ স্পষ্ট। প্রায় দেড় শ বছর আগে বাংলার এ অঞ্চলে উৎসব-পার্বণে কি রকম খরচ পড়ত সেকথা জানতে অনেকেই হয়ত আগ্রহী হবেন। বসু-পরিবারের সেই প্রাচীন দুর্গোৎসবে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র এক সঙ্গেই যে সবটা কেনা হয়েছিল এমন নয়; খুচরো খরিদই বেশী, যেমন সব গৃহস্থঘরের পূজা-পার্বণেই হয়ে থাকে। ভুসো কালির গোটা গোটা অক্ষরে হিসাবের সেই বহুমূল্য দলিলখানায় দেখলাম লেখা আছে—আড়াই সের সরিষার তৈল সাড়ে ছয় আনা; এক মণ ঘৃত সাড়ে একুশ টাকা; পাঁচ সের আতপ চাল তের পয়সা; পনের সের সোনামুগ ডাল এক টাকা দু' আনা, এক মণ নারিকেল তেল চোদ্দ টাকা; এক মণ সুজি সাড়ে চার টাকা; আড়াই সের চিনি ন' আনা; এক মণ বেসন চার টাকা; তিন সের লবণ তিন আনা; আটাশ সের ময়দা আড়াই টাকা; ত্রিশ সের দই দেড় টাকা; সাড়ে-বারো সের রসকরা পাঁচ টাকা দু'আনা; পাঁচ পণ পান (৪০০টি) সাত পয়সা; এক পোয়া এলাচ দশ পয়সা; এক ছটাক লবঙ্গ তিন আনা; দু' তোলা কর্পূর ছ' পয়সা; কুড়িটি আতা চার আনা; ষাটটি শশা চার আনা; তিন সের বাদাম এক টাকা; পাঁচ সের সুপারি আট আনা; সাড়ে-তিন সের বাতাসা চোদ্দ আনা; পাঁচটি মর্তমান কলা এক আনা; দুটি থাতাবিলেবু এক আনা; একটি ঝুনা নারিকেল দু' পয়সা; এক জোড়া ধুতি আট আনা ও একদিনের জন্য ষোলজন মজুর এক টাকা ইত্যাদি। এ হিসাব দেখে আজকের দুর্গাপূজোর উদ্যোক্তাদের যে বেশ বড় রকমের দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়বে তা বুঝতেই পারছি।

গৃহস্বামী মহাশয় বহড়ুর দক্ষিণ রাঢ়ীয় বসু-বংশের কারিকা ও আর যেসব প্রাচীন কাগজপত্র আমাকে দেখিয়েছিলেন তা থেকে মন হয় এ পরিবারের আদিপুরুষ দশরথ বসু কান্যকুব্জ-আগত পঞ্চ-কায়স্থের অন্যতম। তাঁর অধস্তন চতুর্থ পুরুষ, দুই সহোদরের মধ্যে শক্তিরাম, বল্লাল সেনের কাছে কৌলীন্য মর্যাদা লাভ করে 'বাগাণ্ডা-সমাজ' বসু-বংশ এবং মুক্তিরাম অনুরূপ মর্যাদা লাভ করে 'মাহীনগর-সমাজ' বসু-বংশের পত্তন করেন। তাঁদেরই ১৭তম অধস্তন পুরুষ, কৃষ্ণদাস, দু'মাইল দূরের ময়দা গ্রামে এসে প্রথম বসতি করেন। তাঁর পাঁচ পুরুষ পরের আর দুই সহোদর, মুক্তারাম ও রামচরণ ১২০০ বঙ্গাব্দের কাছাকাছি সময়ে তাঁদের বাস উঠিয়ে আনেন বহড়ুতে। ইতিমধ্যে



২৪-পরগণার দক্ষিণ অঞ্চলে এ পরিবার ধীরে ধীরে যে বিস্তীর্ণ জমিদারীর মালিক হয়ে উঠছিলেন তার দেখাশোনা করবার জন্য এই স্থান পরিবর্তন হয়তো প্রয়োজন ছিল। রামচরণের পুত্র নন্দকুমারের সময়ই বসু-বংশের সবচেয়ে বাড়বাড়ন্তের কাল। ১২৩২ বঙ্গাব্দের দোসরা আশ্বিন তারিখে সম্পাদিত তাঁর মূল উইলে যে সাতটি তৌজি দেবোত্তর করা হয় তার বিস্তৃতি থেকে এ অনুমানই স্বাভাবিক যে সেই বিশাল জমিদারি গড়ে তুলতে বেশ কিছুদিনের অবিরাম প্রয়াস নিয়োজিত হয়ে থাকবে। শ্রীবিনয় ঘোষ মহাশয় তাঁর 'পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি' গ্রন্থে (পৃঃ ৬১৩) লিখেছেন, নন্দকুমার বসু ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর দেওয়ান ও কিছুদিন জয়পুর রাজ্যেরও দেওয়ান ছিলেন। আমার অনুসন্ধান অনুসারে, তিনি প্রথমে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর মণ্ডলঘাট কুঠির গোমস্তা ও পরে কাশিমবাজার রেশমকুঠির দেওয়ান ও কলকাতা কাস্টম হাউসের দেওয়ান হয়েছিলেন কিন্তু কখনই জয়পুর রাজ্যের দেওয়ান ছিলেন না। বসু-পরিবারের কেউ আমাকে এরকম কোন কথাও বলেননি। তাঁদের কাছে রক্ষিত প্রাচীন কাগজপত্রেও এর সমর্থন পাওয়া যায় না। নন্দকুমার যে জয়পুর রাজ্যের দেওয়ান ছিলেন এই ধারনায় বিনয়বাবু জয়পুরের কোন শিল্পীকেই বহড়ুর শ্যামসুন্দর-মন্দিরের দেওয়াল-চিত্রগুলির রচয়িতা হিসাবে সরাসরি কল্পনা করেছেন। সে যাই হোক, বসু-পরিবারের বর্তমান কর্তা শৈলেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের পাঁচ পুরুষ আগেকার নন্দকুমারের শ্রেষ্ঠ কীর্তি হল বহড়ুর শ্যামসুন্দরের দালান-মন্দির ও তার দেওয়ালে অঙ্কিত অনেকগুলি 'ফ্রেস্‌কো'-চিত্র। মন্দিরটির নির্মাণে যথেষ্ট পরিমাণে চুনারের বেলে-পাথর ব্যবহৃত হয়েছে ও 'ফ্রেস্‌কো'গুলির অঙ্কনশৈলীতেও রাজস্থানী রীতির প্রভাব স্পষ্ট। কিন্তু স্থপতি ও চিত্রকরেরা যে জয়পুর থেকে এসেছিলেন এমন কোন সুনিশ্চিত প্রমাণ আমার হাতে নেই। পারিবারিক লোকশ্রুতি অনুসারে, নন্দকুমার বহুদিন বৃন্দাবনে বাস করে সেখানে একাধিক রাধাকৃষ্ণের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। শারীরিক অক্ষমতার জন্য তাঁর বৃদ্ধা মাতা সে দেবালয়গুলি দেখতে যেতে পারেননি বলে তাদেরই অনুরূপ এ মন্দিরটি নাকি পৈতৃক ভদ্রাসনের একাংশে নির্মিত হয়। বৃন্দাবনে রাজা

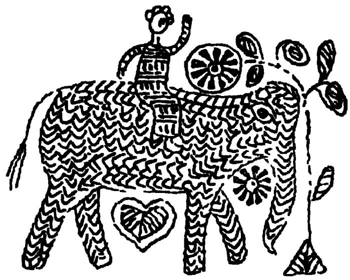
মানসিংহ প্রভৃতির প্রতিষ্ঠিত মন্দিরগুলি যাঁরা দেখেছেন তাঁরা জানেন এই সর্ব-ভারতীয় তীর্থক্ষেত্রে জয়পুরী শিল্পীরা দীর্ঘকাল কাজ করেছেন। বৃন্দাবনের মন্দিরগুলি নির্মাণের সময় নন্দকুমার এহেন যেসব শিল্পীকে নিয়োগ করে থাকবেন তাঁদের মধ্যে দু'একজনকে বহড়ুতে নিয়ে আসা তাঁর পক্ষে খুবই স্বাভাবিক ছিল। এ অনুমানের সমর্থনে আর একটি প্রমাণ পেশ করা যেতে পারে। দালানের পুবের দেওয়ালে প্রাচীন বাংলা হরফে এক জায়গায় লেখা আছে—"অতি দিন হিন ভক্তজন দুর্গারাম ভাসকরেণ চিত্রকরেণ।" (সেকালে 'র'কে পেটকাটা 'ব' হিসাবে লেখা হত।) এইটুকু লিপির মধ্যে ভুল বানানের নমুনা থেকে চিত্রকরকে বাংলা ভাষায় অল্পশিক্ষিত বলেই মনে হয়। আনুমানিক দেড় শ বছর আগে বঙ্গদেশে রাজপুত রীতির চিত্রকলা প্রচলিত ছিল না। বাঙালী কোন চিত্রকর সে সময়ে রাজপুতানায় গিযে এ আঙ্গিকের চর্চা করে দেশে ফিরে এসেছিলেন, এমনও কোন নিশ্চিত প্রমাণ নেই। অথচ 'ফ্রেস্‌কো'-গুলিতে, বিশেষত পুব দেওয়ালের গোপিনীপরিবৃত রাধাকৃষ্ণ 'প্যানেল'টিতে (এটির নীচেই চিত্রকরের নাম লেখা আছে) যুবতীগণের ঘাঘরা, কাঁচুলি ও ওড়নায় ও তাদের অঙ্কনরীতিতে রাজস্থানী কায়দা খুবই স্পষ্ট। বহু ছবিতে বৈষ্ণব ধর্মীয় ভাবেরও যথাযথ প্রকাশ হয়নি। নন্দকুমারেব মতো পরম বৈষ্ণবেব তত্ত্বাবধানে অঙ্কিত চিত্রে কোন বাঙালী চিত্রকর (যে নিজেও "দিন হিন ভক্তজন") এহেন বিচ্যুতি ঘটাতেন কিনা সন্দেহ। প্রায় সমসাময়িক কালে অঙ্কিত গুপ্তিপাড়ার বৃন্দাবনচন্দ্র মন্দিরের 'ফ্রেস্‌কো'-গুলিতে এহেন ত্রুটি দেখা যায় না, কেননা বাঙালী 'সূত্রধর' শিল্পীরাই সেগুলির রচয়িতা ছিলেন বলে মনে হয়। তাছাড়া পশ্চিমবাংলার শত শত মন্দিরলিপিতে 'ভাস্কর' কথাটির ব্যবহার হয়নি বললেই চলে; কারিগররা নিজেদের 'সূত্রধর', 'রাজ' বা 'মিস্ত্রি' (বিভিন্ন বানানে) বলেই পরিচয় দিয়েছেন। শিল্পীর 'ভাস্কর' ভণিতা সেজন্য অ-বাঙালী। ভুল বানানে দু'চারটি বাংলা শব্দ লিখতে শেখা নিরক্ষরেব ড্রয়িং পদ্ধতিতে নাম সই করতে পারার থেকে কঠিন নয়। অন্তত রাজপুত পেণ্টিং-এর স্টাইল আয়ত্ত করা থেকে যে অনেক সোজা তাতে সন্দেহ নেই। এসব বিবিধ কারণে মনে হয় বৃন্দাবনে সংগৃহীত কোন রাজপুত চিত্রকরকে বহুকাল বৃন্দাবন ও বহড়ুতে নিজ আশ্রয়ে রেখে (যখন সে সামান্য ভণিতাযুক্ত নামসই করতে শিখেছিল) নন্দকুমার এ 'ফ্রেস্‌কো'গুলি আঁকবার জন্য নিয়োগ করেছিলেন।

আগেই বলেছি, দেবালয়টি সমতল ছাদের দালান-মন্দির। ঠাকরঘরের প্রবেশ-খিলান-গুলির উপরে ও সামনের ঢাকা বারান্দার পুব ও পশ্চিমের দেওয়ালে 'ফ্রেস্‌কো'গুলি অঙ্কিত। পশ্চিমবঙ্গের খুব কম মন্দিরেই এত বিশদভাবে দেওয়ালচিত্র নিবন্ধ হয়েছে। বিষয়বস্তু (পুবের দেওয়ালে)—দশাবতার, ষড়ভুজ গৌরাঙ্গ ও তাঁর পদতলে প্রণত রাজা প্রতাপচন্দ্র রুদ্র ও পুরোহিত সার্বভৌম, বিভিন্ন পৌরাণিক ও কৃষ্ণলীলার দৃশ্য। এদের মধ্যে রাধার মুখচ্ছবি দর্শনেব চিত্রটিই সবচেয়ে সুন্দর। রাধিকা বসে আছেন কাননে; সামনে সখীর হাতে যে দর্পণ তাতে কিন্তু প্রতিবিম্বিত হয়েছে দু'টি মুখ—রাধিকার ও পিছনে গোপনে-দাঁড়ানো কৃষ্ণের। এ ছবিটিতেও ঘাঘরা ওড়না প্রভৃতি রাজপুত ভঙ্গীর। কোন বাঙালী চিত্রকরের পক্ষে নিজ সমাজের মহিলাদের পরিধেয় এভাবে বিস্মৃত হওয়া সহজ নয়। অনুরূপ 'প্যানেল' যখন 'টেরাকোটা', কাঠখোদাই, পটচিত্র প্রভৃতির মাধ্যমে রচিত হয়েছে তখন বাঙালী 'সূত্রধর' শিল্পীরা কিন্তু কখনও তাঁদের আঞ্চলিক ঐতিহ্য বিস্মৃত হননি। এ থেকেও হয়ত আলোচ্য চিত্রকরের অবাঙালিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়। পশ্চিমের দেওয়ালের মাঝখান জুড়ে এক বৃহৎ 'রাসমণ্ডল' আর তার চারদিকে বৃন্দাবনের আশপাশের চুরাশি বনের দৃশ্য। স্থান

পূরণের জন্য এখানেও কৃষ্ণলীলার কিছু কিছু চিত্র—যেমন বকাসুর বধ ও গোষ্ঠলীলা প্রভৃতি—অঙ্কিত হয়েছে। এছাড়া খিলানশীর্ষে অঙ্কিত বৃষবাহন হরগৌরীর ছবিটিও সুন্দর।

এ ছবিগুলি আঁকবার জন্য জমিন কিভাবে তৈরি হয়েছিল, রংগুলি কিভাবে প্রস্তুত হয়েছিল সেসব কথা এখন আর জানবার উপায় নেই। রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে এই বহুমূল্য শিল্পকৃতিগুলি অধিকাংশই এখন বিবর্ণ হয়ে পড়েছে। দেওয়ালের পলস্তারা খসে গিয়ে অঙ্গহানিও ঘটেছে অনেকগুলির। বসু-পরিবারের বর্তমান আর্থিক অবস্থাও এমন নয় যে তাঁরা এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় যত্ন নিতে পারেন। সরকারী প্রচেষ্টায় বা কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের উৎসাহে এগুলি সংরক্ষিত হবার আশাও কম। কালের উদ্যত গ্রাসের মধ্যে এরাও হয়ত অচিরে লুপ্ত হবে, যেমন দুর্গের মতো এই বিশাল বাড়ির অনেক অংশই হয়েছে ইতিমধ্যে।

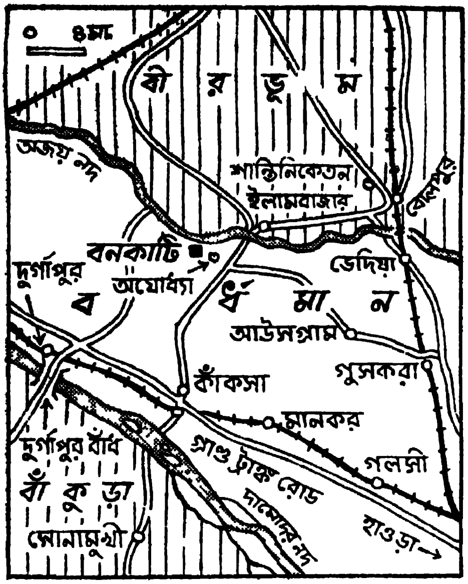
চলে আসবার আগে সেই করুণ অঙ্গহানির মধ্যে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম কিছুক্ষণ। ঠাকুরদালানের সামনের অঙ্গন ঘিরে যে ঢাকা বারান্দা তার প্রান্তসীমা এখন ভেঙে পড়েছে। দোতলার বারান্দার কয়েকটি থাম আজও দাঁড়িয়ে আছে নিরালম্ব অসহায়তায়। কড়ি-বরগা ঝুলে পড়েছে ছাদ থেকে। চটাওঠা দেওয়ালে, মেঝেতে বড় বড় ফাটল। চামচিকার দুর্গন্ধে বিষাক্ত বাতাস। গৃহস্বামীকে একটু ঘুরে আসছি বলে সন্তর্পণে এসে দাঁড়িয়েছিলাম অতীতের এই প্রেতপুরীর মাঝখানে। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়েছে। ম্লান একটু জ্যোৎস্না উঠেছে, দেবীপক্ষের ষষ্ঠী-সপ্তমীর মতো। সে আলোয় বারান্দার মেঝেতে পর পর থামের ছায়া পড়েছে কোণাকুণিভাবে। নীচে উঠনের আগাছার ঝোপে তরল অন্ধকার। ঠাকুরদালানের সাদা থাম, সাদা দেওয়াল জ্যোৎস্নায় উজ্জ্বল। সেদিকে তাকিয়ে কি দাঁড়িয়েছিলাম অনেকক্ষণ? চারিদিকের প্রগাঢ় নীরবতায় কি খুবই তন্ময় হয়ে গিয়েছিলাম? মনে হল, বহুদূরাগত অতি মৃদু ঢাকের আওয়াজ যেন শুনতে পাচ্ছি। ধীরে ধীরে, পর্দায় পর্দায় সে ধ্বনির মাত্রা বাড়তে লাগল, এগিয়ে আসতে লাগল। আর, ওরা কারা? একে একে ছায়াঢাকা সব মানুষ এসে জড়ো হল নীচের প্রাঙ্গণে। ঠাকুরদালানের মৃদু আলোও এবার উজ্জ্বলতর হয়ে উঠল। সে আলোয় স্পষ্ট দেখতে পেলাম বড় বড় ঝাড়লণ্ঠন ঝুলছে দুর্গা প্রতিমার সামনে। ষড়ৈশ্বর্যময়ী প্রতিমা। সামনের উঠনে ততক্ষণে অগণিত জনতা। কাঁসর-ঘণ্টা বাজছে অবিরত। ধূপের গন্ধে চারিদিক ভরে গেল। প্রদীপ হাতে পুরোহিত এসে দাঁড়ালেন দেবীমূর্তির সামনে। মহাসমারোহে আরতি শুরু হল। কতক্ষণ সে ষোড়শোপচার আরতি দেখতাম জানি না। উদ্বিগ্ন গৃহস্বামীর তীব্র কণ্ঠস্বরে যেন ঘুম ভেঙে জেগে উঠলাম। আলো নিবে গেল, ভিড় সরে গেল, কোলাহল থেমে গেল, অতি সুমধুর এক অভিজ্ঞতা ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল আমার মন থেকে।



বনকাটি

গ্রামের নাম 'এগারো মাইল', এ আর শুনিনি। অথচ বোলপুর রেল-স্টেশনের বাইরে বোলপুর-পানাগড় রুটের বাসে সওয়ার হয়ে কন্ডাকটরকে যখন বোঝালাম যে ইলামবাজার ছাড়িয়ে অজয় ব্রীজ পার হবার পর ডান দিকে কিছু দূরের গ্রাম বনকাটিতে যেতে চাই, তখন বেশ প্রত্যয়ের সঙ্গেই সে বললে—আপনাকে 'এগারো মাইল'-এ নামতে হবে। প্রথমে ভেবেছিলাম, বাস-রাস্তায় বোলপুর থেকে এগারো মাইল গিয়েই বুঝি যাত্রার বিরতি। কিন্তু ম্যাপ খুলে বুঝলাম এধারণা ভুল না হয়ে যায় না, কেননা বোলপুর থেকে বনকাটির দূরত্ব অনেক বেশী। আসলে, পানাগড়-বোলপুর বাস রুটে পানাগড় থেকে এগারো মাইলের মাথায়, রাস্তার পাশে যে খানকয়েক কুঁড়েঘর আছে (তাকে গ্রাম বলা যায় কিনা সন্দেহ) তারই লোক-চলতি নাম 'এগারো মাইল'। সেখান থেকে গরুর গাড়ির চাকার রেখা অনুসরণ করে তিন মাইলটাক পশ্চিমে গেলে এদিককার বড় গ্রাম অযোধ্যায় পৌঁছনো যায়। বনকাটি অযোধ্যার সংলগ্ন পশ্চিমের গ্রাম। বোলপুর থেকে যাঁরা আসতে চান, তাঁদের ক্ষেত্রে, বর্ধমান জেলার কাঁকসা থানার উত্তরপ্রান্তবর্তী এ পল্লীতে আসবার এই-ই পথনির্দেশ। কলকাতার দিকের লোকেরা হাওড়া স্টেশন থেকে সকাল সওয়া ছ'টায় ব্ল্যাক ডায়মন্ড এক্সপ্রেসে চেপে পৌণে ন'টায় পানাগড়ে এসে নামতে পারেন। তারপরে, বোলপুরগামী বাসে দশটা নাগাদ 'এগারো মাইল'-এ পৌঁছে প্রায় সাড়ে-তিন মাইলের মতো পদযাত্রা শুরু। যাতায়াতে সাত মাইল ও বনকাটি, অযোধ্যা পরিভ্রমণ শেষ করে বিকেল তিনটের মধ্যে বাস-রাস্তায় ফিরে আসা সম্ভব। সেজন্য কলকাতায় ফিরতে রাত আটটার বেশী না হওয়ারই কথা। 'এগারো মাইল'-এর সামান্য উত্তরে (মানে, বোলপুরের দিকে) বাস চলাচলের পথের উপর বন-বিভাগের যে চেকপোস্ট আছে তার পাশ দিয়ে পশ্চিমমুখী এক রাস্তা এ গ্রাম অবধি গিয়েছে। সে পথে জীপ যেতে পারে স্বচ্ছন্দে। গাড়িতে যাওয়াও খুব কষ্টকর নয়।

শীতের এক কনকনে সকালে বোলপুর থেকে 'এগারো মাইল'-এ এসে যখন বাস থেকে নামলাম, তখন কিছু লোক সে বাস ধরে পানাগড়ের দিকে চলে গেল আর কিছু দেখলাম পথের ধারে বসে আছে বোলপুরগামী বাসের আশায়। বনকাটির কথা জিজ্ঞেস করতেই তারা বলে উঠল—এই মাঠটুকু পেরোলেই ওই যে দূরের গাছপালা দেখা যাচ্ছে, ওইখানে বনকাটি। আমাদের পোশাক-আশাকে হয়ত বা একটু শহুরে ছাপ থেকে থাকবে। গ্রাম্য জনতার কোলাহল আমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছি না এই ভেবে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের মতো চেহারার এক প্রৌঢ় উঠে এসে আর সবাইকে থামালে,



আদ্যোপান্ত আমাদের আরজি শুনলে আর একবার, তারপর সেই একই গাছপালার দিকে দেখিয়ে, শহুরে বাবুদের বোঝবার সুবিধার জন্য ভাষাটা মার্জিত করে বললে—যাত্রা করুন; বনকাটি সাতিশয় সন্নিকট।

এর পরে হয়তো সংস্কৃতে কথা কইতে হবে এই আশঙ্কায় ক্ষণমাত্র দেরী না করে আমরা পা বাড়ালাম। গরুর গাড়ির চাকার দাগের পাশে পাশে পায়েচলা পথ। শূন্য, বন্ধ্যা মাঠ জুড়ে এখানে সেখানে কুশ-কাশের ঝোপ। শীতের হাওয়ায় শুকনো পাতা উড়ে যাচ্ছে; ধুলোর কুণ্ডলী উঠেছে ছোট ছোট। মাথার উপরে মেঘমুক্ত দিনের প্রসন্ন আকাশ।...আধ ঘণ্টা পরে মাঠের শেষে গাছপালার কাছে পেঁাছলাম বটে, কিন্তু কোন গ্রামের চিহ্নমাত্র নেই। হনহন করে মেঠো পথ ধরে কিছু লোক আসছিল। তারা বললে সামনের মাঠটি পার হলেই অযোধ্যা, তারপরেই বনকাটি। দ্বিতীয় মাঠের প্রসার আগেরটির থেকে যে বেশ বেশী তা দিগন্তের দিকে তাকিয়েই বোঝা গেল। 'সাতিশয় সন্নিকট' কথা দু'টো তখনও কানে বাজছে। আবার পা চালালাম।

বাকি পথটুকু হাঁটতে হাঁটতে মনে হল, গ্রাম-বাংলার লোকেরা প্রায় সর্বত্রই দূরত্বকে যে এভাবে কম করে দেখান তাতে আমি অন্তত দুঃখিত নই। "উই দেখা যায়", বা "ক্রোশখানেক হবে" এজাতীয় নির্দেশ পাবার পর সাত-আট মাইলও হেঁটেছি কোন কোন ক্ষেত্রে। ক্লান্ত হয়েছি নিশ্চয়ই, কিন্তু এই দীর্ঘ পথে কত মনোহর দৃশ্য দেখেছি যা সঠিক দূরত্বটা গোড়ায় জানতে পারলে হয়ত দেখতেই পেতাম না এইজন্য যে পরিশ্রমের ভয়ে সে পথে হয়ত পা-ই বাড়াতাম না। পশ্চিমবাংলার দূরদূরান্তে যা কিছু দেখেছি, তার কিছু অংশের নাগাল পাবার জন্য এহেন ভুল নির্দেশই যে প্রত্যক্ষভাবে দায়ী তা কি করে অস্বীকার করি? বনকাটি ভ্রমণও তার এক দৃষ্টান্ত। সে গ্রামের খবরই আমরা জানতাম, সেখানেই আমরা যেতে চেয়েছিলাম। কিন্তু 'সাতিশয় সন্নিকট' হয়ে বনকাটি যদি অযোধ্যার এদিকে হত তাহলে অযোধ্যা সম্বন্ধে আমরা তো খোঁজ করতামই না, অন্যেও আমাদের কিছু বলত না। অথচ অযোধ্যায় যে এক সারিতে চারটি বেশ বড় দেউল-মন্দির আছে তা রীতিমত অভিনব। অন্য নানান দিক দিয়েও এ গ্রামের বিশেষ

গুরুত্ব আছে।

সে যাই হোক, বনকাটিতে অবশেষে পেঁছিলাম এক সময়ে। প্রচুর নকাশি কাজে মণ্ডিত এখানকার পিতলের রথটিই আমাদের দ্রষ্টব্য। সে সৌন্দর্যভাণ্ডারের খবর আমাদের অনেক আগে পেয়েছিলেন শিল্পাচার্য নন্দলাল বসু। আর অমনি, বিশ্বভারতী কলাভবনের ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে এখানে এসে অলংকরণগুলির ড্রইং করে বা ছাপ তুলে নিয়ে তিনি ফিরে গিয়েছিলেন শান্তিনিকেতন। সে সব 'মোটিফ' তাঁকে ও তাঁর ছাত্র-ছাত্রীদের নূতন সৃষ্টির প্রেরণা যুগিয়েছে অনেক ক্ষেত্রে। এহেন নবতর প্রয়োগের কয়েকটি দৃষ্টান্ত এখনও দেখা যায় শান্তিনিকেতনের মাটির তৈরী ছাত্রাবাসটির দেওয়ালে, যেখানকার একাধিক ভাস্কর্যের আদি নকশা বনকাটির রথ থেকে সংগৃহীত। অথচ কারুকার্যের সমারোহে রত্নপেটিকার সঙ্গে তুলনীয় বনকাটির এই পিতলের রথটিকে জনসাধারণের গোচরে আনবার জন্য অদ্যাবধি বিশেষ কোন চেষ্টা হয়নি। যেসব গবেষণা-অভিমানী 'ডক্টরেট' লাভের বৈষয়িক উদ্দেশ্যে বঙ্গসংস্কৃতির বিভিন্ন দিক নিয়ে লাইব্রেরীতে বসেই চর্বিতচর্বন করছেন, তাঁদের অধিকাংশের দৃষ্টিও এদিকে, অথবা ব্যাপকভাবে কাঠ বা পিতলের রথ নির্মাণশিল্পের দিকে, এখনও তেমন আকৃষ্ট হয়েছে বলে মনে হয় না। সেজন্য পাণ্ডিত্যবর্জিত, সাধারণের বোধগম্য ভাষায় এ বিষয়ে সামান্য কিছু আলোচনা হয়ত করা যেতে পারে।

*

রথ বলতে আমরা কাঠের রথই বুঝি। কেননা, পূব ও পশ্চিম বাংলার গ্রামগ্রামান্তরে যে অসংখ্য রথ দেখা যায় তার অধিকাংশই কাঠের। পল্লীঅঞ্চলের ছোট ছোট কাঠের রথ যাঁরা দেখেননি এমন শহুরে মানুষও হয়ত গুপ্তিপাড়া, চন্দননগর, মাহেশ, দশঘরা বা মহিষাদলের রথের মেলায় গিয়ে থাকবেন সেসব উৎসবের খ্যাতির জন্য বা কেনাকাটার তাগিদে। এগুলিই পশ্চিমবঙ্গের বৃহত্তম রথ এবং এরা সবই কাঠের তৈরী। পিতলের রথও একদা যথেষ্ট নির্মিত হয়েছে দুই বাংলায় কিন্তু যেহেতু সংখ্যায় তারা অনেক কম এবং মেদিনীপুর জেলার রামগড়, বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুর, বীরভূম জেলার জয়দেব-কেন্দুলি প্রভৃতি স্থানের কয়েকটি ছাড়া বাকিগুলি আয়তনেও বেশ ছোট, সেজন্য সাধারণের কাছে তারা বিশেষ পরিচিত নয়। দীর্ঘদিন অনুসন্ধানের পর শ্রীতারাপদ সাঁতরা মহাশয় 'সাহিত্য পত্র' পত্রিকার ১৩৭৭ খৃষ্টাব্দের 'বর্ষা সংকলন' সংখ্যায় পশ্চিমবঙ্গের জেলায় জেলায় পিতলের রথের যে মূল্যবান তালিকাটি প্রকাশ করেছেন তা থেকে দেখা যায় তিনি কলকাতায় দু'টি, পুরুলিয়ায় একটি, বর্ধমানে চারটি, বাঁকুড়ায় বারোটি, বীরভূমে ন'টি, মেদিনীপুরে ছ'টি, মুর্শিদাবাদে চারটি ও হুগলিতে তিনটি, অর্থাৎ মোট একচল্লিশটি, পিতলের রথের সন্ধান পেয়েছেন। (উৎসাহী পাঠক শ্রীযুত সাঁতরার এই বহুমূল্য নিবন্ধটি দেখতে পারেন।) এছাড়া আরও কিছু পিতলের রথ যে গ্রাম-বাংলার এখানে-সেখানে ছড়িয়ে আছে তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু তবুও তাদের মোট সংখ্যা যে কাঠের রথের থেকে অনেক কম সেকথা বলাই বাহুল্য।

চিরাচরিত কাঠের রথের বদলে পিতলের রথ তৈরি হয়েছে নানা কারণে। প্রতিষ্ঠাতারা প্রায় সব ক্ষেত্রেই ছিলেন বড় ভূস্বামী অথবা ধনী বণিক। অর্থব্যয়টা তাদের কাছে বড় কথা ছিল না। একই আয়তনের কাঠের রথের থেকে পিতলের রথের খরচ অনেক বেশী পড়লেও তাঁরা কাঠের ক্ষয়িষ্ণুতা ও পিতলের দীর্ঘস্থায়িত্বের কথা বিবেচনা করে এই নতুন সৃষ্টির দিকেই ঝুঁকেছিলেন। 'নতুন' বলছি এই জন্য যে শ্রীযুত সাঁতরা ও আমার দেখা যাবতীয় প্রতিষ্ঠালিপিসংবলিত পিতলের রথের মধ্যে বনকাটির নিদর্শনটি প্রাচীনতম। এটির নির্মাণকাল ১২৪১-৪২ বঙ্গাব্দ (১৮৩৪-৩৫ খৃষ্টাব্দ),

অর্থাৎ আজ থেকে মাত্র ১৩৭-৩৮ বছর আগে। ১০৫ বছর আগে নির্মিত বাঁকুড়া জেলার অযোধ্যার পিতলের রথটি ছাড়া আমাদের তালিকার আর কোনটিই ৭৭ বছরের বেশী পুরাতন নয়। তুলনায়, মাহেশের বিখ্যাত কাঠের রথটি খ্রীস্টীয় ষোল শতকের প্রথম দিকে তৈরি বলে অনুমান করবার সংগত কারণ আছে। বারংবার সংস্কারের ফলে মাহেশের সাবেক রথের একটি কাঠের টুকরোও হয়ত এখন আর অবশিষ্ট নেই। কিন্তু প্রায় সাড়ে-চার শ বছর আগেও পশ্চিমবঙ্গে কাঠের রথ তৈরির রেওয়াজ ও কারিগরি দক্ষতা যে যথেষ্ট পরিমাণে বর্তমান ছিল, এ রথটিই তার প্রমাণ।

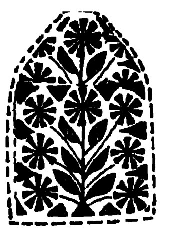
পিতল ব্যবহারের অর্বাচীন রীতিটি সম্পর্কে অনুসন্ধান করতে গিয়ে দেখা যায়, এই নতুন উপাদানে নির্মিত রথগুলি হয় কাঁসা-পিতলের বিখ্যাত কেন্দ্রগুলির কাছাকাছিই তৈরি হয়েছে, নয়ত সেসব কেন্দ্রের কাঁসারী বা কামার সম্প্রদায়ের শিল্পীরা দূরবর্তী স্থানে গিয়ে সেগুলি তৈরি করে দিয়ে এসেছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ, কলকাতার কাঁসারী-পাড়া; বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুর; মুর্শিদাবাদ জেলার বালী-দেওয়ানগঞ্জ প্রভৃতি স্থানের পিতলের রথগুলির উল্লেখ করা যেতে পারে। এদের অবস্থান কাঁসা-পিতলের প্রখ্যাত সব কেন্দ্রে বা তাদের কাছাকাছি। আবার বিভিন্ন পিতলের রথের প্রতিষ্ঠালিপি থেকে দেখা যায় যে বিষ্ণুপুরের অদূরের গ্রাম পাতলাপুরের কারিগরেরা একদা দূরবর্তী স্থানে গিয়েও পিতলের রথ তৈরি করে দিয়ে এসেছেন, যেমন পুরুলিয়া শহরের চকবাজারে বা বিষ্ণুপুর থেকে ২৫।৩০ মাইল দূরের শাসপুরে। কলকাতার আপার চিৎপুর রোডেও একদা এজাতীয় শিল্পীর বসবাস ছিল, কেননা মেদিনীপুর জেলার হাজিপুর প্রভৃতি স্থানের পিতলের রথে তাঁদের নামোল্লেখ আছে। কাঠ বা পিতলের রথ এখন আর বড় একটা তৈরী হয় না; পুরনোগুলির সংস্কার করেই কোনরকমে কাজ চলছে। এখন অবধি আমরা যেটুকু অনুসন্ধান করতে পেরেছি তা থেকে দেখা যায়, ১৩৪৫ সালে নির্মিত হাজিপুরের পিতলের রথটিই, প্রতিষ্ঠালিপি অনুসারে, সবচেয়ে আধুনিক। পরবর্তীকালের অন্য কোন দৃষ্টান্ত আমাদের এখনও জানা নেই। কাঠের রথের তুলনায় পিতলের রথ তৈরির শিল্পটি সেজন্য শুধু অর্বাচীনই নয়, অল্পায়ুও বটে। কেননা, এখন অবধি 'আবিষ্কৃত' উদাহরণগুলির মধ্যে সবচেয়ে পুরনো ও সবচেয়ে আধুনিক দৃষ্টান্তের ভিতরে সময়ের ব্যবধান মাত্র ১০৩—৪ বছরের। আরও অনুসন্ধান-সাপেক্ষে একথা হয়ত মোটামুটিভাবে বলা যায় যে, আনুমানিক দেড় শ বছর আগে আবির্ভূত হয়ে এই সুকুমার শিল্পটি বছর তিরিশ আগে লুপ্ত হয়েছে।

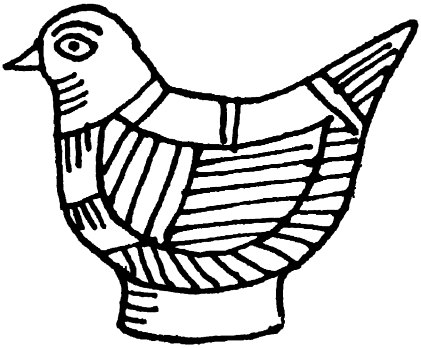
সময়ের এই ব্যবধানটি লক্ষণীয়। শেষ-মধ্যযুগে বাঙালী 'সূত্রধর'-শিল্পীরা 'কাষ্ঠ, পাষাণ, মৃত্তিকা ও চিত্র' এই চারটির মাধ্যমে যে উচ্চাঙ্গের শিল্পচর্চা করে গিয়েছেন, ঠিক এই সময়টিতে তার কিছু অবনতি ঘটলেও পাথরের স্থাপত্য-ভাস্কর্য ছাড়া অন্যগুলি অল্পবিস্তর সজীবই ছিল। সেজন্য কাঠ-খোদাই, পোড়ামাটির মন্দির-অলংকরণ বা পটচিত্রের আঙ্গিকের সঙ্গে পিতলের রথের নকাশি কাজের বেশ সাদৃশ্য দেখা যায়। এ বই-এর অন্যত্র সন্নিবিষ্ট বনকাটির পিতলের রথ থেকে আহৃত বলরাম ও বেহালাবাদিকার ছবি দু'টি যে মন্দির-'টেরাকোটা'র সগোত্র তা যে কোন অভিজ্ঞ ব্যক্তিরই নজরে পড়বে। আবার বলরামের ছবিটির সঙ্গে পটচিত্রের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কথা বর্ণনার অপেক্ষা রাখে না। সেজন্য 'সূত্রধর'-শিল্পীরা যে পিতলের মাধ্যমেও কাজ করেছেন এরকম একটা ধারণা হওয়া স্বাভাবিক, যদিও এ বিষয়ে অকাট্য কোন প্রমাণ নেই। তবে কাঁসারী বা কর্মকার সম্প্রদায়ের কারিগর যাঁরাই এ শিল্পের চর্চা করে থাকুন না কেন, সমকালীন 'সূত্রধর'-শিল্পীদের কলাকৌশল যে তাঁদের খুবই প্রভাবিত করেছিল তা সন্দেহাতীত।

লোহার ফ্রেমের উপরে পিতলের পাত বসিয়ে পঞ্চরত্ন মন্দিরের আদলেই এ রথগুলি সাধারণত তৈরি হয়েছে। তপ্ত পিতলের পিণ্ডকে হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে পাতলা চাদরে পরিণত করবার কারিগরি দক্ষতা আমাদের কাঁসারী বা কর্মকার শিল্পীদের বহুদিনের। উপাদান সংগ্রহের এই দেশী পথটি খোলা থাকলেও কোন কোন ক্ষেত্রে যে বিদেশী পাতও ব্যবহৃত হয়েছে তার লিপিগত প্রমাণ পাওয়া যায় বাঁকুড়া জেলার অযোধ্যার রথটিতে, যার উপকরণ জার্মানী থেকে সংগৃহীত।

দু'জাতীয় নকাশি কাজ হয়েছে পিতলের রথে—চাদরের গায়ে ছেনি দিয়ে রেখাচিত্র খোদাই করে অথবা পিতলের পাতকে ছাঁচে ফেলে উলটো পিঠে হাতুড়ি ঠুকে 'রিলিফ' ভাস্কর্যের সৃষ্টি করে, যার বিদেশী নাম 'রাপুসে ওয়ার্ক'। দ্বিতীয় শ্রেণীর অলংকরণের বেশ ভাল নিদর্শন দেখা যায় বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুরের কৃষ্ণগঞ্জ পাড়ার রথটিতে। এজাতীয় নকাশি কাজ সম্পর্কে যাঁরা একটা ধারণা করতে চান তাঁরা আমার লেখা 'বাঁকুড়া জেলার পুরাকীর্তি' বইটিতে মুদ্রিত মকরবাহিনী গঙ্গার আলোকচিত্রটি দেখতে পারেন। সহজতর কারিগরির জন্য প্রথম শ্রেণীর সজ্জাই অধিকাংশ পিতলের রথে ব্যবহৃত হয়েছে। তাদের মধ্যে বর্ধমান জেলার বনকাটি, বাঁকুড়া জেলার হদলনারায়ণপুর, বীরভূম জেলার জয়দেবকেঁদুলি প্রভৃতি স্থানের রথগুলি উল্লেখযোগ্য। বনকাটির রথটি আকারে মাঝারি; উচ্চতা অনধিক ১৫ ফুট, একতলার দৈর্ঘ্যপ্রস্থ ৬ ফুট ৫ ইঞ্চি, দোতলার ৪ ফুট ৫ ইঞ্চি। কিন্তু খোদাই কাজের প্রাচুর্য ও সাবলীলতায় এটিই যে এ দলে সর্বশ্রেষ্ঠ তাতে সন্দেহমাত্র নেই। "সন ১২৪১ সাল তাং ২ মাঘ য়ারম্ভ সন ১২৪২ সাল ১৫ য়াশাড় তোয়র"—এই প্রতিষ্ঠালিপি থেকে বোঝা যায় এই বিপুল শিল্পকর্ম মাত্র সাড়ে-পাঁচ মাসে সম্পন্ন হয়েছিল। একাধিক শিল্পী নিযুক্ত হয়ে থাকলেও এটা কম কৃতিত্বের কথা নয়।

নকশার নির্বাচনে সংশ্লিষ্ট ধাতুশিল্পীরা মন্দির-'টেরাকোটা' শিল্পীদের কল্পলোকেই শুধু বিচরণ করেননি, তাঁদের ও পটুয়া শিল্পীদের আঙ্গিকেরও অনুসরণ করেছেন নিষ্ঠার সঙ্গে। রামায়ণ-মহাভারতের উপাখ্যান, পৌরাণিক কাহিনী, দশাবতার, সামাজিক মায় ফিরিঙ্গী জীবনচিত্র, শিকার ও প্রমোদ-ভ্রমণের দৃশ্য এবং অজস্র ফুলকারি নকশা স্থান পেয়েছে বনকাটির রথের গায়ে। খোদাই করার আগে পিতলের পাতের উপর সম্ভবত খড়ি দিয়ে নকশাগুলি এঁকে নেওয়া হত। কেননা, শ্রী ...রাপদ সাঁতরার অনুসন্ধান অনুসারে সে সময়ে এ কাজের জন্য 'খড়িপেত্যে' নামে এক বিশেষ শিল্পগোষ্ঠীর অস্তিত্ব ছিল। তাঁরা যে পোড়ামাটির মন্দিরসজ্জা ও পটচিত্র অংকণের আঙ্গিকে রীতিমত অভ্যস্ত ছিলেন এমনই মনে হয়। দুর্ভাগ্যের বিষয়, তাঁদের ও কাঁসারীকর্মকার শিল্পীদের পরিচর্যাপুষ্ট এই সুকুমার কারুকলাটি সম্পর্কে এখনও যথেষ্ট গবেষণা হয়নি। পিতলের রথ আর হয়ত তৈরি হবে না পশ্চিমবঙ্গে। সেজন্য এদের মধ্যে যেগুলি উৎকৃষ্ট তার দু'চারটি নিদর্শন আমাদের প্রধান সংগ্রহশালাগুলিতে রক্ষিত হওয়া প্রয়োজন বলে মনে করি।





মংপু

রবীন্দ্রনাথকে আমি দেখেছি মাত্র একবার। তাও দূর থেকে। কিন্তু বহুদিন আগেকার সে স্মৃতিটা আমার মানসলোকে এখনও এতই উজ্জ্বল যে চোখ বুজলেই তাঁকে দেখতে পাই। আমার বয়স তখন পনের-ষোলো; প্রেসিডেন্সী কলেজের প্রথম বার্ষিক বিজ্ঞান শ্রেণীর ছাত্র। কৈশোর থেকে যৌবনে উত্তরণের মুখোমুখি সে সময়টায় হৃদয়বৃত্তিগুলো এতই প্রখর যে ভালো লাগবার মত কিছু দেখলেই তা একেবারে মনের গভীরে গিয়ে দাগ কেটে বসে। কলেজের ছাত্র-সংস্থা 'রবীন্দ্র পরিষদ'-এর আমন্ত্রণে তিনি এলেন। সে যেন আসা নয়, আবির্ভাব। আমাদের ফিজিক্স্ থিয়েটারে শুভ্র এক বেদীর উপর তাঁর আসন পাতা হল। সামনের ক্রমোন্নত গ্যালারিগুলোয়, পাশের যাতায়াতের পথে, হলের আনাচে-কানাচে তিল ধারণের স্থান নেই। কবির বয়স তখন সত্তরের উপর। রেশমের মত মসৃণ চুলদাড়ি ধবধবে সাদা। আর সেই ভাস্বর পরিমণ্ডলের মধ্যে অপরূপ মুখকান্তি। কিছুক্ষণ ছিলেন আমাদের সঙ্গে। কিছু বলেছিলেন আমাদের। সঙ্গে ছিলেন অল্পবয়সী এক ভদ্রমহিলা। কয়েকটি রবীন্দ্র-সঙ্গীত গেয়েছিলেন তিনি। রবীন্দ্রনাথের সেই দীপ্ত, সুন্দর চেহারাই শুধু নয়, সমস্ত পরিবেশটার খুঁটিনাটি এখনও স্পষ্ট মনে পড়ে।

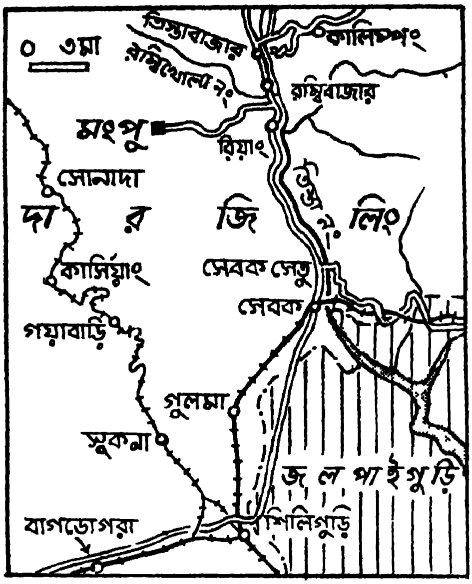
রবীন্দ্রনাথকে আর দেখিনি, সেই শেষ দেখা। কিন্তু তাঁর অকৃপণ দানে জীবন তো কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে রয়েছে। সাফল্যে ব্যর্থতায়, আনন্দে বিষাদে, সর্বদাই তিনি কাছে কাছে আছেন। নিঃসঙ্গতম চিন্তাভাবনার তিনিই সাক্ষী; গভীরতম প্রকাশ-বেদনার তিনিই ধাত্রী। সেই যে দূর অতীতে একদা তাঁকে একটি নমস্কার জানাবার সৌভাগ্য হয়েছিল, তার পরে তাঁর সৃষ্টির কূলপ্লাবী স্রোতে এমনই ভেসে গিয়েছি যে অদর্শনের জন্য মনে আর কোন খেদ নেই।

তবু, স্বীকার করি, একটা দুর্বলতা জয় করতে পারিনি। রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিপূত স্থানগুলি দেখবার জন্য বারবার ছুটে গিয়েছি দূরদূরান্তরে। জোড়াসাঁকোর কথা না হয় বাদই দিলাম। শান্তিনিকেতনের বহিরঙ্গ-দর্শনের সুযোগও মিলেছে আর পাঁচজনের মতো। সেজন্য তাও ধর্তব্যের মধ্যে নয়। কিন্তু শান্তিনিকেতনের অন্তরঙ্গে প্রবেশ করবার এক দুর্লভ সুযোগ পেয়েছিলাম বহুকাল আগে। ডঃ প্রবোধচন্দ্র বাগচী তখন ভাইস-চ্যান্সেলার ও শ্রীযুত ক্ষিতীশ রায় মহাশয় রেজিস্ট্রার। আমাকে তাঁরা স্মরণ করলেন, বিশ্বভারতীর বিবিধ প্রকাশনে ব্যবহারের জন্য বেশ কিছু ছবি তুলে দেবার ব্যাপারে। রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত নানাবিধ জিনিস, আসবাবপত্র, পোষাক-আষাক, কালি-কলম, রং-তুলি, বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশিত তাঁর রচনাসম্ভার, রাশি রাশি চিঠিপত্র, পাণ্ডুলিপি ও

হাতে-আঁকা ছবি, মায় সুইডিস ভাষায় লেখা তাঁর নোবেল পুরস্কারপত্র ও মেডেল প্রভৃতির ফটো তুলেছিলাম সে সময়ে। রবীন্দ্রনাথের অন্তরঙ্গ জীবনের পরিচায়ক সে ছবিগুলি আমার বিস্তৃত সংগ্রহের মধ্যে বিশেষ মূল্যবান। আর একবার গিয়েছিলাম সিংহলের হোরানায়। সেখানে, কলম্বো থেকে কুড়ি মাইল দূরে, তিনি শ্রীপল্লী নামে (সিংহলীরা বলেন, শ্রীপালি) এক বিদ্যালয়ের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছিলেন ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে। প্রতিষ্ঠালিপিটির ছবি তুলতে অল্পই সময় লেগেছিল, কিন্তু অনেকক্ষণ বসেছিলাম সেখানে। রবীন্দ্রনাথের সান্নিধ্যে আবার এসেছি কালিম্পং-এর গৌরীপুর ভবনে। তাঁর স্মৃতিপূত কিছু জিনিসপত্র এখনও সেখানে রাখা আছে আর একটি মর্মরফলকে লেখা আছে—"এই ভবনে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাস করিতেন এবং ২৫শে বৈশাখ ১৩৪৫ সনে 'জন্মদিন' কবিতা আকাশবাণীর মাধ্যমে আবৃত্তি করিয়াছিলেন।" ১৯৪০ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে এখানেই তিনি গুরুতরভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েন ও সে মাসের ২৮শে তারিখে তাঁকে অচৈতন্য অবস্থায় কলকাতায় নিয়ে যাওয়া হয়। তারপর আর এক বছরও তিনি বাঁচেননি। গৌরীপুর ভবনের যে ঘরে তিনি থাকতেন, মনে আছে, তার এক কোণে চুপ করে বসেছিলাম অনেকক্ষণ।

রবীন্দ্রনাথের স্মৃতির সৌরভে বুক ভরিয়ে নিতে, তাঁর অবর্তমানেও তার নিজস্ব পরিমণ্ডলের মধ্যে গিয়ে দু'দণ্ড বসতে আমার আগ্রহের অবধি নেই। গৃহগত, অক্ষম তীর্থকামীর মত আশায় বুক বেঁধে এখনও বসে আছি কবে পতিসর, শাজাদপুর, শিলাইদহে যেতে পারব। কবিগুরুর কোন প্রত্যক্ষ চিহ্ন আজ আর হয়তো সেখানে নেই। তবু একদা তিনি সেখানে ছিলেন; অজস্র সৃষ্টিকর্মে নিমগ্ন থেকে বহুকাল কাটিয়ে গেছেন সেসব জায়গায়; আজও হয়ত কাছাকাছিই আছেন অদৃশ্যলোকে। আর আছে নিত্যরূপা প্রকৃতি—প্রত্যূষ থেকে রাত্রিশেষ অবধি রবীন্দ্রনাথের কালের মতোই একই রূপসজ্জায় যার ক্লান্তি নেই, বিরতি নেই। অতএব আমার কাছে এসব স্থান তীর্থস্বরূপ।

এহেন অভিনব তীর্থযাত্রায় দু'বার গিয়েছি মংপুতে। সেখানকার সিংকোনা আবাদ ও কুইনিন ফ্যাক্টরীর কর্মীদের নিয়েই গ্রাম। শিলিগুড়ি-কালিম্পং সড়কে, সেভক পার হয়ে পাহাড়ী রাস্তায় কিছুদূর গিয়ে, রম্বি-বাজার গ্রামের আগে ঝ বখোলা নদীর সেতুর পাশ দিয়ে এক বাঁহাতি রাস্তায় ছ'মাইল দূরে মংপু। 'মংপুতে রবীন্দ্রনাথ' নামক বিখ্যাত গ্রন্থের লেখিকা শ্রীমতী মৈত্রেয়ী দেবী ও তাঁর স্বামী ডঃ মনোমোহন সেনের আমন্ত্রণে রবীন্দ্রনাথ ১৯৩৮ থেকে ১৯৪০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে চারবার গিয়েছিলেন মংপুতে। বলা বাহুল্য, নিসর্গদৃশ্য ও আতিথেয়তা উভয়ের জন্যই জায়গাটা তাঁর ভাল লেগেছিল। মংপু পাহাড়ের উপরের দিকে সুরেল-এর বাংলো বলে যে পুরাতন বাড়িটি পরিচিত, সেখানে থেকেছেন কিছুদিন; তবে বেশীর ভাগ সময়ই তাঁর কেটেছে, পাহাড়ের গায়ে, অনেকটা নীচে, সেন-দম্পতির জন্য নির্দিষ্ট অপেক্ষাকৃত নতুন কোয়ার্টারে। রবীন্দ্রনাথের ভাষাতেই সে বাড়ির ঘরদোরের বর্ণনা দিই। পাঠকমাত্রেই জানেন, 'মংপুতে রবীন্দ্রনাথ' বইটি আলাপচারী ভঙ্গীতে লেখা। সুরেল-এর বাংলো থেকে যেদিন নীচের বাড়িতে নামা হল, সেদিন চারিদিকে একবার চোখ বুলিয়ে তিনি মৈত্রেয়ী দেবীকে বললেন—"এ তো চমৎকার বাড়ি। তুমি কেন আপত্তি করেছিলে?—কি সুন্দর এই সামনের ঢালু পাহাড়টি, আকাশের কোল থেকে সবুজ বন্যা নেমে এসেছে। এই সামনের মাঠটিও তোমার ভালো; আমি মাটির কাছাকাছিই থাকতে চাই। চলৎশক্তি কমে এসেছে; মাটির স্পর্শ চোখ দিয়েই তাই মিটিয়ে নিতে হয়। চল তা'হলে, তোমার বাড়ির জিয়োগ্রাফীটা জেনে আসি।...এই



কাঁচের ঘরটি বুঝি আমার লেখবার? এ তো খুবই ভালো, একেবারে উত্তম বলা যেতে পারে। এই চৌকিতে সকাল বেলা বসব আর রোদ্দুর এসে পড়বে কাঁচের ভেতর দিয়ে। তোমার ঐ বৃহদাকার বনস্পতির পাতার ফাঁক দিয়ে শতধারায় ঝরে পড়বে সকাল বেলার আলো, ভোরের সেই রৌদ্রস্নানটি আমাব কত সুন্দর হবে। বাঃ এ চানের ঘরও তোমার ওপরের বাড়ির চাইতে ঢের ভালো। এই পাশের ঘরেই বুঝি তোমরা থাকবে—সে তো আরো সুবিধে, রাত্রে হঠাৎ মূর্ছা যাবার দরকার হ'লে ফস ক'রে তোমায় খবর দিয়ে মূর্ছা যাব। আর আমার সাঙ্গোপাঙ্গরা থাকবে কোথায়? ওদিকটায় বুঝি? ভালই করেছ ওদের একটু দূরে দিয়েছ—ওরা একটু সিগারেট খায়, হো হো করে, বেশী কাছাকাছি থাকতে ভালবাসে না।"

এ তো গেল বাড়ির ভিতরের 'জিয়োগ্রাফী'। পাঁচ-ছ'খানা কামরাযুক্ত উত্তরমুখী কাঠের এ বাংলো-বাড়িটির সামনে একটু জমি আছে, তারপরেই ঢালু পাহাড় নেমে গেছে বহুদূর অবধি। পূব দিকে অনেকখানি সমতল জায়গা, তার অপর প্রান্তে সেই 'বৃহদাকার বনস্পতি' যার উল্লেখ আছে উপরের উদ্ধৃতিতে। বাড়ির উত্তর-পূব কোণে, খাদের ধারে, কয়েক থাক গোল চালা-ঢাকা এক বসবার জায়গা। সম্ভবত রবীন্দ্রনাথের ইচ্ছানুসারেই এটি বানানো হয়েছিল। এ বিশ্রামস্থানটি তাঁর খুব ভাল লাগত; প্রায়ই এসে বসতেন সেখানে। তার পাশেই এক সেগো-পাম গাছ, অনেক উঁচুতে পাতার নীচ থেকে ঝুরি নামিয়ে দিয়েছে রাশি রাশি মালার মতো। এটিও তাঁর খুব প্রিয় ছিল।

এই পরিবেশে চারিদিকের নিসর্গদৃশ্য কেমন লাগত রবীন্দ্রনাথের? সেকথা বলতে হলে শ্রীমতী মৈত্রেয়ী দেবীর লেখা থেকে আবার ধার করা ছাড়া উপায় নেই। মংপুতে রবীন্দ্রনাথকে দেখবার, তাঁর কাছাকাছি থাকবার দুর্লভ সৌভাগ্য তাঁর হয়েছে; আমার হয়নি। প্রথমবার মংপুতে পৌঁছে কবি বলেছিলেন—"পথে আমার কোনো কষ্ট হয় নি। এমন সুন্দর অরণ্যপথ। তোমাদের এই বনটি কিন্তু অপূর্ব। লম্বা লম্বা সব গাছ সোজা ঊর্ধ্বমুখে দাঁড়িয়ে আছে, নিচে ঘন ছায়ায় কালো কালো অন্ধকার—একেই তো বলে অরণ্য।" কিংবা অন্যত্র—"সন্ধ্যেবেলা বারান্দায় একটা চৌকিতে বসতেন, সামনের পাহাড়ের

গায়ে একটি একটি ক'রে আলো জ্বলে উঠত। এইটি ওঁর ভারী ভালো লাগতো দেখতে। অন্ধকারে সমস্ত ঢেকে গেছে। একাকার হ'য়ে গেছে আকাশ আর পাহাড়। শুধু মাঝে মাঝে ছোট ছোট দীপবর্তিকা দূর অদৃশ্য জীবনের বার্তা বহন ক'রে আনছে। বলতেন —'আশ্চর্য লাগে ভাবতে, ওখানেও মানুষের জীবনযাত্রা চলছে! এই রকম ছোট ছোট তাদের ঘর; কী রকম তারা মানুষ, কী রকম তাদের জীবনযাত্রা, কিছুই জানিনে, শুধু গভীর অন্ধকারের মধ্যে এতটুকু আলো, প্রাণের আলো।' '

সে প্রাণের আলো আজও আছে মংপু পাহাড়ে, আশপাশের পাহাড়ে। তাদেরই কল্যাণকামনায় ও প্রধানত তাদেরই উদ্যোগে ১৯৫০ খৃীষ্টাব্দে এ বাড়িতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে 'রবীন্দ্র মেমোরিয়াল লেবার ওয়েলফেয়ার সেণ্টার'। সিংকোনা ফ্যাক্টরীর শ্রমিকদের জন্যই এ ব্যবস্থা। পশ্চিম দিকের একটি ঘরে কাজ করে এক 'একস্-রে ইউনিট', আর একটিতে আছে এক 'এরিয়া লাইব্রেরী'। তা'ছাড়া বারান্দায় রবীন্দ্রনাথের প্রতিকৃতির নীচে আছে এক তাম্রলিপি যাতে বাংলা, ইংরেজী ও নেপালী ভাষায় এ বাড়ির সঙ্গে কবিগুরুর সম্পর্ক ও এ প্রতিষ্ঠানের ইতিবৃত্ত উৎকীর্ণ। সম্প্রতি পাশের মাঠের দূর প্রান্তে এক প্রেক্ষাগৃহও নির্মিত হয়েছে। বাড়ির পূর্বদিকের দু'টি ঘর রবীন্দ্রনাথের জন্য নির্দিষ্ট ছিল; সেখানেই তিনি থাকতেন। এ দু'টি কক্ষে এখনও তাঁর ব্যবহৃত সোফা, খাট ও অন্যান্য স্মৃতিচিহ্ন রক্ষিত আছে। সিংকোনা বাগানের কর্মীরা প্রত্যহ সেখানে ধূপ জেলে দিয়ে যান, ফুল রেখে যান বিনম্রচিত্তে।

এই ঘর দু'টিতে বসে রবীন্দ্রনাথ যে কাব্যচর্চা করে গেছেন, শ্রীমতী মৈত্রেয়ী দেবী তার বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন তাঁর বইতে। বর্তমান প্রবন্ধের সীমিত পরিসরে আমি এখানে মাত্র একটি কবিতারই উল্লেখ করতে পারি। সেটি মংপু সম্বন্ধেই লেখা:

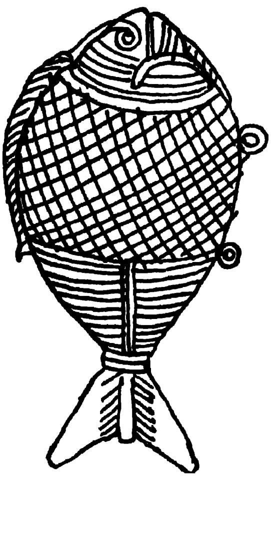
"কুজ্ঝটি জাল যেই সরে গেল মংপুর—
নীল শৈলের গায়ে দেখা দিল রংপুর।
বহুকেলে যাদুকর খেলা বহুদিন তার
আর কোনো দায় নেই লেশ নেই চিন্তার।
দূর বৎসর পানে ধ্যানে চাই দূর্দূর—
দেখি লুকোচুরি খেলে মেঘ আর রোদ্দুর।
কত রাজা এলো গেল মোলো এরি মধ্যে
লড়েছিল বীর, কবি লিখেছিল পদ্যে
কত মাথা কাটাকাটি সভ্যে অসভ্যে
কত মাথা ফাটাফাটি সনাতনে নব্যে।
ওই গাছ চিরদিন যেন শিশু মস্ত
সূর্য উদয় দেখে, দেখে তার অস্ত।
ওই ঢালু গিরিমালা রুক্ষ ও বন্ধ্যা
দিন গেলে ওরি পরে জপ করে সন্ধ্যা
নিচে রেখা দেখা যায় ওই নদী তিস্তার—
নিঠুরের স্বপ্নে ও মধুরের বিস্তার।
হেনকালে একদিন বৈশাখী গ্রীষ্মে,
টানাপাখা-চলা সেই সেকালের বিশ্বে—
রবি ঠাকুরের দেখা সেইদিন মাত্তর
আজ তো বয়স তার কেবল আটাত্তর

সাতের পিঠের কাছে এক ফোঁটা শূন্য
শত শত বরষের ওদের তারুণ্য!
ছোট আয়ু মানুষের তবু একি কাণ্ড
এটুকু সীমায় গড়া মনো-ব্রহ্মাণ্ড—
কত সুখে দুখে গাঁথা ইষ্টে অনিষ্টে
সুন্দরে কুৎসিতে তিক্তে ও মিষ্টে,
কত গৃহ উৎসবে কত সভা সজ্জায়
কত রসে মজ্জিত অস্থি ও মজ্জায়
ভাষার নাগাল ছাড়া কত উপলব্ধি
ধেয়ানের মন্দিরে আছে তারা স্তব্ধি।"

রবীন্দ্রনাথকে একবারমাত্র দেখেছি কিন্তু তাঁর অজস্র সৃষ্টির সরোবরে অবগাহন করে জীবন যে ধন্য হয়েছে, প্রবন্ধের শুরুতে সেকথা বলবার প্রয়াস পেয়েছি। কিন্তু কত অক্ষম সে ভাষা। যা বলতে চেয়েছিলাম তার কতটুকুই বা প্রকাশ করতে পেরেছি। প্রবন্ধের শেষে এসে বুঝতে পারছি, সেই লোকোত্তর প্রতিভা সম্বন্ধে ভাষার নাগালের অতীতে মনের গভীরে যা লুকিয়েছিল তা—

"ভাষার নাগাল ছাড়া কত উপলব্ধি
ধেয়ানের মন্দিরে আছে তারা স্তব্ধি।"

রবীন্দ্রনাথের কাছে থেকে আমরা সবচেয়ে মূল্যবান কি জিনিস পেয়েছি, একথা কেউ যদি আমায় জিজ্ঞেস করেন, তাহলে যে যাই বলুক, আমি বলব—আমাদের বোবা মুখে তিনি ভাষা দিয়েছেন। একজনমাত্র মানুষের পক্ষে একটা গোটা জাতির মুখ ফোটানো বড় সোজা কথা নয়।

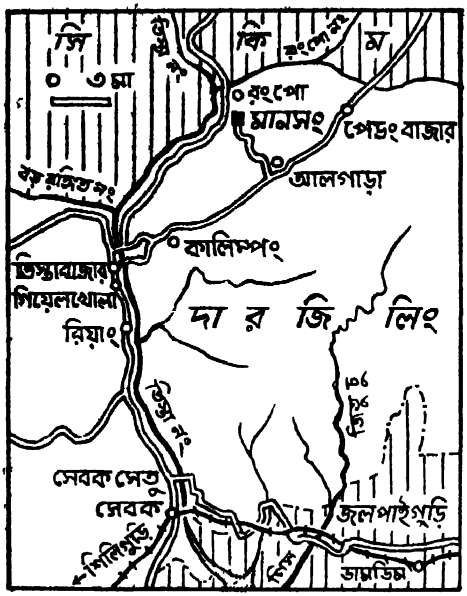


মানসং

উত্তরবঙ্গবাসী জনসাধারণের মনে এ ধারণা বেশ দৃঢ়বদ্ধমূল যে তাঁরা সব দিক দিয়েই অবহেলিত। এর নানা কারণ আছে। পাল-সেন যুগে বরেন্দ্রভূমির যে প্রাধান্য ছিল আজ অবশ্যই তা নেই। পরবর্তী আট শ বছরের পরিবর্তনের কথা মনে রেখে এজন্য আজ আর কোন খেদ করা যায় কিনা সন্দেহ। মুসলমান আমলেও, রাজধানী যখন ছিল রাজমহলে বা গৌড়ে তখনও হয়তো উত্তরবঙ্গের এত অনাদর আরম্ভ হয়নি। কিন্তু শাসনকেন্দ্র যখন মুর্শিদাবাদ ও পরে হুগলীকে ছুঁয়ে কলকাতায় স্থানান্তরিত হল তখন থেকেই এই অবহেলার সূত্রপাত। ষোল কলা পূর্ণ হল, দেশবিভাগের সময় যখন 'সারা-সেতু' সমেত উত্তরবঙ্গের সঙ্গে সরাসরি রেল-সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। মোটামুটি এই অবস্থাই চলেছে গত ২৫ বছর। বিকল্প পরিবহণ ব্যবস্থায় কোনক্রমে কাজ চলে গেছে মাত্র। সম্প্রতি ফারাক্কা সেতুর উপর দিয়ে উত্তরবাংলার সঙ্গে আবার সরাসরি যোগাযোগ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অবস্থার এখন দ্রুত উন্নতি হওয়াই সম্ভব। প্রশাসনকেন্দ্র থেকে দূরের অঞ্চলগুলি সব সময়েই যে ইচ্ছাকৃতভাবে অবহেলিত হয় এমন নয়; নানাবিধ বাস্তব প্রতিবন্ধকই তার কারণ। সাধারণভাবে বলতে গেলে, উত্তরবঙ্গের ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে।

কিন্তু প্রশাসনিক দিক নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করা আমার উদ্দেশ্য নয়। শাসন-যন্ত্রের মুখপাত্রেরা সে বিষয়ে সঠিকভাবে বলতে পারবেন। সাহিত্যের দিকে দৃষ্টি ফিরিয়েও দেখতে পাই, বাংলা ভাষায় দক্ষিণবঙ্গ ও রাঢ়বঙ্গকে অবলম্বন করে যত গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ, পুস্তক লেখা হয়েছে উত্তরবঙ্গ সম্বন্ধে তত হয়নি। কেন হয়নি—তা নিয়ে গবেষণা হতে পারে এবং হওয়াও উচিত। উত্তরবঙ্গ সম্পর্কে ভ্রমণ-সাহিত্য বা স্থান-পরিচিতিমূলক প্রবন্ধ ও পুস্তকেরও বেশ অভাব। জলপাইগুড়ির শ্রীচারুচন্দ্র সান্ন্যাল মহাশয়, সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী জীবিকার মধ্যে থেকেও, তাঁর অঞ্চল সম্বন্ধে যে উল্লেখযোগ্য কাজ করেছেন তা সকলেরই জানা। কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় তাঁর প্রয়াস যে যথেষ্ট নয় সেকথা শ্রীযুত সান্ন্যালের মতো নিরভিমান ও নিরলস 'ফিল্ড-ওয়ার্কার' অকপটে স্বীকার করবেন বলেই আমার বিশ্বাস। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলতে পারি, মালদহ জেলার গৌড় ও পাণ্ডুয়ার বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশিত হয়েছে সত্য কিন্তু পশ্চিম দিনাজপুর জেলার ইসলামপুর এলাকা ছাড়া আর সর্বত্র গ্রামে গ্রামে পাল-সেন যুগের যে অগণিত পাথরের মূর্তি-ভাস্কর্য আবিষ্কৃত ও অনাবিষ্কৃত অবস্থায় আজও পড়ে আছে সে সম্বন্ধে আমরা এখনও প্রায় কিছুই জানি না।

দার্জিলিং জেলার এক অখ্যাত স্থান মানসং সম্পর্কে লিখতে বসে ভাবছি, সামান্য



কিছু সরকারী প্রকাশন ছাড়া (যেগুলিকে কিছুতেই সাম্প্রতিককালের বলা যায় না) এ জেলার শহর-গঞ্জ হাট-বাট-মাঠ সম্বন্ধে কতটুকু তথ্যই বা সর্বসাধারণের গোচরে এসেছে আজ অবধি। শুধু শীতে নয়, সব ঋতুতেই তারা উপেক্ষিত। টুরিস্ট আকর্ষণের জন্য প্রকাশিত কিছু প্রচার-পুস্তিকা জেলার সদর শহর দার্জিলিং, মহকুমা শহর কার্সিয়ং ও কালিম্পং এবং ঘুম, টাইগার হিল, সাণ্ডাকফু ও ফালুটের অতি-সংক্ষিপ্ত বর্ণনায় সীমাবদ্ধ। শিলিগুড়ি মহকুমার সমতলক্ষেত্রে, দূরে নীল পাহাড়ের পটভূমিতে, বিস্তীর্ণ শস্যক্ষেত্রের মাঝে মাঝে ছবির মতো ছোট ছোট গ্রামের একটির নামও আমাদের কানে আসেনি যতদিন না নকশালবাড়ি, খড়িবাড়ি, ফাঁসিদেওয়া খবরের কাগজের শিরোনাম হয়ে দেখা দিল। সেসব জায়গার রাজনৈতিক পরিচয় কিছু হয়ত আমরা পেয়েছি কিন্তু সামগ্রিক পরিচয় পেয়েছি কিনা সন্দেহ। সমতলক্ষেত্র ছাড়া পাহাড়ী এলাকায় কত যে সুন্দর জায়গা এখনও 'আবিষ্কার'-এর অপেক্ষায় রয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। গিয়েলখোলার কিছু উত্তরে তিস্তা ব্রিজ পার হয়ে বাঁহাতি যে রাস্তা গেছে গ্যাংটকের দিকে (ডানহাতি পথ গেছে কালিম্পংয়ে) তাতে কয়েক মাইল গেলেই ভারত-সিকিম সীমান্তে রংপোতে পেঁছনো যায়। তিস্তার শাখা নদী রংপো এখানে এসে মিশেছে তিস্তার সঙ্গে। সংগমের কাছাকাছি উপলাকীর্ণ চড়ার চারদিক ঘিরে কাকচক্ষু-জলের তীব্র স্রোত তরতর করে বয়ে চলেছে নুড়িপাথরের উপর দিয়ে। কাছে, দূরে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে অরণ্যশ্যামল সব পাহাড়। কান-জুড়ানো জলকল্লোল ছাড়া আর কোন শব্দ নেই চরাচরে। অবিকৃত নিসর্গপ্রকৃতির কোলে পরিপূর্ণ প্রশান্তির এমন নিরিবিলি স্থান খুঁজে পাওয়া কঠিন। শুনেছি, উৎসাহী বিদেশী পর্যটকদের কেউ কেউ উপলব্যথিতগতি এসব পাহাড়ী নদীর তীরে তাঁবু খাটিয়ে বাস করে যান কয়েক দিন। আমাদের দেশের এহেন মনোহর অভিজ্ঞতা বিদেশে রপ্তানি হয়ে যায়, অথচ আমরা তার নাগাল পাই না।

অথবা ধরুন বড় ও ছোট রংগীত নদীর মিলনস্থলের কাছে সিংলাবাজার নামে ছোট গ্রামটি। আজকাল দার্জিলিং শহর থেকে রোপওয়েতে চেপে অবলীলাক্রমে সেখানে পেঁছনো যায়। শূন্যভ্রমণের সে অভিজ্ঞতা, চারিদিকের অবর্ণনীয় প্রাকৃতিক দৃশ্য, হাটের দিনে সিংলাবাজারে সমবেত জনতার বিচিত্র পরিবেশ অতি উৎকৃষ্ট ভ্রমণকাহিনী রচনার উপাদান। কিন্তু আমরা, সাধারণ বাঙালী পাঠক, তার কতটুকু খবর রাখি? লাটপাণ্ডার এই অদ্ভুত নামটা পর্যটন বিভাগেরও ক'জন শুনেছেন জানি না। অথচ এখানকার সমতলশীর্ষ পাহাড়ের কিনারায় দাঁড়িয়ে দক্ষিণে তাকালে দেখা যায় অরণ্যাবৃত গিরিশ্রেণী ধাপে ধাপে নেমে গিয়ে শেষ হয়েছে সমতলভূমিতে। কুয়াশাবিহীন পরিষ্কার দিনে, আঁকাবাঁকা গতিপথে প্রবাহিত সাদা ফিতের মতো নদীগুলিকে দেখা যায় জলপাইগুড়ি পার হয়ে রংপুর দিনাজপুর জেলা অবধি। কার্সিয়ং থেকে সমতলভূমির দৃশ্যের প্রশংসায় যাঁরা পঞ্চমুখ তাঁরা নিশ্চয়ই লাট-পাণ্ডারে যাননি। অথচ পর্যটকদের সেখানে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করা দূরে থাকুক, জায়গাটার নামও বিশেষ কোথাও উল্লেখিত দেখি না। অথবা ধরুন মিরিক। সেখানে যাবার পথঘাট এখন হয়ত খুব উন্নত নয়। কিন্তু কষ্ট করে যিনিই একবার গিয়েছেন তিনি নিশ্চয়ই বলবেন এমন নয়নলোভন পাহাড়ী বসতি দার্জিলিং জেলায় কমই আছে। মংপু নামটা অবশ্য অনেকের পরিচিত 'মংপুতে রবীন্দ্রনাথ' বইটির কল্যাণে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিপূত বাড়িটিকে কেন্দ্র করে সেখানে যে সুন্দর একটি স্মারক-প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব আছে সেকথা ক'জন জানেন? কালিম্পং পর্যন্ত দৌড় আমাদের অনেকেরই। কিন্তু তিব্বতের সংগে স্থলবানিজ্য বন্ধ হবার পর থেকে কালিম্পং বাজারের বর্ণাঢ্যতা লোপ পেয়েছে অনেকখানি। অথচ কয়েক মাইল উত্তরে, পেডং বাজারে, হাটের দিনে পাহাড়ী জনতার এখনও যে বিচিত্র সমাবেশ হয় তা মনে রাখবার মতো।

আমি দার্জিলিং জেলায় যেটুকু ঘুরেছি তার ভিত্তিতে দৃষ্টান্তের সংখ্যা হয়তো আরও অনেক বাড়ানো যায় কিন্তু তার বিশেষ প্রয়োজন দেখি না। যে ক'টির উল্লেখ করেছি তা থেকেই সম্ভবত বোঝানো গেছে, পরিচিত শহরগুলির বাইরে যথেষ্ট স্থান আছে দার্জিলিং জেলায়, যেগুলি সাধারণের গোচরে আসা উচিত।

এমনই এক জায়গা মানসং যার সম্বন্ধে আজ লিখতে বসেছি' সেখানে একদিন থাকব এই প্রোগ্রাম করে গিয়ে যে পুরো পাঁচদিন ছিলাম সে কথাটাই সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বলে মনে হচ্ছে। ক্যামেরার ঝোলা কাঁধে ফেলে যখন বাইরে দূরে কোথাও বেরিয়ে পড়ি তখন পথপঞ্জী এমন আঁটোসাঁটো করে ছকা থাকে যে তার বড় একটা নড়চড় হয় না। দ্রষ্টব্য স্থান সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় খবরাখবর আগে থেকে সংগ্রহ করে রওনা হলে, সময়-তালিকার ব্যতিক্রম করার দরকারও হয় না অধিকাংশ ক্ষেত্রে। কিন্তু লোকমুখে শোনা, চিঠিপত্রে জানা বা বই থেকে পড়া সেসব আগাম সংবাদ .বিলকুল বরবাদ .হয়ে .যায় কখনো কখনো—যেমন আমার ক্ষেত্রে হয়েছে মধ্যপ্রদেশের খাজুরাহোয়, রাজপুতানার জয়শলমীঢ়ে, মহারাষ্ট্রের অজন্তা-ইলোরায়, মহীশূরের হালেবিড়-বেলুড়ে অথবা সিংহলের অনুরাধাপুরে। বিশ্ববিখ্যাত এসব জায়গায় অতিরিক্ত যাত্রাবিরতির নিশ্চয়ই মানে হয়। তাই বলে মানসং? নামও তো কেউ শোনেনি সেখানকার! সাধারণের কাছে মানসং যে অজ্ঞাত তা জেনেও বলছি, সেখানে একদিনের জায়গায় পাঁচদিন থেকে বিশ্ববন্দিত ওই সব স্থানের সংগে তাকে আমি একাসনে বসিয়েছি। যে যাই বলুক, আমি তার জন্য বিন্দুমাত্র অনুতপ্ত নই।

কালিম্পং থেকে উত্তরমুখী যে পিচের সড়ক আলগাড়া হয়ে পেডং গিয়েছে

তার নবম মাইল-পোস্টের কাছ থেকে ছোট এক রাস্তা বার হয়েছে বাঁ দিকে। সে পথ পেডং রোডের মতো প্রাচীনও নয় প্রশস্তও নয়; তাতে জীপ বা ল্যাণ্ড-রোভার ছ'মাইল দূরের মানসং অবধি যেতে পারে যেখানে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অন্যতম সিংকোনা-বাগান অবস্থিত। সংগৃহীত সিংকোনার ছাল এ-পথেই কালিম্পং হয়ে মংপুতে যায় সেখানকার কারখানায়। বাগানের শ্রমিকদের বসতি আর দু'চারজন অফিসারের কোয়ার্টার ছাড়া গ্রাম বলতে তেমন কিছু নেই মানসং-এ। বাজারহাট নেই; মুদিখানা দোকানেও যাবতীয় প্রয়োজনীয় জিনিস পাওয়া যায় না। বাগানের গাড়ি করে নানাবিধ রসদ সেজন্য আনতে হয় পনেরো মাইল দূরের কালিম্পং থেকে। তদুপরি বিদ্যুৎ নেই বলে (আমার পরিদর্শনের সময়ে অন্তত ছিল না), বিজলী বাতি নেই, পাখা নেই, 'ফ্রিজ' নেই। কিন্তু আছে যা তা এক ঘন অরণ্যে ঢাকা পাহাড়ের সামনে অনেকখানি সমতল খোলা জায়গার উপর এক অপরূপ ডাক-বাংলো। কাঠের বাড়ি; দু'প্রস্থ শোবার ঘর ও বাথরুম ছাড়া ডাইনিং রুম আর সামনে এক প্রশস্ত ঢাকা বারান্দা। রান্না-ভাঁড়ারের পিছনে মালী ও চৌকিদারদের দু'তিনটি কুটির। এছাড়া জনবসতি নেই প্রায় আধ মাইলের মধ্যে। সামনের বাগানের প্রান্তে পাহাড়ের ঢাল সোজা নেমে গেছে প্রায় তিন হাজার ফুট নীচে তিস্তা নদীর স্রোতঃপথ অবধি। বহু অভিজ্ঞ ভূপর্যটকও নাকি স্বীকার করেন, এখান থেকে সর্পিলগতি তিস্তার মনোরম দৃশ্যপটের মতো নয়নবিমোহন দৃশ্য অন্যত্র বিরল। ডান দিকে সিকিম এলাকার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে এসে রংপো নদীর সংগমের পর তিস্তা পশ্চিমবঙ্গের এলাকায় প্রবেশ করেছে। সামনে ছবির মতো প্রসারিত নদী-পর্বত-অরণ্য-আকাশের এই অনুপম দৃশ্যে গা ডুবিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অনায়াসে বসে থাকা যায়। ডাকবাংলোর পিছনের পাহাড়ের আড়াল থেকে পূর্ণিমার চাঁদ উঠে এসে যখন কোমল, শুভ্র মাধুরী ছড়িয়ে দেয় তিস্তার উপর, তখনকার সে দৃশ্য ভোলবার নয়। দিনের বেলায় এত উঁচু থেকে জলকল্লোল শোনা যায় না। কিন্তু রাতের প্রগাঢ় নীরবতা ভেদ করে অতি দূরাগত যে ধ্বনিটুকু ভেসে আসে তারই বা তুলনা কোথায়! এই অমৃতধ্বনি শুনতে, পরিপূর্ণ প্রশান্তির মধ্যে ওই রুপোলী ফিতের দিকে তাকিয়ে ঠায় বসে থাকতে আমার একদিনের জায়গায় পাঁচদিন লেগেছিল। আবার বলি, আমি সেজন্য একটুও অনুতপ্ত নই।

মানসং একেবারে সিকিম-সীমান্তে অবস্থিত বলে কাঞ্চনজঙ্ঘা পর্বতমালার সব ক'টি তুষারাবৃত শৃঙ্গ শোবার ঘরের জানালা থেকেই দেখা যায়। দার্জিলিং শহর থেকে মূল কাঞ্চনজঙ্ঘা শিখরটি কিছু বড় দেখালেও, সব ক'টি শৃঙ্গ যে চোখে পড়ে না সেকথা হয়ত সুবিদিত নয়। দার্জিলিং ও গ্যাংটকের প্রায় মাঝামাঝি জায়গায় অবস্থিতির দরুণ পরিষ্কার রাত্রে এই দুই শহরেরই আলো দেখা যায় মানসং থেকে। সে আর এক অবিস্মরণীয় অভিজ্ঞতা।

ভ্রমণের সময় যাঁরা সাবধানে লোকসংসর্গ পরিহার করে চলেন না (অভিজাতম্মন্য অনেকেই করেন দেখেছি), তাঁরা কিছু মনের খোরাক পেতে পারেন সিংকোনা-বাগানের কুলি-কামিনদের সঙ্গে দু'দণ্ড কাটিয়ে। শীতের দেশ, জল গরম করবার 'গেইজার' নেই হতভাগাদের। অতএব খুবই ডার্টি তাতে সন্দেহ কি! তবে দেহ ও বেশবাস টিপটপ না হলেও মন বড় পরিষ্কার। মহানগরের কেরানীপাড়ায় যে খুপরিতে উদয়াস্ত কলম পিষে জীবিকানির্বাহ করি তার চারপাশের পরিবেশে অথবা উচ্চ কোটির অভিজাত সমাজে কতকাল—হায় কতকাল—এহেন নির্মল মনের দেখা পাইনি! সিংকোনা-বাগানের মেয়েপুরুষ অমার্জিত নিশ্চয়ই, নিরক্ষর অবশ্যই, অনগ্রসর নিঃসন্দেহে।

তদুপরি এতদূর অশিক্ষিত যে কপট মুখোশের আড়ালে স্বার্থসিদ্ধির নিপুণ চালগুলো কিভাবে চালতে হয় এখনো তা শেখেনি। উপকারীর ঋণ যে বেইমানি দিয়ে শোধ করতে হয় তাও জানে না। সভ্যতার ক্ষতস্বরূপ এক মহানগর থেকে পালিয়ে এই ঘোরতর পশ্চাৎপদ সমাজে আমি একদিনের জায়গায় পাঁচদিন কাটিয়েছিলাম। আবার বলি, সেজন্য আমার বিন্দুমাত্র খেদ নেই।

মানসং-এর আর এক আকর্ষণ জলসা ডাকবাংলোর (ডাকবাংলোটি এই নামেই পরিচিত) কাছাকাছি রমণীয় কয়েকটি বনপথ। সিকিমের খুব কাছাকাছি হওয়ায় অরণ্যপ্রকৃতি একই রকম শ্যামল-নির্জন, একই রকম ভয়াল-গম্ভীর। বহু সময় আমার কেটেছে আলো-ছায়ার আলপনা আঁকা এসব অরণ্যপথে। নিজেকে খুঁজে পাবার এমন পরিবেশ আর হয় না।

কিন্তু জনবিরল এই পাহাড়ী পল্লীর কোন কৌলীন্য নেই, 'স্ট্যাটাস' নেই। সুইটৎজারল্যান্ড বা জাপান পরিভ্রমণের পর, নিদেনপক্ষে শ্রীনগর, সিমলা, মুসৌরী বা উটি ঘুরে এসে, ড্রয়িংরুমের জমায়েতে যে আত্মগরিমা লাভ করা যায়, পচা পশ্চিমবঙ্গের অখ্যাত এই গিরিনীড় তা কখনই দিতে পারবে না। তবুও সবাইকে আমন্ত্রণ জানাই অন্তত একবার মানসং-এ আসবার।



শিকারপুর

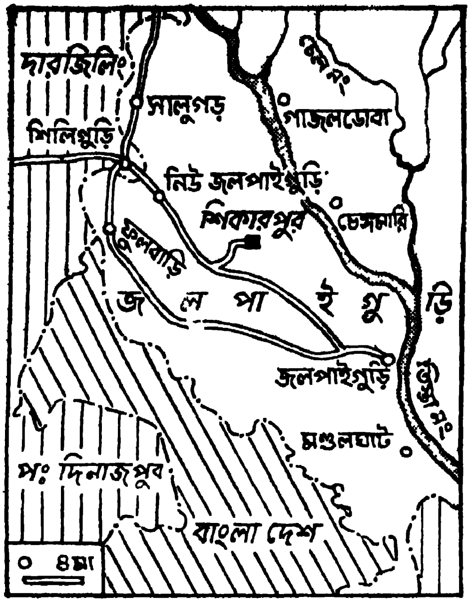
'দেবী চৌধুরানী' যে ঐতিহাসিক উপন্যাস নয়, বঙ্কিমচন্দ্র নিজেই সেকথা বলেছেন। ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত, বইখানির ষষ্ঠ সংস্করণের 'বিজ্ঞাপনে' তাঁর উক্তি—"দেবী চৌধুরানী গ্রন্থের সঙ্গে ঐতিহাসিক দেবী চৌধুরানীর সম্বন্ধ বড় অল্প। দেবী চৌধুরানী, ভবানী পাঠক, গুড্‌ল্যাড সাহেব, লেফ্‌টেনাণ্ট ব্রেনান্‌ এই নামগুলি ঐতিহাসিক। আর দেবীর নৌকায় বাস, বরকন্দাজ সেনা প্রভৃতি কয়টা কথা ইতিহাসে আছে বটে। এই পর্যন্ত। পাঠক মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক আনন্দমঠকে বা দেবী চৌধুরানীকে 'ঐতিহাসিক উপন্যাস' বিবেচনা না করিলে বড় বাধিত হইব।"

আচার্য যদুনাথ সরকার কিন্তু অন্যত্র এ গ্রন্থের 'ঐতিহাসিক ভূমিকা'য় বলেছেন—"হেস্টিংস লাট হইবার পর (১৭৭২) এ দেশের দৃশ্য যেরূপ ছিল, বঙ্কিম তাহার অক্ষরে অক্ষরে সত্য বর্ণনা করিয়াছেন। মনে রাখিতে হইবে যে, 'দেবী চৌধুরানী'র জন্য কাল ও স্থান এ দুইটিই বিদ্রোহেব সম্পূর্ণ উপযোগী করিয়া বাছিয়া লওয়া হইয়াছে। কাল, তখন মুঘল সাম্রাজ্যেব দেশব্যাপী শান্তি ও শৃঙ্খলিত শাসনপদ্ধতি অস্ত গিয়াছে অথচ নবীন ব্রিটিশ শাসন দেশে স্থাপিত হয় নাই—এই দুই মহাযুগের সন্ধিস্থল; রাজনৈতিক গোধূলি অরাজকতাব বিশেষ সহায়ক। আর স্থান, সীমান্ত প্রদেশ; 'আনন্দমঠে' বন্য ঝাড়খণ্ডের প্রবেশদ্বার বীরভূম জেলা, 'সীতারামে' সমুদ্রের প্রায় ধারে কোণঠেসা ভূষণা পরগণা, আর 'দেবী চৌধুরানী'তে রঙ্গপুর জেলা।"

'দেবী চৌধুরানী'র নায়িকা স্বামীপরিত্যক্তা প্রফুল্লকে বঙ্কিমচন্দ্র ঘটনাচক্রে ডাকাতদলের নেত্রীতে পরিণত করে আবার তাঁকে শান্ত গার্হস্থ্যজীবনে ফিরিয়ে নিয়ে গিয়েছেন। এই মূল কাহিনী, সে সময়কার রংপুর জেলার উত্তর অংশের পটভূমিতে রচিত। সময়, মোটামুটিভাবে, ১৭৮০ থেকে ১৭৯০ খ্রীষ্টাব্দ—'ছিয়াত্তরে মন্বন্তরে'র (১৭৭০) অব্যবহিত পরে। আজকের জলপাইগুড়ি জেলার পত্তন হয় ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে। তার আগে এ জেলার প্রায় সবটাই ছিল রংপুর জেলার অধীন। রংপুর জেলা গেজেটিয়ার (১৯১১) থেকে দেখছি, সে জেলার উত্তর সীমান্ত তখন নেপাল, ভুটান ও কোচবিহার রাজ্যকে স্পর্শ করত। ডাকাতদলের অন্যতম প্রধান ঘাটি বৈকুণ্ঠপুরের বিশাল ও গভীর জঙ্গল এখন জলপাইগুড়ি জেলার মধ্যে হলেও তখন ছিল রংপুর জেলায়। ঐতিহাসিক উপন্যাস বলে স্বীকার না করলেও, বঙ্কিমচন্দ্র এ গ্রন্থে স্থান কাল পাত্র সম্বন্ধে কি বলেছেন তা আর একবার ভাল করে দেখা যাক।

বইটির বিভিন্ন অংশে তাঁর উক্তি—"বরেন্দ্রভূমে ভূতনাথ গ্রামে প্রফুল্লের শ্বশুরবাড়ি; প্রফুল্লের পিত্রালয় হইতে ছয় ক্রোশ। [ভূতনাথ নামটি কাল্পনিক মনে হয়]। তখন দেশ অরাজক, মুসলমানের রাজ্য গিয়াছে; ইংরেজের রাজত্ব ভাল করিয়া হয় নাই—হইতেছে মাত্র। তাতে আবার বছর কতক হইল ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে দেশ ছারখার করিয়া গিয়াছে। তারপর আবার দেবী সিংহের ইজারা। [অত্যাচারী ইজারাদার দেবী সিংহের ভয়াবহ নির্যাতনের কাহিনী সুবিদিত]...গুডল্যাড সাহেব রঙ্গপুরের প্রথম কালেক্টর। ফৌজদারী তাঁহারই জিম্মা। তিনি দলে দলে সিপাহী ডাকাত ধরিতে পাঠাইতে লাগিলেন। কিন্তু সিপাহীরা কিছুই করিতে পারিল না।" অন্যত্র—"ভবানী পাঠক বিখ্যাত দস্যু। তাহার ভয়ে বরেন্দ্রভূমি কম্পমান।" আর এক জায়গায় দেবী চৌধুরানীকে দরবার (অকাতরে দানধ্যান) করবার অনুরোধ করে ভবানী পাঠক বলছেন—"ইংরেজ সন্ধান পাইয়াছে তুমি এখন এই প্রদেশে আছ। এবার পাঁচ শত সিপাহী লইয়া তোমার সন্ধানে আসিতেছে। অতএব এখানে দরবার হইবে না। বৈকুণ্ঠপুরের জঙ্গলে হইবে প্রচার করিয়াছি। সে জঙ্গলে সিপাহী যাইতে সাহস করিবে না—করিলে মারা পড়িবে।" এ পুস্তকের ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক ভিত্তি সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র আর বিশেষ কিছু বলেননি।

এবার সরকারী কাগজপত্রে উল্লেখিত ইতিহাস ও ভূগোল প্রসঙ্গে আসা যাক। ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত মিঃ জে. এ. ভাস রচিত রংপুর জেলা গেজেটিয়ারের সংশ্লিষ্ট অংশের বাংলা তর্জমা এই রকমঃ "১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে দলছুট দেশী সৈন্য ও ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে সর্বস্বান্ত কৃষকদের সঙ্গে নিয়ে ডাকাতের দল—কোন কোন ক্ষেত্রে সংখ্যায় তারা পঞ্চাশ হাজারের মতোও হত—গ্রামের পর গ্রাম লুট করছিল বা আগুন ধরিয়ে দিচ্ছিল। রংপুর ও দিনাজপুরের দক্ষিণে ও বগুড়া জেলার পশ্চিমে গঙ্গাভিমুখী অঞ্চলে, শাসনকেন্দ্র থেকে বহুদূরে তাদের দৌরাত্ম্য ছিল সর্বাধিক। ১৭৮৭ খ্রীষ্টাব্দে, এই এলাকার বিখ্যাত দস্যুদলপতি ভবানী পাঠককে দমন করবার জন্য লেফ্‌টেনাণ্ট ব্রেনানকে নিয়োগ করা হয়। তিনি ডাকাতদলের সন্ধানে একজন দেশী অফিসারের অধীনে চব্বিশ জন সিপাই পাঠান। তারা ভবানী পাঠক ও তার ষাটজন নৌকারোহী সঙ্গীকে অতর্কিতে আক্রমণ করে। যুদ্ধে দলনেতা ও তার তিনজন অনুচর নিহত ও আটজন আহত হয় আর বন্দী হয় চল্লিশজন। পাঠক ছিল বাজপুরের অধিবাসী। গঙ্গার দক্ষিণবর্তী অঞ্চল থেকে মজনু শা নামে যে আর এক কুখ্যাত দস্যু প্রতি বছরই উত্তরের এই অঞ্চলে অভিযান করত, তার সঙ্গে ভবানী পাঠকের যোগাযোগ ছিল। লেফ্‌টেনাণ্টের রিপোর্টে দেবী চৌধুরানী নামে আর একজন স্ত্রী-ডাকাতের উল্লেখ পাওয়া যায়; সে ভবানী পাঠকের দলে ছিল। সে বজরায় বাস করত। তার অধীনে বহুসংখ্যক সশস্ত্র বরকন্দাজ ছিল যাদের সাহায্যে সে নিজেই ডাকাতি করত আবার পাঠকের লুটের অংশও পেত। চৌধুরানী উপাধি থেকে মনে হয় সে হয়তো ছোটখাট এক জমিদার ছিল। কিন্তু ধরা পড়বার ভয়ে তাকে সর্বদা নৌকায় বাস করতে হত।...১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দের এক রিপোর্টে দেখা যায় জেলার (রংপুর জেলার) উত্তর প্রান্তে, পাহাড়ের পাদদেশে, বৈকুণ্ঠপুরের জঙ্গলে এক বিরাট ডাকাতের দল আস্তানা গেড়ে সেখান থেকে নানা দিকে অভিযান চালাতে থাকে। লতাগুল্মে সমাচ্ছন্ন এই ঘন অরণ্যে কেবল সংকীর্ণ বনপথ দিয়েই প্রবেশ করা যেত, যার হদিস কেবল ডাকাতরাই জানত। কালেক্টর দু'শ বরকন্দাজ সংগ্রহ করে জঙ্গলের প্রবেশপথগুলি প্রথমে বন্ধ করলেন। এখানে-সেখানে হাতাহাতি লড়াই কিছু হল কিন্তু কয়েক মাস গত হলেও জয়-পরাজয়ের কোন নিশ্চিত মীমাংসা হল না। তখন



রসদ বন্ধ করে লুটেরাদের অনাহারে মারবার ব্যবস্থা করা হল। কিছু ডাকাত নেপাল ও ভুটানে পালিয়ে গেল কিন্তু তাদের দলপতি ও প্রধান কয়েকজন সাগরেদ ধরা পড়ল। বারো মাসের মধ্যে জেলার এই অঞ্চলে ও অন্যান্য এলাকায় ৫৪৯ জন দস্যুকে গ্রেপ্তার করে কালেক্টর তাদের রাজদ্বারে হাজির করলেন।”

এই বিবরণে ভবানী পাঠক, দেবী চৌধুরানী ও তাঁদের সহযোগীদের স্পষ্টভাবেই ডাকাত, দস্যু, লুটেরা প্রভৃতি বিশেষণে ভূষিত করা হয়েছে। নিছক ধনলাভের আশাতেই যে তাঁরা দলবদ্ধভাবে দুর্বলের উপর অত্যাচার করতেন সেকথা বলতেও কোন কার্পণ্য করা হয়নি। অন্যদিকে বঙ্কিমচন্দ্র কিন্তু ভবানী পাঠক ও দেবী চৌধুরানীকে রবিন হুডের থেকেও মহত্তর চরিত্র হিসেবে চিত্রিত করেছেন। তাঁর উপন্যাসের এক জায়গায় দেবী রানীর দরবারের বর্ণনা আছে। দরবার বলতে, ধনী বা অত্যাচারীদের কাছ থেকে লুণ্ঠিত ধনসম্পত্তি অকাতরে দরিদ্রদের মধ্যে বিতরণ। দেবী চৌধুরানী মাঝে মাঝেই এরকম দরবার করতেন। আর, ভবানী পাঠকের ঋজু চরিত্রটিকে তিনি “দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন” এই নীতির উপর অবিচল রেখেছেন। ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠিত হবার পর, আইনশৃঙ্খলা যখন মোটামুটি ফিরে এল তখন ভবানী পাঠক বুঝলেন দস্যুবৃত্তি এবার তাঁকে ছাড়তে হবে কেননা দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনের জন্য এবার পৃথক এক শক্তি আবির্ভূত হয়েছে। গ্রন্থের উপসংহারে বঙ্কিমচন্দ্র সেজন্য লিখেছেন—“ইংরেজ রাজ্য শাসনের ভার গ্রহণ করিল। ...সুতরাং ভবানী ঠাকুরের কাজ ফুরাইল। দুষ্টের দমন রাজাই করিতে লাগিল। ভবানী ঠাকুর ডাকাইতি বন্ধ করিল। তখন ভবানী ঠাকুর মনে করিল, ‘আমার প্রায়শ্চিত্তের প্রয়োজন’। এই ভাবিয়া ভবানী ঠাকুর ইংরেজকে ধরা দিলেন, সকল ডাকাইতি একরার করিলেন, দণ্ডের প্রার্থনা করিলেন। ইংরেজ হুকুম দিল, ‘যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরে বাস।’ ভবানী পাঠক প্রফুল্লচিত্তে দ্বীপান্তরে গেল।”

ঔপন্যাসিক প্রয়োজনে বঙ্কিমচন্দ্রের নায়ক-নায়িকা হয়তো বা কিছুটা রোমাণ্টিক।

তিনি নিজেও তাঁদের হুবহু ঐতিহাসিক ব্যক্তি বলে দাবি করেননি। অন্যদিকে, সরকারী বর্ণনায়, তাঁরা যে সাধারণ লুটেরা বা ঠ্যাঙাড়ে হিসাবে চিত্রিত হয়েছেন তাতেও অতিরঞ্জনের ছাপ স্পষ্ট। এই পরস্পরবিরোধী বিবরণের বিচার করতে বসলে, ভারত-ইতিহাসের আর এক বহুবিতর্কিত চরিত্র, শিবাজীর কথা ও রবীন্দ্রনাথের 'শিবাজি-উৎসব' নামের বিখ্যাত কবিতাটির নীচের পংক্তিগুলি সহজেই মনে পড়ে।

"সেদিন এ বঙ্গপ্রান্তে পণ্যবিপণীর
একধারে
নিঃশব্দচরণ
আনিল বণিক্‌লক্ষ্মী সুরঙ্গ পথের
অন্ধকারে
রাজসিংহাসন।
বঙ্গ তারে আপনার গঙ্গোদকে
অভিষিক্ত করি
নিল চুপে চুপে;
বণিকের মানদণ্ড দেখা দিল পোহালে
শর্বরী
রাজদণ্ডরূপে॥
সেদিন কোথায় তুমি হে ভাবুক,
হে বীর মারাঠি,
কোথা তব নাম।
গৈরিক পতাকা তব কোথায় ধূলায়
হল মাটি—
তুচ্ছ পরিণাম।
বিদেশীর ইতিবৃত্ত দস্যু বলি করে
পরিহাস
অট্টহাস্য রবে—
তব পুণ্য চেষ্টা যত তস্করের নিষ্ফল
প্রয়াস,
এই জানে সবে॥
অয়ি ইতিবৃত্ত কথা, ক্ষান্ত করো
মুখর ভাষণ
ওগো মিথ্যাময়ী,
তোমার লিখন পরে বিধাতার অব্যর্থ
লিখন
হবে আজি জয়ী।
যাহা মরিবার নহে তাহারে কেমনে
চাপা দিবে—
তব ব্যঙ্গ বাণী।
যে তপস্যা সত্য তারে কেহ বাধা
দিবে না ত্রিদিবে
নিশ্চয় সে জানি॥"

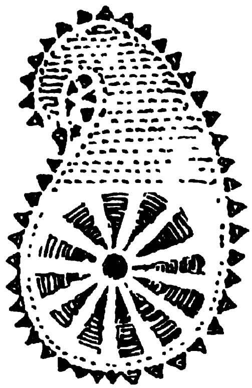
মিথ্যাময়ী ইতিবৃত্তকথার মুখর ভাষণ যখন স্তব্ধ করা যায় না তখন সর্বত্রই জনমানসে এক বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। বলহীন অসহায়ের প্রতিশোধস্পৃহা চরিতার্থ করবার সেইটাই একমাত্র পথ। ব্যঙ্গবাণী ও অট্টহাসিতে যেসব মহনীয় চরিত্রকে হনন করবার চক্রান্ত করা হয়ে থাকে, জনসাধারণ তাদের মহত্ত্বের উচ্চাসনে বসিয়ে প্রকাশ্যে বা গোপনে পূজা করে। সাধারণ চোর বা 'পাহাড়ী ইঁদুর' ইত্যাদি বিশেষণে ভূষিত শিবাজী আজ মারাঠি-জগতে প্রায় দেবত্বের পর্যায়ে উন্নীত। জালিয়ানওয়ালাবাগের শহীদদের স্মৃতির উদ্দেশে আজও সেখানে পাঞ্জাবের গ্রাম-গ্রামান্তরের সাধারণ মানুষ ফুল দিয়ে যায়, কখনো বা কয়েকটি সন্ধ্যাদীপ। লোক-হিতৈষী ভবানী পাঠক ও দেবী চৌধুরানীর ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। বিদেশীর ইতিবৃত্ত তাঁদের দস্যু বলে চিহ্নিত করবার চেষ্টা করেও সফল হয়নি। লোককল্পনায় তাঁরা যে এখন দেবত্বের পর্যায়ে উন্নীত সম্প্রতি তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পেলাম।

শিলিগুড়ি (বা নিউ জলপাইগুড়ি) থেকে যে পিচের সড়ক গেছে জলপাইগুড়ির দিকে, তাতে ন'দশ মাইল গিয়ে বাঁহাতি এক কাঁচা রাস্তায় কিছুদূর গেলে সন্ন্যাসীর হাট নামে এক জায়গায় পেঁছনো যায়। জলপাইগুড়ি জেলার রাজগঞ্জ থানার শিকার-পুর মৌজায় অবস্থিত এ গ্রামে বুধ ও শনিবার যে বিরাট হাট বসে তাতে গরুবাছুর, ছাগল, মুরগি ছাড়া যথেষ্ট পরিমাণে কৃষিপণ্যও বিক্রী হয়ে থাকে। কাছেই শিকার-পুর টি এস্টেটের বিস্তৃত চা-বাগান। সমস্ত এলাকাটাই আগে অব্যবহিত উত্তরের বৈকুণ্ঠপুর জঙ্গলের শামিল ছিল। আনুমানিক সত্তর-আশি বছর পূর্বে সে জঙ্গল হাসিল করে চা-বাগিচাব পত্তন হয। সন্ন্যাসীর হাট নামের একটু তাৎপর্য আছে। হাটের সীমানার বাইরে, এক ইউক্যালিপ্টাস কুঞ্জের মধ্যে, নেপালী প্যাগোডা গড়নের টিনের চালাযুক্ত এক কাঠের মন্দির আছে, যার বিগ্রহ, বিস্ময়করভাবে, ভবানী পাঠক ও দেবী চৌধুবানীর দুটি পূর্ণাবয়ব কাঠের মূর্তি। ভবানী পাঠকের 'সন্ন্যাসীবাবা' বা 'সন্ন্যাসী ঠাকুর' নামটি এ অঞ্চলে বহুদিন প্রচলিত। সে নাম থেকেই গ্রামের নামেব উৎপত্তি। বিদেশীর ইতিবৃত্তে দস্যু বলে বর্ণিত এই পরহিতব্রতী সাধক-সাধিকা এখানে দেবত্বের পূর্ণ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত।

ভবানী পাঠক বা দেবী চৌধুরানী ঠিক এই জায়গাতেই কখনো বাস করেছিলেন এমন নিশ্চিত কোনো প্রমাণ নেই। ভবানী পাঠক যে ক্রমাগত স্থান পরিবর্তন করতে বাধ্য হয়েছেন আর দেবী চৌধুরানী যে সাধারণত বগুড়ায় বাস করতেন সেকথা ঐতিহাসিকভাবে সত্য। কিন্তু আজকের সন্ন্যাসীর হাট ও তার দক্ষিণের বিস্তৃত এলাকা যে দু'শ বছর আগে বৈকুণ্ঠপুরের বিশাল অরণ্যের অন্তর্গত ছিল তাতে সন্দেহ নেই। সে জঙ্গলের বিভিন্ন ঘাটির মধ্যে একটি এখানে থেকেও থাকতে পারে। সন্ন্যাসীবাবার মন্দিরের (মন্দিরটি এই নামেই সাধারণের কাছে পরিচিত) প্রাঙ্গণে তিন-চারটি বেশ বড় বড় পাথরের টুকরো দেখা যায়, কিন্তু সেগুলি কখনো কোন ইমারতের অংশ ছিল বলে মনে হয় না। অতএব আগে এখানে কোন মন্দির ছিল এমন মনে করবার কারণ নেই। স্থানীয় কিংবদন্তী অনুসারে, শিকারপুর টি এস্টেট পত্তনের সময় প্রথম ম্যানেজার 'হ্যাচিং সাহেব' গরুর গাড়ি করেই যাতায়াত করতেন। একবার নাকি বিরাট দুই বাঘ পিছন ও সামনে থেকে তাঁর গাড়ি ঘেরাও করে এই মন্দির নির্মাণের প্রতিশ্রুতি আদায় করে নেয়। বাঘছালপরা ভবানী পাঠকের মূর্তিটি মহাদেবের মূর্তির আদলে কল্পিত ও উচ্চতায় প্রায় সাড়ে-পাঁচ ফুট। দেবী চৌধুরানীরটি প্রায় সাড়ে-তিন ফুট উঁচু। দু'টিই বেশ উগ্র রঙে রঞ্জিত। এছাড়া প্রমাণ আকৃতির দু'জন সশস্ত্র পাইক, সন্ন্যাসীবেশী একজন অনুচর, ভবানী পাঠকের উপবিষ্ট গুরু-

দেব, দেবী রানীর দুই সখী ও একটি বাঘের মূর্তিও আছে। সব ক'টিই কাঠের তৈরী ও রং-করা। কারিগরি খুবই নিরেস। উত্তরবঙ্গের এ অঞ্চলে যে হাওড়া-হুগলী জেলার মতো ভাল কাঠের কারিগর দুর্লভ এ মূর্তিগুলিই তার প্রমাণ।

কিন্তু শুধুমাত্র কারিগরির বিচারে এ বিগ্রহগুলির মূল্য নিরূপণ করা যায় না। এদের মর্যাদা নির্ণয় করা উচিত জনমানসের প্রকাশের মাপকাঠিতে। ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বিস্তারের প্রথম যুগে, গরীব ও অত্যাচারিতের বন্ধু এই সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনী প্রবলতর বিদেশী শক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে নিহত হন। তাঁদের গুণগ্রাহী দেশবাসী সে হত্যাকাণ্ডের কোন প্রতিবিধান করতে পারেনি বলেই আজ তাঁদের দেবতার আসনে বসিয়ে পুজো করছে। এরকম আশ্চর্য মন্দির, এরকম অভিনব বিগ্রহ পশ্চিমবঙ্গে আর কোথাও আছে কিনা সন্দেহ।





বাণেশ্বর

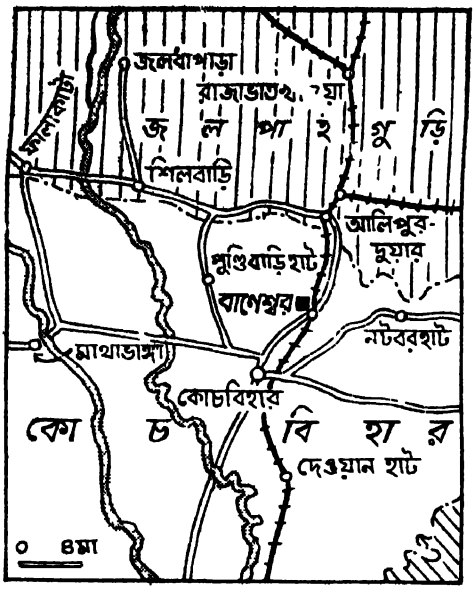
সমবেত কণ্ঠে "বা—বা তারকনাথে—র চরণে—এ সেবা লাগে; মহাদে—ব" ধ্বনি তুলে এইমাত্র একদল গাজন-সন্ন্যাসী আমার বাড়ির সামনের পথটুকু অতিক্রম করে গেলেন। কলকাতার দক্ষিণাঞ্চলে যেখানে আমার বাস সেখান থেকে তারকেশ্বরের দূরত্ব চল্লিশ মাইলের কম নয়। সমস্ত চৈত্র মাসটা কঠিন আচার নিয়ম পালন করে এই সন্ন্যাসীদের অধিকাংশই প্রথমে যাবেন বৈদ্যবাটির নিমাইতীর্থ ঘাটে। সেখান থেকে বাঁকে করে গঙ্গাজল নিয়ে পায়ে হেঁটে যাবেন প্রায় চব্বিশ মাইল দূরে তারকনাথের মন্দিরে 'বাবা'র মাথায় ঢালতে। পদযাত্রীরা শুধু পুরুষই নন, বালিকা, যুবতী, প্রৌঢ়ারাও থাকেন তবে তাঁরা সংখ্যায় কম। অধিকাংশ পুণ্যার্থীই একদিনে এ দূরত্ব অতিক্রম করতে পারেন না। পথপ্রান্তের ধর্মশালায় তাঁদের রাত্রিবাস করতে হয। কিছু দূর দূরে অন্তর যেসব বিশ্রামস্থান আছে সেখানে যাত্রাবিরতি করতে হয সকলকেই। শ্রান্তি অপনোদনের জন্য সেখানে পানীয়ের ব্যবস্থা থাকে। আর থাকে ক্লান্ত পা দু'টিকে চাঙ্গা করবার জন্য উষ্ণ জলের গামলা। তাতে এক-একবার পা ডুবিয়ে কিছুক্ষণ বসে থাকলে আবার কয়েক মাইল হাঁটা যায়। এসব পরিশ্রান্ত স্ত্রী-পুরুষ অবশেষে যখন তারকেশ্বরে এসে পেঁছিন তখন এক উদ্বেল তীর্থকামী জনতা গ্রাস করে তাঁদের। চৈত্রশেষের প্রচণ্ড গরমে, সেই চাপাচাপি ভীড়ে, প্রাণপণ চেষ্টায় গঙ্গাজলের কলসী সামলে, তাঁরা যখন 'বাবা'র মন্দিরে ঢুকতে পান ততক্ষণ অবধি কোন্ দৈবশক্তি যে তাঁদের সচল রাখে তা আমার ধারণার বাইরে। অনেকে অজ্ঞান হয়ে যান। কিন্তু অধিকাংশই উচ্চনিনাদে তারকনাথের মাথায় জল ঢালতে পারেন শেষ অবধি। দূর অতীতে তারকেশ্বর শিব-মন্দির প্রতিষ্ঠার কাল থেকেই, এপ্রথা চলে আসছে।

শুধু যে গাজন-সন্ন্যাসীরাই তারকেশ্বরে আসেন তা নয়। মনস্কামনা পূর্ণ হবার আশায়, আগের বছরের অভিলাষ পূর্ণ হবার আনন্দে, হাজার হাজার সাধারণ নরনারীও একই কষ্ট হাসিমুখে সহ্য করেন। কলকাতা অঞ্চলের মত অল্প দূরত্বের স্থান থেকেও তাঁরা যেমন আসেন, তেমনি আসেন নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, বর্ধমান, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, মেদিনীপুর প্রভৃতি অল্পবিস্তর দূরের জেলাগুলি থেকেও। ধর্মীয় উন্মাদনা মানুষকে যে কতদূর আত্মবিস্মৃত ও কষ্টসহিষ্ণু করতে পারে, তারকেশ্বরের গাজন বা শিবরাত্রি উৎসবে সমবেত জনতার আচরণ দেখলে তা কিছুটা বোঝা যায়। এর মূলে আছে বাবা তারকনাথের অসীম মাহাত্ম্য। বস্তুত, পদ্মার দক্ষিণে পশ্চিমবঙ্গের যে অংশ, সেখানে শৈবতীর্থের তালিকায় তারকেশ্বরের

নাম সর্বাগ্রে। চব্বিশ-পরগণা জেলার মন্দিরবাজারের কেশবেশ্বর, কলকাতা-কালীঘাটের নকুলেশ্বর, নদীয়া জেলার শিবনিবাসের বুড়ো শিব, মুর্শিদাবাদ জেলার বড়নগরের ভবানীশ্বর, বীরভূম জেলার বক্রেশ্বর, বর্ধমান জেলার জামালপুরের বুড়োরাজ অথবা কুড়মুনের ঈশানেশ্বর, বাঁকুড়া জেলার এক্তেশ্বর, হাওড়া জেলার বালীর কল্যাণেশ্বর এবং মেদিনীপুর জেলার এগরার হট্টনাগর প্রভৃতি শিব অল্পাধিক বিখ্যাত। কিন্তু তারকনাথের খ্যাতি-প্রতিপত্তির সঙ্গে তাঁদের কারও তুলনাই হয় না।

দক্ষিণবঙ্গে আঞ্চলিকভাবে প্রসিদ্ধ আরও অজস্র শিবের পূর্ণ তালিকা তো দূরের কথা, আংশিক তালিকা পেশ করাও আমার অভিপ্রায় নয়। তবে এ দেবতাটির অজস্রতার কথা বিবেচনা করে অনায়াসেই বলা যায়, গ্রাম-বাংলায় শিবই সবচেয়ে জনপ্রিয় দেবতা। তাঁর মন্দিরের সংখ্যাও সর্বাধিক। শুধু দক্ষিণবঙ্গেই নয়, উত্তরবঙ্গেও। উত্তরবঙ্গের প্রসিদ্ধতম দুই শিবঠাকুর হলেন কোচবিহার জেলার বাণেশ্বর ও জলপাইগুড়ি জেলার জল্পেশ্বর। সেখানেও গ্রামগ্রামান্তরে অল্পখ্যাত আরও অনেক শিব আছেন। তাঁদের সকলের কথা যেহেতু বলা সম্ভব নয় সেজন্য খ্যাতির শীর্ষে যে দু'জন, আজ শুধু তাঁদের একজনেরই বিবরণ দেব।

কোচবিহার শহরের ছ'সাত মাইল উত্তরে বাণেশ্বর শিবের প্রাচীন মন্দিরটি অবস্থিত। শিবের নাম থেকেই গ্রামের নাম। বাণেশ্বর ও কোচবিহার শহর রেলপথ ও পিচের রাস্তা দ্বারা সরাসরি সংযুক্ত। পশ্চিমমুখী মন্দির—ভিতর ও বাইরে চতুষ্কোণ। বাইরের মাপ, প্রতি দিকে ৩১ ফুট; উচ্চতা আনুমানিক ৩৫ ফুট। ১৬৬৫ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ কোচবিহার-অধিপতি মহারাজা প্রাণনারায়ণ এটি নির্মাণ করান। গর্ভগৃহের মেঝে যে বাইরের সমতল থেকে প্রায় ১০ ফুট নীচু তা থেকেও ইমারতটির প্রাচীনত্ব প্রমাণিত হয়। সেই সূত্রে স্থানীয় ভক্তজনের বিশ্বাস, আদি মন্দিরটি নাকি ছিল পাথরের এবং অলৌকিকভাবে বিশ্বকর্মার তৈরি; প্রাণনারায়ণ ইঁটের দেওয়াল দিয়ে পাথরের গাঁথনি ঢেকে এটির সংস্কার করেন মাত্র। বলা বাহুল্য, এ ধারণা সত্য নয়। কেননা, পাথরের সৌধ কখনই এভাবে মেরামত হয় না। তা ছাড়া এখনকার ইঁটের দেওয়ালের ভিতরে পাথরের কোন অংশও নেই। এ শিবলিঙ্গকে ঘিরে আর এক কিংবদন্তী প্রায় সব অনাদিলিঙ্গ বা স্বয়ম্ভূলিঙ্গ সম্বন্ধেই প্রচলিত। গ্রামের কোন গরু মন্ত্রচালিতের মতো গভীর অরণ্যের এক নির্দিষ্ট স্থানে গিয়ে সকলের অলক্ষ্যে রোজ দুধ বর্ষণ করে আসে; পরে কৌতূহলী গ্রামবাসী সেখানকার মাটি খুঁড়ে আবিষ্কার করে এক শিবলিঙ্গ। বহু চেষ্টায়ও সে লিঙ্গ স্থানান্তরিত করা যায় না। তখন কোন ধনী ভক্ত শিবের আচ্ছাদনের জন্য মন্দির নির্মাণ করে দেন। পরে, শিবের খ্যাতিবৃদ্ধির সঙ্গে সেখানে বড় মন্দির স্থাপিত হয়। এ কাহিনী এত অজস্র শৈবতীর্থের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যে তাকে লোককল্পনার বেশী মূল্য দেওয়া যায় কিনা সন্দেহ। সে যাই হোক, স্থাপত্যের দিক থেকে এ দেবালয়ের অনুপম বৈশিষ্ট্য এর গম্বুজশীর্ষ ছাদ। মুসলমান আমলে, বহু হিন্দু মন্দিরের চালের নীচের পিঠ গম্বুজের আকারে নির্মিত হলেও বাইরের আকৃতি হয়েছে চালা বা রত্নশৈলী অনুযায়ী। কিন্তু কোচবিহারের অধিকাংশ মন্দিরে এর ব্যতিক্রম দেখা যায়। সেখানে ছাদের ভিতর ও বাহির দু'দিকই গম্বুজের আকারে তৈরি করাই ছিল রীতি। সেখানে এক-গম্বুজ মসজিদের ছাদের থেকে হিন্দু দেবালয়ের ছাদের আকৃতিগত বিশেষ কোন পার্থক্য নেই। মন্দিরের সামনে সানবাঁধানো প্রশস্ত চত্বর। তার দুই প্রান্তে, মন্দিরের গা ঘেঁষে, চণ্ডী ও ভুবনেশ্বরীর স্থান। প্রথমটি উত্তর দিকে অবস্থিত ও আসলে ৬ ইঞ্চি×৬ ইঞ্চি মাপের এক বিষ্ণুপট্ট যাতে লক্ষ্মী সরস্বতী ছাড়া গঙ্গা



যমুনার মূর্তিও খোদিত আছে। প্রথাগতভাবে, শিলাখণ্ডটির বিপরীত দিকে নিশ্চয়ই দশাবতার মূর্তি উৎকীর্ণ ছিল। কিন্তু পিছনের দেওয়ালের চুনবালির মধ্যে নিবদ্ধ হওয়ায় সেদিক এখন অদৃশ্য। দক্ষিণ দিকে ভুবনেশ্বরীর স্থানে কি মূর্তি ছিল জানা যায় না; সেটি নাকি অনেক দিন আগে চুরি হয়ে গিয়েছে। ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের ভূমিকম্পে মন্দিরের সমতা কিছুটা নষ্ট হওয়ায় শিবলিঙ্গটি এখন পূব দিকে অনেকখানি হেলানো।

উত্তরবঙ্গে বাণেশ্বর-শিব যে জল্পেশ্বর-শিবের মতোই প্রসিদ্ধ সেকথা আগেই বলেছি। এই দুই বিখ্যাত দেবতাকে ঘিরে সেজন্য জনশ্রুতির অন্ত নেই। বাণেশ্বর সম্বন্ধে আর একটি কিংবদন্তী—দৈত্যরাজ বাণাসুর এই শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন বলেই তিনি বাণেশ্বর নামে পরিচিত। 'জল্পেশ্বর কাহিনী ও শ্রীশ্রীবাণেশ্বর দেবের মহাত্ম্য কথা' নামের পদ্যে-লেখা এক পুস্তিকায় (লেখক শ্রীপ্রমদপতি চক্রবর্তী) বাণাসুরের কাহিনী সবিস্তারে বর্ণিত হয়েছে। দ্বাপর যুগের শেষে, উত্তরবঙ্গের উজানীনগরে দৈত্যরাজ বলীর পুত্র মহাবীর বাণাসুর রাজত্ব করতেন। বৃত্রাসুরের মতো তিনিও স্বর্গরাজ্য অধিকার করেন কিন্তু ইষ্টদেব শিবের আদেশে তা আবার ইন্দ্রকে ফিরিয়ে দেন। পরে তাঁর অনুশোচনা হয় যে তাঁর মৃত্যুর পরে অমর দেবতারা নিশ্চয়ই অরক্ষিত উজানীনগর জয় করে নেবে। তাই তিনি কঠিন তপস্যায় শিবকে সন্তুষ্ট করে বর চাইলেন যে স্বয়ং মহাদেবকে তিনি কৈলাস থেকে এনে তাঁর রাজ্যের জল্পেশ্বরে প্রতিষ্ঠা করবেন যাতে তাঁর রাজত্বের মাহাত্ম্য হয় কাশীর সমান আর সেই সুবাদে তাঁর অবর্তমানে দেবতারা যেন তাঁর রাজ্য আক্রমণ না করে। মহাদেব রাজী হলেন এই শর্তে যে তাঁকে মাত্র এক রাত্রির মধ্যে কৈলাস থেকে জল্পেশ্বরে স্থানান্তরিত করতে হবে। ফাল্গুন মাসের শিবচতুর্দশী তিথিতে কৈলাস থেকে যাত্রা করে রাত্রি শেষ হবার আগেই মহাবলী বাণাসুর গন্তব্যস্থানের কাছাকাছি এসে উপস্থিত হলেন। আর তখনই শুরু হল দেবকুলের লীলাখেলা। প্রবল প্রস্রাবের বেগে বাণাসুর যখন আর অগ্রসর হতে পারলেন না তখন তাঁর সম্মুখে ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে আবির্ভূত হলেন

বহু ছলনার নায়ক নারদ। মহাদেবকে তাঁর কাছে গচ্ছিত রেখে বাণাসুর মূত্রত্যাগ আরম্ভ করলেন। কিন্তু দেবতাদের লীলায় তা নাকি এতই দীর্ঘস্থায়ী হল যে এদিকে রাত্রি ভোর হয়ে গেল। অতএব মহাদেবকে আর জল্পেশ্বরে নিয়ে যাওয়া গেল না। শিব তখন দয়াপরবশ হয়ে বাণাসুরকে বর দিলেনঃ—

> "আজি হতে তব রাজ্য মম মহিমাতে।
> শিবরাজ্য নামে খ্যাত হইবে জগতে॥
> বসেছি যেথায় এই মাটির উপর।
> হবে মম লিঙ্গ-পীঠ অর্ধনারীশ্বর॥"

সেই থেকে এখানে যে স্বয়ং মহাদেবের বাস সে বিষয়ে ভক্তজনের মনে কোন সন্দেহ নেই।

মূল মন্দিরের উত্তরে, এক টিনের চালাঘরে সিংহাসনশীর্ষ পদ্মের উপর বাণেশ্বরের উপবিষ্ট বিগ্রহ ও বাণেশ্বরের আর এক অর্ধনারীশ্বর মূর্তি নিত্যউপাসিত। দুটিই পিতলের এবং উচ্চতায় যথাক্রমে পাঁচ ইঞ্চি ও এগারো ইঞ্চি। অর্ধনারীশ্বর মূর্তিটিকে ফাল্গুন পূর্ণিমার দোল ও মদনচতুর্দশী উৎসব উপলক্ষে কোচবিহার শহরের মদনমোহন ঠাকুরবাড়িতে সাময়িকভাবে নিয়ে যাওয়া হয় বলে সেটি 'চলন্ত বাণেশ্বর' নামেও খ্যাত।

মূল বাণেশ্বর শিবলিঙ্গের প্রধান উৎসব শিবরাত্রি। শ্রীঅশোক মিত্র সম্পাদিত 'পশ্চিমবঙ্গের পূজা-পার্বণ ও মেলা' গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে এ অনুষ্ঠানের নিম্নরূপ বিবরণ দেওয়া হয়েছে—"উৎসবটি বহুকালের প্রাচীন। কেহ কেহ বলেন, প্রায় চারি শত বৎসরের প্রাচীন। উৎসবটি দুই দিনব্যাপী চলে। শিবচতুর্দশীর দিন চারি প্রহরে চারিবার সাড়ম্বরে আনুষ্ঠানিক শিব পূজা, হোম ও যজ্ঞাদি অনুষ্ঠিত হয়। উৎসব উপলক্ষে প্রায় কুড়ি হাজার নরনারীর সমাগম হয়। এই সকল যাত্রীরা প্রধানত কোচবিহার জেলার বিভিন্ন অঞ্চল হইতে এবং জলপাইগুড়ি, মালদহ, পশ্চিম দিনাজপুর ও ভুটান প্রভৃতি স্থান হইতে ট্রেনে, গরুর গাড়িতে ও পদব্রজে আসিয়া থাকেন। সমবেত যাত্রীরা মন্দির প্রাঙ্গণে উৎসবের দুই দিন দলে দলে বিভক্ত হইয়া নামগান করেন এবং শিবের নিকট সাধারণ পূজা ও মানত পূজাদি দিয়া থাকেন। মানত হিসাবে নানা উপচারে নৈবেদ্য, খাসী, পাঁঠা, কবুতর ও বৃষ উৎসর্গ করা হয়। শিবের নিকট কেহ কেহ অন্নভোগও নিবেদন করেন। অন্নভোগ নিবেদনের জন্য পূজারম্ভের পূর্বেই পূজারীর নিকট মূল্য জমা দিতে হয়। এখানে একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, শিবের নিকট নিবেদিত পশুপক্ষীগুলির মধ্যে কোন-কোনটি বলি দিয়া, কোন-কোনটিকে কণ্ঠে ফাঁস লাগাইয়া ঝুলাইয়া দেওয়া হয়, কোন-কোনটিকে পাথরে আছড়াইয়া মারা হয়, আবার কতকগুলিকে দেবতার নামে উৎসর্গ করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হয়। উৎসবের দুই দিন এইরূপ পশুপক্ষী মানত অনেকগুলি হইয়া থাকে। পূজায় ও উৎসবে শিবের নিকট ভাঙ ও গঞ্জিকা নিবেদন করা প্রয়োজনীয় ধর্মাচার বলিয়া গণ্য করা হয়। উৎসবকালে অঘোরপন্থী, বৈষ্ণব ও নাগা সাধুর সমাগম হয়। উৎসবে অহিন্দুরাও যোগ দেন; তবে সংখ্যায় খুব অল্প।"

অঘোরপন্থীরা বীভৎসাচারী শৈব সম্প্রদায় হিসাবেই সাধারণত পরিচিত। বাণেশ্বরের মতো প্রখ্যাত শৈবতীর্থে তাঁরা আসবেন তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই। কিন্তু বৈষ্ণব, নাগা সাধু এমন কি অহিন্দুদের উপস্থিতি বেশ কৌতূহলোদ্দীপক। দক্ষিণবঙ্গের তারকেশ্বর বা অন্যান্য শৈবতীর্থে সচরাচর এরকমটি ঘটে না। উত্তর-বঙ্গের বাণেশ্বর যে শুধু শৈব দেবতা নন তার আর এক প্রমাণ, ফাল্গুন মাসে

চলন্ত 'বাণেশ্বরের' দোল ও ফুলদোল উৎসবও অনুষ্ঠিত হয় যা পুরোপুরি বৈষ্ণব অনুষ্ঠান। বস্তুত, এরকম আপাতবিরোধী পার্বণ দক্ষিণবঙ্গে কল্পনাও করা যায় না। কোচবিহার অঞ্চল একদা যে বৈষ্ণব ধর্মের প্লাবনে ভেসে গিয়েছিল, সেকথা ইতিহাসস্বীকৃত। সেই প্লাবনের স্রোতগুলিকে বিশ্লেষণ করে শৈব ও বৈষ্ণব ধর্মের এহেন মিশ্রণের মর্মোদ্ঘাটন বেশ চিত্তাকর্ষক গবেষণার বিষয়বস্তু হতে পারে।

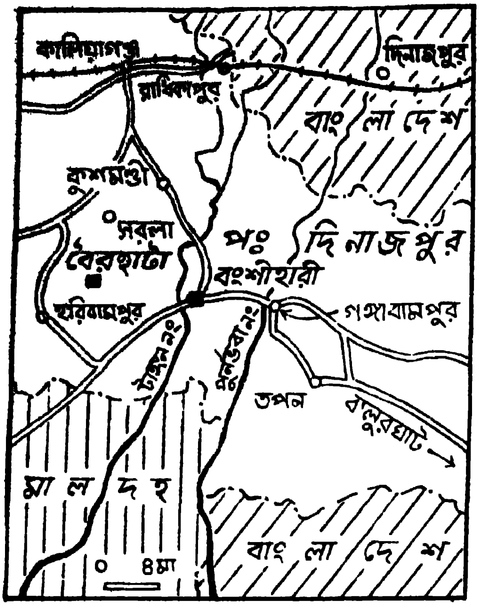
গলায় ফাঁস দিয়ে বা পাথরে আছাড় মেরে বলির পশুপক্ষী হত্যা করার রীতিটিও অভিনব। 'পশ্চিমবঙ্গের পূজা-পার্বণ ও মেলা' গ্রন্থটিতে শুধু "কণ্ঠে ফাঁস লাগাইয়া ঝুলাইয়া দেওয়া হয়" বলা হয়েছে। কিন্তু বাণেশ্বর মন্দিরের পাণ্ডা-পুরোহিতদের কাছে আমরা যা শুনেছি তা আরও ভয়াবহ। সাধারণত পাঁঠা বা খাসি এভাবে উৎসর্গ করা হয়। ছোট ছোট গোল-পোস্টের মতো ফ্রেমের সমান্তরাল দণ্ডটিতে ফাঁসের রশি বাঁধা থাকে। সে দড়ি থেকে ঝোলানো বধ্য পশুর অন্তিম আর্তনাদ থামিয়ে অল্প সময়ে কাজ শেষ করবার জন্য ঘাতকেরা এক হাতে তার মুখ চেপে ধ'রে আর এক হাতে পাথরের নোড়া দিয়ে খুব জোরে মাথায় কয়েকবার আঘাত করে। দমবন্ধ হবার সঙ্গে এভাবে মাথার খুলিও থেঁতো হয়ে যায়। পায়রা, হাঁস প্রভৃতিকে প্রথমে 'চলন্ত বাণেশ্বরের' কাছে উৎসর্গ করে তাঁর মন্দিরের আশপাশের পাথর বা সিমেন্টের মেঝের ওপব আছাড় মেবে বধ করা হয়। হিন্দুর তীর্থক্ষেত্রে কোন্ অনার্য রীতি আজও যে এভাবে বেঁচে আছে তা কে বলবে! অন্যদিকে, উৎসর্গীকৃত কিছু কিছু পশুপক্ষীকে পূর্ণ স্বাধীনতায় মুক্তি দেওয়ার রীতিটিও বিশেষভাবে লক্ষণীয়। অতি বর্বর ও অতি উদাব এই দুই প্রথার সহাবস্থান এক আশ্চর্য ব্যাপার। একই দেবতার উপাসনায় এতদুব ভিন্নমুখী রীতির উৎস সম্বন্ধেও চিত্তাকর্ষক গবেষণা হতে পারে।

সভ্য রীতির আব এক দৃষ্টান্ত দেখা যায বাণেশ্বব মন্দিরের ঠিক দক্ষিণের 'মোহন দীঘি'তে। স্মরণাতীত কাল থেকে সেখানে বহু কচ্ছপের বাস। তাদের আদি 'পুরুষে'র নাম নাকি ছিল 'মোহন'। সেই সূত্রেই দীঘির নাম। এরা সকলেই বাণেশ্বরের আশ্রিত জীব। তীর্থযাত্রীরা সেজন্য তাদের ক্ষতি করা দূরে থাকুক, পরম সমাদরে মুড়ি প্রভৃতি খাইযে থাকেন।

উত্তরবঙ্গের শিবঠাকুরদের চৈত্রসংক্রান্তির গাজন-উৎসব যে একেবারেই হয় না বা নামমাত্র হয় সেকথাও উল্লেখযোগ্য। দক্ষিণবঙ্গে অনুরূপ কিছু ভাবাই যায় না। কেননা, শিবরাত্রি উৎসব সেখানে অল্পাধিক আড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হলেও, গাজনই প্রধান ও সবচেয়ে জনপ্রিয় শৈব উৎসব। আমাদের দেবপূজার ক্ষেত্রে এসব আঞ্চলিক পার্থক্যও অনুসন্ধানের যোগ্য।

বংশীহারী : বৈরহাটা

পশ্চিম দিনাজপুর জেলায় কোন্ ডাকবাংলোটি সবচেয়ে শ্রান্তিহর, সবচেয়ে নয়নাভিরাম? সেখানে চাকরি করেছেন এমন সরকারী কর্মচারীদের জনে জনে জিজ্ঞেস করে দেখেছি। তাঁদের মতে, রায়গঞ্জের রোডস ডিপার্টমেন্টের ডাকবাংলোটি ছিমছাম ও আধুনিক সন্দেহ নেই, সে শহরের বাইরে, কিছু দূরে, কুলিক ডাকবাংলোটিও বেশ নিরিবিলি বটে, কিন্তু নিরালা বিরামস্থান হিসেবে এ জেলায় বংশীহারী ডাকবাংলোর তুলনা হয় না। পশ্চিম দিনাজপুরে খুব ঘুরেছি, একথা বলতে পারি না; অদ্যাবধি মাত্র গুটি চল্লিশেক জায়গার কভারেজ করতে পেরেছি। ডাকবাংলোও সব দেখা হয়নি। তবে যতগুলি দেখেছি, তার ভিত্তিতে আমার ভিন্ন মত পোষণ করবার কোন কারণ নেই। বাগানঘেরা বংশীহারী ডাকবাংলোর একেবারে গা ঘেঁষে ছোট্ট নদী টাঙ্গন-এর স্রোত সদাপ্রবাহিত। সিমেন্ট-বাঁধানো সোপানশ্রেণী বাগানের প্রান্ত থেকে নেমে গেছে নদীর জলে। পাড়ে অতি প্রাচীন এক অশ্বত্থ গাছ। তার ডালপালা ঝুঁকে পড়েছে নদীর উপর, একতলা ডাকবাংলোর ছাদের উপর। প্রতি সন্ধ্যায় হাজারো পাখি ফিরে আসে তার প্রসারিত বাহুর আশ্রয়ে। তাদের মিশ্রিত কূজনে ওই একটুকু সময় চারিদিকের নির্জন পরিবেশ মুখর হয়ে ওঠে। নীচে টাঙ্গন-এর রুপালী স্রোত দিনশেষের আলোয় মলিন তে থাকে। ঠিক তখন, এই জনহীন নদীর ঘাটে, প্রবহমান জলধারার দিকে তাকিয়ে অন্যমনে বসে থাকা এক অপরূপ অভিজ্ঞতা। আবার আবছা কুজ্ঝটিকা ভেদ করে, ওপারের ঘুমন্ত গাছপালার ভিতর দিয়ে যখন সূর্যোদয় হয়, সে দৃশ্যেরই বা তুলনা কোথায়! জলের উপর থেকে হাল্কা বাষ্প ওঠে কুণ্ডলী পাকিয়ে অপ্সরীর উত্তরীয়ের মতো। কুয়াশার দীর্ঘ আস্তরণ চুপ করে শুয়ে থাকে ওপারের প্রান্তরে। নদী বেগবতী কিন্তু ছোট। এত ছোট যে আস্তে করে ঢিল ছুঁড়লেও ওপারে গিয়ে পড়ে। তখন হঠাৎ ভয় পেয়ে কাদাখোঁচা পাখি ডানা মেলে উড়ে যায়। আবাব গিয়ে বসে একটু দূরে। লেজ নাচায়। খাবার খুঁটে খায়। টাঙ্গন-এর জলস্রোত ব'য়ে চলে অবিরাম। ফেনা ভেসে যায়, ভেসে যায় ছোট ছোট কচুরিপানার ঝাড়, পুজোর ফুল। সূর্য আর একটু উপরে উঠলে, নদীতে নেমে অবগাহন স্নানে যে কী অপরিসীম তৃপ্তি তা কি ক'রে বোঝাই! কলকাতা মহানগরের বিষপঙ্ক থেকে দু' দিনের মেয়াদে উদ্ধার পেয়ে সে যেন বন্ধনমুক্তির এক মহোল্লাস। আক্ষেপ এই যে, এত মনোরম এক বিরামস্থানেও কাজের বোঝা কাঁধে নিয়ে গিয়েছি দু'দুবার; কোনবারই হাত-পা ছড়িয়ে দু'দণ্ড বিশ্রাম করবার অবকাশ পাইনি। কিন্তু আমি না পেলেও অন্যে হয়ত



পেতে পারেন। তাঁরা যেন একবার এসে থেকে যান বংশীহারী ডাকবাংলোয়। ইলেকট্রিসিটি নেই; প্রাঙ্গণের টিউবওয়েলে জলের থেকে বালিই ওঠে বেশী। তবু নিমন্ত্রণ জানাতে আমার সংকোচ নেই। কেননা কাঞ্চনকুলীন 'অভিজাত' সম্প্রদায় বা নবনীতকোমল ইনটেলেকচুয়ালরা আমার লক্ষ্য নয়। কলকাতার দিক থেকে যাঁরা আসবেন তাঁরা কলকাতা-বালুরঘাট দৈনিক বাস-সার্ভিসে, কলকাতার শহীদ মিনারের কাছ থেকে ভোরবেলা রওনা হয়ে বিকেল নাগাদ বংশীহারী বাজারে পেঁছতে পারেন। বাজারের সিকি মাইলটাক আগে টাঙ্গন-এর উপর এক সেতু পার হয়ে আসতে হয়। সেখানকার চেক-পোস্টে বাস কিছুক্ষণ থামে। কন্ডাকটরকে বলে যদি সেখানেই নামতে পারেন, তবে পথের ডান পাশেই ডাকবাংলো; নয়ত বাজার থেকে এটুকু পথ হেঁটে বা সাইকেল-রিক্‌শায় আসা যায়। আসবার আগে রায়গঞ্জে অবস্থিত পি. ডবলিউ. ডি-র এক্‌জিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারের কাছ থেকে আগাম অনুমতি নেওয়া বাঞ্ছনীয়।

এই ডাকবাংলোকে কেন্দ্র ক'রে পশ্চিম দিনাজপুর জেলার দক্ষিণ অংশের বংশীহারী, গঙ্গারামপুর, কুশমণ্ডি ও ইটাহার থানার গ্রামাঞ্চলে ঘুরে বেড়িয়েছি দু'বার। এই এলাকায় বা জেলার অন্যত্র উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিক ইমারত এখন তেমন কিছু নেই, কিন্তু পাল-সেন যুগের যে অগণিত ভাস্কর্য গ্রামগ্রামান্তরে ছড়ানো আছে তার সংখ্যা এ ক'টি থানাতেই সম্ভবত সবচেয়ে বেশী। আর আছে তপন, বালুরঘাট ও কুমারগঞ্জ থানায় ও অপেক্ষাকৃত অল্প পরিমাণে, কালিয়াগঞ্জ, হেমতাবাদ ও রায়গঞ্জ থানায়। জেলার উত্তর অংশে গোটা ইসলামপুর মহকুমায় পুরাকীর্তির সংখ্যা নগণ্য।

আমাদের খবর ছিল, বংশীহারী ডাকবাংলোর অদূরে, টাঙ্গন-এর ভাটির দিকে, এক গাছতলায় নাকি পনের-কুড়িটি পাথরের মূর্তি জড়ো করে রাখা আছে। নদীর ধারের কোন লুপ্ত মন্দির থেকে সেগুলি সম্ভবত সংগৃহীত। এত বড় রত্নভাণ্ডারের সন্ধান সচরাচর পাওয়া যায় না। বংশীহারী পেঁছেই আমরা তার উদ্দেশে বার

হয়ে পড়লাম। ডাকবাংলোর সংলগ্ন দক্ষিণে একখণ্ড পতিত জমিতে উদ্বাস্তু শ্রীজিতেন্দ্রনাথ পাল বরিশাল জেলার ঝালকাঠি থেকে এসে বসবাস করছেন। তাঁর সংগ্রহে যে মূর্তিগুলি আছে, সে প্রসঙ্গে একটু পরেই আসছি; আগে তাঁর কুটিরের দক্ষিণে, এক ঢিবির উপর প্রাচীন এক মন্দিরের যে ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়, তার বর্ণনা দিয়ে নিই। ঢিবিটি বেশ বিস্তৃত ও আশপাশের জমি থেকে তার বর্তমান উচ্চতা দশ ফুটের কম নয়। সেখানে ইতস্তত-ছড়ানো বহু সাইজ-ক'রে কাটা পাথরের টুকরোর মধ্যে দরজার বাজুর অংশ, বিগ্রহের পাদপীঠ ও এক ভগ্ন যোনিপট্ট দেখে সন্দেহ থাকে না যে এখানে একদা এক পাথরের মন্দির ছিল। স্থানীয় অধিবাসীরা বলেন, আগে পাথরের টুকরোর সংখ্যা শুধু অনেক বেশীই ছিল না, বেশ কিছু অলংকৃত নিদর্শনও ছিল তাদের মধ্যে। ঢিবির পশ্চিম পাশ দিয়ে এখন এক গভীর নালার সৃষ্টি হয়েছে। তার ওপারে, একই ঢিবির বিস্তারের উপরে, অনুরূপ বহু পাথরের টুকরো ছাড়াও কষ্টিপাথরের দু'টি বড় কীর্তিমুখ দেখা যায়—তার একটি ক্ষয়িত কিন্তু অন্যটি ভাল অবস্থাতেই আছে। এরাও যে লুপ্ত মন্দিরটির অংশ এমন মনে করাই সঙ্গত। পশ্চিমবঙ্গে পাল-সেন আমলের অসংখ্য মূর্তি-ভাস্কর্য আবিষ্কৃত হলেও সে সময়ের খুব কম মন্দিরই উত্তরকালের জন্য রক্ষা পেয়েছে। সে সব অগণিত বিনষ্ট মন্দিরের মধ্যে এটিও একটি। কি গড়নের বা কোন্ বিগ্রহের উপাসনার জন্য এ দেবালয়টি নির্মিত হয়েছিল, সেকথা আজ আর সঠিকভাবে বলা সম্ভব নয়।

শ্রীজিতেন পাল মশায়ের বাড়ির পূবে, নদীর ঘাটের কাছে এক গাছতলায় যে একটি ক্ষয়িত উমা-মহেশ্বর ও আর কয়েকটি ভগ্ন মূর্তি আছে, তারা তেমন উল্লেখযোগ্য নয়, কিন্তু তাঁর গৃহে উপাসিত, অভগ্ন নারায়ণমূর্তিটির মতো সুন্দর বিগ্রহ ব্যক্তিগত সংগ্রহে কমই দেখা যায়। উচ্চতায় ৩১ ইঞ্চি ও প্রস্থে ১৫ ইঞ্চি, এ ভাস্কর্য-নিদর্শনটির কারিগরি দক্ষতা খুবই প্রশংসনীয়। পাল মশায় বলেন, মালদহ জেলার কালিয়াচক থানার এক দীঘির পঙ্কোদ্ধারের সময় এটি পাওয়া যায়। এ উক্তি কতদূর নির্ভুল বলা যায় না। কেননা, বংশীহারীর একাধিক গৃহস্থের ঘরে বেশ কয়েকটি বিষ্ণুমূর্তি এখনও রক্ষিত আছে। তাঁরা সকলেই সেগুলি পেয়েছেন লুপ্ত মন্দিরটির কাছাকাছি জায়গা থেকে। সেক্ষেত্রে, বহুদূরের কালিয়াচক থেকে পাল মশায় কেন যে এই গুরুভার বিগ্রহটি এতদূর বয়ে নিয়ে আসবেন তা সহজবোধ্য নয়।

ডাকবাংলোর সামনেই, টাঙ্গন-এর অপর পাড়ে, বংশীহারী থানা। সেতু পার হয়ে ডানহাতি ঢালু রাস্তায় নেমে গেলেই সেখানে পেঁছনো যায়। থানা কম্পাউন্ডের পিছনে (দক্ষিণে) কয়েকঘর গৃহস্থের বাস। তাঁদের মধ্যে শ্রীশান্তিময় সেনগুপ্ত, শ্রীবিনন্দ সরকার ও শ্রীভূষণচন্দ্র সরকারের সংগৃহীত বিষ্ণুমূর্তিগুলিও উল্লেখযোগ্য। প্রথমটির ভাস্কর্য-নৈপুণ্য খুবই উচ্চ শ্রেণীর। অন্যগুলি অত ভাল না হলেও, মন্দ নয়। এ সবগুলিই পাওয়া গেছে লুপ্ত মন্দিরটির কাছাকাছি নদীর ধার থেকে। শ্রীসেনগুপ্তের বাড়িতে ছোট একটি উমা-মহেশ্বর মূর্তিও আছে। এখন কিছুটা ক্ষয়িত ও শ্রীহীন হলেও এ নিদর্শনটি উল্লেখযোগ্য এইজন্য যে পাল-সেন যুগের হর-পার্বতী বা উমা-মহেশ্বর মূর্তি সে যুগের বিষ্ণুমূর্তির থেকে অনেক কম সংখ্যায় পাওয়া গিয়েছে। বংশীহারী গ্রামের বিভিন্ন স্থানে আরও কিছু কষ্টিপাথর ও বেলেপাথরের ভাস্কর্য দেখা যায়। কিন্তু সেগুলি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ নয় বলে, এবার কাছাকাছি গ্রাম সরলা-র প্রসঙ্গে আসতে পারি।

পিচ-রাস্তার উপর অবস্থিত এ অঞ্চলের সুপরিচিত গ্রাম দেহাবন্দ্ থেকে কাঁচা রাস্তায় প্রায় চার মাইল পূবে গেলে সেখানে পেঁছনো যায়। এখানকার পাশাপাশি

দু'টি বড় ঢিবি (তার একটিতে এক পাথরের মন্দিরের অনাবৃত অংশ দেখা যায়) ও অনেকগুলি উৎকৃষ্ট পাল-ভাস্কর্যের জন্য এ গ্রামের প্রত্নতাত্ত্বিক গুরুত্ব কম নয়। কিন্তু বর্তমান প্রবন্ধে সে বিষয়ে বি॰ ৃত আলোচনার অবকাশ না থাকায় শুধু একটি মূর্তির উল্লেখ করব, যা থেকে বোঝা যা॰ব পাল-সেন যুগের কত অপরূপ বিগ্রহ অনুপাসিত ও প্রায় অরক্ষিত অবস্থায় এখনও পশ্চিম দিনাজপুরের যত্রতত্র পড়ে রয়েছে। গ্রামের হাটতলার অদূরে ভুন্দা দেবশর্মার (রাজবংশী) বাড়িতে যে অপূর্ব লক্ষ্মী-নারায়ণ মূর্তিটি আছে আমি তার কথাই বলছি। এ বিগ্রহের বর্তমান মালিক সম্পূর্ণ নিরক্ষর এক খেত-মজুর। বছর কুড়ি আগে, স্থানীয় এক পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধারের সময় তিনি নাকি এটি পেয়েছিলেন। আমার পরিদর্শনের সময় উঠনের তুলসীতলায় এটিকে পড়ে থাকতে দেখি, যদিও পরিবারের লোকেরা বেশ জোরের সঙ্গেই বলেন, এটি নিত্য-উপাসিত ও তুলসীতলায় ওই অবস্থাতেই নাকি প্রত্যহ তাঁর পূজা হয়। উচ্চতায় ১৮ ইঞ্চি ও প্রস্থে ৯ ইঞ্চি এই বিরল ও সুন্দর ভাস্কর্যটি যে-কোনদিন চুরি হয়ে কলকাতার কালোবাজারে হাজির হতে পারে; ইতিমধ্যেই হয়েছে কিনা জানি না।

পথপ্রদর্শক বন্ধুটির সঙ্গে এসব ব্যক্তিগত সংগ্রহের কথা তুলতেই তিনি বললেন, সরলার মাইল চারেক দক্ষিণে, বংশীহারী থানার অন্তর্গত বৈরহাটা গ্রামের যতীশচন্দ্র শর্মা (দেশী ক্ষত্রিয়) ব্যক্তিগত সংগ্রহটি এ অঞ্চলে সম্ভবত সবচেয়ে মূল্যবান। একে-ওকে বিলিয়েও নাকি ডজনখানেক পাথরের উৎকৃষ্ট মূর্তি এখনও তাঁর হেপাজতে আছে। শর্মা মশায়ের বাড়িতে হাজির হতে আমি আর দেরী করিনি। তিনি সম্পন্ন গৃহস্থ, স্থানীয় অঞ্চল-প্রধান—বছর খানেক আগে অন্তত তা-ই ছিলেন। সব ক'টি মূর্তি তিনি দেখিয়েছিলেন কিনা জানি না—আমরা দেখতে পেয়েছিলাম, দু'টি ছোট বিষ্ণুমূর্তি, দু'টি অল্পাধিক ভগ্ন মাঝারি সাইজের সূর্যমূর্তি ও একটি অতি-বিরল দশভুজ, পঞ্চমুখ, নৃত্যরত ভৈরবমূর্তি। মোটামুটি অভগ্ন শেষোক্ত ভাস্কর্যটির পাদপীঠ ও পশ্চাদ্‌ফলক সমেত উচ্চতা ৪০ ইঞ্চি ও প্রস্থ ১৮ ইঞ্চি। কারিগরি নৈপুণ্যে এতই উচ্চ শ্রেণীর যে তার তুলনা মেলা ভার। মূর্তিটির মুখমণ্ডল ক্ষমাসুন্দর, প্রশান্ত হাসিতে উদ্ভাসিত। সর্বোচ্চ শ্রেণীর ভাস্করের বিরল প্রেরণা-প্রসূত এ মূর্তিটি পৃথিবীর যেকোন সংগ্রহশালার গৌরবের কারণ হতে পারে। শুধু তাই নয়, পাদপীঠে খোদাই-করা এক পংক্তির যে দীর্ঘ লিপিটি আছে তাতেও এর মূল্য বহুগুণে বর্ধিত হয়েছে। কলকাতার ইন্ডিয়ান মিউজিয়মের কর্তৃপক্ষকে আমি এই অতি-দুষ্প্রাপ্য পুরাবস্তুটির বিস্তৃত খবর দেওয়ায় তাঁরা এটি সংগ্রহ করে আমাকে জানিয়েছেন যে এত উৎকৃষ্ট আর কোন মূর্তি-ভাস্কর্য তাঁরা সম্প্রতিকালে সংগ্রহ করতে পারেননি। এতে আমি যারপরনাই খুশী হয়েছি। কেননা, অন্যথায় কোন ধনীর ব্যক্তিগত সংগ্রহে স্থানলাভ ক'রে এই অসামান্য শিল্পকীর্তিটি গবেষকদের অগোচরে দু'চারজন বন্ধুবান্ধবের অশিক্ষিত প্রশংসা আহরণ করত মাত্র অথবা কৌশলী কালোবাজারীদের হাত-ফেরত হয়ে বিদেশে পাড়ি দিত। মালিক শ্রীশর্মাও যে এটির গুরুত্ব কিছুই বুঝতেন না তার প্রমাণ তাঁর বাড়িতে ঢোকবার মুখে যে গোয়ালঘর তারই দেওয়ালে এটি হেলান দেওয়া ছিল। অথচ তুলনায় অনেক নিরেস বিষ্ণুমূর্তি-গুলিকে তিনি হয় তুলসীমঞ্চের গায়ে সিমেন্ট দিয়ে গেঁথে নিয়েছেন, নয় ঘরে তুলে রেখেছেন। এই দুষ্প্রাপ্য ভৈরবমূর্তিটির সামনের পূর্ণায়ত মুখমণ্ডলের দু'পাশে দু'টি করে প্রোফিল মুখ আছে; প্রতিটির উপরেই জটামুকুট। শায়িত অসুরের উপর দণ্ডায়মান মূর্তিটি স্থূলোদর। ডানহাতের প্রথমটিতে বুকের-কাছে-ধরা কপাল (ভিক্ষাপাত্র), তারপর, বামাবর্তে, দ্বিতীয়টিতে বরদমুদ্রা, তৃতীয়টিতে শক্তি, চতুর্থটিতে

বাণ ও পঞ্চমটিতে খড়্গ। বাঁ হাতের (উপর থেকে নীচে) প্রথমটিতে ঢাল, দ্বিতীয়টিতে, ধনু, তৃতীয়টিতে মনে হয় কোন মুদ্রা, চতুর্থটিতে সাপ ও পঞ্চমটিতে করোটিযুক্ত ত্রিশূল। কুণ্ডলীকৃত দাড়ি ও সূক্ষ্ম একজোড়া গোঁফও আছে। গলায় সর্পবেষ্টনী ও রত্নহার। প্রতি মণিবন্ধে গলায় ও ঊর্ধ্ববাহুতে বাজুবন্ধ। সব মিলিয়ে, এহেন অভিনব ও উৎকৃষ্ট ভাস্কর্য খুবই বিরল। পশ্চিম দিনাজপুর জেলার গ্রামে গ্রামে এরকম আরও কত মূর্তি যে আবিষ্কারের অপেক্ষায় পড়ে আছে তা কে বলবে! পুরাতত্ত্বের গবেষকরা যতদিন না সংগ্রহশালাগুলির বাইরে দৃষ্টিপাত করবার কষ্টস্বীকার করছেন, ততদিন সেগুলি হয়ত সাধারণের অগোচরেই থেকে যাবে।





সাহিত্য পরিষৎ সংগ্রহশালা : বিষ্ণুপুর

দেশ শুধু মানচিত্র নয়, বিস্তৃত এক ভূখণ্ডও নয়। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—"দেশ মানুষেরই সৃষ্টি। দেশ মৃন্ময় নয়, সে চিন্ময়। মানুষ যদি প্রকাশমান হয় তবেই দেশ প্রকাশিত।"

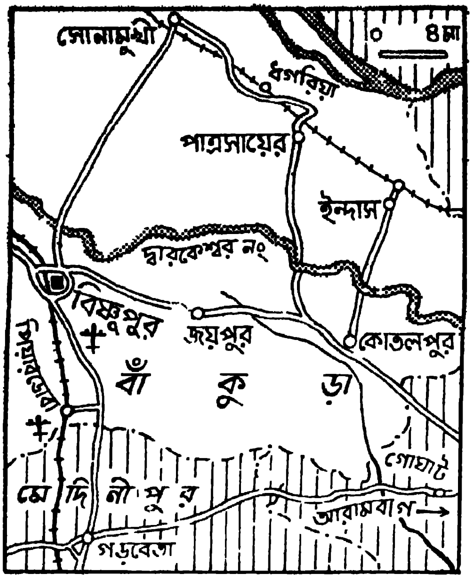
দেশদেশান্তরে মানুষের এই প্রকাশের ধারা যে কত বিচিত্র, কত ক্লান্তিহীন, কত ঐশ্বর্যময় তা ভাবলে অবাক হতে হয়। চিন্ময় বঙ্গের ক্ষেত্রেও দেখি তার শাশ্বত মনোময় রূপটি দূরকালব্যাপী নিরলস সাধনায় পুষ্ট। পরিসরের বিস্তৃতিতে, উপকরণের বৈচিত্র্যে ও সঞ্চয়ের অপরিমেয়তায় বঙ্গসংস্কৃতিনিকেতন যেন কুবেরের ধনভাণ্ডার। কাব্যে, সাহিত্যে, শিল্পে, সংগীতে সে কৃষ্টিসম্পদ দিকে দিকে পরিব্যাপ্ত। বাঙালীর পালপার্বণে, চারুকলায়, স্থাপত্য-ভাস্কর্যে, কুটিরশিল্পে, লোকাচারে, কিংবদন্তীতে, অশন-বসন-বূপসজ্জায়, তার গৃহস্থালীর কমনীয় মাধুর্যে তা বিধৃত। পটুয়ার চিত্রে, সূত্রধরের কারুকার্যে, বাউলের গানে, গ্রামীণ লোকনৃত্যে, পুরাণ পাঠকের কথকতায়, যাত্রাভিনেতার অভিনয়ে, কুলবধূর নকশী-কাঁথায়, পল্লীবালার আলপনায়—বাঙালীর চিরায়ত সংস্কৃতি বিচিত্র ধারায় প্রবাহিত। বাঙালীর বাঙালিয়ানা তার নিজস্ব খেলনা-পুতুলে, তার ছেলেভুলানো ছড়ায় যেমন অভিব্যক্ত তেমনি প্রকাশিত তার মঙ্গলকাব্যে, সুললিত বৈষ্ণব পদাবলীতে অথবা বিস্ময়কর রবীন্দ্রসাহিত্যে। দিগন্তবিস্তৃত এই সুবিশাল কৃষ্টিসম্পদ উভয় বাংলার গ্রামে নগরে যুগযুগান্তর ধরে অনুশীলিত হয়েছে, সংবর্ধিত হয়েছে। কিন্তু কালের প্রকোপে বা অন্য কারণে রক্ষিত হয়নি অনেক ক্ষেত্রে। জাতীয় ঐতিহ্যের নানাবিধ নিদর্শনের গুরুত্ব উপলব্ধি করে যেসব প্রতিষ্ঠান সে কৃষ্টিসম্পদের সংগ্রহ ও রক্ষণাবেক্ষণের ভার নিয়েছেন তাঁদের ভূমিকার যথেষ্ট প্রশংসা করা যায় কিনা সন্দেহ। সুখের কথা, পশ্চিমবঙ্গে এজাতীয় সংগ্রহশালা বেশ কয়েকটি আছে। সেজন্য, চিরায়ত বঙ্গসংস্কৃতি বিষয়ে কেউ যদি অল্পসময়ে মোটামুটি একটা জ্ঞান আহরণ করতে চান তবে তাঁর পক্ষে এসব গ্রামীণ মিউজিয়মগুলি পরিদর্শন করা অপরিহার্য। কলকাতার ভারতীয় জাদুঘর বা আশুতোষ মিউজিয়ম থেকে তারা অনেক ছোট হতে পারে, কিন্তু গ্রামীণ ঐতিহ্যের প্রতিফলনে ও কর্মীদের ঐকান্তিক নিষ্ঠায় তারা সমুজ্জ্বল। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের বিষ্ণুপুর শাখা বহুদিনের নিরলস সাধনায় যে উৎকৃষ্ট সংগ্রহশালাটি গড়ে তুলেছেন সেটিও এই একই আদর্শে অনুপ্রাণিত।

বাঁকুড়া জেলার মহকুমা-শহর বিষ্ণুপুরে ট্রেনে কিংবা বাসে যেভাবেই উপস্থিত হওয়া যাক না কেন, মল্ল-আমলের বিখ্যাত রাসমঞ্চ অথবা অতি-আধুনিক কালের

ট্যুরিস্ট লজের অদূরে অবস্থিত এ মিউজিয়ম ভবনে পেঁছিতে কারোই কোন অসুবিধা হবার কথা নয়। বাঁকুড়ার সুসন্তান আচার্য যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মহাশয় রাঢ় অঞ্চলের, বিশেষ করে বাঁকুড়া জেলার, সংস্কৃতিসম্পদ সংগ্রহ করবার জন্য এরকম একটি প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন সর্বপ্রথম উপলব্ধি করেন। কয়েকটি পুরাবস্তু দান করে তার পত্তনও করেন তিনি। কিন্তু সেই বীজকে আজকের মহীরুহে পরিণত করতে যিনি দীর্ঘকাল একাগ্র সাধনা করেছেন, তিনি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের বিষ্ণুপুর শাখার সম্পাদক শ্রীমাণিকলাল সিংহ। তাঁর মতো নিরলস, কষ্টসহিষ্ণু ও নিরভিমান 'ফিল্ড-ওয়ার্কার' আমি বেশী দেখিনি। প্রধানত তাঁর এবং আর কয়েকজন সহকর্মীর চেষ্টায় বিদ্যানিধি মহাশয়ের নামের সঙ্গে যুক্ত এই 'আচার্য যোগেশচন্দ্র পুরাকৃতি ভবনে' বাঁকুড়া ও রাঢ়ের চিরায়ত সংস্কৃতির পরিচায়ক এত অসংখ্য বস্তু সংগৃহীত হয়েছে যার তুলনা অন্য কোথাও পাওয়া সম্ভব নয়। ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দে আনুষ্ঠানিকভাবে এটির উদ্বোধন করেন কবিশেখর কালিদাস রায়। বিদ্যানিধি মহাশয় তখন জীবিত ছিলেন। তাঁর আশীর্বাদ নিয়ে প্রতিষ্ঠানটি যাত্রা শুরু করে। ১৯৫৪ সালে তাঁর অনুমতিক্রমে মিউ-জিয়মটির বর্তমান নামকরণ করা হয়।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের বিষ্ণুপুর শাখা আর 'আচার্য যোগেশচন্দ্র পুরাকৃতি ভবন' পরস্পরের পরিপূরক প্রতিষ্ঠান। দুটি একই গৃহে অবস্থিত এবং তাদের উদ্দেশ্য একই—বাঁকুড়া জেলা তথা রাঢ়ের প্রাচীন ইতিহাস, সংস্কৃতি ও সভ্যতার উপর আলোক-পাত করা। গত একুশ-বাইশ বছরের চেষ্টায় যে ভূরি পরিমাণ কৃষ্টিসম্পদ তাঁরা সংগ্রহ করেছেন, দুঃখের বিষয়, তা ভালভাবে প্রদর্শনের জন্য তাঁদের প্রয়োজনীয় স্থান নেই। ভবনটি দোতলা করবার পরিকল্পনা থাকলেও, অর্থাভাবে একতলাটি কোনরকমে সম্পূর্ণ হয়েছে মাত্র। তাও হয়ত হত না যদি স্থানীয় ভট্টাচার্য পরিবার দশ কাঠা জমি দান না করতেন, বিষ্ণুপুর কে. জি. ইঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যায়তনের জনৈক সহৃদয় অধ্যাপক ইমারত নির্মাণের যাবতীয় দায়িত্ব নিঃস্বার্থভাবে পালন না করতেন ও পরিষদের তাবৎ সভ্য বিনা পারিশ্রমিকে নানাভাবে সাহায্য না করতেন।

সংখ্যার দিক থেকে 'আচার্য যোগেশচন্দ্র পুরাকৃতি ভবনে' প্রাচীন পুস্তক-পুস্তিকা ও পুঁথিই প্রধান—প্রায় পাঁচ হাজার। আর কোন গ্রামীণ মিউজিয়মে এত বিশাল পুঁথি-সংগ্রহ আছে বলে আমার জানা নেই। সংস্কৃত, প্রাকৃত ও বাংলা—সব ভাষারই পুঁথিগুলি সাধারণত সাহিত্য, ন্যায়, দর্শন, পুরাণ, জ্যোতিষ ও আয়ুর্বেদসংক্রান্ত। এদের মধ্যে প্রায় ৪৫০ বৎসরের প্রাচীন, তারিখযুক্ত, একটি বিষ্ণুপুরাণের কপি খুবই উল্লেখযোগ্য। অন্যদিকে, বাংলা পুঁথিগুলির বিষয় প্রধানত রামায়ণ, মহাভারত, বৈষ্ণবকাব্য, মঙ্গলকাব্য, লৌকিক কাব্য, পালাগান ইত্যাদি। বাঁকুড়া জেলার গ্রামগ্রামান্তর থেকেই এদের অধিকাংশ সংগৃহীত। এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই এইজন্য যে মল্ল-আমলে বিষ্ণুপুর সাহিত্য, সঙ্গীত ও অন্যবিধ কৃষ্টিচর্চার প্রখ্যাত কেন্দ্র ছিল এবং সে বৈভবের পরিমণ্ডল শুধু রাজধানীতে সীমিত না থেকে পার্শ্ববর্তী অঞ্চলেও ছড়িয়ে পড়েছিল। আজ এ প্রতিষ্ঠানের বিরাট পুঁথিশালায় বসে যেকোন গবেষক ধারণা করতে পারবেন অতীতে কী সমৃদ্ধ সংস্কৃতিকেন্দ্র ছিল বিষ্ণুপুর ও তার নিকটবর্তী অঞ্চল। দীর্ঘকাল পরে সে নষ্ট সম্পত্তির অতি ক্ষুদ্র ভগ্নাংশমাত্র উদ্ধার করে 'যোগেশচন্দ্র পুরাকৃতি ভবনের' এত বড় পুঁথিশালা গড়ে উঠেছে। স্থানীয় দাশগুপ্ত পরিবারের প্রদত্ত সংস্কৃত সাহিত্য ও দর্শনের এক অমূল্য সংগ্রহ ও আর একজন শুভাকাঙ্ক্ষীর কাছ থেকে পাওয়া রবীন্দ্রসাহিত্যের বহু দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থও এ প্রসঙ্গে উল্লেখনীয়।



পাথর, পোড়ামাটি ও কাঠের মূর্তি, শিলালেখ, শীলমোহর, মৃৎপাত্র, আয়ুধ প্রভৃতির সংগ্রহটি খুব বড় না হলেও বিশেষ বৈচিত্র্যপূর্ণ। এই বিভাগে আছে নব্যপ্রস্তর যুগের বিবিধ হাতিয়ার, অতি প্রাচীন পোড়ামাটির বাসনকোসন, শীলমোহর, জৈন তীর্থংকরমূর্তি, মন্দির 'টেরাকোটা'র প্রচুর নিদর্শন, গুপ্ত-পালযুগ থেকে শুরু করে পরবর্তী কালের পাথরের সূর্যমূর্তি, অনন্তশয়ান বিষ্ণুমূর্তি, ত্রিমুখ দশভুজা দুর্গা, নটরাজ, উমা-মহেশ্বর, বিষ্ণুপট্ট, শিখর-দেউলের দু'টি ছোট নিখুঁত নিদর্শন ও গরুড়ধ্বজের উপরের গরুড়মূর্তি প্রভৃতি ও বহুসংখ্যক শিলালিপি। শেষোক্ত পুরাবস্তুগুলির নজিরে বাঁকুড়া জেলার অধুনালুপ্ত কয়েকটি মন্দিরের প্রতিষ্ঠাকাল নির্ণয় করা সম্ভব হয়েছে। এই বিভাগের সংগ্রহকার্যের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করতে পেরে আমি কৃতার্থ। এ গ্রন্থের অন্যত্র মুদ্রিত অনন্তশয্যায় শয়ান পাথরের বিষ্ণুমূর্তিটি আমি বাঁকুড়া জেলার জয়পুর থানার গোকুলনগর গ্রাম থেকে সংগ্রহ করে একদা এই মিউজিয়মে দান করেছিলাম। সকলেই জানেন, পাল-সেন যুগের শংখচক্রগদাপদ্মধারী বিষ্ণুমূর্তি যথেষ্ট আবিষ্কৃত হলেও অনন্তশয্যাশায়ী বাসুদেব-মূর্তি বেশী পাওয়া যায়নি। সেদিক থেকে, প্রায় সাড়ে-চার ফুট দীর্ঘ ও দু' ফুট উঁচু এই বৃহদাকার প্রস্তর-ভাস্কর্যটি খুবই উল্লেখযোগ্য।

'যোগেশচন্দ্র পুরাকৃতি ভবনের' প্রাচীন মুদ্রা-সংগ্রহটিও বেশ সমৃদ্ধ। মৌর্য, কুশান, গুপ্ত ও মুসলমান যুগের বিবিধ মুদ্রার অধিকাংশই বাঁকুড়া জেলার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে সংগৃহীত। প্রাপ্তিস্থান, বহুক্ষেত্রে, পুরাতন মন্দিরের সংলগ্ন তুলসী-মঞ্চ। মনে হয়, অতীত কালে, তুলসীমূলে অন্য অর্ঘ্য ছাড়া নগদ মুদ্রাও উৎসর্গ করা হত।

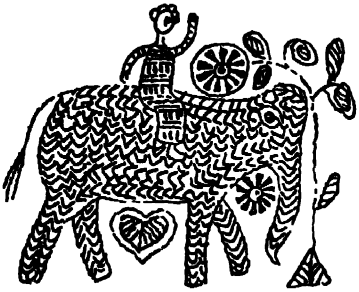
মধ্য-রাঢ়ের লোকশিল্পের বহু নিদর্শনও এই সংগ্রহশালায় স্থান পেয়েছে। ডোকরা-কামারদের তৈরি বিবিধ তৈজসপত্র, দেবদেবীমূর্তি ও 'লক্ষ্মী-সাজ'; বিষ্ণুপুর, হাটগ্রাম প্রভৃতি কেন্দ্রের বিখ্যাত শাঁখের কাজ; মাটি-খুঁড়ে-পাওয়া আদিবাসী রমণী-

দের প্রাচীন অলঙ্কার; বিষ্ণুপুরে প্রস্তুত রেশমবস্ত্রের ধারাবাহিক সংগ্রহ; পাঁচমুড়া, সোনামুখী প্রভৃতি গ্রামের মৃৎশিল্পের নিদর্শন; বাঁকুড়া জেলার পটুয়াদের আঁকা নানারকম পট; দু'তিন শ বছরের প্রাচীন বেশ কয়েকটি পুঁথির চিত্রিত 'পাটা'; বিভিন্ন প্রকারের দশাবতার তাস ইত্যাদি। স্থানীয় কুটিরশিল্পগুলির পুনরুজ্জীবন ও জনপ্রিয়তা অর্জনের ক্ষেত্রেও এ প্রতিষ্ঠান উল্লেখযোগ্য কাজ করেছেন। পাঁচমুড়ার মাটির হাতিঘোড়া ও বিষ্ণুপুরের দশাবতার তাস প্রভৃতি দিল্লী ও কলকাতার বিভিন্ন প্রদর্শনীতে পাঠিয়ে তাঁরাই সর্বপ্রথম সেসব গ্রামীণ শিল্পকে জনসাধারণের সামনে তুলে ধরেন। বাঁকুড়ার পোড়ামাটির ঘোড়া আজ শুধু অল-ইন্ডিয়া হ্যান্ডিক্র্যাফটস বোর্ডের প্রতীকচিহ্নই নয়, দেশে বিদেশে বিপুলভাবে সমাদৃতও বটে।

বাঁকুড়া জেলার অসংখ্য পুরাকীর্তির আলোকচিত্র-সংগ্রহটিও এ মিউজিয়মের গৌরবের বিষয়। সাধারণ লোকের ধারণা, এ জেলার যাবতীয় মন্দির বুঝি বিষ্ণুপুর শহরেই কেন্দ্রীভূত। কিন্তু উৎকর্ষ ও প্রাচীনত্বে অধিকতর মূল্যবান বহু মন্দির যে এ জেলার গ্রামগ্রামান্তরে ছড়ানো রয়েছে সেকথা দর্শনার্থীরা এই ফটোগুলি দেখলেই বুঝতে পারবেন।

'যোগেশচন্দ্র পুরাকৃতি ভবনেব' বিশাল সংগ্রহের কথাই এতক্ষণ বললাম। কিন্তু এগুলি শুধু সাজিয়ে রেখেই এ প্রতিষ্ঠান তাঁদের কর্তব্য শেষ করেননি। গত একুশ-বাইশ বছর ধরে সমস্ত জেলার পক্ষ থেকে যাবতীয় গুরুত্বপূর্ণ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের দায়িত্ব তাঁরাই বহন করে এসেছেন। বিষ্ণুপুরের সংগীত-ঐতিহ্য বঙ্গসংস্কৃতির অন্যতম প্রধান অঙ্গ। সে 'ঘরানা'র সুস্পষ্ট রূপনির্ণয়ের জন্য এই প্রতিষ্ঠান ও বিষ্ণুপুর সাহিত্য পরিষদ কিছুদিন আগে যৌথভাবে 'গোপেশ্বর স্মৃতি-বক্তৃতামালা'র ব্যবস্থা কবেছিলেন। স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ, শ্রীবীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, পণ্ডিত কৃষ্ণরতন-জনকার প্রভৃতি বিশেষজ্ঞদের রচিত সে বক্তৃতাগুলি এখন গ্রন্থাকারে প্রকাশের পথে। কয়েক মাস আগে বিষ্ণুপুর তথা পশ্চিমবঙ্গের প্রখ্যাত সংগীতশিল্পী রামপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্মশতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে যে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় তাতেও সমস্ত জেলার সঙ্গীতরসিকরা যোগদান করেন। এছাড়া, পুরাবস্তুদাতাদের ঋণ স্বীকার করবার জন্য প্রতি বৎসরই সমাবর্তন উৎসবের আয়োজন করে তাঁদের পদক বা প্রশংসা-পত্র দেওয়ারও ব্যবস্থা আছে। এসব অনুষ্ঠানে ডক্টর শশিভূষণ দাশগুপ্ত, ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ডক্টর সুকুমার সেন, অধ্যাপক নির্মলকুমার বসু প্রমুখ সুধীজন সভাপতিত্ব করেছেন।

এতক্ষণ 'যোগেশচন্দ্র পুরাকৃতি ভবন' ও বিষ্ণুপুর সাহিত্য পরিষদের বিচিত্র কার্যক্রমের যে বর্ণনা করলাম তা সহজেই জানা যায়, সহজেই চোখে পড়ে। কিন্তু এ সবের অন্তরালে যে প্রবল প্রাণশক্তি এ দু'টি প্রতিষ্ঠানকে সজীব রেখেছে তা কেবল অনুভবযোগ্য। আমার মতে, চারিদিকে প্রবহমান জীবনধারার সঙ্গে নিবিড় ও নিরন্তর সংযোগ রক্ষা করা যেকোন লোকসংস্কৃতিকেন্দ্রের প্রধান কর্তব্য। সে স্তন্যধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হলে তাঁদের স্বাস্থ্যহানি অবশ্যম্ভাবী। সুখের বিষয়, বিষ্ণুপুরের এ প্রতিষ্ঠান দু'টি বাঁকুড়ার জনজীবনের সঙ্গে অতি ঘনিষ্ঠ সংযোগ রেখে তাঁদের কাজ করে যাচ্ছেন। জেলার দূর পল্লীঅঞ্চলেও তাঁরা অপরিচিত নন, তাঁদের সংগ্রহভাণ্ডারে আরও দান করবার জন্য গ্রামবাসীরা সর্বদাই উদ্‌গ্রীব। এই যোগাযোগ ও সহমর্মিতা যদি অব্যাহত থাকে তাহলে রাঢ়ের বিবিধ কৃষ্টিসম্পদে 'যোগেশচন্দ্র পুরাকৃতি ভবন' যে অদূর ভবিষ্যতে কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে উঠবে তাতে আমার অন্তত কোন সন্দেহ নেই।



আনন্দনিকেতন কীর্তিশালা ঃ বাগনান

এখানে এখন ফুলের মেলা। আকাশে উড়ছে মুঠো মুঠো বোগেনভিলিয়ার আবির আর মাটির কাছাকাছি রাশি রাশি ডালিয়া, রঙ্গন, গোলাপের সমারোহ। ও দিকটায় সবুজ ঘাসে ঢাকা মাঠ। তার তিন দিক ঘিরে গাঁদা আর কসমসের কেয়ারি। অন্য দিকে এক সারি বন-ঝাউ। কাছেই টলটলে নীল জলের এক পুকুর—দক্ষিণ পবনে মৃদুশিহরিত। মহানগরের রৌরব থেকে পালিয়ে ঝাউ-এর এই শীতল ছায়ায় সবুজ ঘাসের ওপর চুপচাপ শুয়ে থেকেছি কতদিন। ঝকঝকে নীল আকাশে মেঘের শোভাযাত্রার দিকে তাকিয়ে, ঝাউ-বনে বাতাসের ঘুমপাড়ানি গান শুনতে শুনতে কতবাব চোখ বুজে এসেছে গভীর তৃপ্তিতে। বড় নয়নাভিরাম, বড় শ্রান্তিহর, বড় প্রীতিপ্রদ পরিবেশ।

বারো বছর আগে, এই একই জমিতে ছিল এক শ্মশান। কাছাকাছি গ্রামের লোকেরা সেখানে মরা গরুমহিষও ফেলে দিয়ে যেত। শকুনের পাল ছেঁড়াছিঁড়ি করে খেত সে সব লাশ। লোকালয় থেকে দূরে সেই ভাগাড়কে যাঁরা আজ শান্তিউদ্যানে পরিণত করেছেন, মনের সঞ্চয় তাঁদের যাই হোক, পার্থিব সম্পদ বড়ই অল্প। আদর্শের যে আগুন তখন তাঁদের মনে জ্বলছিল তা বাস্তবে রূপায়িত করতে অত্যল্প মূল্যে একখণ্ড জমির বিশেষ প্রয়োজন ছিল সে সময়ে। ভাগাড়, ভাগাড়ই সই। কারও কাছে হাত না পেতে তো পাওয়া যাবে সস্তায়। তেরো বছর আগে, ১৯৬০ খৃষ্টাব্দে, দুজন দৃঢ়চেতা মানুষ শক্ত পায়ে এসে দাঁড়ালেন এই শ্মশানে, এই ভাগাড়ে। অব্যবহিত পূর্বে এক রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সক্রিয় সংযোগের জীবন তখন তাঁদের কাছে শ্মশানে পরিণত হয়েছে। রাজনীতির প্রতি শ্রদ্ধা হারালেও সমাজসেবায় তাঁরা তখনও আস্থাশীল। তাঁদের অবিচল বিশ্বাস, গ্রামীণ সমাজে গণতন্ত্রকে সফল করতে হলে সামাজিক ও রাজনৈতিক নেতৃত্ব নীচু তলার মানুষের মধ্য থেকেই আসা উচিত। নির্বাচিত জমির এখানে-সেখানে আবিষ্কৃত অতীত কালের হাড়গোড় তাঁরা সে সময়ে অপসারণ করেছেন যেন এক প্রতীকের মতো, কেননা মনের আঙিনা থেকে বিগত দিনের মৃত ধ্যানধারণার কঙ্কালগুলো দূর করবার কাজও তখন তাঁদের চলছিল পুরোদমে।

প্রথম যেদিন শুনি পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার জনৈক সদস্য রাজনৈতিক মত-পার্থক্যের জন্য তাঁর দল ও এম. এল. এ. পদ একই দিনে ত্যাগ করেছেন তখন ব্যাপারটা খুবই অস্বাভাবিক মনে হয়েছিল। দলত্যাগটা সোজা; স্বার্থসিদ্ধির জন্য অনেকেই তা করেছেন। একবার নয়, কোন কোন ক্ষেত্রে একাধিক বার। কিন্তু ভাল ভাতা

ও মাইনের এবং বেশ কিছু ক্ষমতার উৎস এম. এল. এ-র পদ নীতির প্রশ্নে সহসা ছেড়ে দেওয়া শক্ত কাজ। তাও কিনা আবার স্বার্থের জন্য নয়, আদর্শের জন্য। এর বেশী খবর যখন পাইনি তখন মনে হয়েছিল ভদ্রলোক হয় প্রকৃত আদর্শবাদী নয় পাগল। ঠিক একথা তখন মাথায় আসেনি যে কিছু পরিমাণে পাগল না হলে আদর্শবাদী হওয়া যায় না।

তারপরে ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়েছে বাগনানের শ্রীঅমল গাঙ্গুলীর সঙ্গে। আদর্শ-বাদ ও পাগলামি দুই-ই তাঁর চরিত্রে বেশ বেশী পরিমাণে আছে একথা বলে আমি আমার অকপট ধারণা ব্যক্ত করছি মাত্র; তাঁকে হেয় করবার কোন অভিপ্রায় আমার নেই। রাজনীতির কলুষের দিকটাই শ্রীযুত গাঙ্গুলীকে পীড়িত করেছিল বেশী। সেজন্য সম্পূর্ণ ভিন্ন পথে, রবীন্দ্রনাথের আদর্শে, গ্রাম পুনর্গঠনের কাজে আত্ম-নিয়োগ করার আইডিয়াটা তাঁকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করে। প্রধানত তাঁরই প্রেরণা ও সংগঠনে এককালের এই শ্মশান-ভাগাড়ে ১৯৬০ খৃীষ্টাব্দের ৩০ সেপ্টেম্বর ছোট একটি দাতব্য চিকিৎসালয়ের দ্বারোদ্ঘাটন ক'রে যে সমাজসেবা প্রতিষ্ঠানের সূত্রপাত হয়, আজ প্রায় তেরো বছর পরে, তা নানাদিকে প্রসারিত হয়েছে। সাবেক ডিসপেন-সারিটি এখন আরও বড় হয়েছে। আর আছে, একটি হাইস্কুল, ছাত্রনিবাস, সাধারণ পাঠাগার ও লাইব্রেরী, মিউজিয়ম, সমাজশিক্ষা-সংস্থা ও মুরগিপালনকেন্দ্র। সমগ্র প্রতিষ্ঠানটির নাম 'আনন্দনিকেতন'। হাওড়া জেলার থানা-শহর বাগনানের দেড় মাইল পশ্চিমে, নবাসন গ্রামে, জাতীয় সড়কের সংলগ্ন এ প্রতিষ্ঠানে পৌঁছতে হলে দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথের হাওড়া-খড়্গপুর লাইনে হাওড়া থেকে প্রায় বত্রিশ মাইল দূরের ঘোড়াঘাটা স্টেশনে নেমে আর কয়েক মিনিটের পথ হেঁটে যেতে হয়।

নবাসন প্রধানত নমঃশূদ্রের গ্রাম। কাছাকাছি পল্লীগুলিতেও তপশীলী সম্প্রদায়ের বহু লোক বাস করেন। আমাদের সমাজে এঁরাই অবহেলিত হয়েছেন, পিছনে পড়ে থেকেছেন চিরকাল। আলোকবর্তিকা যদি কোথাও জ্বালতে হয় তবে তাঁদের মধ্যেই সর্বাগ্রে জ্বালানো দরকার। যাঁদের মানুষ বলে এতদিন কেউ মনেই করেনি, মনুষ্যত্বের শুভ্র আসনে তাঁদের সুপ্রতিষ্ঠিত করবার সাধনাই 'আনন্দনিকেতনের' লক্ষ্য। স্থান নির্বাচনে সেজন্য কোন ভুল হয়নি। সাধারণভাবে যাবতীয় পল্লীবাসীর ও বিশেষ করে এই অনুন্নতদের মধ্যে কাজ করবার আদর্শ, এ প্রতিষ্ঠানের উদ্বোধনী উৎসবে পঠিত সভাপতি ও সম্পাদকের ভাষণের কিছু অংশ উদ্ধৃত করলে আরও পরিস্ফুট হবে। সভাপতি মহাশয় বলেছিলেন—"রবীন্দ্র শতবর্ষপূর্তি বৎসরে ইহার শুভ আরম্ভ এবং মূলত রবীন্দ্রনাথের গ্রামোন্নয়নের চিন্তাধারাই ইহার প্রকৃষ্ট ভিত্তিভূমি। অবশ্য মহাত্মা গান্ধী ও স্বামী বিবেকানন্দের গঠনমূলক দৃষ্টিভঙ্গীও আমাদিগকে প্রভূত প্রেরণা দান করিয়াছে। আমরা বিশ্বাস করি, গ্রামীণ মানুষের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণেই দেশের সামগ্রিক কল্যাণ এবং এই কল্যাণ তখনই সম্ভবপর যখন প্রতিটি মানুষ পরিপূর্ণভাবে আত্মসচেতন হইয়া উঠিবে। এই গ্রামোন্নয়ন ও সমাজ-অনুশীলন কেন্দ্র প্রতিটি মানুষের মধ্যে ব্যক্তিত্ববোধ, মনুষ্যত্ববোধ এবং কল্যাণবোধ জাগাইবার সম্মিলিত পদক্ষেপ।" সম্পাদক শ্রীঅমল গাঙ্গুলী মহাশয় বলেছিলেন—"গ্রামের মানুষ নিজেদের কর্মশক্তির উপর বিশ্বাস অর্জন করুক, নিজেদের অর্থনীতি ও সমাজজীবনকে গড়ে তোলবার কাজে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করুক এবং গণতন্ত্রের মূলকথা, নীচু থেকে নেতৃত্ব সৃষ্টি হোক—এই কাজে সাহায্য করার ভূমিকাই হচ্ছে আনন্দনিকেতনের ভূমিকা।"

শুধু রোগ নিরাময় বা শিক্ষাবিস্তার প্রভৃতি জনকল্যাণের মামুলি দিকগুলির



(যদিও তাদের গুরুত্ব কম নয়) দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ না রেখে, এ প্রতিষ্ঠানেব কর্মীরা একটি গ্রামীণ সংগ্রহশালাকেও যে তাঁদের কর্মসূচীব অন্তর্গত করেছেন তা তাঁদের সর্বাঙ্গীণ জনসেবার আদর্শেরই পরিচায়ক। আমার বিবেচনায় এরকম একটি সুসংগঠিত ও পরিচ্ছন্ন লোকসংস্কৃতির মিউজিয়ম গ্রাম-বাংলায় আর আছে কিনা সন্দেহ। ভাবতে ভাল লাগে যে, প্রধানত একজন সৎ, নিরভিমান ও কঠোব পরিশ্রমী কর্মী শ্রীতারাপদ সাঁতরার দীর্ঘকালব্যাপী একাগ্র সাধনায বহুমুখী পল্লীসংস্কৃতিব পরিচয়জ্ঞাপক এ প্রতিষ্ঠানটি ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে। শ্রী সাঁতরা নবাসন গ্রামেব এক তপশীলী পরিবারের সন্তান। তাঁর সম্প্রদাযগত পরিচয় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য এই কারণে যে তথাকথিত তপশীলী 'জাতি'গুলিব আলোচনাপ্রসঙ্গে আমরা, বর্ণ-হিন্দুরা, সমাজে আমাদের শত শত বৎসবের প্রতিপত্তি ও অগ্রাধিকার এবং তাঁদেব নির্বাসনের কথাটা তুলনামূলকভাবে ভেবে দেখি না। সমাজ-আরোপিত অজস্র বাধা অতিক্রম করে তাঁদের কেউ যখন শিক্ষাগত ও মানসিক দিক থেকে বর্ণহিন্দু বুদ্ধি-জীবীদের সমকক্ষ হন তখন তাঁব কৃতিত্ব বহুগুণে বেশী। অপরিসীম দারিদ্র্যের মধ্যে ছাত্রজীবন অতিবাহিত করে মিউজিয়লজীর প্রথম শ্রেণীব ডিপ্লোমা পাওয়াটা শ্রী সাঁতরার ক্ষেত্রে গৌরবের হলেও, আমাব কাছে তাঁর বড় পরিচয় তিনি প্রকৃত বঙ্গসংস্কৃতিপ্রেমী। সে প্রেম তাঁকে লাইব্রেরীর আরাম-কেদারায় বসে ডক্টরেট হবার সহজ রাস্তায় নিয়ে যায়নি; নিয়ে গিয়েছে গ্রামগ্রামান্তরের রুক্ষ ধুলোর পথে যেখানে অর্থাভাবে নিছক পায়ে হেঁটে তিনি শত শত মাইল পরিভ্রমণ করেছেন তাঁর জন্মভূমিকে প্রত্যক্ষভাবে দেখবার ও চিনবার জন্য এবং তাঁর প্রাণের চেয়েও প্রিয় এ মিউজিয়মটির জন্য নানা জিনিস সংগ্রহ করবার কাজে। তাঁর মতো অথবা বিষ্ণুপুরের মানিকলাল সিংহ বা রাজবলহাটের ধীরেন্দ্রচন্দ্র মজুমদারের মতো লোকসংস্কৃতিপ্রেমীরা খবরের কাগজ বা পত্র-পত্রিকায় কীর্তিত হন না। যাঁরা হন, তাঁদের কথা সকলেই জানেন। তবু আমার স্থির বিশ্বাস, মুষ্টিমেয় হলেও, আজকের এসব সংগ্রাহকরাই খ্যাতির মোহে না পড়ে অশেষ পরিশ্রমে বঙ্গকৃষ্টির অমূল্য উপাদানগুলি সংগ্রহ করে রাখছেন যার ভিত্তিতে কোন-না-

কোন দিন বাঙালীর পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচিত হবে। আজকের এসব সামান্য মানুষের প্রকৃত মূল্য নিরূপণের জন্য যে স্তরে পেঁছনো দরকার, বঙ্গসমাজ যে নিশ্চয়ই একদিন সে পর্যায়ে উত্তীর্ণ হবে তাতে আমি নিঃসন্দেহ। এই সব আদর্শবাদী পুরোধাদের কথা আমি শুধু কিছুদিন আগে বলে গেলাম মাত্র।

আনন্দনিকেতন মিউজিয়মের 'কীর্তিশালা' নামটি প্রখ্যাত নৃতত্ত্ববিদ অধ্যাপক নির্মলকুমার বসুর দেওয়া। অতীত ও বর্তমানের মানুষ এবং তাদের বহুমুখী জীবন-যাত্রার কীর্তিচিহ্নগুলি যে ভবনে সংরক্ষিত থাকে তার নাম কীর্তিশালা হওয়াই সঙ্গত। আনন্দনিকেতনের উদ্বোধনের সময় প্রকাশিত স্মারক-পুস্তিকায় এ বিভাগের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বলা হয়েছে—"আমাদের দেশের পুরানো ইতিহাস ও পুরাবস্তু এবং বর্তমান লোকশিল্পের সঙ্গে পরিচিত করে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থাকে পূর্ণাঙ্গ ও পরিপূর্ণ করে গড়ে তোলাই এই বিভাগটির লক্ষ্য।" অন্যত্র বলা হয়েছে—"দেশগঠনের ক্ষেত্রে যদি আমাদের দেশের অতীত সমাজব্যবস্থার মৌলিকত্ব ভুলে যাই, আমাদের দেশের বহুযুগব্যাপী প্রবহমান অর্থনীতির ধারা উপেক্ষা করি, গ্রামীণ সমাজব্যবস্থার হাজার হাজার বছর ধরে গড়ে ওঠা কাঠামো লক্ষ্য না করি, ভারতবর্ষে অনুসৃত শাসন-পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য বিবেচনা না করি, তাহলে ভারতবর্ষকে প্রগতি ও উন্নয়নের পথে পরিচালিত করা অসম্ভব।" অতীতের সঙ্গে যোগসূত্র রক্ষা করে ভবিষ্যৎকে ঠিক পথে নিয়ে যাবার যে দেশব্যাপী আয়োজন এখন চলছে, আমাদের গ্রামীণ মিউজিয়মগুলি সে কর্মকাণ্ডের অবিচ্ছেদ্য অংশ। প্রাচীন সভ্যতায় মহান অথচ অধুনা অনগ্রসর ভারত-বর্ষের জনশিক্ষার ব্যাপক ও দ্রুত প্রসারের ক্ষেত্রে এই সংগ্রহশালাগুলির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। সেজন্য এজাতীয় প্রতিষ্ঠানের উত্তরোত্তর পোষণ ও পরিবর্ধন কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকারের শিক্ষা দপ্তরের অন্যতম প্রধান কর্তব্য হওয়া উচিত।

আনন্দনিকেতন কীর্তিশালার সংগ্রহের বিবরণ দেবার আগে এ প্রতিষ্ঠানের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কাজের কথা বলে নিই। পশ্চিমবাংলার অসংখ্য মন্দির, মসজিদ ও অন্যান্য পুরাকীর্তি অনাদরে অবহেলায় ইতিপূর্বেই লুপ্ত হয়েছে, বাকিগুলিও ধ্বংসের পথে। এদের সংরক্ষণের জন্য উল্লেখযোগ্য কোন ব্যবস্থাই যখন নেই, তখন একেবারে নিশ্চিহ্ন হবার আগে যতগুলির ছবি ও তথ্য সংগ্রহ করে রাখা যায় ততই ভাল। পোড়ামাটির কারুকার্যখচিত ইমারতগুলির ক্ষেত্রে এ কাজটি খুবই জরুরী, কেননা শেষ-মধ্যযুগে এই বিশেষ অলঙ্করণ পদ্ধতিটি কেবলমাত্র বঙ্গদেশেই ব্যবহৃত হয়েছে, ভারতবর্ষের আর কোথাও হয়নি। আনন্দনিকেতন কীর্তিশালার কিউরেটর শ্রীতারাপদ সাঁতরা এই কঠিন কাজটি হাতে নিয়ে বহুদূর অগ্রসর হয়েছেন। কার্ড-ক্যাটালগ পদ্ধতিতে পশ্চিমবঙ্গের পনেরটি জেলার প্রতিটি পুরাকীর্তি সম্পর্কে পৃথক কার্ডে সংক্ষেপে যাবতীয় তথ্য ও একটি ছোট আলোকচিত্র রাখা হচ্ছে। এ বিষয়ে তারাপদবাবু পরলোকগত ডেভিড ম্যাক্‌কাচ্চনের কাছ থেকে যথেষ্ট সাহায্য পেয়েছেন; আমিও এ প্রচেষ্টার সঙ্গে যুক্ত আছি। কাজটি বিরাট। তবু, পশ্চিম-বাংলার যাবতীয় উল্লেখযোগ্য পুরাকীর্তির অর্ধেকের বেশী এভাবে ইতিমধ্যেই নথিভুক্ত হয়েছে। সমস্ত প্রকল্পটি শেষ হতে আরও দু'তিন বছর লাগতে পারে। আনন্দনিকেতন কীর্তিশালার এই বিশদ তথ্যপঞ্জীটি পুরাতত্ত্বের সঙ্গে সম্পর্কিত যে-কোন সরকারী অথবা বেসরকারী দপ্তর বা প্রতিষ্ঠানের ঈর্ষার বস্তু হবার যোগ্য। অশেষ পরিশ্রমে আহৃত এ জ্ঞানভাণ্ডার যে ভবিষ্যৎ গবেষকদের কাছে মহামূল্য বলে বিবেচিত হবে তাতে সন্দেহ নেই।

এ মিউজিয়ম গত দশ-এগারো বছরে প্রায় আট হাজার পুরাবস্তু ও লোক-

শিল্পসামগ্রী সংগ্রহ করেছেন। তার অধিকাংশই যে দান হিসাবে প্রাপ্ত তা থেকে প্রমাণ হয়, জনসাধারণের সক্রিয় সহানুভূতি থেকে তাঁরা কখনো বঞ্চিত হননি। আমার মতে, বেসরকারী সংগ্রহশালাগুলির এটিই শ্রেষ্ঠ মূলধন। সরকারী সাহায্যও যে একেবারে পাওয়া যায়নি—তা নয়। কেন্দ্রীয় সরকার আসবাবপত্র কিনবার জন্য ৩,০০০ টাকা ও গৃহনির্মাণ বাবদ ২৩,৫০০ টাকা মঞ্জুর করেছেন। সম্প্রতি, প্রায় ৩২,২০০ টাকা ব্যয়ে যে মিউজিয়ম ভবনটি নির্মিত হয়েছে তার দ্বারোদ্ঘাটন করেছেন জাতীয় অধ্যাপক শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়।

সরকারী অনুদানের অপেক্ষা না রেখে আরও নানাবিধ কাজ যে তারাপদবাবু ও তাঁর সহকর্মীরা নিজেরাই করে নিয়েছেন, এ সংগ্রহশালায় এলে পদে পদে তার পরিচয় পাওয়া যায়। পোস্টার, ল্যাবেল, ডিসপ্লে-কার্ড, মাউণ্ট প্রভৃতি তৈরি করা থেকে শুরু করে যাবতীয় প্রদর্শিত সামগ্রী অতি সুশৃঙ্খলভাবে সাজানো ও তাদের ঝাড়পোঁছ কবা সবই তাঁরা বরাবর করে এসেছেন বিনা পারিশ্রমিকে, হাসিমুখে। তাঁদের এই প্রিয় প্রতিষ্ঠানটিকে সর্বসাধারণের কাছে জনশিক্ষার মাধ্যম হিসাবে তুলে ধরাই তাঁদের অভিপ্রায়। সেজন্য গ্রামগ্রামান্তর থেকে কৃষক বা গৃহস্থ ঘরের বউ-ঝিরা বহু-সংখ্যায় এখানে আসতে অসুবিধা বোধ করেন না। অন্যদিকে বিভিন্ন প্রদেশের বিশ্ববিদ্যালয় বা গবেষণা-প্রতিষ্ঠানগুলিকে তাঁরা সাধ্যমত সাহায্য করে থাকেন। বহু প্রত্নবস্তুর আলোকচিত্র পাঠিযে ইতিমধ্যেই কলকাতা, গৌহাটি, পাঞ্জাব, চণ্ডীগড় প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়কে ও কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটিকে তাঁরা সাহায্য করেছেন।

লোকশিল্প সংগ্রহের দিকেই আনন্দনিকেতন কীর্তিশালার ঝোঁক বেশী। সেজন্য পশ্চিমবঙ্গের সব জেলার মাটি বা কাঠের তৈরি রাশি রাশি খেলনা-পুতুল, পিতল ও কাঁসার কাজ, ডোকরা-শিল্পের বহু নিদর্শন এখানে সংগৃহীত হয়েছে। এই পর্যায়ে এক শ্রেণীর পোড়ামাটির তুলসীমঞ্চ এক উল্লেখযোগ্য সংযোজন যা অন্য মিউজিয়মে দেখা যায় না। সন্দেশ ও আমসত্ত্বের ছাঁচের সংগ্রহটিও বেশ সমৃদ্ধ। এগুলির নকশায় আলপনা ও বালুচর শাড়িতে ব্যবহৃত মোটিফের বেশ প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। লোকশিল্পের আর এক নিদর্শন—যশোহর, খুলনা এবং হাওড়া জেলার শ্যামপুর থানা থেকে সংগৃহীত কয়েকটি উৎকৃষ্ট নকশী-কাঁথা।

চিত্রকর-পটুয়াদের অঙ্কিত পটচিত্রের সংখ্যা বেশী নয়; মেদিনীপুর, বর্ধমান ও মুর্শিদাবাদ জেলা থেকে আনীত ১৪।১৫টি পটচিত্র এ সংগ্রহশালায় স্থান পেয়েছে। এই পর্যায়ে আঠারো শতকের বেশ কয়েকটি চিত্রিত পুঁথির পাটাও পড়ে। বাংলা পুঁথির সংখ্যা দেড় শ'র কিছু বেশী; সেগুলির পাঠোদ্ধারের কাজ চলছে।

পুরাতাত্ত্বিক বস্তু সংগ্রহের ক্ষেত্রে এ মিউজিয়মের কর্মীরা নিজেরাই অনুসন্ধান চালিয়ে হাওড়া জেলার হরিনারায়ণপুর থেকে পাল-সেন যুগের যেসব প্রত্ন-নিদর্শন আবিষ্কার করেছেন তা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তা ছাড়া মৌর্য যুগ থেকে শুরু করে পাল-সেন অবধি যুগের নানাবিধ মৃৎপাত্র, পোড়ামাটির মূর্তিকা ও ফলকও এখানে প্রদর্শিত হয়েছে। এই পর্যায়ে 'টেরাকোটা' মন্দিরের অলঙ্কৃত টালির বিস্তৃত সংগ্রহটিরও সপ্রশংস উল্লেখ করা যেতে পারে। সংখ্যায় বেশী না হলেও, মৌর্য-শুঙ্গ যুগের ও পরবর্তীকালীন মুঘল ও ব্রিটিশ আমলের অনেকগুলি মুদ্রাও এ মিউজিয়মে স্থান পেয়েছে।

পাথরের মূর্তি-সংগ্রহের মধ্যে আছে, পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্থান থেকে আহৃত দশম শতকের ক্ষুদ্র বিষ্ণুমূর্তি, জৈনমূর্তি ও দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতকের মহিষমর্দিনী,

উমা-মহেশ্বর ও তিন-চারটি ভগ্ন বিষ্ণুমূর্তি এবং বিষ্ণুপট্ট ও বিহার থেকে সংগৃহীত তিনটি বুদ্ধমূর্তি। এই পর্যায়ে হাওড়া জেলার দেউলপুর গ্রাম থেকে আনীত কাঠের বুদ্ধমূর্তিটি খুবই উল্লেখযোগ্য। ভাস্কর্যের ধরন ও রং প্রয়োগের রীতি থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় এটির উৎপত্তিস্থল দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার কোন দেশ। কিন্তু কি করে সেটি যে দেউলপুরে এল তা অজ্ঞাত। এই দুষ্প্রাপ্য মূর্তিটি সংগ্রহ করে আনন্দনিকেতন কীর্তিশালায় একদা দান করতে পেরেছিলাম বলে আমি কৃতার্থ।

ছাত্রসমাজকে সম্বোধন করে রবীন্দ্রনাথ একদা বলেছিলেন—"দেশের কাব্যে, গানে, ছড়ায়, প্রাচীন মন্দিরের ভগ্নাবশেষে, কীটদষ্ট পুঁথির জীর্ণ পত্রে, গ্রাম্য পার্বণে, ব্রতকথায়, পল্লীর কৃষি-কুটিরে...স্বদেশকে সন্ধান করিবার জন্য...দিনের পর দিন বিনা বেতনে, বিনা পুরস্কারে, খ্যাতিবিহীন কর্মে স্বদেশপ্রেমকে সার্থক করো।" কবিগুরুর এই আহ্বানে আনন্দনিকেতন কীর্তিশালার কর্মীদের মত সততার সঙ্গে খুব কম বাঙালীই আজ অবধি সাড়া দিয়েছেন।

অমূল্য প্রত্নশালা: রাজবলহাট

"বাঙালীর ইতিহাস নাই"—বঙ্কিমচন্দ্রের এ খেদোক্তি হয়ত চিরকাল সত্য থাকবে না। আজ হোক, কাল হোক, বাঙালীর সর্বাঙ্গীণ ইতিহাস নিশ্চয়ই লেখা হবে। সে মহৎ ও বিরাট কাজের উপকরণ সংগ্রহের এখনই সময়। আরও বেশী দেরী হয়ে গেলে সংগ্রহ করবার মত কোন উপাদানই আর অবশিষ্ট থাকবে না। ঘরকুণো, বুদ্ধিজীবী বাঙালীদের উভয় বাংলার গ্রাম-পরিক্রমায় উদ্বুদ্ধ করতে পারলে একটা মহৎ উদ্দেশ্য সাধিত হয় বলে আমার স্থির বিশ্বাস। এঁদের মধ্যে অল্পসংখ্যক পর্যবেক্ষকও যদি গ্রামগ্রামান্তরে ছড়ানো অপস্রিয়মাণ সাংস্কৃতিক উপাদানগুলি সংগ্রহ ক'রে আনেন, যাঁর যেমন ক্ষমতা সেই মতই যদি প্রবন্ধাদি লেখেন, তাহলে বেশ বড় একটা কাজের সূত্রপাত হয়। এভাবে বহুজনের প্রচেষ্টায় সংগৃহীত উপকরণের ভিত্তিতেই একদিন বাঙালী জাতির পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচিত হবে।

সুখের কথা, সংখ্যায় অল্প হলেও কিছু খাঁটি বঙ্গসংস্কৃতিপ্রেমী বহুদিন যাবৎ গ্রামাঞ্চল থেকে আমাদের কৃষ্টিসম্পদগুলি উদ্ধারের কাজে ব্রতী আছেন। তাঁরা সকলেই শিক্ষিত কিন্তু দরিদ্র। সামাজিক প্রতিপত্তি বলতে তাঁদের কিছুই নেই। কিন্তু এই সহায়সম্বলহীনতা তাঁরা বহুগুণে পূরণ ক'রে নিয়েছেন তাঁদের উচ্চ আদর্শবাদ ও নিরলস কর্মসাধনা দিয়ে। তাঁদের মহৎ প্রয়াস উচ্চ কণ্ঠে কীর্তিত হবার যোগ্য।

বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুরনিবাসী শ্রীমানিকলাল সিংহ এই বিরল গোষ্ঠীর একজন। জীবিকার ক্ষেত্রে তিনি সাধারণ স্কুল-শিক্ষক মাত্র। কিন্তু প্রায় একক প্রচেষ্টায় ও দীর্ঘকালের একাগ্র অধ্যবসায়ে বিষ্ণুপুর সাহিত্য পরিষৎ মিউজিয়মে বঙ্গসংস্কৃতি-নিদর্শনের যে বহুমূল্য ভাণ্ডারটি তিনি গড়ে তুলেছেন তা পশ্চিমবঙ্গের গৌরব। বাগনানের আনন্দনিকেতন কীর্তিশালার সংগঠক শ্রীতারাপদ সাঁতরাও এ প্রসঙ্গে এক উল্লেখযোগ্য নাম।

আর একজন ও তাঁর সৃষ্ট প্রতিষ্ঠানের কথা আজ বলব যেদিকে দেশবাসীর দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়া উচিত। কেননা আমার ধারণা, উভয় বাংলার মফঃস্বলে প্রায়-অজ্ঞাত যে কয়েকটি গ্রামীণ মিউজিয়ম এরকম সৎ কর্মীদের চেষ্টায় স্থাপিত হয়েছে, তাদের রকমারি সংগ্রহ বাঙালী জাতির পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনার জন্য কোন-না-কোন সময়ে যথেষ্ট কাজে লাগবে। আমি হুগলী জেলার রাজবলহাট গ্রামের (জাঙ্গিপাড়া থানা) 'অমূল্য প্রত্নশালা' ও তার প্রতিষ্ঠাতা ৺ধীরেন্দ্রনাথ মজুমদারের কথা বলছি। ধীরেনবাবুর শৈশব অতিবাহিত হয় বিহারের বিভিন্ন স্থানে যেখানে তাঁর বাবা চূন ইত্যাদির কারবারে লিপ্ত ছিলেন। কিন্তু সে ব্যাবসা পড়ে যাওয়ায়, রাজবলহাট থেকে তিন-চার মাইল দূরে,

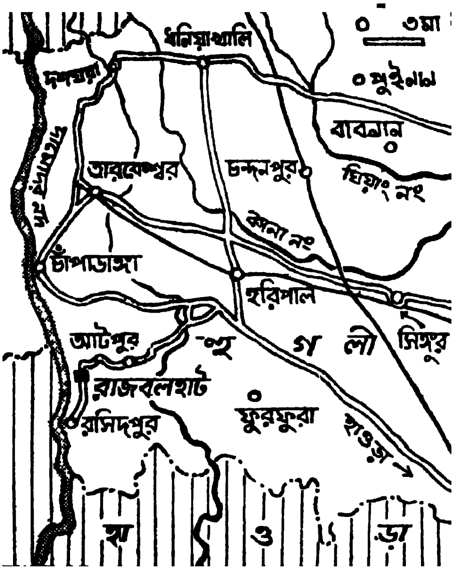
মার্টিন রেলের হাওয়াখানা স্টেশনের অদূরে, জয়রামপুর গ্রামে তাঁদের পৈতৃক বাড়িতে তাঁরা ফিরে আসেন। দারুণ দারিদ্র্যের জন্য, ধীরেনবাবু স্কুলের দশম শ্রেণীর বেশী পড়াশুনা করতে পারেননি। অর্থাভাবে লেখাপড়া স্থগিত রেখে তিনি যেকোন রকমের একটা জীবিকা গ্রহণ করতে বাধ্য হন এবং তাঁর প্রথম চাকুরি জোটে কলকাতার বিজ্ঞান কলেজ লাইব্রেরীর দপ্তরীর কাজ। তাঁর বিশ্বস্ততা ও কর্তব্যনিষ্ঠা দেখে স্বর্গীয় মেঘনাদ সাহা তাঁকে বসু বিজ্ঞান মন্দির গ্রন্থাগারের ক্যাটালগিং-এর ভার দেন।

মার্চ মাসে মৃত্যুকালে তিনি ছিলেন সাহা ইনস্‌টিটিউট অব নিউক্লিয়ার ফিজিক্স-এর ডেস্‌প্যাচ ক্লার্ক মাত্র। আপাতদৃষ্টিতে মুদ্রণের অযোগ্য এই সামান্য জীবনকাহিনী আমি পাঠকসমাজে পেশ করলাম এইজন্য যে সামাজিক কৌলীন্য বা পদমর্যাদার অভাব যে বঙ্গসংস্কৃতিসন্ধানের কিছুমাত্র অন্তরায় নয়, ধীরেনবাবু তার জাজ্বল্যমান প্রমাণ। প্রচলিত অর্থে তিনি অতি সাধারণ মানুষ হলেও অসাধারণ অধ্যবসায়ে সৃষ্ট তাঁর 'অমূল্য প্রত্নশালা'র পরিপ্রেক্ষিতে তিনি মহতো মহীয়ান্‌। প্রতিষ্ঠানটির বিবরণ থেকেই সেকথা প্রমাণিত হবে।

এক আকস্মিক ঘটনায় ধীরেনবাবুর দৃষ্টি পুরাবস্তু সংগ্রহের দিকে প্রথম আকৃষ্ট হয় শুনেছি। বিহারে থাকাকালীন তিনি নাকি একবার বুদ্ধগয়ার কাছে দু'তিন সের পুরনো মুদ্রা সস্তায় সের দরে খরিদ করেছিলেন। বিক্রেতা ধুলোমাখা সে ঐশ্বর্যের মূল্য কিছুই জানত না। এই মূল সংগ্রহ পরিবর্ধিত হয়ে এখন যে রূপ নিয়েছে তা পরে বলছি।

হাওড়া-তারকেশ্বর লাইনের হরিপাল স্টেশনে নেমে রসিদপুরগামী বাস ধরলে আঁটপুরের পরই রাজবলহাটে গিয়ে নামা যায়। রাজবলহাটের সংলগ্ন গ্রাম গুলিটা কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্মস্থান। তাঁর স্মৃতিরক্ষার জন্য ১৯২৪-২৫ খ্রীষ্টাব্দে রাজবলহাটে 'হেমচন্দ্র পাঠাগার'-এর প্রতিষ্ঠা হয়। ১৯৩৯ সালে, যুদ্ধের হিড়িকের সময়, স্বনামধন্য পণ্ডিত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় এ গ্রামে বাস করতে এসে স্থানীয় জনজীবনের সঙ্গে নিজেকে গভীরভাবে জড়িত ক'রে ফেলেন। সেজন্য 'হেমচন্দ্র পাঠাগারে'রই একাংশে, ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে, 'অমূল্য প্রত্নশালা' স্থাপিত হয়। এখনও তিন-কুঠরিযুক্ত এক একতলা দালানে এ দু'টি প্রতিষ্ঠান পাশাপাশি অবস্থিত ও একই কার্যনির্বাহক সমিতির হাতে তাদের পরিচালনার দায়িত্ব ন্যস্ত। শ্রীবিনয় ঘোষ মহাশয় তাঁর 'পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি' গ্রন্থে এই মিউজিয়মটি সম্বন্ধে লিখেছেন—"রাজবলহাটের 'অমূল্য প্রত্নশালা'টি একটি ভাল প্রতিষ্ঠান। সাধারণত গ্রামাঞ্চলে মিউজিয়ম প্রতিষ্ঠার এরকম উদ্‌যোগ দেখা যায় না। চেষ্টা করলে এই প্রত্নশালাটি দক্ষিণরাঢ়ের ঐতিহাসিক নিদর্শনাদির একটি ভাল সংগ্রহশালা হতে পারে।" দুঃখের বিষয়, বিনয়বাবু ছ'সাত লাইনের এক প্যারাগ্রাফে এ প্রতিষ্ঠানের বিবরণ শেষ করেছেন। তিনি যদি আর একটু বিস্তৃত-ভাবে লিখতেন তাহলে তাঁর ও আমার পরিদর্শনের অন্তর্বর্তী সতের-আঠারো বছরে এটির কতখানি অগ্রগতি হয়েছে তার একটা তুলনামূলক সমীক্ষা করা যেত। তবুও প্রায় দু'দশক আগে এটি যে এক উৎকৃষ্ট প্রতিষ্ঠান ছিল সে তথ্যটিও মূল্যবান।

রাজবলহাটের যাবতীয় জনহিতকর উদ্‌যোগের সঙ্গে জড়িত স্থানীয় ভড় পরিবার (বিশেষ ক'রে 'জহরলাল ভড় মহাশয়) হেমচন্দ্র পাঠাগার ও অমূল্য প্রত্নশালার বর্তমান ভবনটি নির্মাণ করিয়ে দিয়েছেন। 'দুলালের তাল মিছরী' ও অন্যান্য ব্যবসায়-সূত্রে ধনী হলেও তাঁরা কলকাতাপ্রবাসী হয়ে পৈতৃক গ্রামকে ভুলে যাননি। এখনও তাঁরা রাজবলহাটের উন্নতিমূলক বিবিধ প্রচেষ্টার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। 'অমূল্য



প্রত্নশালা'র প্রাণস্বরূপ ধীরেনবাবুকে তাঁরা শুধু উৎসাহই দেননি, গ্রামগ্রামান্তরে তাঁর সংগ্রহের কাজে আর্থিক ও অন্যবিধ সাহায্যও করেছেন। গত একত্রিশ বছরে এ প্রতিষ্ঠানটির কতখানি শ্রীবৃদ্ধি হয়েছে এবার তার খবর নেওয়া যাক।

লোকসংস্কৃতির বিবিধ উপাদান সংগ্রহ করা যাবতীয় গ্রামীণ সংগ্রহশালার মুখ্য উদ্দেশ্য হলেও তাদের সংগৃহীত সম্ভারের মধ্যে বেশ আপেক্ষিক তারতম্য দেখা যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ, ঠাকুরপুকুরের (২৪-পরগণা) গুরুসদয় মিউজিয়মের নকশী-কাঁথার সংগ্রহটি এতই সমৃদ্ধ যে ভূভারতে তার তুলনা মেলা ভার। সংখ্যা ও উৎকর্ষে তাঁদের জড়ানো-পটগুলিও খুবই উল্লেখযোগ্য। আবার বিষ্ণুপুরের (বাঁকুড়া জেলা) বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ ভবনে রক্ষিত পুঁথি-সংগ্রহটির মত মূল্যবান সঞ্চয় এজাতীয় মিউজিয়মে আর আছে কিনা সন্দেহ। বাগনানের (হাওড়া জেলা) আনন্দ-নিকেতন কীর্তিশালার গ্রাম্য খেলনা-পুতুলের নিদর্শনগুলিও খুবই বিশিষ্ট। তেমনি, বালুরঘাটের (পশ্চিম দিনাজপুর জেলা) কলেজ মিউজিয়ম ও জেলা গ্রন্থাগার মিউজিয়ম দু'টির প্রধান ঝোঁক পাথরের প্রাচীন মূর্তি-ভাস্কর্যের দিকে। দৃষ্টান্ত আরও বাড়ানো সম্ভব কিন্তু আমার বক্তব্য পরিস্ফুট করবাব জন্য তার আর প্রয়োজন নেই।

'অমূল্য প্রত্নশালা'র মুদ্রা-সংগ্রহটিই তার শ্রেষ্ঠ সম্পদ। এই বিভাগে কমবেশি পঁচিশটি পাঞ্চ্-মার্ক্ড মুদ্রা; কুশান যুগের আটটি মুদ্রা; ইলতুতমিস, শের শাহ, আকবর, শাহ আলম প্রভৃতির প্রায় শ'খানেক মুদ্রা ছাড়াও আরও বেশ কিছু প্রাচীন নিদর্শন নিয়ে ভারতীয় সংগ্রহটির মোট সংখ্যা হবে প্রায় তিন শ'র মত। এছাড়া ভারতবর্ষের দেশীয় রাজ্যগুলির ও পৃথিবীর প্রায় সব দেশের অপেক্ষাকৃত আধুনিক মুদ্রার সংখ্যা বারো শ'র কম নয়। এই গুরুত্বপূর্ণ সংগ্রহটি যে ধীরেনবাবুর প্রায় একক প্রচেষ্টার ফল সেকথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

পুরনো রথের কাঠের ভাস্কর্য ও তক্তার উপর আঁকা বহুবর্ণ চিত্রগুলিও এ মিউজিয়মের বিশিষ্ট সম্পদ। শেষ-মধ্যযুগের 'সূত্রধর' শিল্পীরা যখন কাঠের রথ তৈরি

করতেন তখন তার অঙ্গসজ্জার জন্য সমতল দেওয়ালের বহু স্থানে রঙিন ছবি এ'কে দেওয়াও যে তাঁদেরই দায়িত্ব ছিল, সেকথা হয়ত সুবিদিত নয়। 'অমূল্য প্রত্নশালা'য় রক্ষিত এজাতীয় ছ'সাতটি বড় বড় প্যানেলের অঙ্কনপটুত্ব এতই উচ্চ শ্রেণীর যে শুধু সেগুলি দেখবার জন্যই রাজবলহাট পরিদর্শন নিরর্থক নয়। তাদের বিষয়বস্তু রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্তি, বীণাবাদিকা, বেহালাবাদিকা প্রভৃতি। রাজবলহাটের সাত মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে, দামোদরতীরবর্তী পালিয়াড়া গ্রামের ছত্রেশ্বেরী দেবীর প্রাচীন রথ থেকে এগুলি সংগৃহীত। রঙের ঔজ্জ্বল্য এখন ম্লান হলেও এ নিদর্শনগুলি এক বিশিষ্ট শিল্পকর্মে বিগত যুগের বাঙালী কারিগরদের প্রভূত নৈপুণ্যের স্বাক্ষর বহন করে। রথে ব্যবহৃত কাঠের সারথী, পরী প্রভৃতির মূর্তিগুলি মন্দ নয়, তবে সেরকম শিল্পবস্তু অন্যত্রও দেখা যায়।

পূর্ববর্তী 'মন্দিরদ্বার' নিবন্ধে, কিছু কিছু প্রাচীন দেবালয়ের কাঠের দরজায় 'সূত্রধর' শিল্পীদের অপূর্ব খোদাই-কাজের প্রসঙ্গে হুগলী জেলার আরামবাগ থানার অন্তর্গত ভেলিয়া গ্রামের এক দেবালয়ের উল্লেখ করেছিলাম। সেখানকার কপাটের একটি পাল্লা এ সংগ্রহশালায় রক্ষিত আছে। (সরেজমিন অনুসন্ধানে জেনেছি, অপর পাল্লাটি চিরতরে লুপ্ত হয়েছে।) অলংকৃত মন্দিরদ্বারের এত ভাল দৃষ্টান্ত আমি আর দেখিনি। বিষ্ণু, কালী, মহিষমর্দিনী প্রভৃতি দেবদেবীর পৃথক প্যানেলগুলি আকারে ে শ বড—উচ্চতায় প্রায় বারো ইঞ্চি, প্রস্থে কমবেশি ন' ইঞ্চি। এগুলির কারিগরির সূক্ষ্মতা ও মুনশীয়ানারও তুলনা হয় না।

'অমূল্য প্রত্নশালা'র পাথরের মূর্তি-সংগ্রহটি বিশেষ সমৃদ্ধ না হলেও (ভাঙা নিদর্শনগুলি সমেত মোট সংখ্যা আট-দশটি), একটি ভগ্ন নবগ্রহশিলা সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। উচ্চতায় সাড়ে-তেরো ইঞ্চি ও প্রস্থে বারো ইঞ্চি, এ ভাস্কর্যটির কারিগরি দক্ষতা বিশেষ প্রশংসনীয়। হাওড়া শহরের সংলগ্ন দাসনগরের কাছে বাঁকড়া নামে যে গ্রাম আছে সেখানকার 'শেঠের পুকুর' খুঁড়বার সময় এটি পাওয়া যায়। বহু লুপ্ত ও ভগ্ন মন্দির থেকে আহৃত 'টেরাকোটা' টালির সংগ্রহটিও বেশ চিত্তাকর্ষক। নকশার মোটিফ থেকে বোঝা যায়, এদের অনেকগুলি খুব প্রাচীন দেবালয়ে ব্যবহৃত হয়েছিল। ডোকরা কামারদের তৈরি প্রায় পঞ্চাশটি শিল্প-নিদর্শনও বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। প্রাচীন পুঁথিব সংখ্যা প্রায় ত্রিশ। অবিলম্বে তাদের পাঠোদ্ধার হওয়া প্রয়োজন। বিশ্বভারতী বা বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে অগ্রণী হলে ভাল হয়। এছাড়া, নানা রকমের পুতুল, জড়ানো-পট, লক্ষ্মীসরা প্রভৃতি লোকশিল্পের নমুনাও কিছু কিছু আছে। পুরনো বই-এর সংগ্রহটিও মন্দ নয়।

বিশিষ্ট ব্যক্তিদের ডায়েরি, চিঠি, হাতের লেখার নিদর্শনগুলিও অভিনিবেশযোগ্য। এই বিভাগে আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর দিনলিপি ও হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রবীন্দ্রনাথ, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, নেতাজী সুভাষচন্দ্র, পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু, আইনস্টাইন, নলিনীকান্ত ভট্টশালী ও মহারাজা মনীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর চিঠিপত্র ও হস্তাক্ষর রক্ষিত আছে।

মাত্র একজন বঙ্গসংস্কৃতিপ্রেমী ও তাঁর দু'চার জন সহযোগীর দীর্ঘদিনের প্রচেষ্টায় এ প্রতিষ্ঠানটি গড়ে উঠেছে। সরকারী ও বেসরকারী সূত্র থেকে আশানুরূপ সাহায্য না পেলেও তাঁরা নিরুদ্দাম হননি। আরও অর্থসাহায্য পেলে ভাল, না পেলেও ক্ষতি নেই। কেননা দারুণ অনটনের মধ্যেও তো তাঁরা গত একত্রিশটি বছর কাটিয়ে এসেছেন। কিন্তু যাঁদের সংস্কৃতিনিদর্শনগুলি সংগ্রহ ও রক্ষা করবার জন্য তাঁরা এতদিন পরিশ্রম করলেন, সেই দেশবাসীর সদিচ্ছা ও সহানুভূতি থেকে তাঁরা যেন বঞ্চিত না হন। এ প্রবন্ধ রচনার সেটাই কৈফিয়ত।



সরকারী শিল্প-বাণিজ্য সংগ্রহশালা

বর্তমান প্রবন্ধমালায় পাঠকের দৃষ্টি পল্লীঅঞ্চলের দিকে ফেরানোই আমার অভিপ্রায়। রচনাগুলি সেজন্য গ্রাম-বাংলার কিছু-না-কিছুর উপর ভিত্তি করেই লেখা। এ ভাণ্ডারের শেষ আছে বলে আমার মনে হয় না। আমার স্থির বিশ্বাস, মন যাঁদের বাধাবন্ধহীন, তাঁদের অভিনিবেশ আকৃষ্ট করবার মত চিত্তাকর্ষক জিনিসের কিছুমাত্র অভাব নেই দুই বাংলার গ্রামগুলিতে। কলকাতায় চেয়ার আলো করে যেসব তাত্ত্বিক গ্রামীণ বিষয়ের উপর আকছার আলোকপাত করছেন, তাঁদের লীলা ও কৌশল কোনটাই আয়ত্তে না থাকায় বোকার মতো হাটে-মাঠে বেশ কিছু ঘুরে বেড়িয়েছি সত্য। কিন্তু তার পরিমাণ প্রয়োজনের তুলনায় যে কত কম সেকথা আমার চেয়ে বেশী আর কে জানে! সে সীমিত পরিভ্রমণ, নিউটনের মতো আমার এ প্রতীতিই শুধু দৃঢ় করেছে যে অনাবিষ্কৃত অংশের পরিসর মহাসমুদ্রের মতোই সীমাহীন, যা অতিক্রম করতে যেকোন কৌতূহলী জিজ্ঞাসুর জন্মজন্মান্তর কেটে যেতে পারে।

গ্রাম-বাংলার সে অফুরন্ত ভাণ্ডার ছেড়ে কেন যে আজ কলকাতার এক সংগ্রহ-শালার বিবরণ দিতে বসেছি তার একটু কৈফিয়ত আছে। কলকাতা বা অন্য শহরে অবস্থিত হলেই যে একটি মিউজিয়মের গ্রামীণ সংস্কৃতির সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন হবে এমন কোন কথা নেই। বরং উলটোটা হওয়াই সম্ভব। কেননা তাবৎ শহুরে মিউজিয়মের প্রধান সংগ্রহ পল্লীঅঞ্চল থেকেই আহৃত। দৃষ্টান্তস্বরূপ, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের পুঁথিশালা ও আশুতোষ মিউজিয়মের লোকসংস্কৃতির বিশাল সংগ্রহের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। শহুরে মিউজিয়মে রক্ষিত পাথর, ধাতু, কাঠ বা পোড়ামাটির অধিকাংশ মূর্তিও পাওয়া গেছে গ্রামগ্রামান্তর থেকে।

আমাদের পল্লীজীবনকে ভালভাবে জানতে হলে, তার বহুমুখী বিকাশের যেসব নিদর্শন এজাতীয় শহুরে মিউজিয়মে রক্ষিত, তাও দেখা বিশেষ প্রয়োজন। গ্রামীণ সংস্কৃতিপ্রবাহে ডুব দিতে হলে অবশ্যই গ্রামে যাওয়া দরকার, কিন্তু সে স্রোতোবাহিত নিদর্শনগুলি দেখবার জন্যে যেখানেই তারা সঞ্চিত থাকুক না কেন, সেখানেই যাওয়াটা আবশ্যিক।

৪৫নং গণেশচন্দ্র এভিনিউয়ের তিনতলায় অবস্থিত পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিল্প-বাণিজ্য সংগ্রহশালা এরকমই একটি প্রতিষ্ঠান। অবিভক্ত বঙ্গদেশের সমস্ত অঞ্চলের বড়, মাঝারি, ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্পের নানাবিধ নমুনা সংগ্রহ করে ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে যখন এটির পত্তন হয় তখন এজাতীয় সংস্থা ভারতবর্ষের অন্য কোন প্রদেশে ছিল না। তৎকালীন অর্থমন্ত্রী শ্রীনলিনীরঞ্জন সরকার তাঁর উদ্বোধনী ভাষণে

বলেছিলেন—"১৯২৮-২৯ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতায় অনুষ্ঠিত কংগ্রেস প্রদর্শনীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের সময় এরকম একটা শিল্পসংগ্রহশালা স্থাপনের কথা প্রথম আমার মনে আসে।...সে প্রদর্শনী সংগঠন করবার সময় আমি ভালভাবেই বুঝতে পারি, স্থায়ী কোন প্রতিষ্ঠানে আমাদের ছোট-বড় নানা শিল্পের এবং কারুকলা ও হস্তশিল্পের উৎকৃষ্ট নিদর্শনগুলি সংগৃহীত হওয়া উচিত, যাতে সে কেন্দ্র থেকে উৎপাদক ও ক্রেতা সকলেই খবরাখবর, উপদেশ-নির্দেশ ও অনুপ্রেরণা পেতে পারেন। ১৯০৫-০৬ খ্রীষ্টাব্দের স্বদেশী আন্দোলন এই প্রদেশে শিল্পের পত্তন ও প্রসারের ক্ষেত্রে প্রচুর উদ্দীপনার সৃষ্টি করেছিল সত্য, কিন্তু অভিজ্ঞতার অভাবে ও অন্যান্য কারণে সে আবেগ বিশেষ ফলপ্রসূ হয়নি। কিন্তু সেসব ব্যর্থতা একেবারে বিফলে গিয়েছে, এমন কথাও বলা যায় না। কেননা, তা থেকেই আমরা আমাদের দৈন্য ও অসুবিধার কথা বুঝতে শিখি। সেজন্য, অবাধগতিতে না হলেও, স্বদেশী যুগ থেকে আমাদের শিল্পপ্রচেষ্টায় মোটামুটি একটা অগ্রগতিই সূচিত হয়েছে, যার ফলে এই প্রদেশে এখন বেশ কিছু বৃহৎ ও ক্ষুদ্র শিল্পের পত্তন হয়েছে।...সেসব শিল্প ও গ্রামীণ কারুকলার অগ্রগতি ও সাফল্যের কাহিনী এরকম কোন কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানে সংগৃহীত হওয়া উচিত, যেখান থেকে দেশী ও বিদেশী বাজারের খবরাখবরই শুধু পাওয়া যাবে না, উৎপাদক ও ক্রেতা ছাড়াও সকলের জনাই সে সংস্থা একটি স্থায়ী শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান-রূপে গড়ে উঠবে। আমাদের যাবতীয় শিল্প, বিশেষ করে পল্লীঅঞ্চলের হস্তশিল্প ও কুটিরশিল্পগুলির যথার্থ উন্নতি এভাবেই সূচিত হতে পারে।"

বলা বাহুল্য, এই আদর্শ পূরণের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিল্প-বাণিজ্য সংগ্রহ-শালায় শুধু নানাবিধ বস্তু-নিদর্শনের সমাবেশই হয়নি, কোথায় কোন্ শিল্পের কতখানি অগ্রগতি হয়েছে, এ প্রতিষ্ঠান তার হালফিল খবর রাখেন, উৎপাদিত পণ্যের দেশী ও বিদেশী বাজারে কাটতির সম্ভাবনার কথা জিজ্ঞাসু সবাইকে জানান ও সাধারণভাবে দেশবাসীকে শিল্প-বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি বিষয়ে সচেতন করবার চেষ্টা করেন। এজন্য, আর পাঁচটা মিউজিয়মের মতো এখানে যেমন প্রদর্শনীকক্ষ আছে, তেমনই আছে এক তথ্য-প্রচার বিভাগ এবং পাঠগৃহসমেত এক গ্রন্থাগার ও ভ্রাম্যমাণ প্রদর্শনীর এক পৃথক শাখা।

উভয় বাংলার লোকসংস্কৃতিবিষয়ক নিদর্শনগুলিই আমাদের প্রধান আলোচ্য বিষয় ব'লে, প্রথমে অন্যান্য বিভাগের সংক্ষেপে উল্লেখ ক'রে পরে মূল বিষয়ে ফিরে আসব। তথ্য-প্রচার বিভাগ রাজ্যের যাবতীয় শিল্প-বাণিজ্য সম্বন্ধে শুধু খবরাখবরই রাখেন না, সে সম্বন্ধে যে যেখান থেকেই প্রশ্ন করুক না কেন, তার যথাযথ উত্তরও দিয়ে থাকেন। লাইব্রেরীটি খুব বড় না হলেও, সেখানে প্রয়োজনীয় বই-এর কোন অভাব নেই। দৈনিক ও সাময়িক পত্রিকাও রাখা হয় যথেষ্ট সংখ্যায় এবং পাঠকরা সেগুলি বিনামূল্যে পড়তে পারেন। ভ্রাম্যমাণ প্রদর্শনী শাখাটির কাজ গ্রামগ্রামান্তরে কুটির-শিল্প ও চারুশিল্পের প্রদর্শনীর আয়োজন করা, যাতে গ্রামীণ কারিগররা বিভিন্ন দিকে আধুনিক অগ্রগতির সঙ্গে পরিচিত হয়ে নিজেদের উন্নতি করতে পারেন। সিনেমা দেখানোর ব্যবস্থা থাকায় এই বিভাগের প্রচার সাধারণত খুবই ফলপ্রসূ হয়ে থাকে।

লোকসংস্কৃতির নিদর্শনগুলির বেলায় সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কথা হল, দেশ-বিভাগের সাত-আট বছর আগে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার দরুন এ সংগ্রহশালায় পূর্ববঙ্গের সম্ভারও বেশ কিছু স্থান পেয়েছে, যা পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য মিউজিয়মে বড় একটা দেখা যায় না। প্রদর্শনীকক্ষের গ্যালারীগুলি বিভিন্ন অংশে বিভক্ত, যথা—যন্ত্রপাতি, খেলনা-পুতুল, বস্ত্র, কুটির ও হস্তশিল্প, নানাবিধ মডেল, বাণিজ্যিক পণ্যের নমুনা

এবং দেওয়ালে টাঙানো তথ্য-লিপি ও প্রাচীরপত্র। এ প্রতিষ্ঠানকে সংগ্রহ ও তথ্য-বিতরণ দুই কাজই করতে হয় ব'লে এত বিস্তৃত ব্যবস্থা করতে হয়েছে। তবে বর্তমান সমীক্ষার প্রয়োজনে আমরা শুধু দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ বিভাগগুলির আলোচনা করতে পারি।

প্রথমেই ধরুন খেলনা-পুতুলের কথা। লোকশিল্পের এ মাধ্যমটি যে কতদিনের প্রাচীন তা এখনও সঠিকভাবে নির্ণীত হয়নি। প্রাগৈতিহাসিক কালে তৈরী পোড়ামাটির বিবিধ শিল্পসম্ভার বহু জায়গায় আবিষ্কৃত হয়েছে। সে পুরাতন ঐতিহ্যের ধারাটি নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রবাহিত হয়ে এসেছে আধুনিক কাল অবধি। এই দীর্ঘ দিনের বিবর্তনে উপাদান, বিষয়বস্তু, কারিগরি দক্ষতা সবই ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হয়েছে। ফলে, সাবেক পোড়ামাটির পাশাপাশি কাঠ, ধাতু, গালা, ন্যাকড়া, কাগজের মণ্ড প্রভৃতির অজস্র মডেলের আবির্ভাব ঘটেছে বিভিন্ন কেন্দ্রে। সেসব কেন্দ্রের ইতিহাস ও কারিগরি 'ঘরানা'র ইতিবৃত্ত যেকোন গবেষকের পক্ষে খুবই কৌতূহলোদ্দীপক। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত নানান উপকরণে তৈরী যেসব খেলনা-পুতুল এ মিউজিয়মে স্থান পেয়েছে তার তুল্য বৃহৎ সংগ্রহ অন্যত্র বড় একটা দেখা যায় না। এর প্রধান কারণ, সরকারী সংগ্রাহকরা সব জেলাতেই ছড়ানো রয়েছেন। সরকারী প্রচেষ্টায় প্রায়ই যেসব প্রদর্শনী বা প্রতিযোগিতা হয়, সেখানে প্রদর্শিত শিল্পসম্ভারও তাঁরা সরাসরি কিনে নিতে পাবেন। বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলি থেকে তাঁদের অর্থবলও বেশী। এ প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তারা আমাকে যে ছাপানো তথ্য-পুস্তিকাটি দিয়েছেন, কিছুদিনের পুরনো হলেও তা থেকে দেখতে পাচ্ছি—মেদিনীপুর জেলার নাড়াজোল, ২৪-পরগনার জয়নগর, বীরভূম জেলাব রাজনগর, বাঁকুড়া জেলার পাঁচমুড়া, মুর্শিদাবাদ জেলার কাঠালিয়া, নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগর, হুগলি জেলার উত্তরপাড়া ও মালদহ জেলার হরিশ্চন্দ্রপুর প্রভৃতি কেন্দ্রের নানারকম মাটির পুতুল এখানে সংগৃহীত হয়েছে। তাছাড়া, শান্তিনিকেতন ও কলকাতাব ন্যাকড়ার পুতুল, পুরুলিয়া ও শ্রীরামপুবেব কাগজের মণ্ড দিয়ে তৈরী এজাতীয় শিল্পসম্ভার, বর্ধমান জেলার নতুনগ্রামের কাঠের পুতুল এবং শান্তিনিকেতন ও অন্যান্য কেন্দ্রের গালার পুতুল ও ফলফলারি এ মিউজিয়মে স্থান পেয়েছে। বলা বাহুল্য, লোকায়ত বা আধুনিক ধাঁচের নিদর্শনের মধ্যে কোন পার্থক্য করা হয়নি। যে কেন্দ্রের যেটি বৈশিষ্ট্য তা প্রতিফলিত করবার জন্য সবরকম খেলনা-পুতুলই সংগ্রহ করা হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গ শিল্প অধিকারের প্রযত্নে আমাদের কুটিরশিল্পগুলির উন্নতির কাজ কিভাবে চলছে, সেকথা 'হস্তশিল্প-কেন্দ্রঃ বারুইপুর' প্রবন্ধে কিছু বলেছি। সে প্রকল্প অনুযায়ী গ্রামীণ শিল্পীরা বহু কেন্দ্রে নতুন উপাদান ও নমুনা নিয়ে পরীক্ষানিরীক্ষা করছেন। উদ্দেশ্য, আধুনিক রুচিব সঙ্গে সঙ্গতি রেখে কুটিরশিল্পগুলিকে বাঁচানো। এভাবে যেসব শিল্পসম্ভারের সৃষ্টি হচ্ছে, তার বেশ ভাল দৃষ্টান্ত দেখা যাবে এ পুস্তকের অন্যত্র মুদ্রিত দুর্গা-'মুখোশে'র ছবিটি থেকে। কাগজের মণ্ড বা ওই জাতীয় হালকা উপাদানে তৈরী দুর্গার 'মুখোশ'টি অনেকেরই ভাল লাগবার কথা, কেননা এখানে সাবেক ও আধুনিক রীতির অতি সুন্দর সংমিশ্রণ ঘটেছে। এই বিশেষ ধরনের কারুকৃতিটি বহু ভদ্র পরিবারের ড্রয়িংরুমে দেওয়ালসজ্জা হিসেবে ব্যবহৃত হতে দেখেছি। আধুনিক রুচির সঙ্গে তাল রেখে চলতে পারলে গ্রামীণ শিল্পীরা যে সহজে বিক্রয়যোগ্য নানা সম্ভার প্রস্তুত করতে পারেন, এটি তার প্রকৃষ্ট নিদর্শন। অন্য ছবিটি প্রাচীন এক বালুচর শাড়ির আঁচলার। অনুরূপ ডিজাইন অনুসরণ করে দু'একটি কেন্দ্রে এখন আবার বালুচর শাড়ি বোনা হচ্ছে। সরকারী শিল্প-বাণিজ্য সংগ্রহশালার অন্যতম কাজই হল দুঃস্থ কুটির-

শিল্পীদের কাছে এভাবে নতুন দিগন্ত খুলে দেওয়া। সে কাজের দায়িত্ব তাঁরা যে ভালভাবেই পালন করছেন তা প্রমাণ করবার জন্য আরও কয়েক প্রকারের ছবি ব্যবহার করতে পারলে খুশী হতাম। কিন্তু স্থানাভাবে তা সম্ভব নয় বলে পাঠকদেব অনুরোধ করব এহেন নবসৃষ্টির আরও নানাবিধ নিদর্শন তাঁরা যেন স্বচক্ষে গিয়ে দেখে আসেন।

ডোকরা-কামারদের তৈরী শিল্পসম্ভার সম্বন্ধেও এখানে দু'কথা বলা যেতে পারে। তাঁদের কারিগরি পদ্ধতি গতানুগতিকতার নিগড়ে যে কতদূর আবদ্ধ সেকথা সকলেই জানেন। তবু সেখানেও কিছু কিছু আধুনিক কলাকৌশলের অনুপ্রবেশ ঘটানো গেছে। সাবেক রীতিপদ্ধতির কোন ক্ষতি করেনি বলে তাতে লোকসান হয়নি বরং লাভই হয়েছে। এ মিউজিয়মে ডোকরাশিল্পের সংগ্রহটি বেশ সমৃদ্ধ। তাতে প্রাচীন ও নবীন দুই রীতির সম্ভারই স্থান পেয়েছে।

এতদিন মহিষের শিং থেকে প্রধানত চিরুনিই তৈরি হত। ঘর সাজানোর জন্য ছোট ছোট সারস পাখি প্রভৃতিও উৎপন্ন হয়েছে কোন কোন কেন্দ্রে। কিন্তু আধুনিক ধ্যানধারণা ও মোটিফ প্রযুক্ত হলে এই প্রাচীন কুটিরশিল্পটির পরিসর যে কতদূর বিস্তৃত হতে পারে তা এ মিউজিয়মে রক্ষিত রাশি রাশি নিদর্শন দেখলে বেশ বোঝা যায়। এই পর্যায়ে শোলা, কাঠ, গালা প্রভৃতি উপাদানে নির্মিত নানারকম সজ্জা-দ্রব্যেরও উল্লেখ করা যেতে পারে যার সংগ্রহটিও রীতিমত সমৃদ্ধ।

শঙ্খ ও হাতির দাঁতের কাজ আমাদের লোকশিল্পগুলির অন্তর্গত। প্রথমটি বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুর, হাটগ্রাম প্রভৃতি স্থানে ও দ্বিতীয়টি মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুরে প্রধানত কেন্দ্রীভূত। সেসব জায়গার কারিগরি নৈপুণ্যের বহু উৎকৃষ্ট নিদর্শন এ মিউজিয়মে সংগৃহীত হয়েছে। গ্রামীণ হস্তশিল্পীদের প্রতিভা যে কত অসংখ্য দিকে নিয়োজিত তা এ সংগ্রহশালায় এলে যেমন বোঝা যায় তেমন অন্যত্র যায় কিনা সন্দেহ। হস্তশিল্প-বিভাগে রঙিন ঘাসের চিত্রকর্ম থেকে শুরু কবে, বাঁশ, বেত, নারকেল-পাতা ও নারকেল-খোলার নানারকম জিনিস, পোড়ামাটির তুলসীমঞ্চ, পুরুলিয়া ও উত্তরবঙ্গের বিবিধ মুখোশ, কাঁসা-পিতলের যাবতীয় সম্ভার প্রভৃতি অগণিত শিল্পকৃতি স্থান পেয়েছে। আগের অনুচ্ছেদগুলিতে যেসব কুটিরশিল্পের উল্লেখ করেছি, সেগুলিও এই বিভাগেই পড়ে। বস্তুত, পশ্চিমবঙ্গের হস্তশিল্পের এত বিস্তৃত সংগ্রহ অন্য মিউজিয়মে বড় একটা দেখা যায় না।

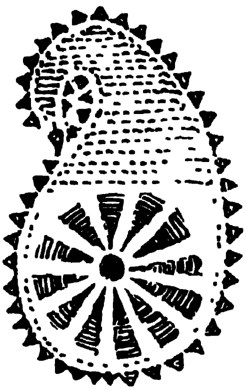
হস্তশিল্পের অন্তর্গত হলেও যে বিভাগগুলির পৃথক আলোচনা প্রয়োজন তা হল তাঁত ও সূচীশিল্প, লোকচিত্রশিল্প, বাদ্যযন্ত্রশিল্প ও খেলার সরঞ্জাম। আগেই বলেছি, দেশ বিভাগের বেশ কয়েক বছব আগে প্রতিষ্ঠিত হবার দরুন এ মিউজিয়মে পূর্ববঙ্গের কিছু কিছু নিদর্শন সংগৃহীত হয়েছে। সম্ভবত, তাঁতবস্ত্র বিভাগেই তাদের সংখ্যা সর্বাধিক। পূর্ব ও পশ্চিমবাংলার বিখ্যাত কেন্দ্রগুলি থেকে আহৃত অসংখ্য নিদর্শনের মধ্যে এখানে আছে একাধিক প্রাচীন মসলিন, সোনার সুতোয় বোনা তিন শ' বছরেরও বেশী পুরনো দুর্লভ একটি শাড়ি; বালুচর, নীলাম্বরী, ঢাকাই, জামদানী প্রভৃতি শাড়ি অনেকগুলি। সম্প্রতি বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুরে বালুচর শাড়ি যে আবার প্রস্তুত হচ্ছে তার নমুনা রয়েছে কয়েকটি। এছাড়া, টাঙাইল, শান্তিপুর, ধনেখালি প্রভৃতি বিখ্যাত কেন্দ্রে উৎপন্ন নানান অপূর্ব নিদর্শনের তো কথাই নেই। এ বিভাগের সঙ্গে সম্পর্কিত নকশী-কাঁথাগুলি সংখ্যায় বেশী না হলেও তাদের মধ্যে কয়েকটি শিল্পনৈপুণ্যে হীন নয়। এমব্রয়ডারির নিদর্শনগুলিও অভিনব কেননা এজাতীয় শিল্পকর্ম খুব কম মিউজিয়মেই সংগৃহীত হয়েছে।

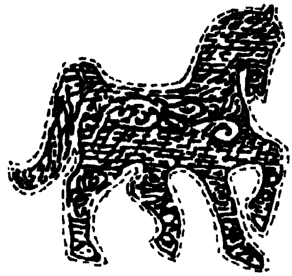
পটচিত্র ও একই আঙ্গিকে আঁকা লক্ষ্মীসরার সংগ্রহটিও বেশ সমৃদ্ধ। বীরভূম,

২৪-পরগনা, কলকাতা প্রভৃতি এলাকা থেকে আহৃত এ নিদর্শনগুলির মধ্যে কয়েকটি বেশ উল্লেখযোগ্য। ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের সঙ্গে সম্পর্কিত ও নানাবর্ণে চিত্রিত ঘট, কুলো, পিঁড়ি প্রভৃতির সংগ্রহটিও দর্শনীয়।

খেলার সরঞ্জাম ও উভয় বাংলায় ব্যবহৃত বাদ্যযন্ত্রের নমুনাগুলিও চিত্তাকর্ষক। অবসর বিনোদনের এসব উপকরণ বাঙালীর জীবনযাপন প্রণালীর একটি বিশেষ দিকে আলোকপাত করে। বিষ্ণুপুরের দশাবতার তাস থেকে শুরু ক'রে হাওড়া জেলার দেউলপুর গ্রামে প্রস্তুত পোলো-বল ও অপ্রচলিত নিদর্শন থেকে আরম্ভ করে অদ্যাপি ব্যবহৃত নানারকম বাদ্যযন্ত্র এই বিভাগে স্থান পেয়েছে। অভিনবত্বের জন্য এ শাখাটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

এ মিউজিয়মের বিশাল সংগ্রহের পিছনে আছে সরকারী অর্থবল ও জনবল। লোকসংস্কৃতির বেসরকারী মিউজিয়মগুলি থেকে তাঁদের সংগ্রহ যে বেশী ও বৈচিত্র্য-পূর্ণ হবে তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই। কিন্তু শেষোক্ত সংগ্রহশালার কর্মীদের যে জিনিসটির অভাব কোথাও দেখিনি তা হল তাঁদের উদ্যম ও নিষ্ঠা। সরকার নিশ্চয়ই চান বঙ্গসংস্কৃতির উপকরণগুলি কোথাও না কোথাও সংগৃহীত হোক। তা না হলে, তাঁদের নিজস্ব মিউজিয়মটিরও কোন মানে হয় না। সেজন্য বেসরকারী সংগ্রহশালা-গুলির জন্য সরকারী অনুদান যে আরও যথেষ্ট পরিমাণে বাড়ানো উচিত তাতে সন্দেহ নেই। এ বাড়তি খরচ যে অপাত্রে ন্যস্ত হবে না, আমার অভিজ্ঞতা থেকে সেকথা বেশ জোরের সঙ্গেই বলতে পারি।

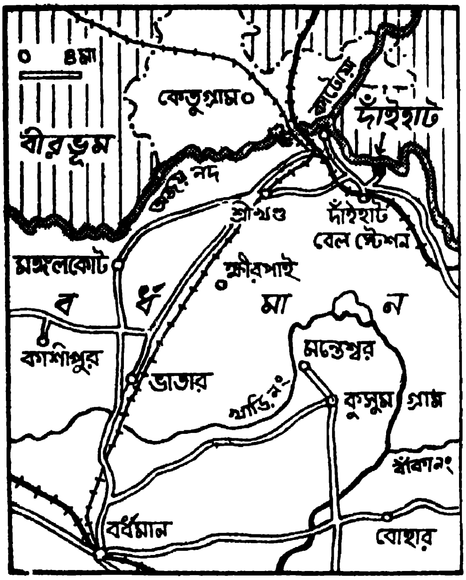




দাঁইহাট

উভয় বঙ্গে এমন মিউজিয়ম আছে কিনা সন্দেহ যেখানে পাল-সেন যুগের (বা তার পূর্ব ও পরের) পাথরের মূর্তি-ভাস্কর্য অল্পবিস্তর স্থান পায়নি। এহেন পুরাবস্তু ভারতবর্ষের বিভিন্ন সংগ্রহশালায়ও সমাদরে গৃহীত হয়েছে। তাদের সব ক'টির নাম ও সংগৃহীত ভাস্কর্যের তালিকা এতই বিশাল যে অন্য উদ্দেশ্যে লিখিত বর্তমান প্রবন্ধে তাদের ন্যূনতম আলোচনা করাও সম্ভব নয়। বড় সংগ্রহশালাগুলির মধ্যে দিল্লীর জাতীয় মিউজিয়ম এবং কলকাতার জাদুঘর, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, এশিয়াটিক সোসাইটি ও আশুতোষ মিউজিয়ম প্রভৃতিতে পাথরের যে বিপুল ভাস্কর্যসম্ভার রক্ষিত আছে তা থেকে সহজেই অনুমান করা যায় যে নানা রকম পাথরের উপাদানে বিগ্রহনির্মাণশিল্প বঙ্গদেশে একদা অতি ব্যাপকভাবে স্ফূর্তিলাভ করেছিল। এ প্রসঙ্গে ঢাকা মিউজিয়ম ও রাজশাহীর বরেন্দ্র রিসার্চ সোসাইটির সংগ্রহশালাটিও বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। সেখানকার পাথরের পুরা-বস্তুর সংগ্রহ দু'টিও বেশ সমৃদ্ধ ছিল। সাম্প্রতিক পাকিস্তানী বর্বরতায়, সে অমূল্য সঞ্চয় বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি শুনেছি। এপার-ওপার বাংলায় আরও অগণিত ছোট-মাঝারি মিউজিয়ম আছে। বর্তমান প্রবন্ধে তাদের বিবরণের বিশেষ প্রয়োজন নেই।

সংগ্রহশালাগুলির বাইরে বৃহৎ বঙ্গের গ্রামগ্রামান্তরেও কত যে প্রস্তর-ভাস্কর্য ছড়ানো রয়েছে তার সীমাসংখ্যা নেই। মন্দিরে, গাছতলায়, পল্লীবাসীর কুটির বা ঠাকুরঘরে রক্ষিত সেসব অজস্র পুরাকীর্তি ছাড়াও আরও অজ্ঞাত কত শত দেবদেবী-মূর্তি যে ইতস্তত দীঘি-পুষ্করিণীর পঙ্কের নীচে বা প্রাচীন ঢিবির অভ্যন্তরে আবিষ্কারের অপেক্ষা করছে তা কে বলবে! হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় সেজন্য যথার্থই বলেছিলেন—"হিন্দু ও বৌদ্ধগণের কত মূর্তিই যে ছিল, আর কত মূর্তিই যে পাথরে গড়া হইত, তাহা ভাবিলে আশ্চর্য হইয়া যাইতে হয়। বরেন্দ্র রিসার্চ সোসাইটি অনেক মূর্তি সংগ্রহ করিয়াছেন। সাহিত্য পরিষদেও অনেক মূর্তি সংগ্রহ হইয়াছে। সকল মিউজিয়মেই কিছু কিছু মূর্তিসংগ্রহ আছে; তথাপি বনে-জঙ্গলে পুরানো গ্রামে পুরানো নগরে এখনও গাড়ি গাড়ি মূর্তি পাওয়া যাইতে পারে।" শাস্ত্রী মহাশয় শুধু হিন্দু ও বৌদ্ধ দেবদেবীমূর্তির কথাই বলেছেন! কিন্তু পশ্চিমরাঢ়ে, বিশেষত বাঁকুড়া ও পুরুলিয়া জেলায়, জৈনমূর্তিও কম পাওয়া যায়নি। এই তিন ধর্মের সমবায়ে উদ্ভূত নানান মিশ্র-বিগ্রহের নিদর্শনও অপ্রতুল নয়। তাছাড়া পাথরের মন্দির অলং-করণেও মূর্তি এবং ফুলকারি নকশার যথেষ্ট ব্যবহার হয়েছে। ক্ষেত্রবিশেষে সেগুলিও উৎকৃষ্ট ভাস্কর্য। স্থূলভাবে একথা হয়ত বলা যায় যে উত্তরবঙ্গের মালদহ,



দিনাজপুর, রংপুর, বগুড়া, রাজশাহী প্রভৃতি জেলা ও উত্তররাঢ়ের বিভিন্ন অঞ্চল, যথা বীরভূম জেলা, মুর্শিদাবাদ জেলার জঙ্গীপুর ও কান্দি মহকুমা এবং বর্ধমান জেলার কাটোয়া মহকুমা প্রভৃতি থেকেই অদ্যাবধি এজাতীয় মূর্তি-ভাস্কর্যের সবচেয়ে বেশী সংখ্যায় সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের অন্যান্য এলাকা থেকে পাথরের দেবদেবীমূর্তি যে পাওয়া যায়নি তা নয়, তবে মোটামুটিভাবে তারা সংখ্যায় কম।

এই নিদর্শনগুলি থেকে সহজেই অনুমান করা যায়, পাথরের মূর্তিনির্মাণশিল্প একদা বঙ্গদেশে খুবই প্রসার লাভ করেছিল। পাল-সেন যুগের আগেও এ শিল্পের অল্পবিস্তর চর্চা হয়েছে সত্য, কিন্তু মোসলেম আবির্ভাবের অব্যবহিত পূর্বের কয়েক শতাব্দীতে এই কারুকলাটি যেরূপ ব্যাপকভাবে ও দক্ষতার সঙ্গে অনুসৃত হয়েছে, বঙ্গদেশের ইতিহাসে আর কোন যুগে তার ভগ্নাংশমাত্রও হয়েছে কিনা সন্দেহ। মুসলমান শাসনকালে, সহজবোধ্য কারণে, এই শিল্পচর্চায় সহসা ছেদ পড়ে এবং পরবর্তীকালে সেই নিগৃহীত কারুকৃতিকে আর পূর্বের গৌরবে উন্নীত করা সম্ভব হয়নি। সন্দেহ নেই যে পাল-সেন যুগে বহু নিপুণ ভাস্কর বঙ্গদেশের বিভিন্ন অংশে কাজ করতেন ও তাঁদের পরিচর্যাপুষ্ট অনেক আঞ্চলিক গোষ্ঠী বা 'স্কুল'-এরও সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু মুসলমান ও কোম্পানী-যুগের অমানিশা পার হয়ে উনিশ শতকে বাঙালীর নবজাগরণের কাল অবধি তার কোন ক্ষীণ ধারা অবিরামভাবে প্রবাহিত হয়ে এসেছিল এমন সঠিক কোন প্রমাণ নেই। অন্তত এবিষয়ে যথেষ্ট অনুসন্ধানের আলোকপাত এখনও হয়নি।

প্রাক্-মোসলেম যুগের বাঙালী ভাস্করদের সম্বন্ধে শ্রদ্ধেয় ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় বলেছেন—"তিব্বতীয় লামা তারানাথ লিখিয়াছেন যে, ধীমান ও তাঁহার পুত্র বিৎপালো প্রস্তর ও ধাতুর মূর্তি গঠন ও চিত্রাঙ্কনে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন এবং তাঁহাদের শিষ্য-প্রশিষ্যগণ একটি স্বতন্ত্র শিল্পী সম্প্রদায় গঠন করিয়াছিলেন। এই শিল্পিদ্বয়ের নির্মিত কোন মূর্তি বা তাঁহাদের সম্বন্ধে অন্য কোন বিবরণ

পাওয়া যায় না। কিন্তু বাংলায় যে শিল্পী-সংঘ ছিল, বিজয়সেনের দেওপাড়া প্রশস্তিতে তাহার উল্লেখ আছে।...যে শিল্পী ইহা উৎকীর্ণ করিয়াছিলেন প্রশস্তির শেষ শ্লোকে তাঁহার পরিচয় আছে। তিনি ধর্মের প্রপৌত্র, মনদাসের পৌত্র, বৃহস্পতির পুত্র, বরেন্দ্রের শিল্পীগোষ্ঠী-চূড়ামণি রাণক শূলপাণি। ইহা হইতে অনুমিত হয় যে, বরেন্দ্র (এবং সম্ভবত বাংলার অন্যান্য অঞ্চলে) একটি শিল্পী-সংঘ ছিল এবং শূলপাণি এই সংঘের প্রধান ছিলেন।...বাংলার শিলালিপি ও তাম্রশাসন হইতে আমরা এইরূপ আরও কয়েকজন শিল্পীর নাম পাই, যথা ভোগটের পৌত্র, সুভটের পুত্র তাতট; সৎ-সমতট নিবাসী শুভদাসের পুত্র মঙখদাস ও তৎপুত্র বিমলদাস; সূত্রধর বিষ্ণুভদ্র; বিক্রমাদিত্য-পুত্র শিল্পী মহীধর ও তৎপুত্র শিল্পী শশিদেব; শিল্পী কর্ণভদ্র; শিল্পী তথাগতসার। মোটের উপর এরূপ অনুমান অসঙ্গত হইবে না যে, উল্লিখিত আটজন এবং শূলপাণি ...যে কেবল প্রস্তর ও তাম্রপটে অক্ষর উৎকীর্ণ করিতেন তাহা নহে, তাঁহারা উচ্চশ্রেণীর শিল্পী ছিলেন এবং ধাতু ও প্রস্তরের মূর্তি প্রভৃতিও গঠন করিতেন।" (বাংলাদেশের ইতিহাসঃ প্রাচীন যুগঃ পঞ্চম সংস্করণ (১৩৭৭)ঃ পৃ ২৩০-৩১)। শুধু বঙ্গদেশেই নয়, বাংলার স্থপতি ও ভাস্করদের শিল্পজ্ঞান যে ভারতবর্ষের সীমা অতিক্রম ক'রে বিদেশের স্থাপত্য-ভাস্কর্যকেও একদা প্রভাবিত করেছিল সেকথা সকলেই জানেন।

*

পাথরের মূর্তিনির্মাণশিল্পের এই সাবেক ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে একদা দাঁইহাটে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিলাম সেখানকার ভাস্করদের খোঁজখবর নিতে ও অতীতের সঙ্গে তাঁদের যোগসূত্র যদি কিছু থাকে—আবিষ্কার করতে। বর্ধমান জেলার মহকুমা শহর কাটোয়া থেকে যে পিচের সড়ক হুগলী জেলার সপ্তগ্রামের কাছে গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোডে এসে মিশেছে (এপথ 'আসাম লিঙ্ক রোড'-এরও অংশ বটে), তার সামান্য উত্তরে, কাটোয়া থেকে মাইল চারেক দূরে, দাঁইহাট মিউনিসিপ্যাল শহর অবস্থিত। ব্যান্ডেল-বারহারোয়া রেলপথের দাঁইহাট স্টেশনে নেমে বা কাটোয়া থেকে বাসে কিংবা সাইকেল-রিকশায়ও যাওয়া যায়। শহরে ঢুকলেই পুরনো সব পাকা বাড়ি আর ঘিঞ্জি পথঘাট থেকে এ জনপদের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ থাকে না। ভাস্করদের সন্ধানে ঘুরতে ঘুরতে অবশেষে এসে পৌঁছলাম কাঁসারিপাড়ায়। সেখানে এখন দু'জন মাত্র কুশলী শিল্পী অবশিষ্ট আছেন। তাঁরা পিতাপুত্র। পিতার নাম বিশ্বনাথ ভাস্কর, পুত্রের শৈলেন্দ্রকুমার ভাস্কর। বয়স যথাক্রমে (আনুমানিক) ৬৫ ও ৪০ বছর। আমার পরিদর্শনের দিন বিশ্বনাথবাবু শিল্পসামগ্রী কলকাতায় পৌঁছে দিতে গিয়েছিলেন ব'লে শৈলেনবাবুর কাছ থেকে সংগৃহীত তথ্যই এ প্রবন্ধে ব্যবহার করেছি।

এ পরিবারের বংশগত উপাধি 'ভাস্কর' কিন্তু তাঁরা জাতিতে সূত্রধর। কত পুরুষ ধরে তাঁরা এ পদবী ব্যবহার করছেন বা দাঁইহাটে তাঁদের বসতি কত কালের সে বিষয়ে সঠিক কিছু জানা যায় না। 'ভাস্কর' উপাধিধারী মাত্র ছ'টি পরিবার এখন এ শহরে বাস করেন। কিন্তু বাকি পাঁচটি পরিবারের উপার্জনক্ষম পুরুষেরা পৈতৃক পেশা ত্যাগ করে বিভিন্ন শিক্ষিত জীবিকায় প্রবাসী। ছুটিছাটা বা পুজাপার্বণে দাঁইহাটে ফিরে এলেও তাঁদের আর কখনই সাবেক বৃত্তিতে ফিরে যাবার সম্ভাবনা নেই। আজকের মাগগিগণ্ডার দিনে পৈতৃক পেশায় সংসার প্রতিপালন করা খুবই কষ্টকর বলে তাঁরা উপার্জনের অন্য পথ বেছে নিতে বাধ্য হয়েছেন। তাছাড়া মোটামুটিভাবে ভাস্করের কাজ শিখতে অন্তত দশ বছর শিক্ষানবিসীর প্রয়োজন হয়। অনিশ্চিত সাফল্যের জীবিকায় এত দীর্ঘ সময় নিয়োগ করা খুব কম লোকের পক্ষেই

সম্ভব। সেজন্য বিশ্বনাথবাবু ও শৈলেনবাবুর অবর্তমানে দাঁইহাট থেকে যে এ শিল্পটি লোপ পাবে এমনই মনে হয়। তাঁদের পরিবারের বংশপঞ্জী সামান্যই উদ্ধার করা গিয়েছে। বিশ্বনাথ ভাস্কর মহাশয়ের বাবা ও জ্যাঠা ছিলেন, যথাক্রমে যোগেন্দ্রনাথ ও আনন্দগোপাল ভাস্কর ও তাদের পিতা ছিলেন নবীনচন্দ্র ভাস্কর। আরও পূর্ববর্তী কোন পুরুষের নাম সংগ্রহ করা যায়নি। কিন্তু ভাস্কর হিসাবে নবীনচন্দ্রের যে খ্যাতি আজও এ অঞ্চলে লোকের মুখে মুখে ফেরে তা থেকে তাঁকে ঐতিহ্যবিহীন এক ভুঁইফোড় শিল্পী বলে কিছুতেই মনে করা যায় না। বংশানুক্রমিক দক্ষতা তাঁর অবশ্যই ছিল কিন্তু তাঁর কত পুরুষ আগে এ পরিবার মূর্তিনির্মাণশিল্পে প্রথম লিপ্ত হন তা এখন অনুমানসাপেক্ষ। অতএব এই কারুকলার পাল-সেন যুগের সুপ্রাচীন স্রোতটি যে দাঁইহাটের বর্তমান ভাস্করদের মধ্য দিয়ে ক্ষীণ ধারায় প্রবাহিত রয়েছে সেকথা নিশ্চিতভাবে বলা যায় না। বরং উলটোটা হওয়াই সম্ভব। কেননা, বিগ্রহ খোদাইয়ের সময় তাঁরা 'শিল্পশাস্ত্র' জাতীয় কোন আকর-গ্রন্থের উপর নির্ভর করেন না, অতীত-কালের কোন বিধিবন্ধ সূত্রও অনুসরণ করেন না। মূর্তির অঙ্গপ্রত্যঙ্গের আনুপাতিক মাপ সম্বন্ধে পূর্বনির্দিষ্ট কোন আদর্শ রূপায়িত না করে শিল্পীর নিজের দৃষ্টিতে যা শোভন মনে হয় তাই করেন। বংশগত দক্ষতা এ ব্যাপারে তাঁদের অবশ্যই সাহায্য করে থাকে কিন্তু সে নৈপুণ্য যে পাল-সেন যুগের উৎস থেকে নিঃসৃত এমন মনে করবার কোন কারণ নেই। সেজন্য অনুমান হয়, মুসলমান যুগের শেষে বা পরবর্তী কোন সময়ে দাঁইহাটের এ 'স্কুল'টির পত্তন হয়ে থাকবে।

শ্রীযুত বিনয় ঘোষ মহাশয় তাঁর 'পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি' গ্রন্থে কাছাকাছি আর এক গ্রাম পাতুন-এর অধুনালুপ্ত ভাস্করগোষ্ঠী সম্বন্ধে লিখেছেন। কালনা মহকুমার মন্তেশ্বর থানার উত্তর অংশে অবস্থিত সে পল্লীর দাঁইহাট থেকে পাখি-ওড়া দূরত্ব মাত্র বারো মাইলের মত। পাতুন-এর শিল্পীরা এখন একেবারেই নিশ্চিহ্ন হয়েছেন। কিন্তু এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে কাছাকাছি এ দু'টি গ্রামে পাথর, কাঠ, অষ্টধাতু প্রভৃতির মূর্তি-নির্মাণশিল্পীরা একদা যথেষ্ট সংখ্যায় কাজ করতেন। তাঁদের মধ্যে, কমবেশি এক শ বছর আগে, দাঁইহাটের নবীনচন্দ্র ভাস্কর দূরবিস্তৃত খ্যাতির অধিকারী হয়েছিলেন। ৩৭৪ নম্বর আপার চিৎপুর রোডে ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত 'ওরিয়েণ্টাল স্টোন ওয়ার্কস' নামে তাঁর ভাস্কর্য-বিপনিটি এখনও তাঁর বংশধরদের হেফাজতে চালু আছে। বর্ধমান জেলার ক্ষীরগ্রামের যোগাদ্যা ও দক্ষিণেশ্বরের কালী, এ দু'টি মূর্তি নাকি তাঁরই তৈরি। শোনা যায়, সমকালীন বহু রাজামহারাজা বিগ্রহ নির্মাণের জন্য তাঁরই দ্বারস্থ হতেন। সেসব পৃষ্ঠপোষকের মধ্যে ছিলেন বর্ধমান, লালগোলা, কাশিমবাজার, দিনাজপুর, নাটোর, দীঘাপতিয়া প্রভৃতির মহারাজারা, পুটিয়ার মহারানী, চূড়ামন ও লালগড়ের রাজারা এবং আরও বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি।

দাঁইহাটের এ ভাস্কর-পরিবার বংশগতভাবে পাথর, কাঠ ও অষ্টধাতুর মূর্তিশিল্পে পারদর্শী। তবে শেষ দু'টি উপাদানে এখন বিশেষ কাজ হয় না বললেই চলে, কেননা এজাতীয় বায়না আজকাল খুব কমই পাওয়া যায়। বিগ্রহের প্রকারভেদও এখন খুবই সীমিত। কৃষ্ণ, কালী, নাড়ুগোপাল ও শিবলিঙ্গের ফরমাস বেশী পাওয়া যায় বলে প্রধানত সেসব মূর্তিই এখন তৈরি হয়ে থাকে। কষ্টিপাথর, বেলেপাথর, শ্বেতপাথর ও বিহারের চাণ্ডিল থেকে আনীত বিশেষ এক শ্রেণীর পাথরই সাধারণত ব্যবহার করা হয়। শেষোক্ত ধরনের পাথরের সমাদরই সবচেয়ে বেশী কেননা কষ্টিপাথর ও শ্বেতপাথরের থেকে তা অপেক্ষাকৃত নরম। এতে তাড়াতাড়ি কাজ করা যায় বলে পড়তা পোষায় বেশী। কষ্টিপাথর ও মর্মরের মূর্তিও কিছু কিছু তৈরী হয় বটে তবে তাদের মহার্ঘতার জন্য

সহজে ক্রেতা পাওয়া যায় না। আনুমানিক দেড় ফুট উচ্চতার একটি বেনুকৃষ্ণ বিগ্রহ নির্মাণ করতে সময় লাগে প্রায় পনেরো দিন, বানি পাওয়া যায় কমবেশি দু'শ টাকা আর মহাজনরা সে মূর্তি বিক্রী করে অন্যূন পনের শ টাকায়। কলকাতার চিৎপুর রোডে যে আট-ন'টি পাথরের মহাজনী দোকান আছে তাদের কাছ থেকে দাঁইহাটের ভাস্কররা আগাম পাথর এনে বানিতেও কাজ করেন, আবার নিজস্ব উপকরণে স্বাধীন-ভাবেও কাজ করে থাকেন। বায়না সংগ্রহের জন্য সুগঠিত সংস্থা না থাকায় ও অল্প মূলধনে যথেষ্ট পরিমাণ উপকরণ মজুদ করবার ক্ষমতার অভাবে দাঁইহাটের কারিগররা তাঁদের বেশ কিছু মূর্তি দাদনপদ্ধতিতে তৈরি করতে বাধ্য হন। পাথর, কাঠ বা অষ্টধাতুর প্রাচীন মূর্তির 'নবকলেবর' করবার কাজেও এখানকার শিল্পীদের নানা জায়গা থেকে ডাক পড়ে। বহুদিন আগে এরকম এক ভাস্করের দেখা পেয়েছিলাম বোলপুরের অদূরে মুলুক গ্রামে। তিনি তখন সেখানকার মন্দিরে কষ্টিপাথর ও অষ্টধাতুর তৈরী প্রাচীন কৃষ্ণ ও রাধিকার বিগ্রহ দুটির সংস্কার করছিলেন।

উভয় বঙ্গের অন্যান্য কুটিরশিল্পের মতো দাঁইহাটের ভাস্কর্যশিল্পেও আধুনিক যন্ত্রপাতির অনুপ্রবেশ ঘটেনি। ছেনি, হাতুড়ি, মাটাম, কম্পাস, বেড়ি-কম্পাস প্রভৃতি সামান্য কয়েকটি সাবেক ধরনের হাতিয়ার দিয়েই কাজ চলে যায়। বহু পুরুষের সঞ্চিত দক্ষতা যেখানে কারিগরি নৈপুণ্যের প্রধান উৎস সেখানে চলনসই যন্ত্রপাতিতে কিছুমাত্র অসুবিধা হয় না। আমাদের গ্রামীণ হস্তশিল্পগুলির ক্ষেত্রে এই একই কথা মোটামুটি-ভাবে সর্বত্রই বলা চলে। মূর্তি নির্মাণের সময় আলোচ্য শিল্পীরা কোন ছবি, ফোটোগ্রাফ বা মডেলও অনুসরণ করেন না। 'শিল্পশাস্ত্র' বা বিধিবদ্ধ কোন ফরমুলা অনুসারে কাজ করাও তাঁদের রীতি নয়। সেজন্য বংশগত শিল্পপ্রতিভাই তাঁদের একমাত্র অবলম্বন। কিন্তু সে প্রতিভার প্রয়োগ যে আর কতদিন অব্যাহত থাকবে তা বলা যায় না।



হস্তশিল্প-কেন্দ্রঃ বারুইপুর

বারুইপুরের মতো নানান আকর্ষণে পূর্ণ স্থান গ্রাম-বাংলায় কমই আছে। এ পল্লীর জন্য মানানসই একটা বিশেষণ খুঁজতে গিয়ে many-splendoured এই ইংরেজী কথাটাই বারবার মনে আসছে। সে রকমারি দীপ্তির বিবরণই প্রথমে একটু দিয়ে নিই।

বারুইপুরের যে অংশের নাম আটিসারা, শ্রীচৈতন্যদেব একদা স্বয়ং সেখানে এসেছিলেন। চৈতন্যভাগবতে তার নিম্নরূপ উল্লেখ আছে।

“সেই মত প্রভু তত্ত্ব কহিতে কহিতে।
উত্তরিলা আসি আটিসারা নগরীতে॥
সেই আটিসারা গ্রামে মহা ভাগ্যবান।
আছেন পরম সাধু শ্রীঅনন্ত নাম॥
রহিলেন প্রভু আসি তাহার আলয়।
কি কহিব আর তার ভাগ্য সমুচয়॥
বৈকুণ্ঠের পতি আসি অতিথি হৈলা
সন্তোষে ভিক্ষার সজ্জ করিতে লাগিলা॥
সর্ব রাত্রি কৃষ্ণকথা কীর্তন প্রসঙ্গে।
আছিলেন অনন্ত পণ্ডিত গৃহে রঙ্গে॥

(অন্ত্য খণ্ড: দ্বিতীয় অধ্যায়)

সেদিনের অনন্ত পণ্ডিতের ভিটায় এখন চৈতন্য-মহাপ্রভুর শ্রীপাট প্রতিষ্ঠিত। সেখানে উপাসিত অষ্টধাতুর কৃষ্ণরাধিকা ও কাঠের গৌর-নিতাই মূর্তিগুলির মতো সুঠাম বিগ্রহ কমই দেখা যায়। এ পাটবাড়ি ও সে সময়ে অদূরে প্রবাহিত আদি-গঙ্গাকে কেন্দ্র ক'রে এত ইতিহাস ও কিংবদন্তী ছড়ানো যে তা নিয়ে অনায়াসেই এক পৃথক প্রবন্ধ রচনা করা সম্ভব।

বারুইপুরের পুরনো বাজারের কাছে ‘রাজবল্লভ ভবন’ নামে যে প্রাচীন অট্টালিকাটি দেখা যায় সেটিও এক উপভোগ্য লেখার বিষয়বস্তু হতে পারে। মেদনমল্ল পরগণার এককালীন অধীশ্বর মদন রায়ের বংশধরদের এক অংশ এখন এখানে বাস করেন। মদন রায়ের ইতিহাস (ও কাহিনী), বিগত যুগের গৃহস্থাপত্যের নিদর্শন হিসেবে এ বাড়ির গুরুত্ব, পুরনো দিনের বিবিধ গৃহদেবতা ও তাঁদের উৎসবপার্বণ প্রভৃতি নিয়েও স্বতন্ত্র প্রবন্ধ অনায়াসেই লেখা চলে।

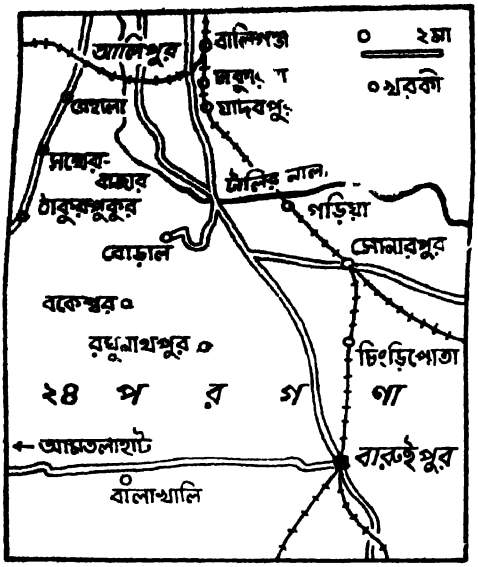
বারুইপুরের সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের সম্পর্কের কথাই বা কম যায় কিসে? ‘সাহিত্য সংসদ’ কর্তৃক প্রকাশিত বঙ্কিম রচনাবলীর (প্রথম খণ্ড) ‘যোগেশচন্দ্র বাগল লিখিত

ভূমিকা থেকে দেখা যায় যে বঙ্কিমচন্দ্র ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ থেকে ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দের মে অবধি বারুইপুরের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর ছিলেন। এই তিন বছরের মধ্যেই প্রকাশিত হয় তাঁর প্রথম দু'খানি কালজয়ী উপন্যাস—দুর্গেশ-নন্দিনী (মার্চ, ১৮৬৫) ও কপালকুণ্ডলা (১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দের শেষ দিকে)। সাহিত্য-কীর্তি ছাড়াও তাঁর বারুইপুরের জীবন সম্বন্ধে ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই মে তারিখে 'সংবাদ প্রভাকরে' প্রকাশিত এক পত্রে বলা হয়েছিল—"...সৌভাগ্যক্রমে বারুইপুরের এলাকাবাসিগণ শ্রীযুত বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট পাইয়াছেন। বাবু বঙ্কিমচন্দ্র শিক্ষা বিষয়ে আমাদের যেরূপ শ্রদ্ধা ও সম্মানাস্পদ, বিচার বিষয়েও গভর্ণমেণ্টের এবং প্রজাগণের সেইরূপ প্রশংসাভাজন।...বাবু বঙ্কিমচন্দ্র অভিমানের মস্তকে পদার্পণ করিয়া যথাযোগ্য ব্যক্তিগণের সহিত যথাযোগ্য সম্ভাষণ ও শারীরিক কষ্টকে কষ্ট বোধ না করিয়া পীড়িত অবস্থাতেও বিচারকার্য সম্পাদন করেন। কার্তিকী পূর্ণিমাতে বারুইপুরে যে রাসযাত্রা হয় তাহাতে অসম্ভব জনতার মধ্যস্থলে তিনি পদব্রজে পরিভ্রমণ করিয়া শান্তি স্থাপন ও অন্যান্য বিষয়ে তদন্ত করিয়াছেন। স্বকার্য্য বিষয়িনী কর্ত্তব্যতা পক্ষেও ইঁহার নিকট অনেক বিচারক পরাস্ত হন।...অতএব বঙ্কিমবাবু সকল বিষয়েই প্রশংসা ও ধন্যবাদের পাত্র।" ছাব্বিশ থেকে ঊনত্রিশ বছর অবধি বঙ্কিমচন্দ্র বারুইপুরে ছিলেন। সে পল্লীর পটভূমিতে এই যুগান্তকারী প্রতিভার উন্মেষকাল সম্পর্কেও নিশ্চয়ই উপাদেয় প্রবন্ধ রচনা সম্ভব।

বারুইপুরে মন্দিরাদি বিশেষ কিছু নেই। তবু বিশালাক্ষীর দালান-মন্দিরে কাঠের তৈরি বৃহৎ বিশালাক্ষীমূর্তি ও দু'পাশের নারায়ণমূর্তি দু'টি অভিনিবেশযোগ্য। মন্দিরের সামনে ক্যানিং যাবার প্রধান সড়কের ওপাশে, অদূরবর্তী এক পুকুর থেকে পাওয়া প্রায় চার ফুট উচ্চতার কষ্টিপাথরের যে দরজা'র বাজুটি মাটিতে পোঁতা আছে তাও কম দর্শনীয় নয়। প্রাচীন কোন মন্দিরের এই অংশটিকে অবলম্বন করে রীতিমত অনুসন্ধান চালালে হয়ত কোন অভিনব পুরাকাহিনী উদ্‌ঘাটিত হতে পারে।

বারুইপুরের আর এক অংশ বাগানিপাড়ার 'বিবি মা' এক আশ্চর্য লৌকিক দেবী। হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের আরাধ্যা এ দেবীর 'থান' অন্তত এক শ' বছরের প্রাচীন। কাহিনী-কিংবদন্তীতে বনবিবি, কিন্তু ওলাবিবিরূপে উপাসিতা 'বিবি মা' মূলত মুসলমানদের উপাস্য হলেও তাঁর বাৎসরিক উৎসবের দিন মাঘ পূর্ণিমায়, যা হিন্দু মতে পবিত্র দিন। সেদিন কাছেপিঠের যাবতীয় হিন্দু পরিবারের প্রধানা গৃহিণীরা যে সূর্যাস্তের পরে পূজো শেষ হওয়া পর্যন্ত নিরম্বু উপবাস পালন করে থাকেন তা আশ্চর্য শোনালেও সত্যি। এই 'বিবি মা'কে নিয়েও বিস্তৃত আলোচনা হতে পারে।

বারুইপুর থেকে ক্যানিং-এর রাস্তায় কিছুদূর গেলে পথের ডান ধারে 'পিয়ালী টাউন' নামে যে নূতন পত্তন গড়ে উঠেছে, সেখানকার শল্যচিকিৎসার যন্ত্রপাতি তৈরির কারখানাটিও নানা দিক দিয়ে উল্লেখযোগ্য। স্টেনলেস স্টীল থেকে নানাবিধ সার্জিক্যাল ইন্‌সট্রুমেণ্ট নির্মাণে এ কারুশালার খুবই নামডাক। সব দিক খুঁটিয়ে লিখলে, এই অভিনব প্রতিষ্ঠানটিকে নিয়েও সুন্দর রচনা হতে পারে। কিন্তু বর্তমান প্রবন্ধে এ সবের কোনটিই আমার আলোচ্য বিষয় নয়। তবে আর একটি প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে বলব, যা many-splendoured বারুইপুরের গৌরবের অন্যতম নিদর্শন। আমি স্থানীয় হস্তশিল্প-কেন্দ্রটির কথা বলছি যেখানকার কর্মীরা আমাদের চিরাচরিত গ্রামীণ কুটিরশিল্পগুলির সর্বাঙ্গীণ উন্নতি সাধনের জন্য নানাভাবে নিয়োজিত আছেন। তাঁদের নিরলস প্রচেষ্টা কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে কতদূর ফলপ্রসূ হয়েছে এবার সে প্রসঙ্গে আসা যাক।



*

কলকাতা শহরের পাঁচ ও ছ' নম্বর বাস দক্ষিণপ্রান্তবর্তী যে টারমিনাসে এসে থামে সেই গড়িয়া থেকে ক্যানিংগামী পৃথক বাসে চেপে বারুইপুর শহরের আরও কিছু দক্ষিণে 'পিয়ালী টাউন'-এ এসে নামলেই এ হস্তশিল্প-কেন্দ্রটিতে পেঁছনো যায়। গড়িয়া থেকে সময় লাগে আনুমানিক প'য়তাল্লিশ মিনিট। বাসের ভাড়া সঠিক মনে নেই, তবে টাকাখানেকের বেশী নিশ্চয়ই নয়।

আলোচ্য প্রতিষ্ঠানটিকে সংক্ষেপে হস্তশিল্প-কেন্দ্র বলে উল্লেখ করলেও সরকারী পরিভাষায় কিন্তু এর সঠিক নাম 'এক্সপেরিমেণ্টাল ওয়ার্কশপ কাম রিসার্চ ইনস্-টিটিউট'। সর্বভারতীয় হ্যাণ্ডিক্রাফট্স বোর্ডের প্রেরণা ও পরিকল্পনা অনুসারে ১৯৫৯ খৃীষ্টাব্দে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়। বিহার ও মহীশূরেও অনুরূপ দু'টি কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে। এগুলির ব্যয়ভার কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার যৌথভাবে বহন করেন। এদের লক্ষ্য—অবহেলিত ও ক্ষয়িষ্ণু কুটিরশিল্পগুলিকে উন্নততর মডেল, ডিজাইন, নমুনা ও যন্ত্রপাতি সরবরাহ ক'রে এবং উৎপন্ন সামগ্রীর বিক্রির ব্যবস্থা ক'রে তাদের স্বনির্ভর হতে সাহায্য করা।

বারুইপুরের কেন্দ্রটিকে সাহায্য করবার জন্য ও একই পরিকল্পনার অন্তর্গত 'পেপার ডিজাইন সেন্টার' নামে রাজ্য সরকারের আর একটি সংস্থা আছে যাদের কাজ কুটিরশিল্পে ব্যবহারযোগ্য যাবতীয় উন্নততর ডিজাইন, যা কাগজে ছ'কে দেখানো যায়, তা উদ্ভাবন করা। এসব নকশা ও ভারত সরকারের কলকাতাস্থিত রিজিওনাল ডিজাইন সেন্টার কর্তৃক প্রস্তুত নানাবিধ মোটিফ বারুইপুরের কেন্দ্রে রূপায়িত হয়। প্রাপ্ত নমুনা নিয়ে কাজ করা ছাড়াও বারুইপুর কেন্দ্র ভারত সরকারের ডিজাইন সেণ্টারকে তাঁদের নিজস্ব নকশা প্রভৃতি রূপায়ণেও সাহায্য করেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, ডিজাইন সেণ্টার ডোকরা কর্মকারদের শিল্পপদ্ধতির উন্নতির জন্য বহুদিন যাবৎ যে পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন তদনুসারে তাঁদের কারিগররা বারুইপুর কেন্দ্রে থাকবার ও কাজ করবার সুযোগ পেয়ে থাকেন ও তাতে রীতিমত উপকৃত হন। কলকাতা ও বারুইপুরে অবস্থিত কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের এ দু'টি প্রতিষ্ঠান

পরস্পরের ঘনিষ্ঠ সহযোগিতায় বেশ ফলপ্রসূ এক কর্মপ্রচেষ্টায় নিযুক্ত আছেন দীর্ঘকাল।

বারুইপুর কেন্দ্রের তিনটি অংশ—নকশা রচনা ও হস্তশিল্প বিভাগ, যন্ত্রপাতির উন্নতিসাধন বিভাগ ও রাসায়নিক প্রক্রিয়ার উৎকর্ষবিধান বিভাগ। প্রথম বিভাগের অধীনে যে কুটিরশিল্পগুলিকে নিবিড় উন্নতিসাধনের জন্য নির্বাচিত করা হয়েছে তারা হল—শোলা, শিঙ, ঝিনুক, বাঁশ, বেত, মাদুর, মসলন্দ, শিশল তন্তুর মাদুর, শাড়ি ছাপানো, বাটিক ও ন্যাকড়ার পুতুল। এসব শিল্পের কারিগররা কলকাতার এক শ' মাইলের মধ্যেই যথেষ্ট সংখ্যায় বাস করেন বলে প্রশিক্ষণ-দল পাঠিয়ে তাঁদের উপদেশ-নির্দেশ দেওয়ার যথেষ্ট সুবিধা হয়। শোলার পুতুল তৈরির ক্ষেত্রে আমাদের গ্রামীণ শিল্পীরা কখনই ছাঁচের ব্যবহার করেননি। অথচ যৎসামান্য শিক্ষায় এই নতুন পদ্ধতি আয়ত্ত করে উৎপাদনের পরিমাণ ও গুণাগুণ প্রচুর পরিমাণে বাড়ানো সম্ভব। শিঙ ও ঝিনুকের সামগ্রী এতদিন স্বতন্ত্রভাবেই তৈরি হয়েছে। কিন্তু এই দুই উপাদানের সংমিশ্রণে যে অভিনব ও উন্নততর সৃষ্টি সম্ভব সেকথা সাবেক রীতির কারিগরদের কখনো মনে পড়েনি। এখানে উৎপন্ন কিছু কিছু শিল্পনিদর্শন থেকে সহজেই বোঝা যায়, শিঙ ও ঝিনুকের সুসমঞ্জস ব্যবহারে কী অসামান্য রূপসৃষ্টি করা সম্ভব। বাঁশ, বেত ও শরকাঠির মিশ্র ব্যবহার বা শোলার উপাদানে অভিনব সামগ্রীর উদ্ভাবনও কারিগরদের সামনে নতুন দিগন্ত খুলে দিচ্ছে। মাদুর, মসলন্দ প্রভৃতিতে এতদিন চিরাচরিত শরকাঠি বা মাদুর-কাঠিই ব্যবহৃত হয়ে এসেছে। কিন্তু শিশল তন্তুও যে এজন্য কাজে লাগানো যায় তা বারুইপুর কেন্দ্রেরই আবিষ্কার। বাটিক ও ছাপা শাড়ির ক্ষেত্রে রুচিসম্মত নকশা ও ন্যাকড়ার পুতুলের বেলায় জাপানী পদ্ধতির প্রয়োগ, গ্রামীণ শিল্পীরা অনেক স্থানে গ্রহণ করেছেন। তবু উন্নত কারিগরি-জ্ঞানের প্রসারের ক্ষেত্রে কিছু কিছু অন্তরায়ও আছে। গ্রাম-বাংলার কুটিরশিল্পীরা এখনও বহু সংখ্যায় স্থানীয় দাদনদার মহাজনের বশীভূত। তাঁরা যে নকশার বায়না দেন তা সরবরাহ করতেই শিল্পীদের অধিকাংশ সময় ব্যয়িত হয় বলে নতুন ডিজাইন নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা তাঁদের পক্ষে বিশেষ সম্ভবপর হয় না। সাবেক ঐতিহ্য থেকে বিযুক্ত নকশার কতদূর কাটতি হবে সে বিষয়েও তাঁদের মনে যথেষ্ট সংশয় থাকে। শেষোক্ত আশংকা দূর করবার জন্য বারুইপুর কেন্দ্রের [illegible] ঁরা খুবই কার্যকর এক পন্থা অবলম্বন করেছেন। তাঁরা প্রথমেই পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিভিন্ন সেলস্ এম্পোরিয়াম, বেঙ্গল হোম ইন্ডাস্ট্রিস অ্যাসোসিয়েশন, হ্যান্ডলুম অ্যান্ড হ্যান্ডি-ক্রাফ্‌টস এক্‌সপোর্ট কর্পোরেশন, পশ্চিমবঙ্গ স্মল ইন্ডাস্ট্রিস কর্পোরেশন প্রমুখ বড় বড় ক্রেতাদের দিয়ে নতুন নকশা, ডিজাইন বা মডেলগুলি অনুমোদন করিয়ে বিক্রির ভাল মতো আশ্বাস পেলে তবেই কুটিরশিল্পীদের কাছে সেগুলি প্রচার করেন। বহুক্ষেত্রে গ্রামীণ কারিগররা মনোনীত পণ্য এসব বড় খরিদ্দারদের কাছে পরে সরাসরি যোগান দিয়েও থাকেন। এইভাবে ক্রেতা-বিক্রেতার মধ্যে যে যোগাযোগ গড়ে ওঠে তাতে আরও একটা উপকার হয়। এসব বৃহৎ ক্রেতারা অনেক সময় সাবেক ধরনের পণ্যও প্রচুর পরিমাণে খরিদ করেন দেশী বা বিদেশী বাজারে বিক্রির জন্য। অন্য দিকে, শিল্পীরা নতুন নকশার দু' পাঁচটা জিনিস তৈরি করলেও সনাতন ছাঁদের পণ্যও যথেষ্ট পরিমাণে উৎপন্ন করে থাকেন। সেজন্য এসব জাতের অর্ডারও তাঁরা সরাসরি পান তাঁদের কুলীন ক্রেতাদের কাছ থেকে, যা দূর মফস্বলে বসে থাকলে কখনও পেতেন কিনা সন্দেহ। এইভাবে প্রাচীন ঐতিহ্যের ক্ষতি না করে (এমন কি কোন কোন ক্ষেত্রে তার শ্রীবৃদ্ধি করে) বহু কুটিরশিল্পী নতুন নকশা, মডেল প্রভৃতিরও চর্চা

করবার অবকাশ পাচ্ছেন।

বারুইপুর কেন্দ্রে যেসব উন্নত যন্ত্রপাতির উদ্ভাবন করা হয়েছে তার অনেকগুলি বিদ্যুৎচালিত বলে বিদ্যুৎশিহীন গ্রামাঞ্চলে এখনও তাদের প্রসার সম্ভবপর হয়নি। সেজন্য, বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে, পাদানিচালিত পালিশ করবার যন্ত্র বা টার্নিং-এর সহজ যন্ত্রপাতির নকশা সরবরাহ করা হয় যাতে গ্রামের কারিগররা নিজেরাই সেগুলি তৈরি করে নিতে পারেন। কাছাকাছি অবস্থিত সার্জিক্যাল ইনস্ট্রুমেণ্ট ফ্যাক্টরীতে প্রশিক্ষণ দেবার জন্য এহেন সাদাসিধা যন্ত্র রাখাও হয়, আবার শিল্পীদের বিকল যন্ত্রগুলি সারিয়েও দেওয়া হয়।

রাসায়নিক অগ্রগতির ক্ষেত্রে, নিরন্তর গবেষণার ফলে বাঁশের ঘুণধরা রোধ ও বাঁশ ব্লীচ করবার পদ্ধতি আবিষ্কার করে সে জ্ঞান সংশ্লিষ্ট কারিগরদের মধ্যে বিতরণ করা হচ্ছে। সামুদ্রিক ঝিনুকে যে গোলাপী আভা থাকে তা দূর করে মুক্তার ঔজ্জ্বল্য আনবার উপায়ও বার করা হয়েছে। প্রসঙ্গত, এজাতীয় ঝিনুক ভারত-মহাসাগরীয় দ্বীপগুলি থেকে সংগ্রহ করে জাপান তার বিবিধ কুটিরশিল্পে বহুল পরিমাণে ব্যবহার করে থাকে কিন্তু সংশ্লিষ্ট রাসায়নিক প্রক্রিয়াগুলি এত গোপন রাখা হয় যে তা জানবার উপায় নেই। দেশী বেতকে ব্লীচ করে মল্লাক্কা বেতের মতো রং ও টেক্সচার আনা সম্ভব হয়েছে যাতে দেশী বেতশিল্পের উন্নতির সম্ভাবনা বৃদ্ধি পেয়েছে প্রচুর। শিশল তন্তুতেও যে হাতির দাঁতের মতো সামান্য হলদেটে রং থাকে তা দূর করে ধবধবে সাদায় পরিণত করা গিয়েছে। ফলে, এ উপকরণটিকে এখন আরও পাঁচ রকম কাজে লাগানো সম্ভব হবে। বাটিকের কাজ-করা ছাতা শৌখিন মহিলাদের প্রিয় হলেও আচ্ছাদনী কাপড়কে জলনিরোধক করা এতদিন এক সমস্যা ছিল। বারুইপুর কেন্দ্র এ প্রশ্নেরও সমাধান করেছেন।

বেশ কিছুদিন আগে, আমি যখন একাধিকবার এ কেন্দ্র পরিদর্শন করি, তখনকার কথাই লিখলাম। সন্দেহ নেই, ইতিমধ্যে আরও নতুন নতুন প্রক্রিয়া আবিষ্কৃত হয়েছে এবং আমাদের অবহেলিত কুটিরশিল্পগুলি তা থেকে লাভবান হচ্ছে। এ কেন্দ্রে নিবিড় উন্নয়নের জন্য যে কুটিরশিল্পগুলিকে নির্বাচিত করা হয়েছে তাদের কথাই এতক্ষণ বললাম। তাছাড়া মাটির ভাস্কর্য ও খেলনা-পুতুল এবং কাঠ-খোদাইয়ের কাজও কিছু কিছু হয় বারুইপুর কেন্দ্রে। বলা বাহুল্য, সেখানেও নিত্যনতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে যাতে উৎপন্ন দ্রব্য আধুনিক রুচিসম্মত হয়, যাতে ক্রেতার দৃষ্টি আকর্ষণ করা যায় সহজেই।

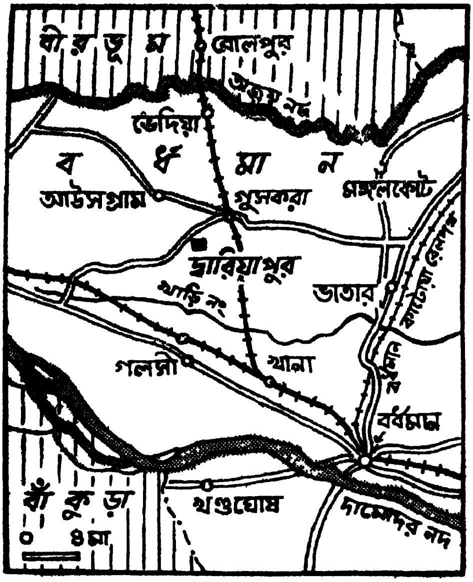
প্রশ্ন উঠবে, খরিদ্দারদের মনোরঞ্জনের তাগিদে আমাদের গ্রামীণ শিল্পগুলির 'চরিত্র' এভাবে পরিবর্তিত করা ঠিক কিনা। আমি যতদূর বুঝি, নিছক নীতিগতভাবে পুরাতন ঐতিহ্যই হয়ত আঁকড়ে থাকা উচিত। কিন্তু তাতে সাবেকিয়ানা বাঁচলেও অনেক ক্ষেত্রে কারিগরদের মৃত্যু অবধারিত,—যেমন ঘটেছে আমাদের বহু প্রাচীন কুটির-শিল্পের বেলায়। আমি সেজন্য এ প্রসঙ্গে একটুও শুচিবায়ুগ্রস্ত নই। শিল্পী মারা গেলে, তার শিল্প কি করে বাঁচে সেকথা বোঝা দুষ্কর। তবুও এবিষয়ে নানা মুনির নানা মত। অচলায়তনপন্থীরা এসব ক্ষেত্রে কোনরকম পরিবর্তনের পক্ষপাতী নন। এহেন অনড় মনোভাবের জন্যই আমাদের বহু উৎকৃষ্ট কুটিরশিল্প ইতিপূর্বেই লোপ পেয়েছে। আধুনিক প্রয়োগকৌশলের প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে যদি একালের ক্রেতাদের রুচির দিকেও তীক্ষ্ন দৃষ্টি না রাখা হয় তাহলে গ্রামীণ শিল্পগুলির পুনরুজ্জীবনের আশা দুরাশা। বারুইপুরের হস্তশিল্প-কেন্দ্রটি বহুদিন যাবৎ সে অভীষ্টলাভের চেষ্টাই করছে।

দ্বারিয়াপুর

সাহেবগঞ্জ লুপ-লাইনে বর্ধমানের চার স্টেশন পরে গুসকরা। ট্রেন থেকে নেমে মানকড়গামী বাস পাবেন; সাইকেল রিকশা পাবেন। পিচ রাস্তা বরাবর সোজা চলে আসুন চার মাইল দূরের দ্বারিয়াপুর গ্রামে। সমৃদ্ধ গ্রাম; পোস্ট-অফিস প্রভৃতি আছে। কিন্তু আমার কাছে এ পল্লীর গুরুত্ব সেজন্য নয়। এখানকার এক পাড়ায় যে তেইশ-চব্বিশ ঘর ডোকরা কর্মকারের বাস, তাঁরাই আমার অভিনিবেশের বিষয়। ডোকরাদের এত বড় কলোনী পশ্চিমবাংলায় আর নেই। আরও আশ্চর্যের কথা, প্রায়-যাযাবর এই শিল্পিগোষ্ঠী সরকারী প্রচেষ্টায় এখানে স্থায়ী আস্তানা পেয়েছেন ও সরকারী সাহায্যেই খুঁজে পেয়েছেন সমৃদ্ধির পথ।

বাঁকুড়া ও মেদিনীপুর জেলাতেও ডোকরা কামাররা বিক্ষিপ্তভাবে বাস করেন। বাঁকুড়া শহরের উপকণ্ঠে সাত-আটটি পরিবারের এক গোষ্ঠীকে অনেকদিন আগে দেখেছিলাম। ওড়িশার কটক, ময়ূরভঞ্জ ও বাস্তার জেলাতেও তাঁদের দেখা যায়। সকলেই অতি দরিদ্র। এত দরিদ্র যে তালপাতা, শালপাতা প্রভৃতি দিয়ে কোন রকমে ছোট ছোট কুটির বানিয়ে তাতে সপরিবারে বাস করেন। পুরুষদের পরনে সাধারণত একটিমাত্র নেংটি আর মেয়েদের ছেঁড়া একপ্রস্থ গামছা। তাতে লজ্জা নিবারণ হয় না। আহার—সকালে ভাতের ফেন ও সন্ধ্যায় জলে-ভেজানো সেই একই ভাত। অথচ, এই মুষ্টিমেয় ও ক্ষয়িষ্ণু কর্মকারগোষ্ঠীর তৈরি শিল্প-নিদর্শন প্রায় সব সংগ্রহশালারই গর্বের বস্তু; কিছু কিছু আবার উচ্চ-মধ্যবিত্ত বঙ্গসংস্কৃতিপ্রেমীদের ড্রইং-রুমের শোভাবর্ধনও করে থাকে।

অল ইন্ডিয়া হ্যান্ডিক্রাফট্‌স বোর্ডের অধীন পূর্বাঞ্চলীয় ডিজাইন সেণ্টারের দৃষ্টি যখন দ্বারিয়াপুরের ডোকরাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়, তখন তাঁদেরও অবস্থা ছিল একই রকম। লোকশিল্পের যে উৎকৃষ্ট নিদর্শনগুলি তাঁরা তৈরি করতেন, মহাজনরা তা কিনে নিত নামমাত্র মূল্যে। মহাজনদের কাছে আকণ্ঠ ঋণেও তারা ডুবে ছিলেন। দিন গুজরানের জন্য গৃহস্থবাড়ির ভাঙা বাসনকোসন মেরামত করাই তখন তাঁদের জীবিকার প্রধান অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। মানে, প্রাণরক্ষার তাগিদে, অতি প্রাচীন এই শিল্পরীতিটি পরিত্যাগ করে তাঁরা অন্য জীবিকার দিকে ঝুঁকেছিলেন—যেমন নাকি আর পাঁচটা উৎকৃষ্ট কুটিরশিল্পের ক্ষেত্রেও হয়েছে। সর্বনাশ যখন সমুৎপন্ন তখন সাহায্যের আশ্বাস নিয়ে এলেন পূর্বাঞ্চলীয় ডিজাইন সেণ্টারের কর্তৃপক্ষ, বিশেষ করে সে সংস্থার পরিচালক শ্রীপ্রভাস সেন। ভাস্কর হিসেবে খ্যাতির অধিকারী হলেও পশ্চিমবঙ্গের লোকশিল্পের প্রতি গভীর মমত্ববোধের জন্যও তাঁর সুপরিচিত হওয়া উচিত। শ্রীসেন



ও তাঁর সংস্থা দ্বারিয়াপুরের ডোকরাগোষ্ঠীর জন্য যা করেছেন, সে প্রসঙ্গে আসবার আগে ডোকরা-শিল্পের মোটামুটি একটা বিবরণ দেওয়া প্রয়োজন।

*

প্রাচীন বাংলায়, নানা প্রয়োজনে যে বাঁশ ও বেতের যথেষ্ট ব্যবহার ছিল তাতে সন্দেহ নেই। ডোকরাদের তৈরি ধাতুমূর্তির গঠনপ্রকরণ থেকে সহজেই বোঝা যায়, দূর অতীতের কোন সময়ে বাঁশ ও বেতের উপকরণের বদলে এই শিল্পটিতে ধাতুর, বিশেষত পিতলের, ব্যবহার আরম্ভ হয়। তার আগে এজাতীয় শিল্পদ্রব্যগুলি বাঁশ বা বেতের চিলতে দিয়েই হয়ত তৈরি হত। হাতি ঘোড়া মাছ ময়ূর হরিণ প্রভৃতি পশুপক্ষী, লক্ষ্মীনারায়ণ মহিষমর্দিনী রাবণ হনুমান প্রভৃতি পৌরাণিক চরিত্র, প্রদীপ পিলসুজ কাজললতা ঝাঁপি ধানচাল মাপবার 'কুনকে' প্রভৃতি তৈজসপত্র নির্মাণে ডোকরাদের কৃতিত্ব সুবিদিত। সেসব কারুকৃতিতে লোকশিল্পের প্রভাব যে কতদূর স্পষ্ট তা এ বই-এর অন্যত্র মুদ্রিত ছবিটি থেকেই প্রতীয়মান হবে। অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নিখুঁতভাবে গড়বার সেখানে কোন মাথাব্যথা নেই, যেমন থাকে না হাতে-গড়া, নাক-টেপা কাঁচা বা পোড়ামাটির খেলনা-পুতুলে। কিন্তু এই উভয়বিধ শিল্পসৃষ্টিই গ্রামীণ সারল্য ও আশ্চর্য জীবনীশক্তিতে সমুজ্জ্বল, যা লোকশিল্পের প্রাণস্বরূপ।

ডোকরারা যে উপায়ে মূর্তি ও তৈজসপত্র প্রভৃতি তৈরি করে থাকেন, ফরাসী ভাষায় তাকে বলে 'সিরে পারদ্যু' পদ্ধতি। আন্তর্জাতিকভাবে ব্যবহৃত এ ফরাসী নামের বাংলা পরিভাষা হওয়া উচিত 'গলানো-মোম' পদ্ধতি। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের ডোকরারা মোমের পরিবর্তে সাধারণত অন্য উপকরণ ব্যবহার করে থাকেন। প্রথমে অভীষ্ট মূর্তির আদলে বালিমাটির একটি মডেল তৈরি করে নেওয়া হয়। তারপর রজন অথবা ধুনো সরষের তেলে ফুটিয়ে এমন এক ক্বাথ বানানো হয় যা স্থিতিস্থাপক, অর্থাৎ টানলে লম্বা হয় আবার গরম করলে মোমের মত গলেও যায়। অতঃপর বালিমাটির প্রাথমিক মডেলটির গায়ে কোন কোন জায়গায় ক্বাথের ফিতে বা লেত্তি লম্বালম্বি ও আড়াআড়িভাবে সাজিয়ে আর কোন কোন স্থানে ক্বাথের প্রলেপ দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয় জমাটভাবে। বালিমাটির

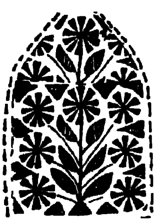
কেন্দ্রীয় মডেলটি এভাবে দ্রবণীয় ক্বাথের আবরণে আবৃত হলে সেটিকে আগাগোড়া নরম মাটির পুরু আস্তরণে ঢেকে সবটা রোদে শুকিয়ে নেওয়া হয়। বাইরের মাটির আবরণের স্থানে স্থানে ফুটো রাখা হয়, যাতে সমস্ত পিন্ডটিকে গরম করলে ভিতরের ক্বাথ গলে গিয়ে সেসব ছিদ্রপথে বার হয়ে আসতে পারে। এইভাবে ভিতরের ক্বাথ বার করে দিয়ে, অন্য সব ফুটো বন্ধ করে একটিমাত্র ছিদ্রপথে গলানো পিতল ভিতরের ফাঁপা অংশে ঢেলে দেওয়া হয়। ছাঁচের মধ্যে গলিত ধাতু জমে যাবার পর বাইরের মাটির আবরণ ভেঙে প্রাথমিক মূর্তিটি বার করে আনা হয়। বালিমাটির যে প্রাথমিক মডেলটি ধাতুর আচ্ছাদনের ভিতরে থেকে যায়, কোন কোন ক্ষেত্রে তা স্থানচ্যুত করা হয় না। মূর্তির গায়ে জাফরি-কাটা অংশ যেখানে কম বা একেবারেই নেই, সেসব ক্ষেত্রেই এ রীতিটি প্রযোজ্য। কিন্তু জাফরি-কাটা অংশ যেখানে বেশী সেখানে বালিমাটির ডেলাটিকে খুঁচিয়ে বার করে দেওয়া হয় যাতে বাইরে থেকে এই দৃষ্টিকটু পিন্ডটি না দেখা যায়। তারপর উকো প্রভৃতি অতি সাধারণ হাতিয়ার দিয়ে অল্পবিস্তর নকাশি কাজ ও পালিশ শেষ হলে শিল্পবস্তু তৈরি সমাপ্ত হয়।

পশ্চিমবঙ্গের বাইরে কোন কোন অঞ্চলের ডোকরারা ছাঁচের ভিতরে ফাঁপা অংশ সৃষ্টি করবার জন্য মোম ব্যবহার করেন শুনেছি। দক্ষিণভারতে কুম্ভকোনমের অদূরবর্তী গ্রাম স্বামীমালাই-এর ব্রোঞ্জ-মূর্তিশিল্পীদেরও 'সিরে পারদু' পদ্ধতিতে মোম ব্যবহার করতে দেখেছি। বংশানুক্রমিকভাবে বহু শতাব্দী ধরে তারা একাজে নিযুক্ত আছেন। জগৎজোড়া খ্যাতির অধিকারী দক্ষিণভারতের কিছু কিছু প্রাচীন ব্রোঞ্জমূর্তি (নটরাজ, অম্বিকা প্রভৃতি, যা এখন তাঞ্জোর ও মাদ্রাজ মিউজিয়মে রক্ষিত) সম্ভবত তাঁদেরই পূর্বপুরুষের কীর্তি। অভীষ্ট মূর্তিটি তাঁরা প্রথমে নিরেট মোম দিয়ে তৈরি করে নেন। খুব নরম উপাদানে তৈরি বলে প্রাথমিক মডেলটি কারুকার্যখচিত ও সূক্ষ্ম করে গড়তে অসুবিধা হয় না। তারপর তাকে মাটির আবরণে ঢেকে, তাপপ্রয়োগে ফাঁপা করে নিয়ে, সে ফাঁপা অংশে গলিত ব্রোঞ্জ ঢেলে, যথাকালে আচ্ছাদনটি ভেঙে নিরেট ব্রোঞ্জের মূর্তি বার করে আনা হয়। শেষ পর্যায়ের নকাশি কাজগুলি করা হয় সব শেষে। এই প্রাচীন পদ্ধতির সঙ্গে ডোকরা শিল্পের মূল পার্থক্য এই যে, শেষোক্ত ক্ষেত্রে অধিকাংশ সময়েই শিল্পবস্তুগুলি নিরেট না হয়ে হয় ফাঁপা। সেজন্য যে একটু পৃথক কারিগরির প্রয়োজন হয় তা আগেই বলেছি। আর এক পার্থক্য, ডোকরারা সর্বদাই পিতল ব্যবহার করে থাকেন—ব্রোঞ্জ, তামা বা কোন মিশ্রিত ধাতু তাঁরা কোথাও কাজে লাগান বলে শুনিনি। বড় বড় মূর্তিগুলি অনেক সময় তাঁরা আলাদা আলাদা অংশে ঢালাই করে পরে তাপপ্রয়োগে জুড়ে নেন।

দরিদ্র ভ্রাম্যমাণ ডোকরারা বাড়ি বাড়ি ঘুরে পিতলের পুরনো তৈজসপত্র গালিয়ে ফরমাশমত গৃহস্থের ব্যবহার্য নতুন জিনিসও তৈরি করে দিয়ে থাকেন। যাঁদের দিন একেবারে চলে না তাঁরা শুধু ঝালাই-এর কাজও করেন বাধ্য হয়ে। দ্বারিয়াপুরের ডোকরারা আর্থনীতিক দুরবস্থার এই শেষ স্তরে এসে পৌঁছেছিলেন যখন আঞ্চলিক ডিজাইন সেণ্টার-এর কর্মীরা তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেন।
রোগব্যাধিতে ও মহাজনের কাছে ঋণের দায়েও তাঁরা তখন আকণ্ঠ নিমজ্জিত ছিলেন। প্রথম পরিদর্শনেই বোঝা যায়, দ্বারিয়াপুরের তৎকালীন ১৮ ঘর ডোকরা কর্মকারের মধ্যে অন্তত এমন কয়েকজন কুশলী কারিগর আছেন যাঁদের নতুন কোন পদ্ধতি বা 'মোটিফ' শেখানোর কিছুমাত্র প্রয়োজন নেই; দরকার, উঞ্ছবৃত্তির অবমাননা থেকে বাঁচিয়ে, বংশগত কাজ যথেষ্ট পরিমাণে যোগাড় করে দিয়ে তাদের একটা স্থায়ী উপার্জনের ব্যবস্থা করা। সে সময়কার সবচেয়ে দক্ষ শিল্পী, শম্ভু ও বৈকুণ্ঠ কর্মকারকে

এই উদ্দেশ্যে কলকাতার ডিজাইন সেণ্টারে এনে দৈনিক দশ টাকা মজুরিতে সাবেক ও প্রায়-ভুলে-যাওয়া মডেলগুলির অনুশীলনে নিযুক্ত করা হয়। প্রভাস সেন মশায়ের কাছে শুনেছি—এই দু'জন নিপুণ কর্মীকে যখন জানানো হয় যে তাঁরা দৈনিক দশ টাকা মজুরি পাবেন তখন তাঁরা বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে যান, কেননা তার আগে তাঁদের মাসিক আয় এর থেকে বেশী ছিল না। আর একটি সুচিন্তিত কাজ করেছেন ডিজাইন সেণ্টার —নব্য রুচির কোন 'মোটিফ' কর্মকারদের উপর আরোপ করবার চেষ্টা করেননি। কেননা তাঁরা নিশ্চিতভাবেই জানতেন যে দেশী ও বিদেশী বাজারে সাবেক ধরনের শিল্পদ্রব্য-গুলির যথেষ্ট চাহিদা হবার প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে। প্রথম দু'জন কর্মী নতুন ধ্যানধারণা নিয়ে গ্রামে ফিরে যাবার দু'তিন বছরের মধ্যেই—
দ্বারিয়াপুরের ডোকরা কর্মকাররা প্রায় আশি হাজার টাকার শিল্পসম্ভার উৎপন্ন করেন যা ভারত ও ভারতের বাইরে বিক্রি করতে কোনই অসুবিধা হয়নি। দ্বারিয়াপুরে এখন ২৩।২৪ ঘর কর্মকারের বাস। তাঁরা সকলেই স্থানীয় সমবায় সমিতির সভ্য। সমিতির উদ্বৃত্ত অর্থ ও দশ হাজার টাকার সরকারী অনুদানে তাঁরা নিজেদের 'ওয়ার্ক-শেড' ও গুদামঘর বানিয়ে নিয়েছেন। ডিজাইন সেণ্টারেব তত্ত্বাবধানে বিপণনের ব্যবস্থা থাকায় প্রতি শিল্পী পরিবারের মাসিক আয় এখন দাঁড়িয়েছে প্রায় ২৫০ টাকা, যা কয়েক বছর আগে কল্পনাতীত ছিল। তাঁরা এখন নিজেদের জমিতে, নিজেদের কুঁড়েঘরে বাস করেন —মহাজনের অত্যাচারে যেকোন সময়ে ভিটেছাড়া হতে হয় না। ছেলেমেয়েরা স্কুলে যাচ্ছে। তাদের একজন উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে কিন্তু সেজন্য বাপ-ঠাকুরদার পেশা ছাড়েনি। সেও একজন দক্ষ কারিগর। স্কুল-কলেজের আধুনিক শিক্ষার কুফল যে এখানে প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি সেটা রীতিমত সুখবর।

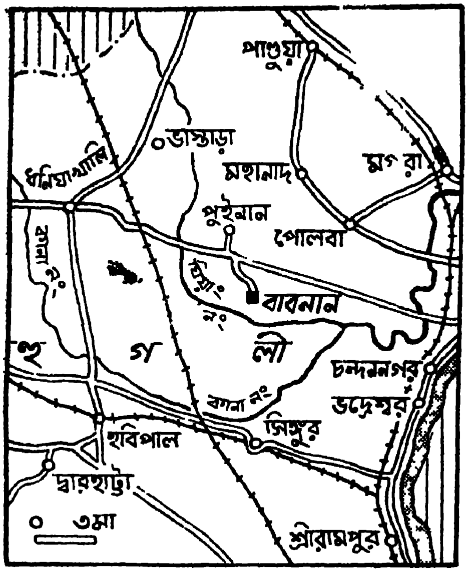
আমাদের ক্ষয়িষ্ণু কুটিরশিল্পের পুনরুজ্জীবনেব ক্ষেত্রে বর্ধমান জেলার এই অখ্যাত গ্রাম দ্বারিয়াপুর এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্তস্বরূপ। সেখানকার অধিবাসীদের মাথাপিছু আয় অনেক বেড়েছে সেটা সুখের কথা হলেও সব চেয়ে বড় কথা নয়। বড় কথা হল, তাঁরা আত্মপ্রত্যয় ফিরে পেয়েছেন আর পেয়েছেন ভবিষ্যতেব মোকাবিলা করবার জন্য এক বলিষ্ঠ বিশ্বাস। সাবেক কারিগরি রীতিনীতির অহেতুক পরিবর্তন না করে গ্রামীণ শিল্পের শুষ্ক ধমনীতে রক্তসঞ্চারের যে ব্যবস্থা দ্বারিয়াপুরে সফল হয়েছে, অন্যান্য কুটিরশিল্পের ক্ষেত্রেও তার সাফল্য হয়ত কষ্টকল্পনা নয়।



বাবনান

জীবিকাগত কারণে হুগলী জেলায় একদা বাস করেছিলাম প্রায় দু'বছর। সতত ভ্রাম্যমাণ থাকাটা ছিল সে-জীবিকার রীতি আর জেলাকে তন্নতন্ন করে জানাটা সে-পেশার আবশ্যিক অংগ। তবু, সদর শহর চুঁচুড়া থেকে মাত্র দশ-পনের মাইল দূরের পল্লীগ্রামে এক অভিনব কুটিরশিল্পের খবর পেলাম প্রথম বছর শেষ হওয়ার পর এবং সময়টা ঘোর বর্ষাকাল হলেও ক্যামেরাপাতি গুছিয়ে নিয়ে আর এক নতুন অভিজ্ঞতার সন্ধানে রওনা হয়ে গেলাম বাবনান গ্রামের দিকে। হুগলী জেলার সদর মহকুমার দাদপুর থানায় এই গ্রাম ও তার চিকন শিল্পের অস্তিত্ব সম্বন্ধে হুগলীর এক সদাপর্যটনশীল আমলাও যদি এত দীর্ঘ দিন অজ্ঞ থাকতে পারেন, তবে, অনুমান করি, এ প্রবন্ধের দূরস্থিত পাঠকেরা এবিষয়ে কিছুমাত্র ওয়াকিবহাল নন।

চুঁচুড়া রেল-স্টেশনের লাগোয়া উত্তরে, রেল-লাইনের আড়াআড়ি যে পিচের রাস্তা সিধা পশ্চিমে চলে গেছে, তাতে অহরহ বাস চলে ধনিয়াখালি, দশঘরা, তারকেশ্বর অবধি। পরিধেয়কুশলা কল্পিত পাঠিকাদের কাছে ধনিয়াখালি নামটা হয়ত চিত্ত-বিক্ষেপের কারণ হতে পারে। এত মিহি সুতোর, এত রকমারি ও সুদৃশ্য তাঁতের শাড়ি পশ্চিমবাংলার খুব কম কেন্দ্রেই উৎপন্ন হয়। সে যাই হোক, ধনিয়াখালিগামী এই সড়কের উপরই, চুঁচুড়া রেল-স্টেশন থেকে দশ মাইল দূরে, পুইনান গ্রাম, যেখান থেকে কাঁচা রাস্তায় বাবনানের দূরত্ব আর তিন মাইল। চুঁচুড়া থেকে বাসবাহিত হয়ে পুইনান অবধি আসা কিছুমাত্র ক্লেশকর নয় কিন্তু বর্ষাকালে শেষের তিন মাইল পথ অগম্যই বলা চলে। গরুর গাড়িও তখন এপথে চলতে ভয় পায়। যদি এ প্রবন্ধ কোনো পাঠক-পাঠিকাকে বাবনান ভ্রমণের উৎসাহ জোগায়, তবে তাঁকে আমি পরামর্শ দেব শীতকালে আসতে। পুইনান গ্রামে, পিচের রাস্তার ধারে, জেলাবোর্ডের একটি ছোট পরিচ্ছন্ন ডাকবাংলো আছে। সেখানে যাত্রাবিরতি ও বিশ্রামের জন্য জেলাবোর্ডের ইঞ্জিনীয়ার মহোদয়কে আগেভাগে চিঠি লিখলে অনায়াসেই ব্যবস্থা হতে পারে। বাবনান গ্রামের চিকন শিল্পের উৎকৃষ্টতম নিদর্শনগুলি কয়েকটি কারিগর পরিবারের সযত্নরক্ষিত সম্পত্তি। সাধারণত বিক্রয়যোগ্য নয় বলে সেগুলি দেখতে সামান্য ক্লেশ স্বীকার করে এখানে আসা ছাড়া অন্য উপায় নেই। এই প্রীতিপ্রদ অভিজ্ঞতা লাভের জন্য বাস চলাচলের সড়ক থেকে পদব্রজে তিন আর তিনে ছয় মাইল ভ্রমণ যে কিছুমাত্র পণ্ডশ্রম নয় এমনই আশ্বাস আমি দেব সেসব কল্পিত পাঠকপাঠিকাকে। চিকনের কাজ বলতে বাঙালী জনসাধারণ সাদা জমিনের উপর ছিদ্রবহুল ফুলতোলা নকাশি কাজকেই বুঝে থাকেন। এজাতীয় কারিগরি লখনউ অঞ্চলের বিশেষত্ব। বোতাম-সেলাইয়ের অজস্র ব্যবহারে ও সূক্ষ্ম



কারিগরির নিপুণ প্রয়োগে লখনউ-এর চিকন কোন কোন ক্ষেত্রে বেশ উঁচুদরের শিল্প-বস্তু। শাড়ির জমিন ও পাড়ে, মিহি কাপড়ের মুসলমানী টুপিতে বা আদ্দির পাঞ্জাবির কাঁধে-বুকে এরকম চিকনের কাজ অনেকেই দেখে থাকবেন। বাবনান ও সন্নিহিত আর কয়েকটি গ্রামের শিল্পীরা কিন্তু এজাতীয় শিল্পসৃষ্টিতে অনভ্যস্ত। তাঁদের কাজ প্রধানত চার শ্রেণীতে বিভক্ত, শিল্পীদের নিজেদের ভাষায় যেগুলির নাম—কাটা-কাপড়ের কাজ, 'শ্যাডো'র কাজ, ঝাঁজের কাজ ও এমব্রয়ডারি।

কাটা-কাপড়ের কাজের ক্ষেত্রে জমিনের উপর পূর্বাহ্নে 'ট্রেস'-করা নক্‌শা বরাবর বোতাম সেলাই শেষ হবার পরে জমিনের অপ্রয়োজনীয় অংশগুলি সেলাই-এর পিছন দিক থেকে ছোট ধারালো কাঁচি দিয়ে কেটে বাদ দেওয়া হয়। ফলে, নকাশি ভরাট অংশ ও বাদ-দেওয়া ফাঁকা অংশের সমন্বয়ে রকমারি সুদৃশ্য প্যাটার্নের সৃষ্টি হয়ে থাকে। এইটিই সাধারণ্যে চিকনের কাজ বলে পরিচিত, যদিও লখনউ এর চিকনের থেকে এর পার্থক্য প্রচুর। সহজেই অনুমান করা যায়, আচ্ছাদনী বস্ত্র (টেবল-ক্লথ, বেড-কভার প্রভৃতি) এই পদ্ধতিতে অপরূপ শ্রীমণ্ডিত হতে পারে।

প্রসঙ্গত, কাপড়ের উপর নকশা 'ট্রেস' করবার যে সহজ গ্রাম্য উপায়টি বাবনানের শিল্পীরা অবলম্বন করে থাকেন, সেবিষয়ে দু'কথা বলে রাখি। নকশা-আঁকিয়েরা প্রায় সকলেই পুরুষ, যদিও সূচীশিল্পীরা প্রায় সকলেই স্ত্রীলোক। পুরুষ চিত্রকরের প্রথমে পেন্সিল দিয়ে সাদা কাগজের উপর প্রয়োজনীয় ডিজাইনটি এঁকে নেন। তাঁদের ভাণ্ডারে তৈরী ডিজাইনের নমুনাও অল্পবিস্তর সঞ্চিত থাকে। শিক্ষানবিস ছোট ছোট ছেলেরা তারপর ছুঁচ দিয়ে নকশার প্রতিটি রেখা বরাবর অসংখ্য ফুটো করে কাগজে। ইতিমধ্যে পাতলা কালো রঙ তৈরি করা হয় কেরোসিনে কাঠকয়লা ভিজিয়ে। সেই রঙ, ছিদ্রযুক্ত নকশার কাগজটিকে কাপড়ের উপর চেপে ধরে, তার উপর বুলিয়ে দেওয়া হয় ন্যাকড়ার সাহায্যে। ছিদ্রপথে জমিনের উপর যে অগণিত বিন্দুর ছাপ পড়ে, তা থেকে সম্পূর্ণ ডিজাইনটি স্পষ্ট বোঝা যায়। শাড়ির পাড় বা বেড-কভার ইত্যাদির ধার বরাবর লম্বা কোনো নকশা আঁকবার প্রয়োজন হলে, একটি ডিজাইনকে বারংবার

পাশাপাশি 'ট্রেস' করে দীর্ঘায়িত নকশার সৃষ্টি করা হয়ে থাকে।

কাটা-কাপড়ের কাজে দীর্ঘ পরিশ্রমসাপেক্ষ সূক্ষ্ম নকশার ব্যবহার আজকাল আর হয় না বললেই চলে। উপযুক্ত পারিশ্রমিক দিতে আগ্রহী ক্রেতার অভাবই এর কারণ। বাবনানের শিল্পীরা সখেদে আমাকে বলেছেন, উৎকৃষ্ট বেড-কভার প্রভৃতি তাঁরা একদা শতাধিক টাকাতেও বিক্রি করতে পারতেন। বর্তমান বাজার, কুড়ি-পঁচিশ টাকার বেশী নয় এবং টেবল-ক্লথ প্রভৃতি ছোট মাপের জিনিসের জন্য পাঁচ-সাত টাকার বেশী দর পাওয়া প্রায় অসম্ভব। দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধি ও বর্তমান মন্দার বাজার যে এই শিল্পিগোষ্ঠীকে, এমন কি তাঁদের শিল্পনৈপুণ্যকে, বিরূপভাবে প্রভাবিত করেছে তাতে সন্দেহ নেই।

ইংরেজীতে যাকে বলে 'পট-বয়লার্স', তেমন রুজি-রোজগারের পণ্য হিসেবে সস্তা দামের কাটা-কাপড়ের কাজ বাবনানে এখনও যথেষ্ট পরিমাণে উৎপন্ন হয় কিন্তু স্থানীয় সুদক্ষ শিল্পীদের প্রতিভা বরাবরই বিকশিত হয়েছে 'শ্যাডো'র কাজ বা এমব্রয়ডারিতে। 'শ্যাডো'র কাজে অরগ্যাণ্ডি বা ঐ জাতীয় খুব মিহি কাপড়ের উলটো পিঠ থেকে ঘনসন্নিবিষ্ট সেলাই-এর সুতোর আভা ('শ্যাডো') সোজা পিঠে ফুটে উঠবে এই রীতি। এই কারুকৃতিতে সাধারণত খুব চড়া রঙের সুতো ব্যবহার করা হয়ে থাকে এবং সেলাই-এর পদ্ধতি অনুসারে, নকশার প্রান্ত বরাবর সে-সুতোর ছোট ছোট ফোঁড় ওঠে সামনের পিঠে। আর, পিছনের দিকে, জমিনের উপর দিয়ে আড়াআড়ি বা কোণাকুণিভাবে টেনে নিয়ে সেলাই-এর সুতোর ঠাস বুনানিতে নকশার ভিতরের সমস্ত অংশটিকে ভরাট করে ফেলা হয়। সেলাই শেষ হলে, সোজা পিঠে ফোঁড় প্রায় কিছুই দেখা যায় না, কিন্তু উলটো পিঠের ভরাট নকশার মৃদু আভা অরগ্যাণ্ডির পাতলা আবরণ ভেদ করে ফুটে ওঠে আশ্চর্য কমনীয়তায়। উগ্র রঙের বাড়াবাড়ি, সেলাই-এর প্রায় সব শাখাতেই আজকাল অল্পবিস্তর নজরে পড়ে। কিন্তু খাঁটি শিল্পীর কাজ রঙকে আয়ত্তে এনে সংযত পরিবেশনে দর্শকের নয়নানন্দ বিধান করা। অন্য দিকে, দর্শকদের দায়িত্বও কম নয়। এই একই সুবে তাঁদের অভিরুচিরও মেলবন্ধন হওয়া উচিত। কিন্তু এরকম যোগাযোগ কদাচিৎ ঘটে। যুবতীর থেকে বৃদ্ধার ব্যক্তিত্ব সুন্দরতর দেখবার চোখ যাঁদের তৈরি হয়েছে, অথবা ছোকরার থেকে বৃদ্ধের; চপল চাকচিক্যের পরিবর্তে ধীর প্রশান্তিই যাঁদের কাম্য; চটকদার রঙের ঝলকানি থেকে এই 'শ্যাডো'র কাজ যে তাঁদের প্রীতিকর মনে হবে এমনই আমার বিশ্বাস।

এমন এক সময় ছিল, যখন সত্যিকারের শিল্পরসিকরা এই কারুকৃতিগুলি উচ্চ মূল্যে খরিদ করতেন। আজ উৎকৃষ্ট 'শ্যাডো'র কাজের খরিদ্দার বিরল। কম দামী কাজ এখনও কিছু তৈরি হয় বটে, কিন্তু সেগুলিও উপযুক্ত দাম পায় না এই কারণে যে আধুনিক পয়সাওয়ালারা, আশংকা করি, চোখ-ঝলসানো চাকচিক্যই পছন্দ করেন বেশী।

ব্যবসায়ে নামলে ভিন্ন ভিন্ন সব রকম রুচিরই অল্পবিস্তর দাসত্ব করতে হয়। আর, বাবনানের কারিগরেরা যে লোকহিতায় শিল্পসৃষ্টি করেন না, সেকথা বলাই বাহুল্য। অতএব, অপেক্ষাকৃত চটকদার পণ্যের দিকেও তাঁদের দৃষ্টি রাখতে হয়। এই প্রয়োজনটি তাঁরা মিটিয়েছেন ঝাঁজের কাজ ও এমব্রয়ডারির সাহায্যে। কাটা-কাপড়ের কাজের মতই 'শ্যাডো'র কাজের ব্যবহার সাধারণত বেড কভার টেবল-ক্লথ প্রভৃতি আচ্ছাদন-বস্ত্রে। কিন্তু শেষোক্ত প্রণালী দু'টি ব্যবহৃত হয় ব্যাপকতর ক্ষেত্রে। আচ্ছাদন-বস্ত্র ছাড়াও শাড়ি, পরদা, কামিজ, কুর্তা, শিশুদের পরিধেয় 'বাবাস্যুট' ইত্যাদি প্রচুর পরিমাণে অলংকৃত হয় এমব্রয়ডারি ও ঝাঁজের কাজে।

এমব্রয়ডারিতে অন্যত্র অনুসৃত চিরাচরিত রীতিটি বাবনানেও অনুসরণ করা হয়;

এবিষয়ে স্থানীয় বিশেষত্ব কিছু নেই। জমিনের কাপড়ে নকশার ছাপ বরাবর রঙিন সুতোর ফোঁড় তুলে ফুল পাতা প্রজাপতি ইত্যাদির প্রতিলিপি ফোটানো হয়, যেমন অন্যত্রও মেয়েরাও করে থাকেন। বিশেষত্ব এই যে, এ গ্রামের শিল্পীরা কাপড় টানটান রাখবার জন্য কখনও গোল ফ্রেম ব্যবহার করেননি যা এখনও করেন না। তাঁদের মতে, বাঁ হাতের তর্জনী ও মধ্যমার সাহায্যে কাপড় টেনে ধরে ফোঁড় চালানোতেই অনেক সুবিধা। এবিষয়ে নবীনা প্রবীণা সকলেই একমত। আমার সাধারণ বুদ্ধিতে, ফ্রেমের স্বপক্ষে কিছু যুক্তিতর্কের অবতারণা করেছিলাম। কিন্তু বংশগত দক্ষতার প্রতীতির সামনে সেসব ছেঁদো কথা কিছুমাত্র কার্যকরী হয়নি।

এমব্রয়ডারির নকশায় বিভিন্ন রঙের ব্যবহার সম্পর্কে পুরুষ চিত্রশিল্পীরা হয়ত কখনও কখনও পরামর্শ দিয়ে থাকেন কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রঙ নির্বাচন করেন মহিলা সূচীশিল্পীরা নিজেরাই। এক্ষেত্রেও সকল ভ্রান্তি থেকে তাঁদের রক্ষা করে বংশানুক্রমিক নৈপুণ্য। এমব্রয়ডারিযুক্ত কাশ্মীরী কাজ আজকাল খুব প্রচলিত হয়েছে। কাশ্মীরী কারিগরদের সঙ্গেও একদা ঘনিষ্ঠ সংযোগ করে আমার এই ধারণা হয়েছে যে নকশার নির্বাচন ও অঙ্কন, রঙের সংযত ব্যবহার ও কারিগরের গুনশীয়ানা, প্রতিটি ক্ষেত্রেই বাবনানের শিল্পীরা তাঁদের থেকে কিছুমাত্র হীন নন। ক্রেতার রুচি অনুযায়ী রঙের চটকদার প্রয়োগ অবশ্যই অল্পবিস্তর হয়ে থাকে। কিন্তু তাতে, সাধারণভাবে, বাবনানের শিল্পীদের দক্ষতার দৈন্য প্রমাণিত হয় না। উপযুক্ত পারিশ্রমিক পেলে তাঁরাও উচ্চাঙ্গের এমব্রয়ডারির কাজ করতে পারেন। এ বই-এর অন্যত্র মুদ্রিত এমব্রয়ডারির ছবিটি এক শাড়ির পাড় থেকে নেওয়া। ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট ফটোগ্রাফে রঙের অপূর্ব বিন্যাস ধরা পড়েনি; পাঠকপাঠিকারা হয়ত সেটা অনুমান করে নিতে পারবেন। এই একই নকশার পুনরাবৃত্তি, খুব বেশী পরিমাণে আঁচলায় ও শাড়ির দুই পাড় বরাবর ঘুরে এসেছে এবং অতি সুদক্ষ কারিগরেরও যে এ কাজটি শেষ করতে অন্তত তিন মাস সময় লেগে থাকবে এমনিই মনে হয়। কমপক্ষে দৈনিক চার টাকা মজুরি ধরলেও এরকম একটি শাড়ির মজুরি বাবদই প্রায় চার শ টাকা খরচ পড়বার কথা। উপকরণ, অন্যান্য ব্যয় ও সংগত লাভের হিসাব ধরলে এ শাড়ি কিছুতেই পাঁচ শ টাকার কমে বিক্রি হতে পারে না। বলা বাহুল্য, উৎকৃষ্ট জিনিসের কদর বুঝে এত উচ্চমূল্য দেবার মত খরিদ্দার আজ অল্পই আছে। তাছাড়া বাজার এখন ছেয়ে গেছে অপেক্ষাকৃত সস্তা সিল্ক, টিস্যু, ভয়েল, নাইলন প্রভৃতির জমকালো শাড়িতে। আর, সভয়ে বলি, যাকে যেরকমই মানাক না কেন, আধুনিকাদের যে সস্তা চটকদার শাড়ির প্রতিই ঘোরতর পক্ষপাত সেকথা যেকোনো শাড়ি বিক্রেতাকে জিজ্ঞাসা করলেই জানতে পাবেন।

ঝাঁজের কাজের প্রকৃতি বা পদ্ধতি এমব্রয়ডারির থেকে বিশেষ ভিন্ন নয়। রঙিন সুতোর ফোঁড় চালিয়ে চিত্রসৃষ্টি করা এ কাজেরও রীতি তবে এক্ষেত্রে সেলাই-এর সুতোর নিপুণ টানে জমিনের উপর, পরিকল্পিত প্যাটার্ন অনুযায়ী, অসংখ্য ছোট ছোট ছিদ্রের সৃষ্টি করা হয়ে থাকে, সাধারণ এমব্রয়ডারিতে যা দেখা যায় না। রঙিন নকশায় বিন্যস্ত অগণিত ছিদ্রের সমাবেশে যে অভিনবত্বের সৃষ্টি হয়, ঝাঁজের কাজের সেইটিই বিশেষত্ব। "ঝাঁজ" কথাটি বোধ হয় "ঝাঁজরা" শব্দের অপভ্রংশ; ছিদ্রবহুল জমিন বোঝাবার জন্যই হয়ত তার উদ্ভব। এমব্রয়ডারিপটু কারিগরদের মধ্যে যাঁরা আবার বেশী পারদর্শী তাঁরাই এ কাজে হাত দিয়ে থাকেন, কেননা এ শিল্পকর্মটি বিশেষ দক্ষতাসাপেক্ষ। এমব্রয়ডারির যাবতীয় ক্ষেত্রেই ঝাঁজের কাজের প্রয়োগ হতে পারে এবং এই জাতীয় পরিমিত শ্রমের পণ্য বাবনানের শিল্পীরা যথেষ্ট পরিমাণে উৎপাদনও করে থাকেন। কিন্তু বাহুল্যতার জন্য এজাতীয় অত্যুৎকৃষ্ট শিল্পনিদর্শন আজও খুব বেশী

তৈরি হয় না।

এই রকমারি সূচীশিল্প বাবনান গ্রামের প্রায় চার হাজার অধিবাসীর প্রধান জীবিকা। তাদের অনেকের চাষবাস জমিজমা প্রভৃতি থাকলেও, এ গ্রামের আর্থিক ভিত্তি, বর্তমান মন্দার বাজারেও, এই কুটিরশিল্পটির উপরই প্রতিষ্ঠিত। গ্রামটি মুসলমানপ্রধান; অ-মুসলমানের সংখ্যা শতকরা পাঁচ ভাগের বেশী হবে না। শিল্পীরা সকলেই মুসলমান। পুরুষের ডিজাইনার, ট্রেসার, দর্জি, ফেরিওয়ালা, দোকানদার বা রপ্তানীবণিক হিসাবে কাজ করেন আর, নিতান্ত শিশু ছাড়া অন্য সব বয়সের মুসলিম মহিলাদের হাতে যাবতীয় সূচীকর্মের ভার। ন'দশ বছর বয়স থেকেই বালিকারা জ্যেষ্ঠাদের কাছে তালিম নিতে শুরু করে এবং কয়েক বছরের শিক্ষানবিসীর পর পাকা কারিগরে পরিণত হয়। অধিকাংশ মহিলা শিল্পীই গৃহকর্মের অবসানে ছুঁচসুতো নিয়ে বসতে পারেন শুধু অবসর সময়ে। কিন্তু বংশগত দক্ষতায় অতি দ্রুত তাঁদের হাত চলে আর কিশোরী থেকে অশীতিপরা বৃদ্ধাও যে এই অভিনব কুটিরশিল্পটির বিশ্বস্ত কর্মী এ আমি নিজে দেখে এসেছি। বাবনানের এই কুটিরশিল্পটি কতদিনের? এই গ্রাম ও তার আশেপাশে খোঁজখবর করে এ প্রশ্নের কোন সঠিক জবাব পাইনি। গ্রামবৃদ্ধেরাও যখন এবিষয়ে বিশেষ কিছু বলতে পারেন না তখন প্রকারান্তরে একথাই প্রমাণিত হয় যে, শিল্পটি যথেষ্ট প্রাচীন। শুরু থেকেই এ শিল্পের কারিগরি জ্ঞান শুধু এই গ্রামে সীমাবদ্ধ রাখবার জন্য এমন সতর্ক দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে যে, একেবারে আধুনিককাল ছাড়া, বাবনান গ্রামের কোনো মুসলমান মেয়ের কখনই অন্য গ্রামে বিবাহ দেওয়া হয়নি। অতি উচ্চ কন্যাপণের প্রস্তাব সত্ত্বেও অন্য অঞ্চলের পাত্রপক্ষেরা যে বিফল হয়েছেন এমন কাহিনী আমি একাধিক শুনেছি। কয়েক বছর আগে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কুটিরশিল্প বিভাগ কর্তৃক আয়োজিত বাৎসরিক গ্রামীণ শিল্প প্রদর্শনীর সময়ে এই উগ্র রক্ষণশীলতার আরও কিছু পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল। স্থানীয় সরকারী কর্মচারীদের পীড়াপীড়ি সত্ত্বেও গ্রামের কোন শিল্পীই প্রতিযোগিতায় যোগ দিতে বা শিল্পনিদর্শন পাঠাতে প্রথমে রাজী হননি। সরকারী অনুসন্ধিৎসায় পাছে 'ট্রেড সিক্রেট'গুলি জানাজানি হয়ে যায় এই ছিল তাঁদের ভয়। অবশেষে, অনেক সাধাসাধির পর, কয়েকটি নমুনা সংগৃহীত হয়েছিল যেগুলির রচয়িত্রী, বাবনানের তৎকালীন শ্রেষ্ঠ শিল্পী জোবেদা খাতুন, একাধিক 'শ্যাডো'র কাজের জন্য অনায়াসেই প্রথম পুরস্কার লাভ করেছিলেন। এই অপরূপ শিল্পনিদর্শনগুলি আমি দেখেছি। দেখে আমার মনে হয়েছে, এই আশ্চর্য সূচীকর্মগুলি দেখবার জন্য বাবনান ভ্রমণের ক্লেশ কিছুমাত্র নিরর্থক নয়।

হালফিল, এই রক্ষণশীলতা কিছুটা শিথিল হতে আরম্ভ করেছে। জনসংখ্যাবৃদ্ধি ও অন্য কারণে, বাবনানের কিছু কিছু সূচীশিল্পনিপুণা দুহিতা কাছাকাছি হারিট, আমনান, মাকালপুর প্রভৃতি গ্রামে বধূ হিসাবে উপস্থিত হয়ে এ শিল্পটির সম্প্রসারণের কারণ হয়েছেন। এ গ্রামগুলিতেও এখন চিকন শিল্পের চর্চা অল্পবিস্তর শুরু হয়েছে যদিও তাতে প্রধান ঘাটি বাবনানের চিরাচরিত সুনামের কোন হানি হয়নি।

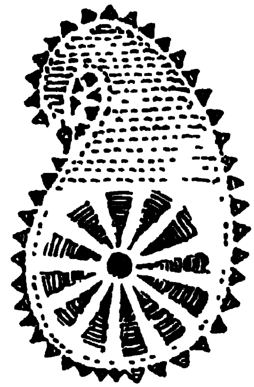
পশ্চিমবঙ্গের এক অখ্যাত পল্লীর এই অভিনব কুটিরশিল্পটি সম্পর্কে সবচেয়ে চমকপ্রদ খবর হল এই যে, একদা মধ্য-আমেরিকার অনেকগুলি দেশে এটির প্রসার বেশ কায়েমিভাবে গড়ে উঠেছিল। কি সূত্রে কিংবা কতদিন আগে এই রপ্তানী বাণিজ্য শুরু হয়েছিল সেকথা এখন সঠিকভাবে জানা যায় না। তবে বাবনানে উৎপন্ন চিকন পণ্যগুলি যে কয়েক বছর আগেও ওয়েস্ট ইণ্ডিজ, ত্রিনিদাদ, কোস্টারিকা, হণ্ডুরাস, পানামা, কলাম্বিয়া প্রভৃতি দেশে প্রচুর পরিমাণে চালান যেত সেকথা স্থানীয় গ্রামবৃদ্ধদের সকলেরই বেশ মনে আছে। এ'দের মধ্যে কয়েকজন বাণিজ্যসূত্রে সেসব দেশে ঘুরেও

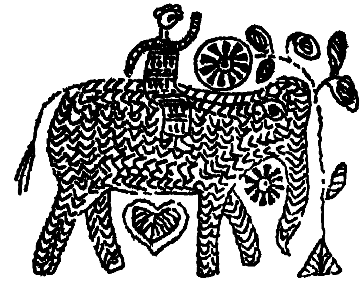
এসেছেন এবং তাঁদের জ্ঞাতিগোষ্ঠীর বহু লোক এখনও সেখানে স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন। এই অবাধ রপ্তানি বাণিজ্যের কালকেই বাবনানের চিকন শিল্পের স্বর্ণযুগ বলা যেতে পারে। দুঃখের বিষয়, সে সৌভাগ্যপর্ব আজ অবিস্মৃত কাহিনীমাত্র। গত কয়েক বছরে এসব দেশ, নিজ স্বার্থে, আমদানি নিয়ন্ত্রণ করেছে; বাবনানের পণ্য এখন আর সেখানে প্রবেশ করতে পারে না। অন্যদিকে ভারতীয় রপ্তানী বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও নানাবিধ বিধিনিষেধ আরোপিত হওয়ায় ও বিদেশী মুদ্রা বিনিময়ের ক্ষেত্রে বহুপ্রকার জটিলতার জন্য মধ্য-আমেরিকার এই ফলাও কারবার এখন বন্ধই হয়ে গেছে বলা চলে। ভারতীয় বাজারই এখন বাবনানের শিল্পীদের একমাত্র অবলম্বন। কিন্তু সে বাজারের ক্রয়ক্ষমতাও অতিশয় সীমাবদ্ধ। প্রধান খরিদ্দার মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের আজকাল সংসার-যাত্রা নির্বাহ করা এমনিতেই দুরূহ হয়ে উঠেছে। আশু প্রয়োজনের অতিরিক্ত গৃহসজ্জার এই শৌখিন উপকরণগুলি চিত্তাকর্ষক হলেও তাঁদের অনেকেরই নাগালের বাইরে। বাবনানের ফেরিওয়ালারা সেজন্য উত্তর-পূর্ব ভারতেব চা-বাগানগুলিতে অথবা বিদেশী-দের আধুনিক আস্তানা দুর্গাপুর, ভিলাই, রাউরকেলা প্রভৃতি শিল্পশহরগুলিতে অপেক্ষাকৃত বেশী দাম পাবার আশায় পণ্যদ্রব্য বয়ে নিয়ে যান। সুবিধামত দাম হয়ত পেয়েও থাকেন, কিন্তু তাতে যাতায়াতের মজুরি পোষায় কিনা সন্দেহ। কলকাতার নিউ মার্কেট ও চাঁদনিতেও বাবনানের ব্যবসায়ীদের নিজেদের দোকান আছে। দাদন দিয়ে, পারিশ্রমিক দিয়ে, উপকরণ সরবরাহ কবে গ্রামের মেয়েদের কাছ থেকে পণ্য সংগ্রহ করে এই ব্যবসায়ীরা কলকাতার দোকানগুলিতে চালান দিয়ে থাকেন। কিন্তু বিক্রীর বর্তমান ব্যবস্থা যে মোটেই সন্তোষজনক নয় সেকথা বাবনানের ব্যবসায়ীরা আমাকে বারংবার বলেছেন।

বিদেশের বাজারে একদা-সুপ্রতিষ্ঠিত এ কুটিরশিল্পটিকে খুব কাছ থেকে দেখবার সুযোগ পেয়ে আমার মনে হয়, বাবনানের শিল্পী ও ব্যবসায়ীদের নিযে, সম্ভব হলে, শক্তিশালী একটি সমবায় সমিতি অবিলম্বে গঠন করা উচিত। সংশ্লিষ্ট সবকারী কর্ম-চারীদের কাছে শুনেছি, সরকারের এবিষয়ে উৎসাহ থাকলেও কাজটি নাকি মোটেই সহজসাধ্য নয় যেহেতু গ্রামের বিত্তশালী মোড়লদের মধ্যে ঘোরতর মনোমালিন্য আছে। শহরের বাসিন্দাদের কাছে আশ্চর্য ঠেকলেও গ্রাম-বাংলাকে যাঁরা চেনেন তাঁদেব কাছে একথা অবিদিত নয় যে, হাতে কাঁচা পয়সা থাকলে পল্লীবাসী ধনবানেরা তার একটা উল্লেখযোগ্য অংশ মামলা-মোকদ্দমা বা দলাদলির অন্যান্য আনুষঙ্গিকে ব্যয় কবে থাকেন। এই সামাজিক ব্যাধি থেকে বাবনান গ্রামও মুক্ত নয। বরং ব্যাধিব প্রকোপ একটু বেশী বলেই মনে হয়, কেননা মধ্য-আমেরিকায় একদা-উপার্জিত প্রচুব অর্থ এখনও তাঁদের হাত থেকে একেবারে নিঃশেষিত হয়েছে এমন মনে করবার কোন কারণ নেই। বিরূপ সমালোচনার জন্য নয়, গভীর পরিতাপের সঙ্গেই আমি একথাগুলি বলছি এই আশায় যে, বাবনান গ্রামের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা দলাদলির ঊর্ধ্বে উঠে তাঁদের সকলেরই প্রিয় এই সুকুমার কুটিরশিল্পটির উন্নতির জন্য সচেষ্ট হবেন।

সরকারের তরফ থেকে আর যেসব দিকে অবিলম্বে হস্তক্ষেপ করা উচিত সেবিষয়ে দু'এক কথা বলি। বাবনানের শিল্পীদের দক্ষতা যথেষ্টই আছে; সেখানে সরকারী সাহায্য নিষ্প্রয়োজন। বংশানুক্রমিক নৈপুণ্যে বিদেশের বাজারেও তাঁরা একদা একচেটিয়া ব্যাবসা করেছেন। সে ব্যবসায় এখন হস্তচ্যুত হওয়ায় ভারতের সর্বপ্রান্তে যাতে এ শিল্পের কদর হয়, সরকার সেদিকে দৃষ্টি দিতে পারেন। এজন্য সরকারী মধ্যস্থতায় গ্রাম থেকে পণ্যসংগ্রহ ও অবিলম্বে তার মূল্য মিটিয়ে দেবার ব্যবস্থা হওয়া উচিত। সরকারী সেল্‌স এম্পোরিয়ামগুলির মারফত বিক্রয়ের জন্য কিছু কিছু মাল

এখনও সংগ্রহ হয় বটে, কিন্তু তার মূল্য পেতে বহু বিলম্ব হয় বলে কারিগররা আমাকে বলেছেন। গ্রাম থেকে সহজে পণ্য চালান দেবার জন্য পুইনান থেকে বাবনান অবধি তিন মাইল অতি কদর্য কাঁচা রাস্তাটিরও সংস্কার হওয়া দরকাব। আর, সর্বোপরি, মধ্য-আমেরিকার হারানো বাজারের পুনরুদ্ধার সম্ভব কিনা সে সম্পর্কে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের সক্রিয় বিবেচনা খুবই প্রয়োজন। আজ যখন বিদেশের বাজারে বিবিধ ভারতীয় পণ্যের সমাদর বাড়ানোর ব্যাপক চেষ্টা চলছে, তখন হুগলী জেলার এই চারুশিল্পটি যেন সে প্রচেষ্টার অন্তর্ভুক্ত হয় এমন দাবি অনেকেই করবেন। (এ বই প্রেসে যাবার সময় খবর পাওয়া গেল, বাবনানের চিকন শিল্পের উন্নতির জন্য পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রীসভা এক লক্ষ টাকা মঞ্জুর করেছেন।)





বাবর শা

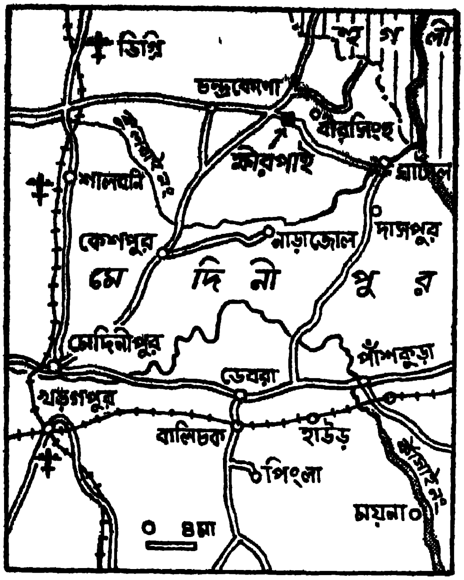
বর্তমান প্রবন্ধগুলিতে বাঙালীর সভ্যতা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে বিভিন্ন দিক থেকে উন্মোচিত করবার প্রয়াসে নানা বিষয়ের আলোচনা (অক্ষম সন্দেহ নেই) হয়ে থাকলেও বাঙালীর আহার সম্বন্ধে এযাবৎ কিছুই লেখা হয়নি। অথচ যেকোন জাতি বা সম্প্রদায়ের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য যে তার খাদ্যের সঙ্গে অন্তত কিছু পরিমাণে সম্পর্কিত তাতে সংশয় নেই। মোগলাই খানায় অভ্যস্ত বলদৃপ্ত মোগলের সঙ্গে তৎকালীন নিরামিশাষী নিরীহ ব্রাহ্মণের চরিত্রগত পার্থক্যের আর পাঁচটা কারণের মধ্যে আহার্যের প্রভেদও যে ছিল একটা তাতে সন্দেহের অবকাশ কোথায়! আবার খাদ্য-প্রকরণের শেষ কথা হল মিষ্টান্ন—রসনা পরিতৃপ্তির জন্য যা শ্রেষ্ঠ নৈবেদ্য। অতএব, সব সমাজেই মিষ্টান্নপ্রস্তুতপ্রণালী যে বেশ ইলাহী ও জটিল এক ব্যাপার তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই। বহুদিনের চর্চায় এ সুকুমার শিল্পটি বাঙালী সমাজে এতই বিশিষ্টতা ও স্ফূর্তিলাভ করেছে যে এবিষয়ে রীতিমত অধ্যয়ন হওয়া উচিত।

ছেলেবেলায় যখন ঢাকায় ছিলাম তখন সেখানকার প্রাণহরা ও ছানার অমৃতি আর পাঁচজনের মতোই স্বাদু ছিল আমারও কাছে। সে বয়সেই নাটোরের কাঁচাগোল্লা, পাবনার দই, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার মাঠা, মুক্তাগাছার মণ্ডা প্রভৃতির খ্যাতি কানে এসে পৌঁছেছিল। তারপর অনেক দিন 'দ্যাশ-ছাড়া' হওয়ায় বাংলাদেশের আর কোথায় কি কি মিষ্টান্ন পাওয়া যায় সেকথা আজ আর সঠিক বলতে পারব না। তবে পরবর্তী জীবনের প্রায় সবটাই পশ্চিমবঙ্গে কেটেছে বলে সেখানকার খবর কিছু কিছু রাখি। জয়নগরের পরে ড্যাশ দিয়ে কেউ যদি বলে শূন্য স্থান পূরণ করুন তবে তাবৎ পশ্চিমবঙ্গবাসীর সঙ্গে গলা মিলিয়ে আমিও বলে উঠব—মোয়া। তেমনি কৃষ্ণনগরের পরে সরভাজা, সরপুরিয়া; বর্ধমানের পরে সীতাভোগ মিহিদানা; জনাই-এর পরে মনোহরা; মোল্লার-চকের পরে দই আর বাগবাজারের পরে স্পঞ্জ রসোগোল্লা। তালিকার এখানেই শেষ নয়—আরও অনেক অনেক আছে। সব ক'টি নাম—আমি অন্তত যে ক'টি জানি—যদি উজাড় করে না বলি তাহলে ভোজনরসিকদের কাছে মহাপাতকের ভাগী হব। লালাক্ষরিত রসনায় তাঁরা যেসব অভিশাপবাণী উচ্চারণ করবেন তা শোনার থেকে ফর্দটা প্রকাশ করে ফেল্যাই ভাল। শক্তিগড়ের ল্যাংচা, সিউড়ির মোরব্বা, রাণাঘাটের পানতুয়া বা শান্তিপুরের নিখুঁতির নাম প্রথম কিস্তিতেই যে বলিনি সেজন্য অনেকেই হয়ত আমার দোষ ধরবেন। তেমনি বহরমপুর-কাশিমবাজারের ছানাবড়া, বেলদার কাজু-সন্দেশ, মালদহের ক্ষীরকদম্ব বা কানসাটের চমচমকে তৃতীয় কিস্তিতে নিয়ে আসবার অপরাধও অনেকের কাছে অমার্জনীয় হতে পারে। বস্তুত 'আপ্রুচি

খানা' এই সূত্র অনুসারে একই মিষ্টান্ন যে সকলের সমান ভাল লাগবে এমন কোন কথা নেই। মুড়াগাছার ছানার জিলিপি, বেলেতোড়ের ম্যাচা, শিয়াখালার ছানার গজা বা আড়ংঘাটার রসোগোল্লার একান্ত অনুরাগীও যথেষ্ট আছেন। আবার এমন মিষ্টান্নরসিক হয়ত একেবারে বিরল নন যাঁরা শিলিগুড়ির ক্ষীরের সিঙাড়া, ধনেখালির খৈচুর, খানাকুলের কারকান্ডা বা চন্দননগরের তালশাঁস সন্দেশের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। নিছক বৃহদায়তনের জন্য প্রসিদ্ধ মিষ্টান্নও কিছু কিছু আছে—যেমন কামারপুকুরের জিলিপি ও তাঁতিপাড়ার (বীরভূম জেলা) বাতাসা ও কদমা। গুণাগুণের থেকে পরিমাণ যাদের কাছে মূল্যবান এসব খাবারের প্রতি তাঁরা পক্ষপাতিত্ব দেখালে আশ্চর্যের কিছু নেই। সবিনয় নিবেদন, এ তালিকা পূর্ণাঙ্গ বলে আমি ঘুণাক্ষরেও দাবি করি না। স্থানীয়ভাবে প্রসিদ্ধ আরও অনেক অনেক মিষ্টান্ন আছে দুই বাংলায় যাদের সম্বন্ধে আমি সামান্যই জানি। এ প্রবন্ধের শুরুতে সেজন্যই বলেছি, বঙ্গকৃষ্টির এই দিকটি সম্পর্কে রীতিমত অধ্যয়ন হওয়া উচিত।

মিঠাই তৈরীর বৈচিত্র্যের ব্যাপারে বাঙালীর স্থান ভারতবর্ষের শীর্ষে। দেশের আর কোন অঞ্চলে এত রকমারি জলখাবার কল্পনাও করা যায় না। বাঙালীর স্বকীয় উদ্ভাবনী প্রতিভা তো এর পিছনে আছেই, আর কাছে উপকরণ নির্বাচনে গোঁড়ামির অভাব। শেষ কারণটির কথা আর একটু বুঝিয়ে বলি। বঙ্গদেশ ছাড়া ভারতবর্ষের অধিকাংশ প্রান্তেই যে দুধ থেকে ছানা উৎপন্ন হয় না—অন্তত খুব সম্প্রতিকাল অবধি যে হত না—সেকথা সকলেই জানেন। বাঙালীদের দেখাদেখি সেসব এলাকার প্রধান শহরগুলিতে হালে কিছু কিছু ছানা তৈরি হয় সত্য কিন্তু সেখানকার বিস্তীর্ণ গ্রামাঞ্চলে এখনও সনাতন রীতিই বহাল আছে। এর কারণ, শুনেছি, ধর্মীয়। গরু যেহেতু মাতা, তার দুধ সেজন্য পবিত্র। সেই পূত পানীয়কে বলপূর্বক বিকৃত করে ('কেটে') ছানা তৈরি করা অতএব অতি গর্হিত কর্ম। পাঠক লক্ষ করে থাকবেন, বাংলার বাইরে ছানার তৈরি মিঠাই-এর প্রচলন প্রায় নেই বললেই চলে। সেখানকার ক্ষীর, রাবড়ি, প্যাঁড়া মণ্ডা প্রভৃতি বহুলব্যবহৃত মিষ্টান্নের কোনটিরই উপাদান ছানা নয়; দুধ জ্বাল দিয়ে বা ক্ষীরে পরিণত করেই সেগুলি প্রধানত তৈরি কেননা তাতে দুধকে 'কাটা'র (বা হত্যা করার) দোষ বর্তায় না' বাঙালীর কাছে দুধ পরম উপকারী পানীয় সন্দেহ নেই, পবিত্র হলেও হয়ত হতে পারে, কিন্তু তার মধ্যে যে এতখানি ধর্মতত্ত্ব নিহিত আছে সেকথা তার মাথায় ঢোকেনি। ফলে আমরা ছানার মতো এক কামধেনু লাভ করেছি যার কাছে চাওয়া মাত্রই বাঙালী ময়রারা থরে থরে মিঠাই পেয়েছে। ওদিকে উপাদান হিসেবে ঘন দুধ বা ক্ষীরকেও তারা অপাংক্তেয় করে রাখেনি। তাতে বাঙালীর মিষ্টান্নের তালিকা আরও দীর্ঘই হয়েছে।

কিন্তু উপকরণ উদ্ভাবনই সব কথা নয়। তার সঙ্গে কারিগরি দক্ষতার (অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সে-নৈপুণ্য আবার বংশগত) মণিকাঞ্চনযোগ হওয়া চাই। ছানা তো এখন বাংলার বাইরেও উৎপন্ন হচ্ছে। কিন্তু সেসব জায়গায় ময়রারা কি স্পঞ্জ রসোগোল্লা বানিয়ে বাগবাজারের ধারেকাছেও কখনো আসতে পারবেন? বাইরের হালুইকরদের কথা বাদ দিয়েও দেখতে পাই, বংশানুক্রমিক অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও সব বাঙালী কারিগরই প্রসিদ্ধ মিষ্টান্নগুলির মতো উচ্চ মানের মিঠাই তৈরি করতে পারেন না। দই কোথায় না তৈরি হয়? তবু পাবনা বা মোল্লারচকের এত নাম কেন? মোয়ার উপকরণ খুবই সুলভ; তৈরির প্রক্রিয়াও কিছুমাত্র জটিল নয়। তা সত্ত্বেও জয়নগর জয়নগরই। দৃষ্টান্ত আর না বাড়িয়ে একথা হয়ত বলা যায় যে মিষ্টান্নশিল্পে বিশেষ বিশেষ ঘরানার অস্তিত্ব আছে। সঙ্গীত জগতে এহেন স্থানীয় বা গোষ্ঠীগত উৎকর্ষ তো আমরা



মেনেই নিয়েছি। তেমনি মৃৎশিল্পের ক্ষেত্রে কুমারটুলি, কৃষ্ণনগর; বয়নশিল্পে ঢাকা, টাঙাইল, শান্তিপুর, ধনেখালি; শঙ্খশিল্পে ঢাকা, বিষ্ণুপুর; চিরুণীশিল্পে যশোহর, বৈষ্ণবচক; মাদুরশিল্পে সবং, রঘুনাথবাড়ি প্রভৃতি স্থানের শিল্পিগোষ্ঠী এক এক বিশেষ ঘরানার অন্তর্গত বলে স্বীকার করে নেওয়াই ভাল। মার্গসঙ্গীতের ক্ষেত্রে ঘরানার আলোচনা যথেষ্ট হয়েছে। প্রধান কুটিরশিল্পগুলির গোষ্ঠীগত উৎকর্ষের অনুসন্ধানও হয়েছে অল্পবিস্তর। কিন্তু কেন জানি না, মিষ্টান্নশিল্পকে কুটিরশিল্পের মর্যাদা এখনও তেমন দেওয়া হয়নি বলে এবিষয়ে আজ অবধি খুবই কম অধ্যয়ন হয়েছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্পীদের বিষয়ে আমরা যতটা জানি, সরভাজা-সরপুরিয়ার কারিগরদের সম্বন্ধে তার থেকে জানি অনেক কম। অথচ মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র প্রায় দু'শ বছর আগে এই মৃৎশিল্পী সম্প্রদায়কে নাটোর থেকে যখন কৃষ্ণনগরে এনে বসতি করান (সেরকমই জনশ্রুতি) তখন তাঁর মতো গুণগ্রাহী ব্যক্তির দৃষ্টি নাটোরের মিষ্টান্নশিল্পীদের দিকে যে একেবারেই পড়েনি সেকথা বিশ্বাস করা কঠিন। হয়ত নাটোরের কাঁচাগোল্লা সে সময়েই প্রসিদ্ধ ছিল; হয়ত সেই সুবাদে নাটোরের কয়েক ঘর ময়রা কৃষ্ণনগরে আশ্রয় পেয়েছিলেন; হয়ত পরবর্তীকালে অন্য কোন কারণে তাঁরা সরভাজা-সরপুরিয়া প্রস্তুত করাটাই বেশী সমীচীন মনে করেন। এসবই অনুমান যা অনুসন্ধানের ফলে সমর্থিত বা অগ্রাহ্য হতে পারে। দুঃখের বিষয় এজাতীয় কোন গবেষণা কৃষ্ণনগর বা অন্যান্য মিষ্টান্ন-কেন্দ্রগুলি সম্বন্ধে এখনও তেমন হয়নি।

কৃষ্ণনগরের মোদক সম্প্রদায়ের আদি বৃত্তান্ত সঠিকভাবে না জানা গেলেও এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে সেকালের রাজামহারাজা বা ধনী ব্যক্তিরা নিজ নিজ বাসকেন্দ্রে অন্যান্য কুটিরশিল্পীদের মত নামকরা ময়রাদেরও এনে বসতি করাতেন। চাকরান জমি ও অপরাপর সুবিধার বদলে তাঁদের দায়িত্ব ছিল দৈনিক সরবরাহ ছাড়াও বারো মাসে তেরো পার্বণের মণ্ডা-মিঠাই তৈরি করা। এ প্রবন্ধের প্রথম দিকে আমাদের প্রসিদ্ধ মিষ্টান্নের উৎপাদন-কেন্দ্রগুলির নাম করেছি। সে তালিকায় উল্লেখিত ঢাকা, নাটোর, মুক্তাগাছা, জয়নগর, কৃষ্ণনগর, বর্ধমান, জনাই, শান্তিপুর, বহরমপুর, কাশিমবাজার, কানসাট, বেলেতোড়,

শিয়াখালা, খানাকুল প্রভৃতি স্থানে ছোটবড় নানা ভূস্বামী বা ধনী লোকের বাস ছিল। এতগুলি জায়গার ক্ষেত্রে এই বিশেষ যোগাযোগটা যে একেবারেই আকস্মিক এমন মনে হয় না। বরং আর পাঁচটা কুটিরশিল্পের মতো বিভিন্ন কেন্দ্রের মিষ্টান্নশিল্প যে স্থানীয় ধনী পৃষ্ঠপোষকদের আনুকূল্যের উপর নির্ভর করেছে, এমনই মনে হয়।

এরকম এক জনপদ মেদিনীপুর জেলার ঘাঁটাল মহকুমার অন্তর্গত ক্ষীরপাই; ঘাঁটাল থেকে সাত-আট মাইল পশ্চিমে অবস্থিত। ঘাঁটাল-চন্দ্রকোণা পিচের সড়ক এ গ্রামের মধ্য দিয়েই গিয়েছে। মেদিনীপুর শহরের দিক থেকে যাঁরা সেখানে যেতে চান তাঁরা মেদিনীপুর-ঘাঁটাল রুটের বাসে আসতে পারেন। কলকাতার যাত্রীদের পক্ষে পাঁশকুড়া রেল-স্টেশনে নেমে পাঁশকুড়া-ঘাঁটাল রুটের বাসে ঘাঁটাল হয়ে যাওয়াই প্রশস্ত। চন্দ্রকোণা, ক্ষীরপাই, ঘাঁটাল, দাসপুর প্রভৃতি সংলগ্ন এলাকা মুসলমান আমল থেকেই সুতী কাপড়, রেশমী বস্ত্র ও তসরের জন্য বিখ্যাত। ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত মিঃ ও'ম্যালীর মেদিনীপুর জেলা গেজেটিয়ার থেকে দেখছি, সতের-আঠারো শতকের তাঁতশিল্পের প্রসিদ্ধ কেন্দ্র চন্দ্রকোণার উন্নতির মূলে ক্ষীরপাই-এর অনেকখানি অবদান ছিল। আঠারো শতকের দ্বিতীয় ভাগে, দু'জন রেসিডেণ্টের অধীনে, সুতী, সিল্ক ও তসরের কারবার করবার জন্য এখানে ইংরেজ ও ফরাসীদের দু'টি বাণিজ্যিক কুঠি ছিল। ওলন্দাজরাও তাঁদেব প্রতিনিধি পাঠিয়ে এসব কুঠি থেকে খরিদপত্র করতেন। উনিশ শতকের শেষ দিকেও ক্ষীরপাই এর সমৃদ্ধি মোটামুটি বজায় ছিল কেননা ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে এ গ্রামকে এক মিউনিসিপ্যাল শহরে পরিণত করা হয়। তখন ক্ষীরপাই-এর লোকসংখ্যা ছিল প্রায় ন' হাজার। তারপরে, বর্ধমান-জ্বরের প্রকোপে এ গ্রামের এত লোকক্ষয় হয় যে সে আঘাত সামলিয়ে ওঠা আর সম্ভব হয়নি। ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দে ক্ষীরপাই-এর বাসিন্দা ছিল মাত্র ৪,২৪৬ জন

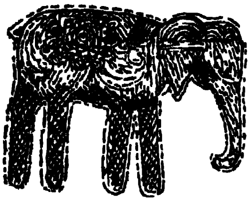
সমৃদ্ধির দিনে, ধনী তন্তুবায়েরাই ক্ষীরপাই-সমাজের শীর্ষে ছিলেন। প্রধানত তাঁদেরই পৃষ্ঠপোষকতায় 'বাবব শা' নামে যে মিঠাইটি এ অঞ্চলে খুব প্রসিদ্ধি লাভ করে, পশ্চিমবঙ্গের দূরবর্তী জেলাগুলিতে তা তেমন পরিচিত নয়। 'বাবর শা'—এই অদ্ভুত নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে নানা কিংবদন্তী প্রচলিত। নিজ গ্রামের কৌলীন্য বাড়ানোই যাঁদের প্রচ্ছন্ন উদ্দেশ্য তাঁরা বলেন, মুঘল সম্রাট বাবর শাহ এ মিষ্টান্নেব খুব তারিফ করেছিলেন বলেই নাকি এই নাম। মতান্তরে, বহুকাল আগে বাবু সা (সাহা) নামে এক স্থানীয় ময়রা এর উদ্ভাবন করেছিলেন বলে এ নাম হয়েছে। এ জনশ্রুতিও সত্য না হতে পারে। কেননা, বাবু সা'র সঠিক বৃত্তান্ত কিছুই জানা যায় না। বর্তমান মিষ্টান্নশিল্পীদের কাছে জিজ্ঞাসাবাদ করে যতটা জানতে পেরেছি তাতে মনে হয় ৭০।৭৫ বছর আগেকার বিখ্যাত কারিগর আশু ময়রা ও পরাণ ময়বাই নাকি এটির উদ্ভাবক। ক্ষীরপাই-এর মিষ্টান্ন ব্যবসায় আগে সাহা, ময়রা প্রভৃতি উপাধিধারী মোদক সম্প্রদায়ের হাতেই ছিল। কালক্রমে, স্থানীয় গন্ধবণিক সম্প্রদায়ের শিল্পীরা তাঁদের কাছে কাজ শিখে এখন প্রাধান্য-লাভ করেছেন। তাঁদের উপাধি—দত্ত, দে, হালদার, চন্দ্র ও নাগ। ক্ষীরপাই-এ এখন যে প্রায় তিরিশ ঘর মিষ্টান্ন ব্যবসায়ীর বাস তার মধ্যে সাবেক মোদক সম্প্রদায়ের সংখ্যা পাঁচ-ছয় ঘরের বেশী নয়; বাকিরা গন্ধবণিক। স্থানীয় তাঁতশিল্পের মতো এ শিল্পটিরও অবনতি হয়েছে; ৩০।৪০ বছর আগেকার প্রায় পঞ্চাশ ঘর কারিগরের মধ্যে অনেকেই এখন অন্য জীবিকা অবলম্বন করতে বাধ্য হয়েছেন।

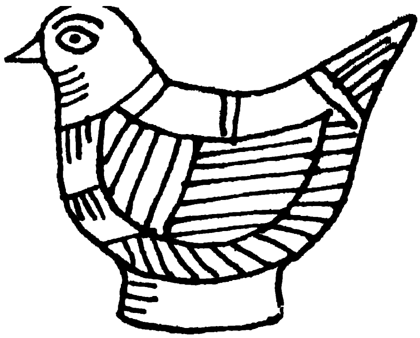
'বাবর শা' তৈরির উপকরণ খুবই সামান্য—ভাল ময়দা (কারিগরদের ভাষায় 'রোল ময়দা'), ঘি (অভাবে বনস্পতি, যা এখন বহুলব্যবহৃত) ও চিনির রস। ময়দা ভালভাবে ময়ান মেখে জল মিশিয়ে উপযুক্ত ঘনত্বের সলিউশন করে নিতে হয় প্রথমে। তারপরে,

কোন ছোট বাটি কাত করে বা ফুটো পাত্র থেকে সে সলিউশন ফোঁটা ফোঁটা ফেলা হয় কড়ায়-চাপানো গরম ঘিয়ের (অথবা বনস্পতির) মধ্যে। ফোঁটাগুলি যাতে ছড়িয়ে যেতে না পারে সেজন্য ঘিয়ের মধ্যে এক লোহার বেড়ি ডোবানো থাকে। প্রথম স্তর ফোঁটা ফেলবার পর (সেগুলি ইতিমধ্যে বোঁদের আকারে পরস্পরের সঙ্গে লেগে যায়), দ্বিতীয়, তৃতীয় বা পরবর্তী স্তরের ফোঁটাগুলি এমনভাবে ফেলা হয় যাতে মধ্যখানটা স্তূপের মতো উঁচু হয়ে উঠলেও ঠিক কেন্দ্রের অংশটা ভরাট না হয়ে সেখানে একটা ফুটো থাকে। ভাজা শেষ হলে চিনির রসে কিছুক্ষণ ভিজিয়ে নিলেই 'বাবর শা' তৈরি হয়। দেখতে অনেকটা মৌচাকের মতো ও খেতে মুচমুচে এ জলখাবারটি উত্তর মেদিনীপুর, দক্ষিণ বাঁকুড়া ও দক্ষিণ-পশ্চিম হুগলী জেলায় খুবই জনপ্রিয়।

'বাবর শা'র নাম আগে শুনে থাকলেও ক্ষীরপাই-এ গিয়েছিলাম প্রধানত সেখানকার উৎকৃষ্ট 'টেরাকোটা' মন্দিরগুলির সন্ধানে ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের শ্বশুরবাড়ির দেশ দেখতে। গ্রামের হাটতলার পাশের মন্দিরে মনোযোগ এতই নিবদ্ধ ছিল যে অদূরের দু' তিনটি খাবারের দোকানের দিকে প্রথমে নজর পড়েনি। মন্দিরের ছবি তোলা ও নোট লেখা শেষ হলে টের পেলাম বেলা পড়ে এসেছে; খিদেও পেয়েছে খুব। অতএব বঙ্কিম দত্ত মহাশয়ের দোকানের সামনের বেঞ্চিতে এসে বসলাম। তিনিই তখন ক্ষীরপাই-এর শ্রেষ্ঠ ময়রা হিসেবে স্বীকৃত ছিলেন। তাঁর ও আশপাশের দোকানের তাঁর সহকর্মীদের কাছে যা শুনেছিলাম তার সবটাই প্রায় বলেছি। বাকিটা চাক্ষুস দেখলাম। ভিয়েন তখন চড়েছে; কিছু 'বাবর শা' রসে নিমজ্জিত আর কিছু ভাজা চলছে। পটাপট কয়েকটা ছবি তুলতেই খাতির বেড়ে গেল। তারপর নোটবই হাতে যখন বিস্তারিত বিবরণ লেখা শুরু করলাম তখন সমবেত জনতার আর সন্দেহ রইল না আমি নিশ্চয়ই কোন খবরের কাগজের রিপোর্টার। আজ হোক, কাল হোক, দত্ত মশায়ের কথা, তাঁর দোকানের কথা অবশ্যই ছাপার অক্ষরে বেরোবে। ফল যা হল তাকে অপ্রত্যাশিত বলা যায় না। বেশ বড় একখানা বগি থালায় চারটি প্রমাণ সাইজের 'বাবর শা' নিতান্ত নিবেদনের ভঙ্গিতে তিনি আমার সামনে এনে ধরলেন। জঠরানল তখন এতই উদ্দীপ্ত যে আপত্তি যেটুকু করেছিলাম তা নিতান্তই মৌখিক।

থালাখানা "শূন্য" করবার পর অল্প দু'একটা কথা হয়েছিল দত্ত মশায়ের সঙ্গে। তিনি সখেদে বললেন—বড় সাইজের কোন অর্ডার ছিল না বলে মাঝারি সাইজের 'বাবর শা'-ই আপনাকে দিতে বাধ্য হলাম। আমার পেট তখন টইটম্বুর। অবিবেচক কোন খরিদ্দার বড় সাইজের আগাম অর্ডার দিলে বিপদেই পড়তাম। বেশী ঘি ঢেলে ও লোহার বেড়ির পরিধি বড় করে 'বাবর শা'র আয়তন ইচ্ছামত বড় করা যায়। কুটুম্বিতার জন্য সেরকম বায়নাও পাওয়া যায় মাঝে মধ্যে। আগেকার কালে, ধনীদের উৎসবে অস্বাভাবিক বড় আকারের 'বাবর শা' তৈরির নানা কাহিনী এখনও এ অঞ্চলে বেশ প্রচলিত।

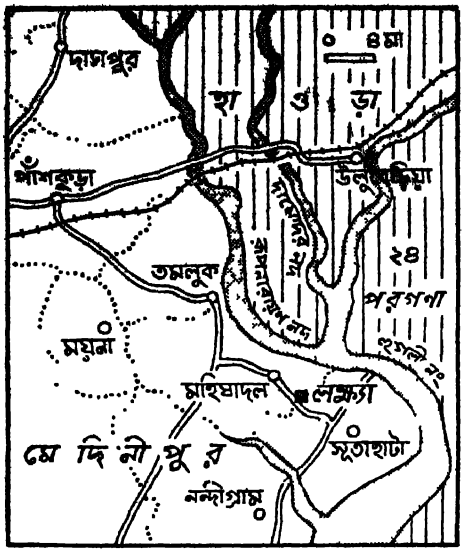




গয়না-বড়ি

গৃহস্থালীর সর্বক্ষেত্রে ব্যবহারিক প্রয়োজন মেটানোর জন্য যেটুকু দরকার শুধু সেটুকুতেই বাঙালীর মন ভরেনি কখনও। কিন্তু সেই অনাবশ্যক বাহুল্যের জন্য তাকে কদাচিৎ মহার্ঘ বিলাসিতার আশ্রয় নিতে হয়েছে। সামান্য শ্রম ও সামান্যতর ব্যয়ে গ্রামীণ বাঙালীর গৃহোপকরণ নয়নাভিরাম হয়ে উঠেছে রূপসন্ধানী চিত্তের স্পর্শে। ধানচাল মাপবার জন্য সাদাসিধা মাটির পাত্র বা নারকেলের মালা হলেই চলে যাবার কথা। কিন্তু এজন্য সূক্ষ্ম নকশায় অলংকৃত কাঁসা-পিতলের কুনকে ছাড়া বাঙালীর চলেনি। পশ্চিম-বঙ্গের বহু অঞ্চলে প্রচলিত, ডোকরা-কর্মকারদের তৈরি 'পাই' নামের যে ধাতুপাত্রগুলি দেখা যায় তা ধানচাল মাপবার জন্যই নির্মিত কিন্তু তাদের গায়ে কারিগরি নকশা বিস্ময়কর। পরিচ্ছন্ন যেকোন পিঁড়িই বরের আসন হবার যোগ্য। কিন্তু তাকে নানা রঙে চিত্রিত না করে বাঙালী কোনদিন সন্তুষ্ট হয়নি। ব্রত অনুষ্ঠানের ক্ষেত্র হিসাবে গোবর-নিকনো ভূমিখণ্ডই যথেষ্ট বিবেচিত হতে পারে। কিন্তু শুভ্র আলপনায় সে ভূমি সজ্জিত না হলে বাঙালী পুরনারীর কাছে তা ব্যবহারের অযোগ্য মনে হয়েছে চিরকাল। ঘরে-তৈরি সন্দেশ, চন্দ্রপুলি বা আমসত্ত্ব সোজাসুজি অতিথিকে পরিবেশন করলে তার স্বাদের কোন তারতম্য হয় না। কিন্তু ছাঁচে ফেলে তাদের সুদৃশ্য নকশায় মণ্ডিত করাটা বাঙালী গৃহিণীরা বরাবরই আবশ্যিক মনে করেছেন। হাঁড়িতে [illegible] খাদ্যবস্তু ঝুলিয়ে রাখবার জন্য যেসব শিকা ব্যবহৃত হয় তার দড়ি অশোভন হোক ক্ষতি নেই, ছিঁড়ে না গেলেই হল। কিন্তু এই সামান্য গৃহোপকরণও সূচীশিল্প ও বঙব প্রয়োগে অসামান্য রূপ নিয়েছে। সম্মানিত কুটুম্বকে বসতে দেবার জন্য বাজার থেকে কেনা পাটি বা মাদুর অনুপযোগী নয়। কিন্তু সেই একই কাজে লাগাবার জন্য বাঙালী বউ-ঝি'রা এক-একটি আসন বা নকশী-কাঁথার পিছনে বহু বছরের পরিশ্রম নিয়োজিত করেছেন। কুলুঙ্গীতে প্রদীপ রেখে গৃহতল আলোকিত করা সম্ভব হলেও অপরূপ কারুকার্যখচিত পিতলের পিলসুজ একদা বহুলপ্রচলিত ছিল বাঙালী সমাজে। দৃষ্টান্ত আর বাড়াব না। বাঙালীর অশন-বসন-গৃহসজ্জায়, তার উৎসব-পার্বণ-লোকশিল্পে, তার ধ্যানে, কল্পনায়, অস্থিমজ্জায় এক বিশিষ্ট সৌন্দর্যস্পৃহা সদা-প্রবাহিত। উভয় বাংলার পলিমাটির পেলবতায়, শস্যক্ষেত্রের দিগন্তবিস্তারে বঙ্গজননীর যে শ্যামলবরণ, কোমলমূর্তি আমাদের মর্মে গাঁথা, তারই শুভস্পর্শ বিধাতার আশীর্বাদের মতো বর্ষিত হয়েছে বাঙালীর গৃহস্থালীতে, তার যাবতীয় সৃজনকর্মে।

কিন্তু প্রধানত শান্ত, মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশই যে বাঙালী-চরিত্রে সৌন্দর্য-সন্ধানের এই প্রেরণা যুগিয়েছে এমন নাও হতে পারে। তাই যদি হত তবে অভ্রান্ত



লক্ষ্যে রাইফেল চালিয়ে যে আফ্রিদী শত্রুনিধনে সর্বোত্তম সুখ পায়, সে-ই আবার জরির-কাজ-করা কুর্তার শোভায় বিমোহিত হয় কেন? তাপদগ্ধ মরুভূমির সীমাহীন হাহাকারের মধ্যে আজন্মলালিত বেদুইন কেন পরায় তার প্রিয় উটের গলায় রঙিন পুঁতির মালা? ভয়ংকর প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে যে আফ্রিকাবাসী অহর্নিশি সংগ্রামে লিপ্ত, আপাতবিরোধীভাবে তাকেই আবার দেখি পাখির পালকে বহুবর্ণ শিরোভূষণ প্রস্তুত করে অবসর বিনোদন করতে। ঝাড়খণ্ড-কিয়নঝাড়ের নিরাভরণা সাঁওতাল যুবতীর নিবিড় কালো কেশে যখন একটি পলাশের কুঁড়ি শোভা পায়, কিংবা রাজপুতানীর চুমকি-বসানো বহুবর্ণ ঘাঘরা যখন পায়ে-চলার ছন্দে তরঙ্গভঙ্গে আকুল হয়ে ওঠে, অথবা বাস্তার-কালাহাণ্ডির আদিবাসী নাচের আসর যখন উত্তাল হয় পশুর লোম ও শিঙের আভরণে তখন রূপানুভূতির সর্বব্যাপী প্রকাশই লক্ষ করি ঘরের কাছের পৃথক পরিবেশে। সৌন্দর্যসাধনার এই ভুবনজোড়া আসনখানি দুই বাংলার হৃদয়-মাঝেও বিস্তৃত। বাঙালীর ক্ষেত্রে সে সহজাত স্পৃহাকে আরও বিকশিত করতে অনুকূল প্রাকৃতিক পরিবেশ হয়ত বা কিছু বেশী সাহায্য করে থাকবে

*

অতিথি-কুটুম্বের পাতে সুদৃশ্য আকারে পরিবেশন করবার জন্য যে সন্দেশ, চন্দ্রপুলি, আমসত্ত্ব প্রভৃতির নকাশি ছাঁচ একদা ব্যবহার করা হত সেকথা একটু আগেই বলেছি। আহার্য তালিকায় এসব সুখাদ্য কুলীন। তাদের ক্ষেত্রে সৌন্দর্যচর্চা হয়ত বা শোভা পায়। কিন্তু অতি সাধারণ যে বড়ি, যার বিচরণের পরিধি শুকতো, ভাজা, ঘণ্ট, ঝোল ও অম্বলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ, তার অঙ্গেও বাঙালী পুরনারীরা যে রূপারোপের চেষ্টা করেছেন সেকথা হয়ত অনেকেই জানেন না। গ্রামীণ বাঙালীর অজস্র নন্দন-প্রয়াসের অন্য কোন দৃষ্টান্ত নিয়ে প্রবন্ধ রচনা করা হয়ত কঠিন নয় কিন্তু আজকের আলোচনার জন্য বড়ির মতো এক অতি সুলভ ও সাধারণ ব্যঞ্জনকে নির্বাচিত করেছি এই কারণে যে, এটি সম্ভবত এ বিষয়ে এক প্রান্তিক উদাহরণ। এ থেকে চূড়ান্তভাবে বোঝা যাবে গৃহস্থালীতে বাঙালীর সুরুচি কতদূর অবধি প্রসারিত।

বাজারে যে বড়ি কিনতে পাওয়া যায় ও যার সঙ্গে আমরা সকলে পরিচিত তা ছোট ছোট ছুঁচলো স্তূপের মতো। অনেক রকম ডাল থেকেই তা তৈরি হতে পারে। ডাল বেটে, জল মিশিয়ে লেই ক'রে নিয়ে, আঙুলে টিপে টিপে পরিষ্কার ন্যাকড়া, কুলো প্রভৃতির উপর ফেলে, রোদ্দুরে শুকিয়ে নিলেই সেরকম বড়ি পাওয়া যায়। দক্ষতার কিছুমাত্র প্রয়োজন হয় না বলে যে-কেউ বাজার-চলতি বড়ি তৈরি করতে পারেন। কিন্তু গয়না-বড়ি বা নকাশি-বড়ির ক্ষেত্রে যে নৈপুণ্যের দরকার তা মোটেই সুলভ নয়। বাংলাদেশের কথা ঠিক বলতে পারব না; তবে পশ্চিমবঙ্গে এক মেদিনীপুর জেলার কোন কোন অঞ্চল ছাড়া আর কোথাও আমি গয়না-বড়ি তৈরি হতে দেখিনি। আমার অনুসন্ধান অনুসারে, সে জেলার মহিষাদল, নন্দীগ্রাম, সুতাহাটা, ময়না, পাঁশকুড়া, তমলুক ও ঘাঁটাল প্রভৃতি থানাতেই এ শিল্পটি সীমাবদ্ধ।

মেদিনীপুর জেলার এসব অংশে কারুশিল্পটি কতদিন থেকে প্রচলিত তা সঠিক জানা যায় না। নকশী-কাঁথার উৎপত্তিকাল নির্ণয় করা যেমন সম্ভব নয়, গয়না-বড়িও তেমনি সর্বপ্রথম কে কোথায় তৈরি করেছিলেন সেকথা বলা যায় না। কারিগর মহিলাদের জিজ্ঞেস করে দেখেছি। ছেলেবেলায় ঠাকুমা-দিদিমার কাছে হাতেখড়ি হয়েছিল, এর বেশী তাঁরা কিছু বলতে পারেন না।

গয়না-বড়ি বা নকাশি-বড়ি নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে কিছু বলা দরকার। জিলিপি তৈরির সময় ফুটো পাত্র থেকে হাত ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে যেভাবে লেই ফেলা হয় (সাধারণত আড়াই প্যাঁচ), গয়না-বড়ির ক্ষেত্রেও মোটামুটি তাই। সূক্ষ্ম পার্থক্য কিছু আছে; সেকথা পরে বলছি। জিলিপি, বা আর একটু বেশি 'অলংকৃত' অমৃতি তৈরির পদ্ধতি-তেই বানানো হয় বলে গয়না-বড়ির আর এক নাম জিলিপি-বড়ি। কিন্তু গয়না-বড়ি নাম কেন? ইংরেজীতে "অর্নামেণ্টেশন" বলতে যেমন গহনার অলংকরণকেই বোঝায় না, অন্যরকম সজ্জাকেও বোঝাতে পারে, তেমনি আলোচ্য বড়িগুলি নানান্ নকশার হয় বলে তারা 'অর্নামেণ্টেড' বড়ি বা গয়না-বড়ি। প্রচলিত নকশার মধ্যে বিবিধ ফলফলারি যথা, আম, কাঁঠাল, আনারস প্রভৃতি; নানারকম পশুপাখি যথা, হাতি, ঘোড়া, বিড়াল, টিয়া, কাকাতুয়া, ময়ূর ইত্যাদি ছাড়াও বঙ্গনারীর গয়নার পুরো সেটও তৈরি হয়ে থাকে। যেমন, মুকুট, টায়রা, কান, দুল, ঝাপটা, নেকলেস, বালা, রুলি, তাগা প্রভৃতি। কারিগর যেখানে পল্লীবধূ সেখানে শেষের 'মোটিফ' গুলি যে অগ্রাধি-কার পাবে তাতে সন্দেহ কি! সেজন্যই সংক্ষেপিত নাম গয়না-বড়ি।

এ শিল্পে উপাদান প্রস্তুত করা কঠিন না হলেও বড়ি তৈরির কাজটি রীতিমত অভিজ্ঞতা ও দক্ষতাসাপেক্ষ। কলাই বা বিউলী ডাল (অন্য ডাল ব্যবহৃত হয় না) খুব ভাল ক'রে বেটে নিয়ে জল মিশিয়ে অনেকক্ষণ ফেটানো হয়। ফেটানো ঠিক হয়েছে কিনা জানবার জন্য অল্প পরিমাণ লেই জলে ভাসিয়ে দেখা হয়—ভাসে না ডুবে যায়। যদি ভেসে থাকে তবে বুঝতে হবে লেই ঠিকমত তৈরি হয়েছে। ডুবে গেলে, ফেটানো চলে আরও কিছুক্ষণ। লেই-এর ঘনত্বের প্রশ্নটি জরুরী কিন্তু তার মীমাংসার জন্য বিশেষ কোন এক্সপেরিমেণ্টের ব্যবস্থা নেই, কারিগরের দক্ষতাই একমাত্র নির্ভর।

লেই ঢালবার জন্য লাগে শক্ত কাপড়ের একটি থলে বা পুঁটুলি, যার গায়ে ছোট ফুটোর মধ্য দিয়ে টিন, পিতল বা রুপোর এক ফাঁপা নলের ডগা বাইরে বার হয়ে থাকে। লেই-পোরা থলি মুঠো করে ধরে সামান্য চাপ দিতে থাকলে ফাঁপা নলের মধ্য দিয়ে তা বাইরে বার হতে থাকে। তখন দক্ষ শিল্পী হাত ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সেই লেই নীচে ফেলে মনোমত নকশার সৃষ্টি করেন। নীচে পাতা কাপড় বা অন্য কিছুর ওপর সাধারণত পোস্তদানার এক মিহি আস্তরণ বিছানো থাকে। তাতে বড়িগুলি পাটাতনের সঙ্গে

জড়িয়ে যায় না; শুকোবার পর সহজেই তুলে নেওয়া যায়।

এ বই-এর অন্যত্র ব্যবহৃত গয়না-বড়ির ছবি দেখলেই বোঝা যাবে, একটুও না থেমে, একটানা হাত নাড়িয়ে এ-নকশাগুলি সৃষ্টি করা কত কঠিন কাজ। ড্রয়িং-এর বেশ ভাল জ্ঞান ও যথেষ্ট অভ্যাস না থাকলে এহেন সূক্ষ্ম মোটিফ তৈরি করা অসম্ভব। নির্বাচিত বিষয়বস্তুর পরিধি-রেখা বা 'আউট-লাইন' সুসমঞ্জসভাবে রচনা করা যেমন কঠিন, ভিতরের অংশ নানা পরিপূরক অলংকরণ দিয়ে ভরাট করাও তেমনি সহজ ব্যাপার নয়। তার থেকে বড় কথা, পল্লীবধূরা অন্যের আঁকা ড্রয়িং কদাচিৎ অনুসরণ করে থাকেন; যাঁর যেমন ক্ষমতা, সেইমতই তাঁদের নিজস্ব ধ্যানধারণা রূপায়িত হয় এই অভিনব কারুকর্মে। এসব বিবিধ কারণেই গয়না-বড়ির উৎকৃষ্ট শিল্পী বেশ বিরল।

গয়না-বড়ির ক্ষেত্রে কলাই ডাল ছাড়া অন্য ডাল ব্যবহার না করার সংগত কারণ আছে। কোন কোন ক্ষেত্রে নকশাগুলি বেশ বড় আকারের (দৈর্ঘ্যপ্রস্থে দশ-বারো ইঞ্চি বা তার চেয়েও বড়) হয় বলে উপাদানের মধ্যে একটা আঠালো ভাব থাকলে ভেঙে যাবার সম্ভাবনা কমে। বিউলী ডাল যে বেশ চটচটে সেকথা সকলেই জানেন। শিল্পীদের কাছে শুনেছি, এ-ডাল নাকি শুকিয়েও ওঠে খুব তাড়াতাড়ি। তাতে অল্প সময়ে বেশী উৎপাদন সম্ভব হয় আর প্রস্তুতকালীন হাঙ্গামাও হ্রাস পায়। না ফেটে গিয়ে, অল্প সময়ে সমানভাবে শুকিয়ে ওঠাটা গয়না-বড়ির ক্ষেত্রে জরুরী বলে এ-শিল্পচর্চার জন্য বিশেষ দিনক্ষণ নির্দিষ্ট আছে। কার্তিক থেকে মাঘ অবধি সাধারণত প্রশস্ত সময় বলে বিবেচিত হয়। কেননা, শীতের এই ক'টা মাসে বাতাসের শুষ্কতার দরুন বড়ি শুকোয় সহজে ও সমানভাবে। কড়া রোদ্দুরে বড়ি ফেটে যেতে পারে বলে সকালের দিকেই তাদের রোদে দেওয়া হয় ও দুপুরের আগে তুলে এনে বাকিটা শুকানো হয় শীতল ছায়ায়। কখনও কখনও পশুপাখির চোখ করা হয় গোটা মসুর ডাল বসিয়ে। সম্মানিত কুটুম্বকে উপহার দেবার জন্য লেই-এর সংগে রং মিশিয়ে রঙিন বড়ি তৈরি করবারও রীতি আছে। সেক্ষেত্রে সাদা ছাড়াও একাধিক রঙের প্রয়োগ হতে পারে। বড়ি শুকালে তাদের মাটির হাঁড়ির মধ্যে সযত্নে সাজিয়ে তুলে রাখা হয় অনির্দিষ্টকাল। হাঁড়িশুদ্ধই তত্ত্ব যায় আত্মীয়-কুটুম্বের বাড়িতে। আবার জামাই-বেয়াই অতিথি হলে, শিকা থেকে হাঁড়ি নামিয়ে সেরা-সেরা নকশা-বড়ি বার ক'রে সরষের তেলে ভাজার ধুম প'ড়ে যায়। বলা বাহুল্য, ঝোলে-অম্বলে-শুকতোয় এ-বড়ির ব্যবহার সৌন্দর্য-হননেরই সামিল। কেননা, ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেলে এত পরিশ্রমে তৈরি নকশার কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। গয়না-বড়ি সেজন্য শুধু ভেজে খাবার জন্য আর, বোধ হয়, ভোজন শুরু করবার আগে অনেকক্ষণ তাকিয়ে দেখবার জন্য।

দুর্বোধ্য কারণে মেদিনীপুর জেলার মাহিষ্য সম্প্রদায়ের পুরনারীদের মধ্যেই এ শিল্পটি প্রধানত সীমাবদ্ধ। গয়না-বড়ির উপকরণ বা কারিগরির মধ্যে এমন কিছু নেই যা এই সীমাবদ্ধতার হেতু হতে পারে। নকশী-কাঁথার ক্ষেত্রে কিন্তু এর উলটোটাই বরং সত্য ছিল। সেখানে, পল্লীবালাদের সেবায় পুষ্ট আর একটি কারুকর্মে, ব্রাহ্মণ শূদ্র সকলেই অংশ গ্রহণ করতে পারতেন। আঞ্চলিকভাবে কোথাও কোথাও হয়ত তার তারতম্য হয়েছে। কিন্তু বিশেষ কোন সম্প্রদায়ের মহিলারা প্রায় একচেটিয়াভাবে সে শিল্পসাধনায় নিযুক্ত ছিলেন, এমন কথা বলা যায় না। গয়না-বড়ির ক্ষেত্রে এ ব্যতিক্রমের কারণ সেজন্য অনুসন্ধানের যোগ্য।

মেদিনীপুর জেলার এক মাহিষ্য-পরিবারের দৌলতে রবীন্দ্রনাথ যে একদা গয়না-বড়ির সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন, সেকথা অল্প লোকেই জানেন। মহিষাদল-সুতাহাটা সড়কের পাশে, মহিষাদল থেকে মাইল চারেক দক্ষিণ-পূর্বে, লক্ষ্যা গ্রাম থেকে শান্তি-

নিকেতনে ছাত্রী হয়ে এসেছিলেন শ্রীমতী সেবা মাইতি। রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন নৃত্যনাট্যে অংশগ্রহণ ক'রে একদা তিনি প্রচুর খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। মাইতিরা মাহিষ্য এবং এ পরিবারের মহিলাদের মধ্যে গয়না-বড়ির উ'চুদরের শিল্পী ছিলেন কয়েকজন। তাঁদের তৈরি নকাশি-বড়ি পেয়ে রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ, নন্দলাল বসু, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখেরা খুব খুশি হয়ে যেসব চিঠিপত্র লিখেছিলেন তার মূল বা ফটোস্টাট কপি, শ্রীমতী সেবা মাইতির কাকা, তমলুকনিবাসী শ্রীস্বদেশনারায়ণ মাইতি মহাশয়, আমাকে দেখিয়েছেন। সেগুলি থেকে কিছু কিছু উদ্ধৃতি পাঠকসমাজে পেশ করবার লোভ সংবরণ করতে পারলাম না। রবীন্দ্রনাথ, ১৩৪১ সালের ২১ মাঘ তারিখের এক চিঠিতে স্বদেশবাবুর মা শরৎকুমারী দেবী ও শ্রীমতী সেবার মা হিরণ্ময়ী দেবীকে লিখেছিলেন —"তোমাদের হাতের প্রস্তুত বড়িগুলি পাইয়া বিশেষ আনন্দলাভ করিয়াছি। ইহার শিল্পনৈপুণ্য বিস্ময়জনক। আমরা ইহার ছবি কলাভবনে রক্ষা করিতে সংকল্প করিয়াছি।"

তারিখবিহীন একটি চিঠিতে অবনীন্দ্রনাথ লিখেছেন—"মেদিনীপুর লক্ষা হইতে তমলুকের নকাশী বড়িগুলি—তোমাদের দেখে শুধু যে চোখের সুখ হল তা নয়, স্বাদ নেবার জন্যেও উৎসাহ জাগলো। কিন্তু ছবিকে ভেজে খাওয়া আর এই বড়ি দাঁতে ভেঙে কিম্বা ঝোলে ঝালে রে'ধে খাওয়ার মানে একই।"

নন্দলাল বসুর একটি চিঠির সারাংশ—"আশিসের (শ্রীমতী সেবার দাদা) মায়ের হাতে তৈয়ারী বড়ির নকশাগুলি সত্যই শিল্পের একটি উৎকৃষ্ট নিদর্শন। বঙ্গমাতার ভাঙ্গা ঝাঁপিতে এই অমূল্য রত্নের সন্ধান পাইয়া আমরা মুগ্ধ হইলাম। এইরূপ শিল্প-সৃষ্টির আনন্দ কবে আবার বাঙ্গলাদেশ ফিরে পাবে।"

ইংরেজী ৪-২-৩৬ তারিখে গুরুদেবকে লেখা রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের একটি চিঠি —"মেদিনীপুরের লক্ষ্যা গ্রামের শ্রীমতী শরৎকুমারী দেবী ও শ্রীমতী হিরণ্ময়ী দেবী যে চমৎকার শিল্পনৈপুণ্যের সহিত বড়ি তৈরী করিযাছেন, শুনিলাম আপনারা তাহার ফোটোগ্রাফ লইয়াছেন। তাহার কিছু print আমাকে অনুগ্রহপূর্ব্বক শীঘ্র পাঠাইনা দিলে তাহা ফাল্গুনেরই প্রবাসীতে ছাপিতে পারি।"

দেশের শ্রেষ্ঠ মনীষীদের দ্বারা সংবর্ধিত এই অনুপম কুটিরশিল্পটির আরও প্রচার ও প্রসার হওয়া বাঞ্ছনীয়। কলকাতার প্রধান কলাশিক্ষায়তনগুলি এবিষয়ে ভেবে দেখতে পারেন। তমলুকের শ্রীযুত স্বদেশনারায়ণ মাইতি ও তাঁর পালিতা কন্যা শ্রীমতী মমতা মাইতি (বড়িশিল্পে তাঁর নৈপুণ্যও বিস্ময়কর) এরকম যেকোন প্রচেষ্টায় সাহায্য করতে প্রস্তুত আছেন। তাঁদের উৎসাহে ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রচার বিভাগের ব্যবস্থাপনায় ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি নাগাদ কলকাতা তথ্য-কেন্দ্রে 'গয়না-বড়ি'র সপ্তাহব্যাপী যে প্রদর্শনী হয়েছিল, শহরের কয়েকটি প্রধান সংবাদপত্র ও অগণিত দর্শক তার ভূয়সী প্রশংসা করেছিলেন।

সামতাবেড়

এখন যাঁদের বয়স অনধিক ৩৫ বছর, তাঁরা শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মৃত্যুর পরে জন্মেছেন। বিশেষ করে তাঁদের মধ্যে শরৎ-সাহিত্যের জনপ্রিয়তা কতদূর সেকথা জানতে বড় ইচ্ছে করে। কোন্ শরৎচন্দ্র? গ্রাম-বাংলার সামাজিক অনাচার ও কুসংস্কারকে প্রতিহত করতে, অবহেলিত বঞ্চিত নারী সমাজকে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করতে যাঁর লেখনী খড়্গের দ্যুতিতে বঙ্গসাহিত্যের আকাশকে কয়েক দশক ধ'রে উদ্ভাসিত রেখেছিল —সেই শরৎচন্দ্র। 'জনদরদী কথাশিল্পী' এ বিশেষণটি প্রয়োগ না করে যাঁর নাম সেসময়ে উচ্চারিত হত না—সেই শরৎচন্দ্র। যিনি লিখেছিলেন—"দেশের নব্বই জন যেখানে বাস করে আছেন, সেই পল্লীগ্রামেই আমার ঘর। মনের অনেক আগ্রহ, অনেক কৌতূহল দমন করতে না পেরে অনেক দিনই ছুটে গিয়ে তাদের মধ্যে পড়েছি এবং তাদের বহু দুঃখ, বহু দৈন্যের আজও আমি সাক্ষী হয়ে আছি"—সেই শরৎচন্দ্র। যিনি লিখেছিলেন—"সংসারে যারা শুধু দিলে, পেলে না কিছুই, যারা বঞ্চিত, যারা দুর্বল, উৎপীড়িত, মানুষ হয়েও মানুষে যাদের চোখের জলের কখনও হিসেব নিলে না, নিরুপায় দুঃখময় জীবনে যারা কোনদিন ভেবেই পেলে না সমস্ত থেকেও কেন তাদের কিছুতেই অধিকার নেই . এদের বেদনাই দিলে আমার মুখ খুলে, এরাই পাঠালে আমাকে মানুষের কাছে মানুষের নালিশ জানাতে"—সেই শরৎচন্দ্র।

গত তিন-চার দশকে আমাদের গ্রামীণ সমাজের অনেক পরিবর্তন হয়েছে, আমাদের নারীসমাজও অনেক বেশী মর্যাদার অধিকারী হয়েছেন সত্য। কিন্তু শোষণ নিপীড়নের শেষ হয়নি—ক্ষেত্র বদল হয়েছে মাত্র। আজকের নবীনদের অভিনিবেশ যে সেই নবতর যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে প্রধানত নিবদ্ধ হবে এমনই স্বাভাবিক। কিন্তু ফেলে-আসা আর এক রণভূমিতে যিনি দীর্ঘকাল, প্রায় একাকী, একই আদর্শের লড়াই চালিয়ে গিয়েছেন, শত বাধা বিপত্তিতেও হার মানেননি, তাঁকে বিস্মৃত হওয়া অন্যায়, তাঁকে বিস্মৃত হওয়া পাপ। আরও অন্যায় এইজন্য যে লাঞ্ছিতের প্রতি অকৃত্রিম সহানুভূতি তাঁর হৃদয়ের একেবারে উৎসমূলে স্থায়ী আসন লাভ করেছিল, হাল আমলের রাজনৈতিক স্ট্রাটেজীর অন্যতম কৌশলমাত্র ছিল না। অত্যাচারের বিরুদ্ধে আপসহীন সংগ্রামের এমন খাঁটি সৈনিক, হায়, এ দুর্ভাগ্য দেশে আজ কত বিরল! তাঁর স্মৃতিচারণ করবার সুযোগ পেয়ে আমি নিজেকে ধন্য মনে করি।

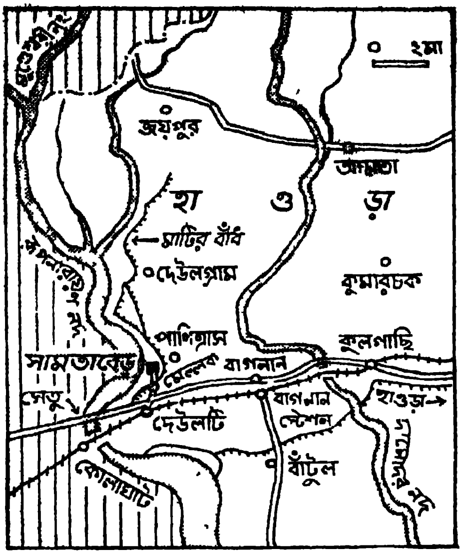
*

শরৎচন্দ্রের চারিত্রিক প্রবণতা ও হৃদয়বৃত্তির প্রকৃত মূল্যায়ণ করতে হলে কেবল-মাত্র সামতাবেড়ের পরিবেশেই তা সম্ভব। ভাগলপুর বা দেবানন্দপুরে তিনি অনভিজ্ঞ

কিশোরমাত্র; রেঙ্গুন, শিবপুর বা অন্যান্য বহু স্থান তাঁর ভূয়োদর্শনের ক্ষেত্র; কিন্তু সামতাবেড়ে তিনি অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধিতে প্রবীণ, জীবনদর্শনের প্রণিধান ও ব্যাখ্যার জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত। আজ থেকে সাতচল্লিশ বছর আগে, ১৯২৬ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে, শরৎচন্দ্র যখন সামতাবেড়ে এসে বসতি স্থাপন করেন তখন সে গ্রাম যে কত পশ্চাৎপদ ছিল তা এখনও সেখানে গেলে অনুভব করা যায়। পাশের গ্রাম গোবিন্দপুরে তাঁর দিদির শ্বশুরবাড়িতে যাতায়াত উপলক্ষে তিনি এ অঞ্চলের সঙ্গে পরিচিত হন সত্য। কিন্তু শেষ জীবনের সবটাই এখানে কাটানোর সিদ্ধান্ত যে এই ক্ষীণ আত্মীয়তার সূত্র দিয়ে নিয়ন্ত্রিত হয়েছিল এমন মনে হয় না। যে কুসংস্কার, যে কূপমণ্ডূকতা, যে সামাজিক হৃদয়হীনতার বিরুদ্ধে তিনি লেখনী ধারণ করেছিলেন, এখানে তার সর্বাঙ্গীন উপস্থিতি তাঁকে অনেক বেশী আকৃষ্ট করে থাকবে। তাই একান্ত আন্তরিকতার সঙ্গেই তিনি লিখেছিলেন—"ইহার ম্যালেরিয়া, দুর্ভিক্ষ, ইহার জলবায়ু, ইহার দোষগুণত্রুটি, দলাদলি বা যা কিছু বল, বাস্তবিকই আমি ভালবাসিয়াছি। নানা অবস্থার মধ্যে পড়িয়া নানা লোকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশিয়াছি। মানুষকে তন্ন তন্ন করিয়া দেখিবার চেষ্টা করিলে তাহার ভিতর হইতে অনেক জিনিস বাহির হয়, তখন তাহার দোষত্রুটিতে সহানুভূতি না করিয়া থাকা যায় না।" আর আকর্ষণের কারণ ছিল, ধীরগতি রূপনারায়ণের উদার প্রসার আর তার কূলে শ্যামল বনচ্ছায়ায় ঢাকা এখানকার শান্ত প্রাকৃতিক পরিবেশ। এক ক্লান্ত জন্ম-যাযাবরের শেষ বিশ্রামের উপযুক্ত স্থান। সেজন্য অন্যত্র তিনি লিখেছেন—"পাড়াগাঁয়ের মাটির বাড়ি আর রূপনারায়ণ নদ এদের মায়া কাটিয়ে আমি বেশিদিন কোথাও থাকতে পারিনে।"

শরৎচন্দ্র ও তাঁর স্ত্রী হিরন্ময়ী দেবীর অবর্তমানে সে টালিছাওয়া দোতলা মাটির বাড়িটি ও সামনের ফলফুলের বাগান আজ শ্রীহীন। তবু শরৎচন্দ্রের স্মৃতিবিজড়িত অনেক কিছু এখনও এখানে সংরক্ষিত আছে বলে দর্শনার্থীর বিরাম নেই। হাওড়া-খড়্গপুর রেলপথের দেউলটি স্টেশনে নেমে (হাওড়া থেকে দূরত্ব প্রায় ৩২ মাইল; ট্রেন জার্নির সময় ১ ঘণ্টা ১০ মিনিট), সাইকেল রিকশায় দু' মাইল পিচের রাস্তা অতিক্রম করে, রূপনারায়ণের বাঁধ-বরাবর ডানদিকে (উত্তর দিকে) দু' ফার্লং হাঁটাপথে গিয়ে বাঁধের বাঁ পাশে (পশ্চিম দিকে) নীচু জমিতে শরৎচন্দ্রের এই পল্লীভবনে পৌঁছনো যায়। হাওড়া স্টেশন থেকে গন্তব্যস্থলে উপস্থিত হতে দু' ঘণ্টার বেশী লাগবার কথা নয়। সেজন্য, কলকাতার দিক থেকে যাঁরা যেতে চান, তাঁরা যে-কোন একটা ছুটির দিনে অনায়াসেই সামতাবেড় ঘুরে আসতে পারেন।

শরৎচন্দ্রের বাড়িটি দোতলা হলেও যে মাটির তৈরি সেকথা আগেই বলেছি। হাওড়া জেলার ঘরামিরা এজাতীয় বাড়ি তৈরি করতে ও কাঁচামাটির অলংকরণে তা সজ্জিত করতে যে কতদূর দক্ষ, 'মাটির বাড়ি' নিবন্ধে সেকথা বলেছি। এ বাড়ির মেঝে সিমেন্টবাঁধানো ও মাটির দেওয়াল চুনকামকরা বলে দর্শকদের অনেকেই সেটিকে পাকা বাড়ি-মনে করতে পারেন। প্রাচীরঘেরা ভবনের প্রবেশপথের উপরে গুচ্ছ গুচ্ছ বোগেনভিলিয়ার সমারোহ; সামনেই টলটলে জলের এক ঘাটবাঁধানো পুকুর। তীর-বরাবর নারিকেলের সারি—শরৎচন্দ্রেরই নিজের হাতে লাগানো। প্রাচীরের ভিতরে, বাগানের মধ্য দিয়ে পথ গিয়ে শেষ হয়েছে পূব-পশ্চিমে প্রসারিত একতলার প্রশস্ত বারান্দায়। তারই পশ্চিম প্রান্তে, শরৎচন্দ্রের লেখাপড়ার জন্য ব্যবহৃত খুব ছোট একটি ঘর—দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ছ'সাত ফুটের বেশী হবে না। পশ্চিমে রূপনারায়ণের দিকে ও দক্ষিণে বাগানের দিকে দুটি কাঁচের জানালা আছে সে ঘরে। অনুমান করতে অসুবিধা হয় না, লেখার ফাঁকে ফাঁকে বাইরে দূরে অনেকক্ষণ উদাস দৃষ্টি মেলে রেখে আবার তাঁর লেখায়



ফিরে আসতেন শরৎচন্দ্র। সবুজ বনাতমোড়া ছোট একটি লেখবার টেবিল—তার ঠিক মাঝখানের একখণ্ড তক্তা টেনে তুলে পিছনের পাযায় ভর দিয়ে তাকে ঢালুভাবে রাখা যায়। হাতলযুক্ত চেয়ার একটি। একটি গদিআঁটা কৌচ—তার উপরে শরৎচন্দ্রের সুপরিচিত ফটো ও হিরন্ময়ী দেবীর মৃত্যুর পরে তোলা একটি ছবি সযত্নে স্থাপিত। কাঠের শেলফ একটি; তার পাশে শরৎচন্দ্রের ব্যবহৃত ছড়ি। কোণের দিকে এক তাকের উপরে একজোড়া চটি ও পুরনো এক গড়গড়ার কাঠের অংশ। এই ছোট ঘরটিতে, এই সামান্য আসবাবে, জীবনের শেষ বারো বছরে বহু বিখ্যাত উপন্যাস লিখেছেন শরৎচন্দ্র। গড়গড়ার নলটি মুখে দিয়ে, দরজা ভেজিয়ে যখন তিনি লিখতেন তখন তামাকের কল্কে বদলানো ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যে কারও এঘরে প্রবেশ নিষেধ ছিল। কোন অজুহাতেই সে সময় তাঁকে বিরক্ত করা যেত না। আজও এ ঘরের নীরবতায় কিছুক্ষণ কাটালে শরৎচন্দ্রের সেই আত্মমগ্ন সান্নিধ্য যেন উপলব্ধি করা যায়।

লেখবার ঘরের পুবে, একতলার টানা বারান্দার পাশে, দু'টি অপেক্ষাকৃত বড় ঘর। প্রথমটিতে শরৎচন্দ্রের ব্যবহৃত একটি সাধারণ পালংক, এক আলমারি বই, একটি রিভলভিং বুক-কেস, খুব পুরনো ধরনের একটি রেডিও ও সামান্য কিছু আসবাব। পাশের ঘরের প্রধান দ্রষ্টব্য তিন-চার আলমারি বই। শরৎচন্দ্রের সংগৃহীত বই-এর কি পরিমাণ অংশ ইতিমধ্যে স্থানান্তরিত হয়েছে তা বলা যায় না। তবে অবশিষ্ট পুস্তকগুলির কীটদষ্ট অবস্থা থেকে বোঝা যায় সেগুলির যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণের জন্য আজ আর কেউ নেই। ১৩৭৬ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত তাঁর 'শরৎচন্দ্র : সামতাবেড়ের জীবন ও সাহিত্য' পুস্তকে শ্রীতারাপদ সাঁতরা মহাশয় এ ব্যক্তিগত লাইব্রেরীর যে সম্পূর্ণ পুস্তক-তালিকা প্রকাশিত করেছেন, গবেষকদের কাছে তা মূল্যবান। তা থেকে দেখা যায়, সাহিত্য, সমাজনীতি, অর্থনীতি, রাজনীতি, ইতিহাস, দর্শন, জীবনী, জীববিদ্যা, শারীরবিদ্যা প্রভৃতি বিষয়ের নানা বইয়ের মধ্যে ইংরেজী বইয়ের সংখ্যাই বেশী। সে সংগ্রহে ডিকেন্স, টলস্টয়, গর্কি, আলেকজাণ্ডার ডুমা, আনাতোল, ফ্রাঁস, ন্যুট হামসুন, কার্ল মার্ক্স, ট্রট্স্কি, ক্রপট্কিন, ডারউইন, বারট্রাণ্ড রাসেল, কীনস, মুকুন্দরাম,

বঙ্কিমচন্দ্র, বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রমথ চৌধুরী, যোগেশচন্দ্র রায়, পরশুরাম, দিলীপকুমার রায়, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির লেখা ইংরেজী ও বাংলা বহু বই স্থান পেয়েছিল। আশ্চর্যের কথা, সাঁতরা মহাশয়ের তালিকায় রবীন্দ্রনাথসংক্রান্ত একটিমাত্র বইয়ের উল্লেখ আছে, তাও ইংরেজীতে; নাম—'গোল্ডেন বুক অব টেগোর'। 'ওম্যান ইন অল এজেস অ্যান্ড অল কাণ্ট্রিস' গ্রন্থমালার সাতটি খণ্ডও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। নারীদরদী শরৎচন্দ্রের সংগ্রহে তাদের হয়ত বিশেষ মূল্য ছিল।

একতলার বারান্দার পূব প্রান্তে দোতলায় উঠবার সিঁড়ি। নীচের লেখবার ঘরটির উপরে দোতলায় কোন ঘর নেই বলে দোতলার রেলিং-ঘেরা খোলা বারান্দা দক্ষিণ ও পশ্চিম দিকে ঘুরে গিয়েছে। এ বারান্দা থেকে রূপনারায়ণের দৃশ্য চোখ জুড়িয়ে দেয়। অর্শের প্রকোপে এক সময় শরৎচন্দ্র যখন বসে লিখতে পারতেন না তখন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে লেখবার জন্য এক উঁচু ডেস্ক বানিয়ে দোতলার এই বারান্দায় রেখেছিলেন। ওপরের দু'টি ঘরের একটিতে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের কাছ থেকে পাওয়া রাধাকৃষ্ণের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত, অন্যটি ছিল শরৎচন্দ্রের শয়নকক্ষ।

শরৎচন্দ্রের কালে অঙ্গনের বাগানটি নাকি দেখবার মত ছিল। অনাদরে অবহেলায় আজ তা নিতান্তই শ্রীহীন। বাগানের পশ্চিম দিকের প্রাচীরের বাইরে একখণ্ড ডাঙ্গা জমিতে পাকা গাঁথনির দু'টি সমতল বেদী। তাদের শিয়রে দু'টি মর্মরফলকে শরৎচন্দ্র ও স্বামী বেদানন্দের জন্ম ও মৃত্যুর তারিখ উৎকীর্ণ আছে। স্বামী বেদানন্দ (প্রভাস-চন্দ্র) ছিলেন শরৎচন্দ্রের মেজ ভাই; ছোট ভাই-এর নাম ছিল প্রকাশচন্দ্র। প্রভাসচন্দ্র অল্প বয়সেই সন্ন্যাসী হয়ে গৃহত্যাগ করেন। বহুদিন পরে সামতাবেড়ে এসে তিনি নাকি বলেন সাত দিনের বেশী থাকতে পারবেন না। সপ্তাহান্তে তাঁর মৃত্যু হয়। পাশাপাশি এ দু'টি বেদীর নীচে এক গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী ও এক জন্ম-ভবঘুরে দুই সহোদরের চিতাভস্ম রক্ষিত।

শরৎচন্দ্রের পল্লীভবনের এ-ই সংক্ষিপ্ত বিবরণ। ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে তাঁর মৃত্যুর পরে তাঁর বিধবা স্ত্রী হিরন্ময়ী দেবী এখানে একাদিক্রমে বাস করে গেছেন প্রায় ২৩ বছর। ১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বরে তিনি দেহরক্ষা করলে এ বাড়িকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসবার জন্য এ নিঃসন্তান দম্পতির আর কেউ অবশিষ্ট রইলেন না। বঙ্গসরস্বতীর অন্যতম বরপুত্রের স্মৃতিবিজড়িত এ ভবনটি সংরক্ষিত হওয়া উচিত। হাওড়া জেলা শরৎচন্দ্র স্মৃতিরক্ষা সমিতি এ বিষয়ে উদ্যোগী হলেও অদ্যাবধি বিশেষ কিছু করে উঠতে পারেননি।

*

শরৎচন্দ্রের স্মৃতিসন্ধানে সামতাবেড়, পানিত্রাস, নবাসন প্রভৃতি কাছাকাছি গ্রামে গিয়েছি একাধিকবার। পানিত্রাস গ্রন্থাগারে ও নবাসনের 'আনন্দনিকেতন কীর্তিশালা'য় শরৎচন্দ্রসম্পর্কিত যেসব পাণ্ডুলিপি ও অন্যান্য সামগ্রী রক্ষিত আছে তা নিঃসন্দেহে মূল্যবান। কিন্তু সে সমস্তই নিষ্প্রাণ দলিল, নির্জীব নিদর্শন। শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ খবর দিতে পারে এমন এক জীবন্ত সাক্ষীর সন্ধান পেলাম একবার সামতাবেড় পরিদর্শনে এসে। কে যেন বললে, সামতাবেড়ে থাকাকালীন প্রায় আগাগোড়াই শরৎচন্দ্রের ভৃত্য ছিল গোপাল হাজরা; সে থাকে পাশের পল্লী গোবিন্দপুরে। ডেকে পাঠাতেই সে এসে হাজির হল শরৎচন্দ্রের বাড়ির একতলার বারান্দায়। ছোটখাট চেহারা, মুখে কাঁচাপাকা দাড়িগোঁফ, মাথার চুল কাকের বাসা। পরণে ময়লা ফতুয়ার উপর ততোধিক ময়লা চাদর; খাটো ধুতি উঁচু করে পরা; বয়স প'য়ষট্টির কাছাকাছি। গোবিন্দপুরে তিন পুরুষের বাস, জাতিতে মাহিষ্য। এখন সামান্য জমিজমার আয়ে কষ্টে দিন চলে।

শরৎচন্দ্র সম্পর্কে দু'চার কথা জিজ্ঞেস করতেই মুখ খুলে গেল তার। একটানা তিন-চার ঘণ্টা প্রশ্নোত্তরের মাঝে মাঝে এই প্রত্যক্ষদর্শী যেসব মণিমুক্তা ছড়াতে লাগল তা সযত্নে কুড়িয়ে নিতে লাগলাম আমার নোটবইতে। বর্তমান নিবন্ধে সে সম্পদের সবটুকু হয়ত পাঠকসমাজে পেশ করতে পারব না।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর খাস ভৃত্য বনমালীর জন্য বঙ্গসাহিত্যের আঙিনার একপাশে একটু স্থান করে দিয়ে গিয়েছেন। কিন্তু তাঁর দীর্ঘকালের আর একটি ভৃত্য 'নাথু'র ততখানি সৌভাগ্য হয়নি। বিশ্বভারতীর এক ফোটাগ্রাফিক কভারেজের সূত্রে, ঘটনাচক্রে তার সঙ্গে একাদিক্রমে কয়েকদিন কাজ করতে হয়েছিল আমাকে। তার চোখে দেখা খুব কাছের মানুষ রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে অনেক গল্প, অনেক অন্তরঙ্গ কাহিনী সে আমায় বলেছিল কাজের ফাঁকে ফাঁকে। সে নোটগুলি আমার মূল্যবান সঞ্চয়। কেননা, রবীন্দ্র-গবেষকরা নীচুতলার এসব প্রত্যক্ষদর্শীদের অজস্র অভিজ্ঞতার তেমন মূল্য দিয়েছেন কিনা সন্দেহ। দিলে তার যথেষ্ট পরিমাণ মুদ্রিত বিবরণ হয়ত দেখতে পেতাম। সাংবাদিকরাও এই হরিজনদের তেমন পাত্তা দেননি, কেননা তাঁদের কাছে সংবাদ সংগ্রহের সহজতম ক্ষেত্র সাধারণত ভি. আই. পি. মহলে। ফল হয়েছে এই যে, হাত বাড়ালেই পাওয়া যেত এমন অনেক উৎকৃষ্ট কাহিনী, উপাদেয় স্মৃতিকথা, ঘরোয়া আলাপের টুকরো থেকে আমরা, সাধারণ পাঠকরা, বঞ্চিত হয়েছি।

যাক সেকথা। গোপাল বললে—এ বাড়ি হবার আগে তো এখানে ঘোর ঝোপজঙ্গল ছিল। 'বাবু' (শরৎচন্দ্র) আসেন প্রথমে; বাড়ি তৈরি হবার বেশ কিছুদিন পরে আনেন 'বড় মা'কে (হিরন্ময়ী দেবী)। গ্রামের চাষাভুষোদের খুব স্নেহ করলেও 'বাবু' তাঁদের বাড়িতে গিয়ে কখনো আসর জমিয়ে বসতেন না। তাঁদের রোগে শোকে আপদে বিপদে সর্বদা পাশে পাশে থাকলেও, ব্যক্তিগত মেলামেশার ক্ষেত্রে 'বাবু' একটু দূরত্ব রেখে চলতেন। তবে বাড়িতে কেউ এলে যথেষ্ট সমাদর ও সহানুভূতি পেত। অত্যধিক ধূমপান ছাড়া অন্য কোন নেশায় 'বাবু'র আসক্তি গোপাল দেখেনি। আড়াই পোয়া করে তামাক লাগত রোজ; চুরুটও সেই পরিমাণে। লেখবার সময় বা ধূমপানের যখন খুব ইচ্ছে হয়েছে, তখন অবিলম্বে সাজা গড়গড়া না পেলে খাপ্পা হয়ে উঠতেন। একদিন পাশের বাড়িতে গোপাল তাস খেলছে। এদিকে লিখতে লিখতে 'বাবু'র গড়গড়া গেছে নিবে। প্রচণ্ড হাঁকডাক শুনে শৈল ঝি এসে সামনে দাঁড়াল। সে বেচারা তামাক সাজতে জানত না। গোপালকে কোথাও খুঁজে না পেয়ে ফিরে এসে 'বাবু'কে সেকথা বলতেই তিনি একেবারে ফেটে পড়লেন। পায়ের চটি এমন জোরে ছুঁড়ে মারলেন যে সেটা বাগানের ধারের পাঁচিলের কাছে গিয়ে পড়ল। গোপাল ইতিমধ্যে খবর পেয়ে ছুটে এসে তামাক সেজে ফেলেছে। ধূমায়িত কলকে হাতে নিয়ে যেই তার প্রবেশ, অমনি 'বাবু'র রাগ একেবারে জল। একবার শুধু বললেন—হতভাগা থাকিস্ কোথায়? তারপরেই নল মুখে দিয়ে লেখা শুরু করলেন।

শরৎচন্দ্রের অপর ভৃত্য যামিনী ধাড়া অনেক সময় 'বাবু'র মন রেখে কথা বলত। শরৎচন্দ্রের চিকিৎসাধীন এক গ্রামবাসী কেমন আছে 'বাবু' সেকথা জানতে চাইলে তাঁকে খুশি করবার জন্য খোঁজ না নিয়েই সে বললে—আজ বেশ ভালই আছে; জ্বর ছেড়ে গিয়েছে। কেমন যেন সন্দেহ হল শরৎচন্দ্রের। গোপালকে গিয়ে দেখে আসতে বললেন। গোপাল গিয়ে দেখে তার মুমূর্ষু অবস্থা। বাড়ি ফিরে সে খবর দিতেই মিছে কথা বলবার জন্য যামিনীর ওপর একেবারে ক্ষেপে উঠলেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই চটিতে পা গলাচ্ছেন, চাদর রাখছেন কাঁধে। অন্যান্য ডাক্তার-বদ্যি ডাকিয়ে, কিছুটা নিশ্চিন্ত হয়ে যখন অনেক দেরিতে বাড়ি ফিরলেন তখন যামিনীর ওপর রাগ পড়ে গেছে।

শুধু বললেন—বেঁচে যাবে; তবে তুই ব্যাটা ঠিক খবরটা দিলে আরও আগে চিকিৎসা আরম্ভ করা যেত।

একবার হয়েছে কি 'বাবু'র হঠাৎ পঞ্চাশ টাকার খুব দরকার পড়ল। 'বড় মা'কে ডেকে বললেন—বড় বউ! (ওই নামেই ডাকতেন) টাকাটা এখুনি না পেলে তো চলে না; আমি সব জায়গায় খুঁজে দেখলাম, আমার কাছে কিছুই নেই। 'বড় মা' সংসার-খরচ থেকে একটু-একটু করে বাঁচানো একরাশ রেজগি এনে হাজির করলেন। 'বাবু'র অবস্থা তখন এতই নিরুপায় যে সেই রেজগির স্তূপ থেকে গুণে গুণে, থাক দিয়ে সাজিয়ে, পঞ্চাশ টাকা করলেন। তারপরে মনের আনন্দে চুরুটের বাক্স খুলতেই দেখা গেল, কখন তার ভিতরে পাঁচটা দশ টাকার নোট রেখেছিলেন। হাসাহাসির রোল পড়ে গেল। 'বড় মা' খুচরো ফেরত নিয়ে গেলেন।

সাংসারিক খরচপত্রের দিকে কোন দৃষ্টি না দিলেও শরৎচন্দ্র তার একপাল পোষা পশুপাখির জন্য অকাতরে ব্যয় করতেন। তাঁর ছিল তিনটি গরু; তারা শুধু থাকত ও খেত, কখনো দুধ দিত না। বড় বড় খাসি ছিল দুটি; তারা প্রত্যেকে আড়াই পোয়া করে ছোলা খেত রোজ—অন্যান্য আহার তো ছিলই। আর ছিল তিনটি দেশী কুকুর, একটি ময়ূর, একটি চন্দনা ও একটি কাকাতুয়া। শরৎচন্দ্র নিজের হাতে এদের পরিচর্যা করতেন, খাওয়াতেন।

লেখাপড়ার সময়ের ব্যাপারে 'বাবু'র কোন বাঁধাধরা নিয়ম ছিল না। দিনে বা রাতে সব সময়েই লেখাপড়া চলত, তবে রাত বারোটার বেশী বড় একটা জাগতেন না। দিনমানে বাগানের কাজ, পশুপাখির কাজ করেও হাতে অনেক সময় থাকত। বিকেলের দিকে ভগ্নীপতি পঞ্চানন মুখোপাধ্যায় বা পরম সুহৃৎ হৃদয় স্যাঁকরার আড্ডায় গিয়ে একটু না বসলেও চলত না। তারপরে বাড়ি এসেই লিখতে বসতেন।

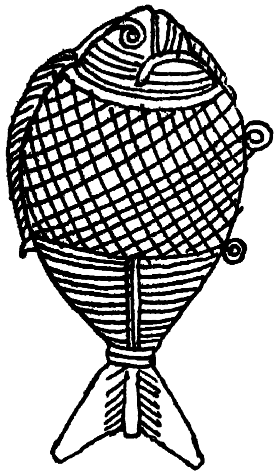
'বড় মা'র কথা গোপালের স্মৃতিতে খুব উজ্জ্বল। সংসারের সব ঝক্কি পুইয়ে তিনি যে 'বাবু'কে একমনে লেখাপড়া করবার সুবিধে করে দিতেন সেকথা গোপালও বুঝত। আর দয়াদাক্ষিণ্যে, স্নেহে অনুকম্পায় যেন ছিলেন সাক্ষাৎ মা ভগবতী। গোপাল যখন গরুর জাবনা মাখছে তখন কতদিন হয়ত ডেকে বলেছেন—বাবা গোপাল, এই মিষ্টিটুকু খেয়ে যা। গোপাল বলেছে—এখন হাত নোংরা রয়েছে মা, পরে খাব। 'বড় মা' সেকথা শোনেনি, কাছে এসে হাঁ করিয়ে মুখে সন্দেশ গুঁজে দিয়ে দিয়েছেন গোপালের।

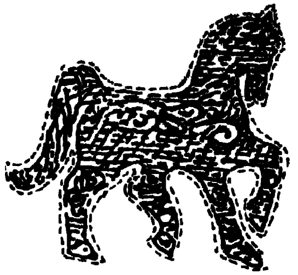
একবার নিজের পরিবারে রাগারাগি করে গোপাল বাড়ির অন্নজল ত্যাগ করেছে; দোকান থেকে চিঁড়ে কিনে খায়। এভাবে সাত দিন কেটে গেলে, গোপালের মা 'বড় মা'কে এসে ধরে পড়ল। 'বাবু'র কানে কথাটা উঠল। তিনি গোপালকে ডেকে বললেন—তুই এমন করছিস কেন, কী চাই তোর? দুষ্টুমি করে গোপাল বললে—চাই আর এমন কি! দু' বেলার খোরাক আর পরণের কাপড় চাই। 'বাবু' তখন তাকে তার রুলটানা মাইনের খাতাটা আনতে বললেন; তাতে তার মাইনে ও যাবতীয় পাওনাগণ্ডার হিসেব লেখা থাকত। সেখানে খস খস করে কি যেন সব লিখে 'বাবু' বললেন—যা, তোর খাওয়াপরার ব্যবস্থা করে দিলাম। গোপালের স্থির বিশ্বাস, তার জন্যে কাঁচা উইলজাতীয় একটা কিছু 'বাবু' সে খাতায় লিখে রেখেছিলেন। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর গোপাল আর সে খাতাখানা পায়নি।

'বাবু'র শেষ অসুখের সময় যখন খুব বাড়াবাড়ি হল, তখন চিকিৎসার জন্য তাঁকে নিয়ে যাওয়া হল কলকাতার অশ্বিনী দত্ত রোডের বাড়িতে। একটু ভাল হয়ে উঠে একদিন নানারকম ফুলগাছের চারা কিনিয়ে গোপালকে দিয়ে সামতাবেড়ে পাঠালেন—কোথায় কোনটা পুঁততে হবে বলে দিলেন সবিস্তারে। 'বাবু'র সঙ্গে গোপালের

সেই শেষ দেখা; তিনি যে এত শিগ্গির চলে যাবেন গোপাল তা ভাবতে পারেনি। কয়েক দিন পরে সামতাবেড়ে খবর এল—'বাবু' আর নেই।

দরদর করে চোখের জল গড়িয়ে পড়তে লাগল গোপালের দু'গাল বেয়ে।...অনেকক্ষণ পরে চাদরের খুঁটে চোখ মুছে ধরা ধরা গলায় বললে—বড্ড ভাল লোক ছিলেন বাবু, সাক্ষাৎ দেবতা একেবারে।





মুকুটমণিপুর

সাধারণের কাছে শরৎচন্দ্রের শেষজীবনের আশ্রয়স্থল হিসেবেই সামতাবেড়ের গুরুত্ব, জাতির স্মৃতিতে এই নগণ্য পল্লীর চিরস্থায়ী আসন তিনিই নির্দিষ্ট করে দিয়ে গিয়েছেন—চলতি ধারণাটা এরকম হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু এ তো শুধু এক তরফের কথা—শরৎচন্দ্রের তরফের। অন্য দিকে, সামতাবেড়ের স্বপক্ষে একথা হয়ত বলা যায় [illegible] সংসারবিরাগী, জন্ম-যাযাবরকে প্রবল আকর্ষণে বুকে টেনে নেবার মত তারও কিছু ঐশ্বর্য ছিল যা শরৎচন্দ্রের নামাঙ্কিত দান নয়। অনুরূপ দৃষ্টান্ত আরও আছে। বীরভূমের এক প্রান্তরের মধ্যে এক প্রাচীন ছাতিমের স্নেহচ্ছায়া মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথকে একদা প্রাণের আরাম দিয়েছিল। শিলাইদহে মৃদু-কল্লোলিত পদ্মার উদার প্রসারের মাঝখানে রবীন্দ্রনাথ খুঁজে পেয়েছিলেন বিশ্বচরাচরে মানবজীবনের অর্থ। অরণ্যপরিবৃত ঘাটশীলায় প্রকৃতির ঘর-ছাড়ানো ইশারা শোনবার জন্য বিভূতি-ভূষণ ছুটে গেছেন বারংবার। বন্ধনটা সব ক্ষেত্রেই উভয়তঃ: মানুষ ও পারিপার্শ্বিক কে কাকে বেশী দিয়েছে বলা যায় না। এহেন দ্বিমুখী সম্পর্ক বিশ্লেষণ করে পশ্চিম-বঙ্গের বেশ কিছু স্থান সম্বন্ধে উপাদেয় রচনা সম্ভব। ভবিষ্যতে সেসব বৃত্তান্ত বাঙালীর ইতিহাসের মূল্যবান উপাদান হবে তাতে সন্দেহ নেই। বর্তমান গ্রন্থে আমার সীমিত সাধ্য অনুসারে শুধু সামতাবেড় ও মংপু সম্বন্ধে সে চেষ্টা করেছি।

এরকম বিশিষ্ট স্থানেই শুধু নয়, প্রায় সর্বত্রই যেসব সংস্কৃতি-উপাদান ছড়ানো আছে, এ পুস্তকের প্রথম নিবন্ধে সেদিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি। সেখানে দেশবাসীর কাছে আবেদন করেছি, তাঁরা যেন গ্রামগ্রামান্তর থেকে আমাদের অপস্রিয়-মান সাংস্কৃতিক উপাদানগুলি সংগ্রহ করে আনেন কেননা সেসব উপকরণের ভিত্তিতেই একদা বাঙালী জাতির পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচিত হবে।

কিন্তু সকলেই যে এহেন গুরু দায়িত্ব বহনে সম্মত বা সক্ষম হবেন এমন আশা করা যায় না। সেজন্য সে নিবন্ধে আরও লিখেছিলাম—"আমার এ আশা যদি ফলবতী নাও হয় তাতেও ক্ষতি নেই। বর্তমান লেখাগুলির মাধ্যমে বার বার আমি ফিরে যাব গ্রাম-পরিক্রমার সেই পরম রমণীয় দিনগুলিতে। আর বরাত গুণে যদি দু'চারজন অনুরাগী পাঠকপাঠিকা পাই—আমি তাঁদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাব পশ্চিমবঙ্গের দিকে দিগন্তরে। পথের শেষে চমকদার কিছু যদি নাও দেখাতে পারি, পথ চলার আনন্দ থেকে তাঁরা কখনই বঞ্চিত হবেন না। বৃষ্টিবিহীন বৈশাখী দিনে তপ্ত বাতাসের হলকা-ওঠা দীর্ঘ পথে তাঁদের আমি নিয়ে যাব বাঁকুড়া, পুরুলিয়ায়; শ্যামছায়াঘন দিনে দূর গ্রামপথে তাঁদের সঙ্গী হব জলপাইগুড়ি, বীরভূম, বর্ধমান, মেদিনীপুরে; শরতের প্রসন্ন আকাশের



নীচে খোলা নৌকায় তাঁদের সঙ্গে ভেসে যাব তিস্তা, ইছামতী, ভাগীরথী, মহানন্দায়।"

অকারণ পুলকে এই ভেসে যাওয়াটা ততটা ঘটেনি এ লেখাগুলোয় যতটা হলে হয়ত ভাল হত। অধিকাংশ প্রবন্ধেই কিছু-না-কিছু নতুন খবর, সাধারণের কাছে অজ্ঞাত কিছু তথ্য পরিবেশনের চেষ্টা করেছি। মহাকালের বিরাট ভাণ্ডারের এক কোণে সসঙ্কোচে তারা পড়ে থাকবে, যদি কোনদিন কোন মহা-ঐতিহাসিকের কাজে লাগে।

কিন্তু সংবাদসমৃদ্ধ নয় এমন গ্রামও তো যথেষ্ট আছে পশ্চিমবাংলায়। জ্ঞান আহরণের ক্ষেত্র না হলেও হৃদয়ের প্রসার ও অনুভূতির পরিধিকে দিগন্তবিস্তৃত করে দিতে তাদের জুড়ি কোথায়! আমাদের গ্রাম-পরিক্রমায় তাদের অবহেলা করবার কোনই কারণ নেই। তাহলে শাজাদপুর, পতিসর, শিলাইদহ, সামতাবেড়, ঘাটশীলা, মংপু—সবই তো বাদ পড়ে বাঙালীর জীবন থেকে। বঙ্গজননীর প্রসারিত অঞ্চলে এরকম আরও কত গ্রাম যে মণিমুক্তার মত খচিত রয়েছে তার খবর কে রাখে! আজ তাই চলুন বেরিয়ে পড়ি যে-দিকে দু'চোখ যায় সেদিকে। সব দায়-দায়িত্বের অতীতে সেইখানে, আকাশ যেখানে অনেক নীল অনেক নীচু, লোকালয় যেখানে অনেক দূরে অনেক পিছে, প্রকৃতি যেখানে কোলের কাছে হাতের মুঠোয়। পশ্চিমবঙ্গে এ সংজ্ঞার সঙ্গে খাপ খায় এমন যে ক'টি জায়গার কথা জানি তাদের মধ্যে মুকুটমণিপুরের স্থান বেশ উঁচুতে। বাঁকুড়া জেলার দক্ষিণাঞ্চলের খাতড়া থানায় অবস্থিত অখ্যাত গ্রাম মুকুট-মণিপুর। গ্রামও বলা যায় কিনা সন্দেহ। মৌজা একটা আছে অবশ্য এ নামের, তবে যেরকম লোকবসতি নিয়ে গ্রাম হয় এখানে তেমন কিছুই নেই। শুধু আছে নয়ন-বিমোহন, পরম শ্রান্তিহর একটি ডাকবাংলো। কংসাবতী জলাধার পরিকল্পনায় যে বিশাল হ্রদের সৃষ্টি হয়েছে তার পাশেই এক ছোট্ট টিলার উপর সেটি অবস্থিত। ঋষি যদি প্রতিবেশীত্যাগী গৃহী হন তাহলে অন্তত কয়েক দিনের জন্য ঋষি হবার এমন সার্থক স্থান নিতান্তই বিরল। মাসানজোড়ের কথা এপ্রসঙ্গে অনেকের মনে পড়তে পারে। সেখানে ময়ূরাক্ষী-বাঁধের এপারে-ওপারে পশ্চিমবঙ্গ ও বিহার সরকারের প্রাসাদোপম দুটি যাত্রীনিবাস আছে। সেখানে স্থান পেতে হলে দীর্ঘদিন ধরে উমেদারি করতে হয়।

অবশেষে স্থান যদি বা মেলে, সে বহু প্রতিবেশীর সন্দিগ্ধ সান্নিধ্যে, বেশভূষা-বিলাসের প্রতিযোগিতার মধ্যে। মুকুটমণিপুরের দিকে কাঞ্চনকুলীনদের নেকনজর এখনও পড়েনি। দুর্গমতার জন্য সেখানে গিয়ে পেঁাছনোও তাঁদের পক্ষে কিছুটা কষ্টকর। থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থাও কেতাদুরস্ত হোটেল থেকে অনেক নিরেস। অতএব, দিন-আনি-দিন-খাই গ্রুপের আপনার আমার পক্ষে দেহমনের বিশ্রামের জন্য পরম রমণীয় স্থান।

কিন্তু মনোরম হলেও মুকুটমণিপুর খুব সুগম নয়। আর ঠিক সেই কারণেই তার আকর্ষণ অনেক বেশী। সভ্যতার ক্ষত এই শহরগুলোর বিষাক্ত পরিবেশ থেকে যদি পালিয়ে বাঁচতে চান তবে যত দূরে যেতে পারেন ততই ভাল। দুনিয়ার দাঁত-বেরকরা মুখের ওপর সদর দরজাটা সশব্দে বন্ধ করে দিয়ে খিড়কি-পথে যদি নিরুদ্দেশের দিকে পা বাড়াতে পারেন তবেই বাঁচবার রাস্তা খুঁজে পাবেন। হাওড়া-খড়্গপুর-আদ্রা রেল-পথে সুবিধামত যেকোন ট্রেনে বাঁকুড়ায় এসে নামতে পারেন। স্টেশন থেকে গন্তব্যস্থল অবধি সরাসরি বাস হয়ত পাবেন না; পাবেন শহরের কেন্দ্রস্থলে মাচানতলা থেকে। এটুকু পথ সাইকেল রিকশায় এসে সেখান থেকে গোরাবাড়ির বাস ধরুন। গোরাবাড়ি মুকুটমণিপুর থেকে আরও মাইল খানেক দক্ষিণে, বাঁকুড়া শহর থেকে প্রায় ৩৫ মাইল দূরে। যে পথে বাস যায় তা মুকুটমণিপুরের ডাকবাংলোর কাছ দিয়েই গিয়েছে। বাস থেকে নেমে, পরিচ্ছন্ন ঘোরানো রাস্তায় টিলার উপরের ডাকবাংলোয় উঠে আসতে কোনই অসুবিধা নেই। কংসাবতী পরিকল্পনার প্রোজেক্ট ইঞ্জিনিয়ারের দপ্তর বাঁকুড়া শহরে। সেখানে আগে খবর দিয়ে বসবাসের আগাম অনুমতি সংগ্রহ করাটা আবশ্যিক।

বছর কুড়ি আগেও গোরাবাড়ি বা মুকুটমণিপুর প্রায় জনহীন পরিত্যক্ত অঞ্চলের শামিল ছিল। কংসাবতী পরিকল্পনার স্থানীয় কর্মকেন্দ্র এখন গোরাবাড়িতে। বহু ইঞ্জিনিয়ার ও কুশলী কর্মীর সেখানে বাস, আর আছে বাঁধ নির্মাণে ব্যবহৃত নানাবিধ যানবাহন ও যন্ত্রপাতির এক বিরাট গুদাম ও মেরামতি কারখানা। মুকুটমণিপুর ডাক-বাংলো থেকে পায়ে হেঁটে সেখানে অক্লেশে যাওয়া যায়: মাঝখানে শুধু শালবনে-ঢাকা নীচু একটি পাহাড়ের ব্যবধান। বাজারহাটও গোরাবাড়িতে। তবে সেজন্য আপনার উদ্বেগের কারণ নেই। কেননা ডাকবাংলোয় খুবই সংগত মূল্যে আহার পরিবেশনের দায়িত্ব যাদের তারাই সানন্দে আপনার সিগারেট, দেশলাই বা অন্যান্য টুকিটাকি জিনিস এনে দেবে। এখানে এলে হয়ত প্রথম আবিষ্কার করবেন যে ধূমপানের সামান্য সরঞ্জাম ছাড়া আর কত অল্পে আপনার দিন অবলীলাক্রমে কেটে যায়। সামনেই প্রায় পঞ্চাশ বর্গমাইলের নীল হ্রদ। টিলার চূড়ায় অনেকখানি জমি সমতল করে নিয়ে যে সুদৃশ্য উদ্যানটি রচিত হয়েছে তার একান্তে সবুজ ঘাসের লনে বসে কোথা দিয়ে যে আপনার সময় কেটে যাবে বুঝতেও পারবেন না। ধূমপানের সরঞ্জাম যদি হাতের কাছে নাও পান, অনুমান করি, তাতেও আপনার খুব অসুবিধা হবে না। কেননা আপনাকে গোপনে ছোবল মারবার জন্য সরীসৃপের দল (তাদের অনেকেই হয়ত আপনার কাছে উপকৃত) আপনার আশেপাশে ভদ্রতার ছদ্মবেশে যে ঘুরে বেড়াচ্ছে না আপনি সেবিষয়ে নিশ্চিন্ত। এখানে ছুটির ক'টা দিনে আপনার কোন দায়দায়িত্ব নেই, জীবিকার্জনের গ্লানি নেই, সদাসতর্ক পাহারায় নিজেকে বাঁচাবার প্রয়োজন নেই। আগে প্রায় ছ' মাইল দীর্ঘ কংসাবতী বাঁধের উত্তর সীমায় এই ডাকবাংলোর কাছে, ইলেকট্রিক ড্রিল যখন কাজ করত রাত্রিদিন, ডিনামাইট দিয়ে পাহাড় ধসানোর শব্দ শোনা যেত মুহুর্মুহু, তখন শান্তি বিঘ্নিত হবার কিছু কারণ ছিল। এখন কংসাবতী বাঁধের কাজ প্রায় শেষ হয়েছে; কুমারী নদীর বাঁধের কাজ চলেছে প্রায় তিন মাইল দূরে। এখন মুকুটমণিপুরে প্রগাঢ় শান্তি। সামনে দিগন্তবিস্তৃত গাঢ় নীল জলরাশি—এত নীল যে তা আকাশের

পূর্ণিমাকেও হার মানায়। আশেপাশে শালবনে-ঢাকা ছোট ছোট পাহাড়। চারিদিকে তরঙ্গায়িত বনভূমির অপূর্ব দৃশ্য। প্রকৃতির উদারপ্রসার কোলে নিজেকে নিঃশেষে সমর্পণ করবার এর চেয়ে উপযুক্ত স্থান বড় বেশী নেই।

কিন্তু গ্রীষ্মকালে আসবেন না মুকুটমণিপুরে। সময়ের বাছবিচার না করে কেউ যদি রওনা হন তবে তিনি হঠকারিতা করবেন। বাঁকুড়ার এ অঞ্চলে যে কী সাংঘাতিক গরম পড়ে তা অনেকে ধারণাই করতে পারবেন না। সেজন্য আসুন শরতে, হেমন্তে, শীতে কি বসন্তে। একটু কষ্ট করে সপরিবারে আসুন। এসে পেঁছিলে পথশ্রম মনে থাকবে না। চারিদিকের মার খেয়ে খেয়ে নিম্নমধ্যবিত্ত আমরা তো 'কষ্ট-প্রুফ' হয়ে গেছি। পথের সামান্য কষ্ট আপনাকে বা আপনার পরিবারকে খুব কাবু করতে পারবে বলে মনে হয় না।

শারীরিক ক্লেশের পরোয়া যাদের কম, সেই ছাত্র বা তরুণ সম্প্রদায়ের জন্য পৃথক এক ইয়ুথ হস্টেলও আছে এখানে। থাকবার অনুমতি দেন জেলাশাসক। ডাকবাংলোর টিলার একটু নীচে, বাঁধের কোল ঘেঁষে, এই যুব-আবাসটি খুবই মনোরম পরিবেশে অবস্থিত। পিছনের দিগন্তবিস্তৃত সুনীল জলরাশির পটভূমিতে ধবধবে সাদা এ বাড়িটি যে কী সুন্দর দেখায় তা ভাষায় বর্ণনা করা শক্ত। এখানে একসঙ্গে ষোলজন ছেলে, ষোলজন মেয়ে ও তাঁদের অভিভাবকদের স্থান সংকুলান হতে পারে। রান্নার যাবতীয় সরঞ্জামও পাওয়া যায়। আগন্তুকরা যদি দল বেঁধে আসেন, তাহলে নিজেদের রান্নাবাড়া নিজেরাই করে নিলে চড়ুইভাতির আনন্দ এক বাড়তি লাভ।

বিশেষ করে এরকম দলের জন্য কাছেপিঠে কিছু ভ্রমণের সুযোগও আছে। কংসাবতী বাঁধ নির্মাণের স্থানীয় ঘাঁটি গোরাবাড়ির কথা আগেই বলেছি। সেখানকার ইঞ্জিনিয়াররা সহৃদয়। সাহায্য চাইলে তাঁরা গোরাবাড়ির কর্মকাণ্ড বুঝিয়ে দিতে কার্পণ্য করবেন বলে মনে হয় না। বাঁধের উপরের রাস্তা-বরাবর কুমারী নদীর দিকেও চলে যাওয়া যেতে পারে। সেখানে বাঁধ নির্মাণের কাজ এখনও চলেছে। কী বিপুল পরিশ্রমে, কত দীর্ঘকাল ধরে যে এক-একটি নদী-উপত্যকা-পরিকল্পনা রূপায়িত হয় তা কর্মচঞ্চল কুমারী-বাঁধের উপর দুদণ্ড দাঁড়ালেই বোঝা যাবে। সে বাঁধের শেষ সীমান্তের দূরত্ব ইয়ুথ হস্টেল থেকে মাইল ছয়েক; যাতায়াতে বারো মাইল। কিছু খাবার সঙ্গে নিয়ে সকালে বার হলে, পরমানন্দে একটা দিন পায়ে পায়ে কাটিয়ে আসা যায়। বিকালের দিকে, ফিরবার সময়, শুধু হ্রদের দৃশ্য দেখতে দেখতেই ডেরায় পেঁছিনো যায় অক্লেশে। সূর্য পাটে নামে ধীরে ধীরে। নীল জলের উপর দীর্ঘ রেখায় লক্ষ লক্ষ হীরা জ্বলতে থাকে। আরও ম্লান হয়ে আসে আলো। ঋতুটা হেমন্ত হলে, আকাশের বিরাট পটভূমিতে রঙের উৎসব লেগে যায়। মৃদুশিহরিত হ্রদের জলে কোন্ সে পটুয়ার রঙিন ছবি প্রতিফলিত হয়ে সিরসির করে কাঁপতে থাকে। পাখিরা নীড়ে ফিরে যায় দলে দলে। অস্তগামী সূর্যের আলো তাদের আন্দোলিত ডানা ছুঁয়ে ছুঁয়ে যায়। আঁধার নেমে আসে। শুক্লপক্ষ হলে, পূবের আকাশে দেখা যায় আশ্চর্য রকম উজ্জ্বল চাঁদ। ভ্রমণের সময়টা যদি পূর্ণিমার কাছাকাছি হয়, তাহলে কংসাবতী-বাঁধের উপরে দিনশেষের এই দৃশ্যকাব্য স্মৃতির পটে চিরদিনের মত মুদ্রিত হয়ে থাকবার কথা।

পুরাকীর্তি অনুসন্ধানের শখটা আজকাল ক্রমে ক্রমে ব্যাপক হয়ে পড়ছে। মুকুট-মণিপুর থেকে সে শখও চরিতার্থ হতে পারে। গোরাবাড়ি ঘাটের ঠিক ওপারে উঁচু পাড়ের আড়ালে প্রাচীন অম্বিকানগর গ্রাম। সেখানে প্রাক্-মুসলিম যুগের দু'টি পাথরের মন্দিরের ভগ্নাবশেষ ও কিছু প্রাচীন বিগ্রহ এখনও দেখা যায়। অদূরে পরেশনাথে একদা এক সমৃদ্ধ জৈন কেন্দ্র ছিল।

বাঁধের কাজ যখন বেশী দূর অগ্রসর হয়নি, নৃত্যতত্ত্বশিল্পগত কংসাবতীর স্বাধীনতা যখন অক্ষুণ্ণ ছিল, তখন অম্বিকানগরের উঁচু পাড় থেকে সামনের দিকে তাকিয়ে চোখ জুড়িয়ে যেত আমার। ডানদিকে, সোনালী বালির বিছানার মধ্য দিয়ে, সর্পিল রেখায় প্রবাহিত হয়ে এসেছে কংসাবতী; বাঁদিকে কুমারীও ঠিক তাই। দিগন্ত থেকে দু'টি সুনীল জলধারা এসে মিশেছে অম্বিকানগরের ঘাটে। তারপর কংসাবতী নামে বয়ে গেছে দক্ষিণ-পূব দিকে। পশ্চিমবাংলার সব ক'টি জেলায় যে অজস্র নিসর্গশোভা দেখবার সুযোগ আমার হয়েছে তার মধ্যে এই বিশেষ প্রাকৃতিক দৃশ্যটি এখনও চোখ বুজলে স্পষ্ট দেখতে পাই। চোখ খুললে সে অনির্বচনীয় দৃশ্য দেখবার এখন কিন্তু আর উপায় নেই। অম্বিকানগরের উঁচু পাড়ে দাঁড়িয়ে সামনে তাকালে এখন দেখা যায় এক বিশাল বাঁধ যার ওপারে কংসাবতী আগেই বাঁধা পড়েছে আর কুমারী পাকাপোক্তভাবে বাঁধা পড়তে চলেছে কিছুদিনের মধ্যে। এতদিন খোলা আকাশের নীচে এ দু'টি নীল নদী আনমনে বয়ে এসেছে; মানুষের কোন কাজে লাগেনি। আমার মত বিষয়বুদ্ধিহীন দু'চারজন মূর্খের কাছে তাদের সেই অবাধ স্বাধীনতার দিনগুলি মনে দাগ কেটে রেখে গেছে। কিন্তু আজকের অগ্রসর সমাজে আমাদের মত সেকেলের স্থান কোথায়! বিশাল বাঁধ দিয়ে নদীর স্রোত আটকাতে পারলে সঞ্চিত জলরাশি চাষের কাজে লাগে, তা থেকে জলবিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়। এসব প্রকল্প আরও কতশত ভাবে যে মানুষের উপকার করে তার সীমাসংখ্যা নেই। বুদ্ধি দিয়ে বোঝবার চেষ্টা করলে, সে সবের কিছুই অস্বীকার করা যায় না। তবু, শেষবার যখন অম্বিকানগরে গিয়েছিলাম—দেখলাম বাঁধের এধারে শুকনো বালির চড়া। ময়ূরকণ্ঠী রঙের শীর্ণ জলধারা দু'টি শুকিয়ে গিয়েছে। পায়ে ভারী শিকল পরে কংসাবতী ও কুমারী আমাদের বৈষয়িক অগ্রগতির কাজে লেগেছে বাঁধের ওপারে। একটা হিন্দী প্রবচন মনে এল আমার—"রমতা সাধু অর বহতা নদী"। অর্থাৎ, যে সাধু ভ্রাম্যমান নয় সে আবার সাধু কিসের। তেমনি যে নদী প্রবাহ হারিয়েছে তাকে আর নদী বলা যায় না। সবুজ পাহাড়ের কোল ঘেঁষে, সোনালী বালির উপর নীল রেখা এঁকে, মুক্ত কংসাবতী আর কুমারীকে আমি পরমানন্দে বয়ে যেতে দেখেছি বহুবার। সে ছবি এখনও আমার মনে আঁকা আছে। গোটা কংসাবতী প্রকল্পের দামের থেকে সে ছবির মূল্য আমার কাছে কম নয়।

মুরগির লড়াই

কষ্ট করে যদি মুকুটমণিপুর অবধি আসতে পারেন তবে কংসাবতীর দক্ষিণে রাণীবাঁধ থানাটাও একবার ঘুরে যাবেন। ঢেউখেলানো ভূপ্রকৃতিতে এত সবুজের সমারোহ, কাছে-দূরে এত নীল পাহাড়ের মেলা পশ্চিমবাংলায় আর কোথায়ই বা পাবেন! ও'ম্যালী সাহেব তাঁর বাঁকুড়া গেজেটিয়ারে এ অঞ্চলকে স্কটল্যাণ্ডের সঙ্গে তুলনা করে স্থানীয় নিসর্গশোভার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে গেছেন। বাঁকুড়া-গোরাবাড়ি রুটের কিছু কিছু বাস এখন কাঁসাই-এর 'কজওয়ে' পার হয়ে রাণীবাঁধের ভিতর দিয়ে ঝিলিমিলি অবধি যায় শুনেছি। বাঁকুড়া শহর থেকেও নাকি সরাসরি ঝিলিমিলির বাস পাওয়া যায়। কংসাবতী প্রকল্পেব কল্যাণে, বাঁধের ভাটিতে বর্ষাকালেও আর তেমন জল থাকে না বলে কাঁসাই পার হওয়া এখন আর দুরূহ নয়। এ রাস্তায় রাণীবাঁধ থেকে ঝিলিমিলি অবধি পথ চিরকাল মনে রাখবার মত। বিশেষ করে, মাঝামাঝি জায়গায় নীচু একসারি পাহাড়ের এপার-ওপারে গভীর অরণ্যের বুক চিরে যে চঁড়াই-উৎরাই সড়ক তার তুলনা হয় না। বহুদিন আগে, সন্ধ্যার পর, এপথে একবার রাণীবাঁধে ফিরে আসছিলাম। পাহাড়ী রাস্তার সর্বোচ্চ অংশে গাড়ি থামিযে অভিভূতের মত অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইলাম পশ্চিমের প্রান্তরের দিকে। সীমাহীন সে অন্ধকার প্রান্তরের কোলে, দিগন্তের কাছে, জামসেদপুর শহরের অগণিত বিজলী আলোর ঝিকিমিকির দিকে তাকিয়ে যেন মনে হল স্বপ্নের এক রাজপুরী দেখলাম—দেওয়ালির রাত্রে আলোকমালায় সমুজ্জ্বল কৈশোরকল্পনার এক রাজপুরী। আজও, চোখ বুজলেই, সে অতীতস্মৃতি মনের তারে তারে বেজে ওঠে তীব্র এক ঝঙ্কারের মত। কিন্তু আজ এসব কথা থাক। তার চেয়ে বরং রাণীবাঁধ থানার অগণিত আদিবাসী মানুষেব সুখদুঃখের দুটো কথা বলি। দুঃখ তাদের অসীম। কিন্তু তার মধ্যেও সুখের ছিটেফোঁটা আছে—যেমন মুরগির লড়াই। অবসরবিনোদনের খুব নিষ্ঠুর, খুব রক্তাক্ত উপায় সন্দেহ নেই। তবু রাণীবাঁধ থানার সর্বত্রই এর চেয়ে জনপ্রিয় 'স্পোর্ট' আর নেই।

*

খুনোখুনি মারামারি করাটা কি মানুষের মজ্জাগত স্বভাব? বহু যুগের ঘষামাজায় তার আদিম প্রবৃত্তিগুলোর উপর পাতলা যে একটু ভদ্রতার আবরণ পড়েছে তা কি যথেষ্ট ঘাতসহ? নিজের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা থাকলে এখনও কি আমাদের একজন আর একজনের টুঁটি টিপে ধরতে সদা-উদ্যত নই? গত দু'তিন হাজার বছরের মানব-'সভ্যতা'র ইতিহাস এতই রক্তরঞ্জিত ও অধিকাংশ ক্ষেত্রে সে রক্তমোক্ষণ এতই অকারণ যে বিধাতার শ্রেষ্ঠ জীব মানুষকে ব্যাপক জিঘাংসার দায় থেকে একেবারে বেকসুর

খালাস দেওয়া যায় কিনা সন্দেহ। প্রাগৈতিহাসিক মানুষের সাবেক প্রবণতাগুলো এখনও যে সংযমের বাঁধনে যথেষ্ট সংহত হয়নি তার প্রমাণ দিকে দিকে।

কেউ যেন ঘৃণাক্ষরেও না মনে করেন এই নৃশংসতা আজকের অনগ্রসর গোষ্ঠীগুলির ভিতরেই সীমাবদ্ধ। ভারতবর্ষে যাঁরা আদিবাসী বলে পরিচিত তাঁদের মধ্যে আদিম অরণ্যচারী জীবনের অনেক রেশ এখনও অবশ্যই বর্তমান। কিন্তু তথাকথিত শিক্ষিত, আলোকপ্রাপ্ত সমাজেও একক বা দলবদ্ধ হৃদয়হীনতার নজিরের কিছুমাত্র অভাব নেই। শুধু এদেশেই নয়, পৃথিবীময়।

মৃগয়া বা শিকার দুনিয়ার রাজারাজড়াদেব ব্যসন সেই ইতিহাস-পূর্ব কাল থেকেই। গরীব অশিক্ষিতরাও চিরকাল বনের প্রাণী মেরেছে সত্য। কিন্তু ক্ষুন্নিবৃত্তির কারণে পশুহত্যা যদিও বা সমর্থন করা যায়, নিছক কালহরণ বা চিত্তবিনোদনের জন্য তা করা যায় কিনা সন্দেহ। অথচ সভ্যতা-অভিমানী উচ্চ কোটির লোকেরাই এই গর্হিত অপরাধটি করে এসেছেন আবহমানকাল। হিংস্র শ্বাপদ নিধনের মধ্যে লোকহিতৈষণা থাকা সম্ভব কিন্তু সেক্ষেত্রেও জিম্ করবেটের মত বিবেকবান শিকারীর সংখ্যা যে আঙুলে গোনা যায় সেকথা না বললেও চলে।

আরও লজ্জার কথা, হিংস্র প্রাণীকে বন্দী করে তারপরে বহু লোকের সামনে তাকে আহত বা নিহত করা অতীতের বিভিন্ন সভ্য সমাজে রীতিমত এক গণ-বিলাসে পরিণত হয়েছিল। প্রাচীন রোমে (রোমক সভ্যতা তখন তুঙ্গে) পালিয়ে বাঁচতে চাইত যেসব ক্রীতদাস তাদের ধরে এনে ক্ষুধার্ত সিংহের সামনে ফেলে দেওযা হত। কালক্রমে এই নিষ্ঠুর প্রথা সভ্যতাগবর্বী রোমের শৌখিন নাগরিকদেব মনোরঞ্জনের জন্য এক উত্তেজক খেলায় পবিণত হয়েছিল। এন্ড্রোক্লিস্ নামে এহেন এক ক্রীতদাস ও সিংহের কাহিনীটি এতই সর্বজনবিদিত যে তা থেকে এই হৃদয়হীন ব্যসনের কথা সকলেই জানেন। কিন্তু ঘরপালানো ক্রীতদাস ছাড়াও অন্যান্য বলশালী ক্রীতদাসদেরও যে এ খেলায় নিযোগ করা হত তা হযত সকলে জানেন না। এই নিষ্ঠুর প্রমোদের জনপ্রিয়তার কালে রোমের সম্ভ্রান্ত নাগরিকরা নিজ ব্যযে বাছা বাছা জোযান ক্রীতদাস পুষতে লাগলেন, ঠিক আজকের দিনে ঘোড়দৌড় জিতবার জন্য ধনীরা যেমন ঘোড়া পোষেন সেই রকম। নানাবিধ ট্রেনিং-এ শিক্ষিত করে, হাতে একটি তলোয়ার দিয়ে তাদের প্রাচীর-ঘেরা মল্লভূমিতে নামিযে দেওযা হত ক্ষুধার্ত সিংহের সামনে। বিশেষভাবে তাদের বাছাই করা ও শিক্ষা দেওয়া হত শুধু এই 'মহৎ' উদ্দেশ্যে যে লড়াইটা যাতে বহুক্ষণ চলে, দর্শকদের প্রমোদ যাতে দীর্ঘস্থায়ী হয়, আনন্দকৌতুকে যাতে তাঁরা এ ওঁর গায়ে ঢলে পড়তে পারেন। এহেন অসম সমবে ক্রীতদাসবা খুব কম ক্ষেত্রেই জয়ী হত। সিংহও আহত হত অল্পবিস্তর। মল্লভূমিতে ছিন্নভিন্নশরীর ক্রীতদাস ও রক্তাক্ত সিংহের দিকে তাকিয়ে দর্শকেরা উল্লাসে ফেটে পড়তেন। এইচ জি ওয়েলস লিখেছেন, রোমকরা এই নির্দয় প্রথাটি বর্বর ইট্রাস্কান সমাজ থেকে গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু লক্ষণীয় এই যে, রোমসাম্রাজ্যের প্রতিপত্তির কালে মানবসভ্যতার যে যথেষ্ট অগ্রগতি হয়েছিল এমন দাবি প্রায়শই করা হয়ে থাকে।

মধ্যযুগীয় ইংলণ্ডে বহুলপ্রচলিত 'বেয়ার গার্ডেন' নামে নিষ্ঠুর খেলাটিরও এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে। বিদেশ থেকে আমদানি করা ভালুককে খুঁটিতে লম্বা দড়ি দিয়ে বেঁধে তার ওপর এক পাল হিংস্র শিকাবী কুকুর লেলিয়ে দেওয়া হত। রজ্জুবদ্ধ ভালুক চতুর্দিকের আক্রমণকারীর সঙ্গে প্রাণপণে যুদ্ধ করে কিছুক্ষণের মধ্যেই রক্তাক্ত মৃত্যু বরণ করত। এই হৃদয়হীন তামাসা দেখবার জন্য বিলেতের অভিজাত সমাজে হুড়োহুড়ি পড়ে যেত। ১৫৭৫ খ্রীষ্টাব্দে রানী প্রথম এলিজাবেথ যে এ খেলা

দেখে বেশ তারিফ করেছিলেন, ইতিহাসের পাতায় তার উল্লেখ আছে। আমি পাঠকদের শুধু স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, এই ইংলণ্ডেশ্বরীর রাজত্বকালেই (১৫৫৮—১৬০৪ খ্রীষ্টাব্দ) সেকস্‌পীয়র তাঁর অমর সাহিত্যসম্ভার রচনা করেছিলেন। সে নিরিখে ইংলণ্ডকে কিছুতেই অসভ্য দেশ বলা যায় না। অথচ এহেন এক বর্বর প্রমোদ যে সে দেশের অভিজাত মহলে তখন খুবই সমাদৃত ছিল সে কথাও সত্য। এই বিস্ময়কর বৈসাদৃশ্যের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের ভার পাঠকদের উপরই ছেড়ে দিচ্ছি।

বিলেতের ভালুক-কুকুরের লড়াই পরে বেআইনী ঘোষিত হলেও স্পেনের ষাঁড়ের লড়াই এখনও সেখানকার সবচেয়ে জনপ্রিয় আনন্দোৎসব। এ খেলায় ধারালো শিংওয়ালা, ক্ষিপ্রগতি ও বেশ হিংস্র প্রকৃতির যেসব ষাঁড় অংশগ্রহণ করে তাদের শুধু বংশ পরিচয় বিচার করে নির্বাচন করাই হয় না, উপযুক্ত তালিম দিয়ে বিশেষভাবে শিক্ষিতও করা হয়। অগণিত দর্শকের প্রমোদকে দীর্ঘস্থায়ী করবার জন্য সশস্ত্র মানুষ তিন দফায় এই নিরস্ত্র পশুর উপর আক্রমণ চালিয়ে বাহাদুরি অর্জন করে। প্রথমে আসে বর্শাধারী দুই অশ্বারোহী বা পিকাডোর। তারা বিপরীত দিক থেকে পর্যায়ক্রমে বর্শার খোঁচায় ষাঁড়কে কিছুটা আহত ও উত্তেজিত করে তোলে। তারপরে আসে দু'জন বর্শাধারী পদাতিক বা ব্যাণ্ডেরিলেরো। তাদেরও কাজ ষাঁড়কে ক্ষিপ্ত ও হয়রাণ করা। এই দুই পর্যায়ের প্রাথমিক লড়াইয়ে ষাঁড় যখন বেশ পরিশ্রান্ত তখন আসে শেষ বীরপুঙ্গব—মাটাডর। তার বাঁ হাতে থাকে উগ্র লাল রঙের একপ্রস্থ কাপড় আর ডান হাতে দীর্ঘ তীক্ষ্ণ তরবারি। লাল কাপড়টি সামনে ধরলে ষাঁড় যখন তেড়ে আসে তখন বিদ্যুদ্‌গতিতে পাশে সরে গিয়ে মাটাডর তার অসির আঘাতে ষাঁড়ের কণ্ঠনালী ভেদ করবার চেষ্টা করে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ষাঁড়কে ধরাশায়ী করতে বহুবার অস্ত্রাঘাতের প্রয়োজন হয়। আর সে সময়টায় 'সভ্য' দর্শকদের একটানা হর্ষধ্বনিতে কানে তালা ধরে যায়। বর্বরতার এখানেই শেষ নয়। লড়াইয়ের শেষে মাটাডর ও তার সঙ্গীরা যখন মল্লভূমি প্রদক্ষিণ করে বীরের অভিনন্দন কুড়োতে থাকেন তখন অন্য সহকারীরা এসে ষাঁড়ের শিরশ্ছেদ করে মুণ্ডহীন ধড়টা প্রাঙ্গণের বাইরে টেনে নিয়ে যায়। বিশেষ আদরযত্নে পালিত হবার জন্য এসব বলির পশুর মাংস নাকি খুবই সুস্বাদু হয় এবং চড়া দামে বিক্রীও হয়ে যায় অভিজাত ক্রীড়ামোদীদের মধ্যে। স্পেন দেশে কুশলী মাটাডররা গণ্যমান্য নাগরিক বলে স্বীকৃত ও উচ্চ সরকারী খেতাবেও ভূষিত হন শুনেছি। কেননা, তাঁরা যে নামকরা স্পোর্টসম্যান!

এ তো গেল বাছা বাছা সভ্য সমাজে পশু নির্যাতনের কাহিনী। অগণিত রসজ্ঞের চোখের সামনে মানুষের মানুষ মারাও যে জনপ্রিয় স্পোর্টস হতে পারে তার পরিচয় পাই হাল-দুনিয়ার সভ্যতম (অনেকের মতে) দেশ আমেরিকায়। ম্যাডিসন স্কোয়ারে অনুষ্ঠিত যেকোন গুরুত্বপূর্ণ মুষ্টিযুদ্ধে লোকে লোকারণ্য হয়, টিকিট বিক্রী হয় লক্ষ লক্ষ ডলারের। সেই মল্লভূমিতে প্রতিপক্ষের মুষ্ট্যাঘাতে জর্জরিত হয়ে কত মুষ্টিযোদ্ধা যে নিহত হয়েছেন বা চিরদিনের মতো দৃষ্টিহীন বা পঙ্গু হয়ে গিয়েছেন তার ইয়ত্তা নেই। তা সত্ত্বেও সেখানে দর্শকের কোনদিন কম্‌তি হয় না। সেই সুবেশ, সুসভ্য জনতার সামনে মুষ্টিযোদ্ধাদের মুখ বুক যখন রক্তে ভেসে যায়, অথবা তাঁদের কেউ মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়ে যখন গোঙাতে থাকেন বা অসাড় হয়ে যান তখন চাঁদে-পাড়ি-জমানো দেশের সংস্কৃতিবান মানুষের বুকে "চিত্ত আত্মহারা, নাচে রক্তধারা"। এই কর্কশ বৈপরীত্যের মধ্যে কিভাবে যে সামঞ্জস্য করা যায়—জানি না।

সামঞ্জস্য শুধু এক উপায়েই হতে পারে। অপ্রিয় শোনালেও কথাটা হয়ত সত্য যে আজকের সভ্য মানুষের চরিত্রে মার্জিত রুচির খোলসটা খুবই পাতলা আর তার

ঠিক নীচেই আদিম প্রবৃত্তির পুরু পুরু স্তর এখনও বেশ বহাল তবিয়তে বর্তমান। এই পরিপ্রেক্ষিতে দেখলে, পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিম সীমান্তবর্তী জেলাগুলির নিম্নবর্ণের হিন্দু ও আদিবাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে মুরগির (বা মোরগের) লড়াই নামে যে প্রমোদটি বহুলপ্রচলিত তাতে আমি নিন্দনীয় কিছু দেখি না। এই অঞ্চলে ও সংলগ্ন বিহার ও ওড়িশা রাজ্যের পূব প্রান্তের বহু অনগ্রসর এলাকায় চিত্তবিনোদনের কোন ব্যবস্থা নেই বললেই চলে। পূজা, পার্বণ ও মেলায় সে উদ্দেশ্য কিছুটা সিদ্ধ হয় বটে, কিন্তু সংখ্যায় তারা মুষ্টিমেয়। তা ছাড়া এহেন জনগোষ্ঠীর জীবনে সভ্যতার প্রলেপ প্রায় কিছুই পড়েনি বলে, আদিম অরণ্যচারী অস্তিত্বের রেশ যে এখনও অনেকটা অব্যাহত আছে তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই। বনে জঙ্গলে হিংস্র শ্বাপদের সঙ্গে অবিরত যুদ্ধ করে তাদের এখন বেঁচে থাকতে হয় না সত্য। গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতে সশস্ত্র সংগ্রামও এখন অতীত দিনের কাহিনী। তবু সেই সদাশঙ্কিত, রক্তাক্ত যুগের স্মৃতি এত সহজে মুছে যাবার নয়। তাই নিহত পশু বা প্রতিপক্ষের রক্তাপ্লুত দেহের উপর দাঁড়িয়ে উল্লাস করবার দিন গত হওয়ায়, মুরগির লড়াই প্রভৃতি নিষ্ঠুর প্রমোদের মধ্য দিয়ে একটা বিকল্প ব্যবস্থা করা হয়েছে। এ বিষয়ে অন্ত্যজ শ্রেণীর লোকদেরই শুধু দায়ী করা যায় কিনা সন্দেহ। এই তো সেদিনও কলকাতার সম্ভ্রান্ত 'বাবু' সম্প্রদায় বুলবুলির লড়াই, মেড়ার লড়াই প্রভৃতিতে মশগুল ছিলেন। বর্ণহিন্দু সমাজে বলিদান প্রথা আজও উঠে যায়নি। রাজনীতিক্ষেত্রে এ আমলের খুনোখুনির কথা না হয় নাই তুললাম।

পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিম সীমান্তবর্তী যে এলাকাগুলির উল্লেখ করেছি মুরগির লড়াই শুধু সেখানেই অনুষ্ঠিত হয় আর কোথাও হয় না, এরকম ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকায় প্রাচীন যুগের ভারতবর্ষ, চীন, পারস্য, গ্রীস, এশিয়া মাইনর ও রোম; মধ্য যুগের ইংলণ্ড, ইটালী, জার্মানী ও স্পেন এবং অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালের আমেরিকা, কিউবা, মেক্সিকো, পুয়ের্টোরিকো প্রভৃতি দেশে এ খেলার জনপ্রিয়তার বিশদ বিবরণ আছে। জি. আর. স্কট-এর লেখা 'দি হিসট্রি অব কক ফাইটিং' নামে অতি উপাদেয় ও দুষ্প্রাপ্য বইটিতে (কলকাতার জাতীয় গ্রন্থাগারে এক কপি আছে) সম্ভবত এপ্রসঙ্গে সবচেয়ে বেশী তথ্য পরিবেশিত হয়েছে। সেখান থেকে দেখছি, খ্রীষ্টীয় আঠারো শতকের মাঝামাঝি ও শেষ দিকে ভারতবর্ষে মুরগির লড়াই-এর কেন্দ্র হিসাবে লখনউ খুব প্রসিদ্ধ ছিল। সেখানে লড়াই-এর উপযোগী করবার জন্য কুলশীল বিচার করে বাছা বাছা মোরগকে দীর্ঘকাল তালিম দেওয়া হত, যাতে তাদের ক্ষিপ্রতা ও হিংস্রতা বাড়ে, যাতে তারা পরপর দু'তিন দিন অবধি যুদ্ধ করতে পারে। বলা বাহুল্য, লখনউ-এর অভিজাত সম্প্রদায় এই প্রমোদের উৎসাহী পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। সে সময়ে ইংলণ্ডে লড়াকু মোরগকে শিক্ষিত করবার ব্যাপারে সবচেয়ে নাম কিনেছিলেন কর্নেল মরডণ্ট নামে এক ব্যক্তি। বিলেতের মুরগির লড়াই-এ তাঁর মোরগরা প্রায় সর্বদাই জয়লাভ করত। লখনউর খ্যাতির কথা শুনে তিনি একবার তাঁর দলবল নিয়ে সেখানে এলেন 'নেটিভ'দের গর্ব খর্ব করতে। ১৭৮৬ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে লখনউ শহরে অনুষ্ঠিত এই প্রতিযোগিতায় মরডণ্ট সাহেবের সব কটি পাখিই পরাজিত হয়। এই ঘটনাকে বিষয়বস্তু করে সেকালের বিখ্যাত চিত্রকর জোহান জোফানী যে ছবিটি এঁকেছিলেন তার একটি প্রতিলিপি ওই গ্রন্থের ১২৮ পৃষ্ঠার মুখোমুখি মুদ্রিত হয়েছে। ছবিতে দেখা যায়—গণ্যমান্য ইউরোপীয়েরা ডানদিকে এক শামিয়ানার নীচে উপবিষ্ট। অন্য সব দিকে কৌতূহলী ভারতীয় দর্শকের ভিড়। সামনে যুদ্ধলিপ্ত দুই মোরগ। মল্লভূমির বাঁদিকে দাঁড়িয়ে মরডণ্ট সাহেব উত্তেজিতভাবে দু'হাত বাড়িয়ে তাঁর পাখিকে উৎসাহিত করছেন আর ডানদিকে দু'জন পাগড়িপরা ভারতীয় সাবাশ

দিচ্ছেন তাঁদের পাখিকে। দু'পক্ষেরই সহকারীরা অন্য মোরগ হাতে নিয়ে অপেক্ষা করছেন দু'পাশে। জোফানীর আঁকা ছবি যাঁরা দেখেছেন (কলকাতার ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হলে তাঁর কয়েকটি মূল ছবি রক্ষিত আছে) তাঁরাই সেগুলির উৎকর্ষের কথা জানেন। এ ছবিটিতেও সেসব গুণাগুণ বর্তমান।

লখনউ-এ মুরগির লড়াই এখনও হয় কিনা সঠিক জানি না তবে সাধারণভাবে একথা বলা যায় যে ভারতীয় অভিজাত সমাজে এ প্রমোদটি এখন আর তেমন সমাদৃত নয়। এ খেলার বর্তমান পৃষ্ঠপোষক গ্রামগ্রামান্তরের অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষ যাদের অনটনক্লিষ্ট শ্লথগতি জীবনে এহেন উত্তেজনাপূর্ণ বৈচিত্র্যের হয়ত বা প্রয়োজন আছে।

মুরগির লড়াই যে রানীবাঁধ থানার সবচেয়ে জনপ্রিয় 'স্পোর্ট' সেকথা আগেই বলেছি। সেখানে প্রধানত আদিবাসীদেরই বাস। মেদিনীপুর, পুরুলিয়া, বীরভূম প্রভৃতি জেলার পশ্চিম সীমান্তবর্তী বহু গ্রামেও মুরগির লড়াই হতে দেখেছি। শীতের এক সকালে ঝিলিমিলির হাটতলার কাছে বহু লোকের বেষ্টনী দেখেই বুঝলাম সেখানে মুরগির লড়াই-এর আসর বসেছে। ভিড় ঠেলে দেখি যুযুৎসুরা সবে সমবেত হয়েছে; তাদের পায়ে পরানো দড়ি ভারী ইঁট বা পাথরের টুকরোর সঙ্গে বাঁধা। নিজের নিজের চৌহদ্দির মধ্যে তারা নিরীহভাবে মাটি থেকে দানা খুঁটে খাচ্ছে। দেখলে বোঝাই যায় না লড়াই-এর সময় এরা কতদূর ক্ষিপ্র ও হিংস্র হয়ে উঠতে পারে। মোরগের মালিকরা এদিক-ওদিক ঘুরছেন, পায়ে যারা হুক পরিয়ে দেবেন তাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলছেন। কোন্ কোন্ মোরগের জোটবন্দী হবে তা স্থির করছেন। মোরগের ডান পায়ে হুক পরাবার ব্যাপারে নিয়মকানুন আছে, তুকতাক আছে। ছোট ছোট কাপড়ের থলিতে নানারকম হুক নিয়ে যে কয়েকটি লোক মালিকদের কাছে ঘুরছেন তাঁরাই এ কলায় পারদর্শী। ফিতে দিয়ে পায়ে অঙ্কুশ এঁটে দেবার সময় বিড়বিড় করে যে মন্ত্র পড়া হয় তা শুধু তাঁরাই জানেন। শত অনুরোধেও আমাকে কেউ সে মন্ত্র বললেন না, কেননা তাহলে মন্ত্রের কার্যকারিতা নাকি একেবারে নষ্ট হয়ে যাবে। এ ছাড়াও তুকতাক আছে—যা পাখির মালিকদের কাছে শুনলাম। মোরগ নিয়ে বাড়ি থেকে বেরোবার সময় উত্তর ছাড়া অন্য দিকের দুয়ার দিয়ে বার হওয়াই বিধি। কেননা, উত্তরে মুখ করে বেরোলে যমের দক্ষিণমুখী দুয়ারের সামনাসামনি পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা। তাতে পাখির পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। বাড়ি থেকে হাটতলা এই সারা পথ পাখিকে চাদরে ঢেকে আনাই প্রশস্ত, তাতে কেউ কুদৃষ্টি দিতে পারে না। অথচ হাটতলায় পেঁছে প্রতিপক্ষের চোখের সামনে তাকে মাঠে ছেড়ে দিতে বাধা নেই। জোটবাঁধাটা যতদূর সম্ভব সমানে সমানেই হয়ে থাকে; ছোট পাখির সঙ্গে বড় পাখিকে লড়তে দেওয়া হয় না। অলিখিত নিয়ম অনুসারে, পরাজিত মোরগের (সে মৃত বা আহত যাই হোক না কেন) একটি ঠ্যাং পান যিনি বিজয়ী মোরগের পায়ে হুক বেঁধেছেন তিনি, আর বাকি ধড়টার হকদার হন বিজয়ী মোরগের মালিক। আহত পাখি যদি আর লড়াই করতে না চায় তাহলে তাকে পরাজিত বলেই সাব্যস্ত করা হয়। দু'টি পাখিই গররাজী হলে খেলা 'ড্র' হয়ে যায়। এসব অলিখিত নিয়ম সবাই এত দীর্ঘকাল মেনে এসেছেন যে এ নিয়ে বিশেষ কোন বিতণ্ডা হয় না বললেই চলে।

মোরগের পায়ে হুক পরানো হলে, দুই মালিক তাঁদের পাখিকে মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে ছেড়ে দেন। দু'পক্ষের সমর্থক ও সাধারণ দর্শকদের তুমুল উৎসাহধ্বনির মধ্যে মোরগরা ঘাড়ের রোঁয়া ফুলিয়ে প্রথমে কিছুক্ষণ পাঁয়তাড়া কষে, এপাশ-ওপাশ ঘুরে আক্রমণের সুযোগ সন্ধান করে। তারপর, হঠাৎ ডানায় ভর দিয়ে মাটি থেকে লাফিয়ে উঠে, শরীর ও মাথা পিছন দিকে হেলিয়ে প্রতিপক্ষের আক্রমণ থেকে যতদূর সম্ভব

দূরে রেখে, সশস্ত্র পা চালায় অন্য মোরগের দেহ লক্ষ্য করে। কখনও কখনও মোক্ষম জায়গায় অস্ত্রাঘাতের দরুন দু'এক মিনিটের মধ্যেই জয়-পরাজয়ের নিষ্পত্তি হয়ে যায়। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সময় লাগে বেশী। এক-একবার লাফিয়ে উঠে হুটোপাটির পরে মাটিতে নেমে আবার পাঁয়তাড়া কষা—আবার আক্রমণ—এইভাবে লড়াই চলতে থাকে যতক্ষণ না কোন আচমকা আঘাতে এক পক্ষ পঙ্গু বা ধরাশায়ী হয়। বিজয়ী মোরগ তখন দর্পিত ভঙ্গিতে বার কয়েক গলা ছেড়ে ডেকে ওঠে। তারপরে আসে আর এক জুটি, তারপরে আরও। সমবেত জনতার উত্তেজিত চীৎকারে আকাশবাতাস মুখরিত হতে থাকে। নিরানন্দ গ্রামীণ জীবনের বেশ কিছু মুহূর্ত কেটে যায় এক তীব্র উদ্দীপনায়।

অগ্রহায়ণ থেকে মাঘ, শীতের এই তিনটি মাস মুরগির লড়াই-এর জন্য প্রধানত নির্দিষ্ট। তবে অন্যান্য মাসেও এ খেলা নিষিদ্ধ নয়। কোন কোন অঞ্চলে বহু রণজয়ী মোরগের মালিককে ফুলের মালা পরিয়ে বা শোভাযাত্রা সহকারে গ্রাম প্রদক্ষিণ করিয়ে অভিনন্দিত করাও হয় শুনেছি। ফলকথা, নিষ্ঠুর হলেও, আদিম প্রবৃত্তির স্মারক হলেও, এ খেলা আমাদের গ্রামীণ জীবনের অঙ্গ এবং সেজন্যই বঙ্গসংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত। এ প্রবন্ধ রচনার সেটাই কৈফিয়ত।



বাসন্তীঃ গোসাবা

ভাবতে অবাক লাগে, আমরা—পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ শহরবাসী মানুষ—কী অসম্ভব রকম ডাঙগায় আবদ্ধ জীব। কলকাতার কথাই ধরি। ইঁট-পিচ-কংক্রীটের এই ঘন অরণ্য থেকে বেরিয়ে ক'জনই বা কালেভদ্রে নৌকো করে বেড়াতে যান গঙ্গার বুকে বা ক্লান্ত সন্ধ্যায় গিয়ে বসেন লেকের পাড়ে জলের ধারটিতে? ছুটিছাটায় সমুদ্রদর্শনের বাসনা হলে, জন্মভূমি ছেড়ে পা বাড়াতে হয় বাইরে কেননা সিন্ধুতীরে যাবার জায়গা পশ্চিমবাংলায় এখনও মাত্র একটি—দীঘা—যেখানে, মরশুমের সময়, অধিকাংশের পক্ষেই স্থান পাওয়া অসম্ভব। পত্র-পত্রিকায় মাঝে মাঝে জুনপুট, ফ্রেজারগঞ্জ বা বকখালির সংবাদ দেখা যায় বটে, কিন্তু সেসব স্থান এখনও আরামপ্রদ ভ্রমণের উপযুক্ত হয়ে ওঠেনি। অথচ আদিম জলায় উৎপন্ন প্রথম প্রাণী সুদীর্ঘ কালে বহু বিবর্তিত হয়ে আজকের মানুষে পরিণত হলেও এখনও হয়ত তার রক্তে বাজে অতল জলের আহ্বান। ঊর্মিমুখর সাগর না হোক, দিগন্তবিস্তার নদী না হোক, কাকচক্ষুজল দীঘির ধারে গিয়ে বসলেও সেজন্য আমাদের বুঝি এত ভাল লাগে। কিন্তু নগরকোটরে যে লক্ষ লক্ষ কীট কিলবিল করছে তাদের সে সুযোগ কোথায়?

গ্রামাঞ্চলে তবু বিকল্প আছে। সেখানে ধানখেতের শেষে দূর বনানীর রেখা দেখা যায় সবুজ শাড়ির নীলাভ পাড়ের মত। আর আম-জাম-নারকেল বা শাল-পলাশ-মহুয়ার বন রোদ্দুরে পিঠ দিয়ে নিশ্চিন্তে ঘুমোয় অবারিত নীল আকাশের নীচে। চারিদিকে জলের জাজিম পাতা না থাকলেও জমির বিস্তার সেখানে আদিগন্ত। ঋতুতে ঋতুতে বসুন্ধরার সেখানে রং বদলায়। দিকচক্রবাল অবধি ভূপ্রকৃতি সেখানে চিরনবীন। কিন্তু শহরে? সভ্যতার রথ যেখানে নির্দয় হুহুংকারে ধেয়ে চলেছে রাত্রিদিন? জীবিকার তাড়নায় সে বধ্যভূমিতে যাঁরা শৃঙ্খলিত, বছরের ক'টা দিন—হায় ক'টা দিন—তাঁদের অবকাশ মেলে দিগন্ত অবধি দৃষ্টি প্রসারিত করবার? প্রকৃতি বলে যে কিছু আছে: তার উদারপ্রসার শান্ত মহিমার মাঝখানটিতে গিয়ে নীরবে দু'দণ্ড বসলে তাপদগ্ধ ক্ষতবিক্ষত জীবনের অনেক জ্বালাই যে নিমেষে জুড়িয়ে যায়, সংবৎসরে সে উপলব্ধিটুকু তাঁদের ক'জনের ভাগ্যেই বা জোটে? আমি তাঁদের গভীর সমব্যথী। কেননা, জনপদপিঞ্জরে আমিও তাঁদেরই মত বন্দী। তবু কখনো কখনো এ ঘোর কারাগারের শিকল ভেঙে মুক্ত আকাশে পাখা মেলে দিতে পেরেছি লঘুসঞ্চারী পাখির মত। ক্ষণকালের জন্য হলেও সেসব স্বাধীনতার স্মৃতি অবিস্মরণীয়। সে স্বর্গসুখের একটি আজ পাঠকপাঠিকাদের সঙ্গে ভাগ করে নেব।

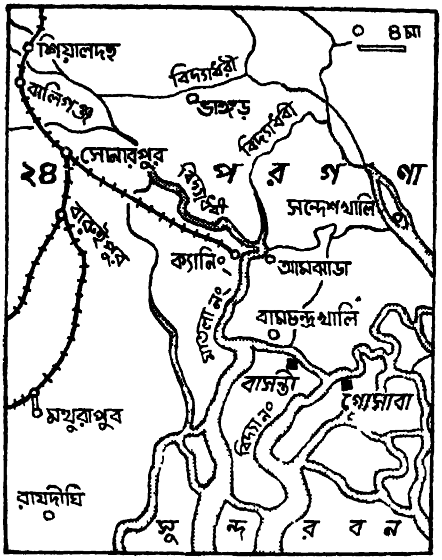
একটু সকাল-সকাল, তৈরি হয়ে নিতে পারলে শেয়ালদা থেকে প্রথম দিকের কোন

ক্যানিং লোকাল ধরা কঠিন নয়। সে ট্রেন ক্যানিং-এ পেঁছায় দেড় ঘণ্টা পরে আর স্টেশনের অদূরে (যেকোন লোক পথ বলে দেবে) জেটিঘাট থেকে গোসাবার লঞ্চ ছাড়ে কিছুক্ষণ বাদে। "ফাস্ কেলাসের" টিকিট কেটে সে লঞ্চে গিয়ে বসুন। থার্ড ক্লাস বা নীচের ডেকের ভাড়া থেকে প্রথম শ্রেণীর ভাড়ার তফাত বেশী নয়, কিন্তু সুযোগ-সুবিধার প্রভেদ অনেক। ছাদে, সারেঙের ঘরের পাশে, খুব ছোট এক কেবিনে কয়েক-জনের বসবার স্থান। জল থেকে কিছুটা উঁচুতে বলে দৃষ্টি চলে বহুদূরে। আর দিগন্ত থেকে ধেয়ে আসা মাতাল বাতাসের দাপাদাপি সেখানে সারাক্ষণ। ওপরে মাতাল বাতাস আর নীচের নদীর নাম মাতলা। চিরবন্দীদশা থেকে মাত্র একদিনের ছুটি পেয়ে অবাধ মুক্তির এই পরিবেশ আপনাকে মাতাল না করেই পারে না। কিছুক্ষণের মধ্যেই সারেঙ ও তার সহকর্মীদের সঙ্গে আলাপ হয়ে যাবে আপনার। স্টিয়ারিং-এর চাকা ঘোরাতে ঘোরাতে সামনে দৃষ্টি রেখে তারা নানা গল্প করবে আপনার সঙ্গে। বলবে, এই মাতলা নদী, ওপারের ক্ষীণ তটরেখা অবধি শান্ত নিস্তরঙ্গ স্রোতে বয়ে চলেছে বটে, কিন্তু কালবৈশাখীর ঝড়ে কী উত্তাল রূপ হয় তার! বড় বড় ঢেউ-এর সে কি উন্মত্ত আস্ফালন! আকাশজোড়া কালো মেঘের ছায়ায় ইস্পাতের মতো নৃশংস দেখায় উদ্দাম জলরাশিকে। আর সে তরঙ্গভঙ্গের ওপর দিয়ে ছুটে আসে ক্ষিপ্ত বাতাস পাগলা ঘোড়ার মত।

গ্রীষ্ম-বর্ষায় আপনাকে এপথে ভ্রমণে আসতে হবে এমন কোনও বাধ্যবাধকতা নেই। যদি সপরিবারে আসেন তা হলে কালবৈশাখীর সময়টা পার করে আসাই নিরাপদ। কিন্তু দিগন্তবিস্তার মাতলা নদীর বুকে ঝড়ের দৃশ্য এক অবিস্মরণীয় অভিজ্ঞতা। এসব লঞ্চ সার্ভিসের সারেঙরা বা দূরগামী নৌকার মাঝিমাল্লারা তো অহরহই এহেন বিপদের মুখে পড়েও টিকে আছেন। সেজন্য জনান্তিকে সুপারিশ করতে পারি, কালবৈশাখীর আশঙ্কা জেনেই চলে আসুন। যদি ঝড়ের দেখা পান—হলফ ক'রে বলতে পারি—আপনার রোমাঞ্চহীন নগর-জীবনে সে অভিজ্ঞতা বহুকাল বাজতে থাকবে তীব্র এক ঝংকারের মত।

এবার বোধ হয় আপনার লঞ্চ ছাড়বার সময় হয়ে এল। অত ঘন ঘন হাতঘড়ি দেখবেন না। কেননা, দক্ষিণের এই সুন্দরবন অঞ্চলে জীবন ঘড়ির কাঁটায় কাঁটায় বাঁধা নয়। ওই দেখুন, এখনও বাঁধের ওপর দিয়ে জেটির সাঁকো পার হয়ে যাত্রীরা আসছে। তাদের তুলে নেবার জন্য দু'দণ্ড অপেক্ষা করা দরকার। দিনে দু'তিন খেপের বেশী লঞ্চ চলে না এ লাইনে। যাতায়াতের অন্য কোন ব্যবস্থাও নেই। ঘড়ি ধরে সেজন্য কাজ হয় না এখানে, যেমন হয় আপনাদের হাওড়া বা শ্যালদায়। সকলের সুবিধা-অসুবিধা দেখে, ধীরে সুস্থে, থিতিয়ে জুড়িয়ে, এখানকার জীবন চলে মন্দাক্রান্তা ছন্দে। সে সুরে সুর মেলাতে হলে ঘড়িটা হাত থেকে খুলে হয় রাখুন পকেটে, নয়ত সরিয়ে ফেলুন দূরতর কোন জায়গায়। স্বেচ্ছায় আরোপিত ঘড়ির নিগড়টাকে একদিনের জন্য ভেঙে ফেললে আপনার ভালই লাগবে।

সারেঙের ঘণ্টা শোনা গেল এবার। ইঞ্জিন চালু হল। থরথর ক'রে কাঁপতে লাগল সমস্ত লঞ্চটা। তারপর পিছু হটে মধ্য-নদীর দিকে মুখ ঘুরিয়ে যাত্রা শুরু হল তার। ক্যানিং ঘাটের কাছে মাতলার বিস্তার এক মাইলের কম নয়। সে বিস্তৃত জলরাশির দিকে তাকিয়ে, যদি 'বাঙাল' হন তবে অনেক পূর্বস্মৃতি মনে পড়বে আপনার। খাঁটি পশ্চিমবঙ্গবাসী হলে হয়ত বা একটু ভয়-ভয় করবে—কোন রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতাতেই যেমন করে। সূর্য তখনও বেশী দূর ওঠেনি আকাশে। তার কোণাকুণি আলোতে লক্ষ লক্ষ হীরামুক্তাবৈদূর্যমণি জ্বলছে ঢেউয়ের উপর, দূর তটরেখা অবধি। আপনার মুগ্ধ দৃষ্টি যে দিগন্ত থেকে দিগন্তরে ঘুরে বেড়াচ্ছে তা সহজেই অনুমান করতে পারি। নগর-কোটর থেকে একদিনের মেয়াদে পালিয়ে আপনি যে নির্মল বাতাসে



ফুসফুস ভরিয়ে নিচ্ছেন তাও বুঝতে অসুবিধা হয় না। সারাটা দিন আজ আপনার কাটবে বিশাল জলরাশির কোলে, উদারপ্রসার প্রকৃতির মাঝখানে। পথে ও পথের শেষে ডাঙ্গাজমিতে অবস্থিত দক্ষিণ নারায়ণতলা, বাসন্তী, সজনেতলা ও গোসাবার যে সামান্য বিবরণ দেব তা আপনি মনে না রাখলেও পাবেন। আদিম জলায় উৎপন্ন প্রথম প্রাণীর আপনি বহুবিবর্তিত বংশধর। কল্প-কল্পান্ত পবে আজ আবার ফিরে এসেছেন সেই প্রাচীন জন্মভূমির পরিবেশে। তাকে বরণ করে নিতে আপনার অবচেতন মন উন্মুখ। আজকের ভ্রমণ আপনার ভাল না লেগেই পারে না।

লঞ্চ এতক্ষণে কোণাকুণি পাড়ি দিয়ে মাতলার পূব তীর বরাবর দক্ষিণে চলতে শুরু করেছে। তটরেখার অদূরে মাটির বাঁধ মাইলের পর মাইল। সুন্দরবনে জলপথেব দুধারে মাটির বাঁধ দেখা যায় সর্বত্র। লোনা গাঙের জল যাতে কূল ছাপিয়ে চাষের জমির ক্ষতি করতে না পারে সেজন্য এই ব্যবস্থা। বাঁধের পিছনে দিগন্তবিস্তৃত ধান খেত, ফসলের মরশুমে সবুজ বা সোনালি গালচেব মত বিছানো। দূরে ঘন গাছপালার আড়ালে, এখানে সেখানে এক-আধটি গ্রাম, প্রকৃতির বিশাল মানচিত্রে জীবনের সংকেত-বিন্দুর মত। বাঁধের উপর দিয়ে লোকজনের আনাগোনা, গ্রামের ঘাটে বউ-ঝিদের গা ধুয়ে স্নান বা ছেলেমেয়েদের জল ছিটিয়ে দাপাদাপি—একের পর এক নীরব মিছিলের মত চোখের সামনে এসে ধীরে ধীরে পিছনের দিকে চলে যেতে থাকে। এত বিরাট দৃশ্যপট, এত প্রগাঢ় প্রশান্তি নগর-কোটরে বসে কল্পনাও করা যায় না।

ভাটিতে চার-পাঁচ মাইল আসবার পর, বাঁধের পিছনে যে বড় গ্রামটি নজরে পড়বে, সারেঙরা তার নাম আপনাকে বলে দেবে—দক্ষিণ নারায়ণতলা। বাদা অঞ্চলের 'টিপিক্যাল' গ্রাম। বৈশিষ্ট্য কিছুই নেই। শুধু নদীতীরে, এক প্রাচীন বটের পাশে জরাজীর্ণ এক আটচালা মন্দির হয়ত আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। 'টেরাকোটা' অলংকরণ নেই, কিন্তু স্থাপত্যরীতিতে অভিনবত্ব আছে। উপরের চারচালাটি অস্বাভাবিকভাবে উঁচু ও নীচের চারচালাটি থেকে আকারে অনেক ছোট। চব্বিশ-পরগণা জেলার উত্তব অঞ্চল বা রাঢ়দেশের আটচালা মন্দিরের সাধারণ গড়ন থেকে এটির পার্থক্যের কারণ অনুমান

করা কঠিন নয়। শতাধিক বছর আগে, উত্তরের পেশাদার মিস্ত্রিদের এত দুর্গম এলাকায় এসে দীর্ঘমেয়াদী মন্দির তৈরি করা প্রায় অসম্ভব ছিল। সেজন্য স্থানীয় কারিগররাই হয়ত কাজ চালিয়ে নিয়েছেন নিজেদের সামর্থ্য অনুসারে। তাঁরা কোন অভিজ্ঞ স্থপতিগোষ্ঠীর শামিল ছিলেন না ব'লে বিধিবন্ধ বা বহুলআচরিত কোন রীতিনীতি তাঁদের প্রভাবিত করেনি।

লঞ্চ এখন চলেছে দক্ষিণে। আরও পাঁচ-ছয় মাইল গিয়ে হঠাৎ মোড় নেবে পুব দিকে। মাইল তিনেক পুবমুখী গিয়ে মনে হবে যেন এক অকূল পাথারে এসে পড়লেন। তটরেখা দেখা যায় কি যায় না—নদীর এখানে এহেন বিস্তার। মাতলার প্রধান স্রোত এখান থেকে নেমে গেছে দক্ষিণে আর অপেক্ষাকৃত অল্প-পরিসর এক শাখানদী পুবমুখী প্রবাহিত হয়ে মিশেছে গিয়ে দশ-বারো মাইল দূরের বিদ্যা নদীতে। যাত্রাপথের সর্বত্রই পালতোলা মালবাহী নৌকারা আপনার সহযাত্রী। ডায়মণ্ডহারবার, ক্যানিং, বসিরহাট, হাসনাবাদ প্রভৃতি গঞ্জ থেকে তারাই প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র পেঁছে দেয় সুন্দরবনের দূরদূরান্তরে। লঞ্চের ছাদ থেকে তাদের সব সময়েই সুন্দর দেখায়। কিন্তু মাতলা ও এই শাখানদীটির সংযোগস্থলের কাছে অকূল জলরাশির পটভূমিতে তারা যত নয়নবিমোহন এমন আর কোথাও কিনা সন্দেহ। ক্যামেরা একটা নিশ্চয়ই সঙ্গে থাকবে আপনার। ছবিও যে পটাপট তুলবেন তা সহজেই অনুমান করতে পারি। শুধু বিনীত সুপারিশ, এক সেকেণ্ডের পাঁচ শ ভাগের এক ভাগ বা হাজার ভাগের এক ভাগ সময়ে ছবিগুলো তুলবেন। না হলে লঞ্চের গতি ও কম্পনের জন্য আপনার ক্যামেরা নড়ে যাবে এবং ছবির সূক্ষ্মতা নষ্ট হবে। অনেক ক্যামেরায় এত অল্প সময়ে ছবি তোলবার ব্যবস্থা থাকে না জানি। সেক্ষেত্রে সারেঙ সাহেবকে সাধাসাধি ক'রে ক্ষণকালের জন্য ইঞ্জিনটা থামিয়ে নিতে পারেন। কিন্তু সেখানেও সেকেণ্ডের আড়াই শতাংশ ভাগের থেকে দীর্ঘতর সময় ব্যবহার করবেন না। চলন্ত লঞ্চের ছাদ থেকে জলদৃশ্যের ছবি তুলতে এহেন অসুবিধা হলেও আপনার একেবারে নিরাশ হবার কারণ নেই; স্থলদৃশ্যের ছবি তোলবার অবকাশও পাবেন বাসন্তী, সজনেতলা ও গোসাবায়। ক্যামেরা আপনার রেডি করুন। প্রায় সাড়ে দশটা বাজে। এবার বাসন্তীতে এসে পড়লেন ব'লে।

পুবমুখী শাখা নদীটিতে কিছুটা ঢুকে, ডান তীরে একদিকের সবচেয়ে বড় গঞ্জগ্রাম বাসন্তী। তার আজকের খ্যাতির মূলে যে ক্যাথলিক পাদ্রিদের অবদান অনেকখানি সেকথা অস্বীকার করা যায় না। ধর্মপ্রচারের জন্য তাঁরা এখানে একটি বড় গীর্জা ও অদূরে সজনেতলায় আর একটি ছোট গীর্জা স্থাপন করেছেন। তাঁদেরই প্রতিষ্ঠিত বাসন্তী বহুমুখী উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়টি এ অঞ্চলের শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। সেখানে জাতিধর্মনির্বিশেষে সকলেই পড়তে পায়। আবাসিক ব্যবস্থাও আছে। জেটি-ঘাটের কাছাকাছি দোকানপাট পার হয়ে সিকি মাইলের মত হেঁটে এলেই অতি সুচারু পরিবেশের মধ্যে অবস্থিত এই গীর্জা ও স্কুলের চত্বরে এসে পেঁছবেন। পাদরিরা সহৃদয়। অন্য কাজে ব্যস্ত না থাকলে তাঁরা প্রতিষ্ঠান দুটি ঘুরে দেখতে আপনাকে সাহায্য করবেন। জেটির কাছে দোকানপাট, হাটতলা, ব্যাপারিদের গুদাম, 'পাইস-হোটেল', লোকজনের আনাগোনা সবই 'ইনটারেস্টিং' লাগতে পারে যদি 'বাঙাল' গন্ধ থাকে আপনার গায়ে। তাহলে গোয়ালন্দ, চাঁদপুরের কথা আপনার আরবার মনে পড়বে। মাইলখানেক দূরের সজনেতলার গীর্জাটিও গিয়ে দেখে আসতে পারেন।

বাসন্তীতে নেমে ঘুরেফিরে জায়গাটা যদি দেখতে চান তা হলে গোসাবাগামী লঞ্চ ছেড়ে দিতে হবে আপনাকে। গোসাবা হয়ে সে লঞ্চ ফিরে আসবে বেলা দেড়টা-দুটো নাগাদ। অতএব সকাল সাড়ে-দশটা থেকে অন্তত তিন ঘণ্টা সময় পাবেন বাসন্তীতে।

যথেষ্ট সময়। দুপুরের আহারটাও সেরে নিন না কোন 'পাইস-হোটেলে'। এসব ভোজনালয়ের সাজসরঞ্জাম যে অতি সামান্য তা না বললেও চলে। কিন্তু গরম ভাত, টাটকা মাছভাজা আর মাছের ঝোলের অভাব নেই। বাসন্তীতে না নেমে গোসাবা অবধি গিয়ে ফিরে আসা যাঁদের অভিপ্রায়, দুপুরের খাবারটা তাঁদের সঙ্গে আনাই শ্রেয়। কেননা, যাত্রাশেষে গোসাবায় লঞ্চ থামে মাত্র আধ ঘণ্টার মত। সেখানে হাটবার ছাড়া দোকানপাটও বেশী বসে না। তাছাড়া গোসাবায় নেমে হ্যামিলটন সাহেবের সমবায় সমিতির পাকা বাড়ি ও কাঠের বাংলো প্রভৃতি দেখে আসতেও কিছু সময় লাগবে আপনার। সঙ্গে খাবার ও একটু জল থাকলে লঞ্চে বসেই লাঞ্চটা সেরে নিতে পারেন।

গোসাবায় পৌঁছনোর সময় আনুমানিক সাড়ে এগারোটা-বারোটা। এক সময় খুব বাড়বাড়ন্ত ছিল গোসাবার। লঞ্চঘাটে শক্ত জেটিও ছিল। এখন নড়বড়ে কাঠের তক্তার ওপর দিয়ে তীরের কাদায় গিয়ে নামতে হয়। কেন এই পরিবর্তন সে বিষয়ে কিছু বলি। ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 'বাংলায় ভ্রমণ' পুস্তকটি থেকে কিছু উদ্ধৃতি এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না। "ক্যানিং টাউন হইতে নৌকা, মোটর লঞ্চযোগে সুন্দরবনের অন্তর্গত স্যার ড্যানিয়েল হ্যামিলটনের জমিদারী গোসাবায় যাওয়া যায়। সুন্দরবন অঞ্চলে চাষ আবাদ প্রবর্তনের জন্য স্যার ড্যানিয়েল সরকারের নিকট হইতে বহু জমি গ্রহণ করিয়া গোসাবায় একটি আদর্শ কৃষি উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছেন। এখানে ভদ্র ও বেকার যুবকগণকে অতি সুলভে বাসস্থান ও কৃষিকার্যের উপযোগী জমি বিলির ব্যবস্থা আছে। স্যাব ড্যানিয়েলের প্রচেষ্টায় শ্বাপদসঙ্কুল সুন্দরবনের মধ্যে গোসাবা একটি আদর্শ পল্লীতে পরিণত হইয়াছে। এখানে সাধারণ শিক্ষার সহিত হাতে-কলমে কৃষিশিক্ষা দেওয়ার প্রতিষ্ঠান আছে। এখানে সুন্দর পথঘাট নির্মিত হইয়াছে, যৌথ ভাণ্ডার আছে, সুপেয় জলের ব্যবস্থা আছে, উৎপন্ন দ্রব্যের খরিদবিক্রয়ের জন্য উপযুক্ত বন্দোবস্ত রহিয়াছে। এক কথায় গোসাবাকে একটি আদর্শ ও আধুনিক পল্লী বলা যাইতে পারে। ইহার এলাকার মধ্যে বিনিময়ের জন্য 'গোসাবা নোট' নামক এক প্রকার নোটও প্রচলিত আছে। অতিথি অভ্যাগতগণের থাকিবার জন্য গোসাবায় একটি 'গেস্ট হাউস' বা অতিথিশালা আছে।" এ সবই এখন বিস্মৃত কাহিনী মাত্র। স্যার ড্যানিয়েলের সমবায় সমিতিগুলি লিকুইডেশনে গিয়েছে বহুকাল। অফিস ও অতিথিশালার জন্য নির্মিত অদ্ভুত আকৃতির একটি পাকা বাড়ি ও টালি-ছাওয়া একটি কাঠের বাংলো ছাড়া এখন আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। এই মহতী বিনষ্টির কারণ শুনেছি রাজনীতি। এক বিদেশীর এসব গ্রামোন্নয়ন পরিকল্পনা যে দুরভিসন্ধিমূলক সেকথা নাকি রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে সহজেই বোঝা গিয়েছিল। সেজন্য বিষবৃক্ষকে বাড়তে তো দেওয়া হয়ইনি, সমূলে উৎপাটিত করা হয়েছে। কিন্তু পরিবর্তে যে কিছুই করা হয়নি সে অপ্রিয় সত্য না হয় আর নাই বললাম। পাকা বাড়িটির একতলার বারান্দায় রক্ষিত হ্যামিলটন সাহেবের এক আবক্ষ মর্মরমূর্তির পাদপীঠে লেখা আছে—

"Sir Daniel Hamilton, the founder of Gosaba and the pioneer of the co-operative movement in India. Born 6th December 1860 ; died 6th December 1939. In sacred and ever-loving memory of their beloved master erected by the members of the co-operative societies of Gosaba."

সেসব সমবায় সমিতির সভ্যেরা এখন নিরুদ্দেশ। আর তাঁদের গুরুর মর্মরমূর্তির ভাবলেশহীন দু'চোখের দৃষ্টি সামনের শূন্যে প্রসারিত যেখান থেকে বহুকাল আগেই

তার সমস্ত পুণ্যচেষ্টা নিশ্চিহ্ন হয়েছে।

*

এবার ফেরার পালা। গোসাবা থেকে ফিরতি যাত্রা সাড়ে বারোটা-একটা নাগাদ আরম্ভ হবার কথা; ক্যানিং-এ পৌঁছবার আনুমানিক সময় বিকেল সাড়ে-তিনটে। বিকেলের দিকে ক্যানিং রেল-স্টেশন থেকে শেয়ালদাগামী ট্রেনের অভাব নেই। কলকাতা-বাসী হলে আপনি সেজন্য সন্ধ্যার মধ্যেই বাড়ি ফিরতে পারবেন। আর সঙ্গে নিয়ে আসবেন একরাশ অভূতপূর্ব অভিজ্ঞতা যার স্মৃতি সভ্যতাজর্জর নগরবাসের ভাবী দিনগুলোতে আপনার স্নায়ুকে হয়ত কিছুটা শীতল রাখবে।

বিরহী

গ্রামের নাম যে এত সুন্দর, এত সুরেলা হতে পারে সেকথা আগে কে জানত! কলকাতা থেকে, বারাসত হয়ে, কৃষ্ণনগর রোড বরাবর সেদিন চলেছিলাম শান্তিপুরের দিকে। বারাসতের প্রায় পনের মাইল উত্তরে, নদীয়া-২৪-পরগনার সীমান্তে, জাগুলির মোড়; কাঁচড়াপাড়ার দিক থেকে আর এক পিচের রাস্তা এসে মিশেছে সেখানে। মোড়ের মাথায় কিছু বাড়িঘর, দোকানপাট, লোকজনের আনাগোনা। সেসব পিছনে ফেলে আরও মাইল পাঁচেক উত্তরে গেলে যে গ্রাম, সেখানকার বাজারে হয়ত দেশলাই কিনবার জন্য নেমে থাকব গাড়ি থেকে। অকারণে, নিতান্ত অন্যমনেই দোকানীকে গ্রামের নাম জিজ্ঞাসা করেছিলাম। পশ্চিমবঙ্গের পথেঘাটে শত-সহস্রবার এই একই প্রশ্ন করেছি নানান জনকে। উত্তর পেয়েছি, আবার সে উত্তর ভুলেও গিয়েছি যথাসময়ে। এখানে একেবারে চমকে উঠলাম। দোকানী বললে—গ্রামের নাম বিরহী। বিরহী? পথের ধারের অতি সাধারণ এই পল্লীর এমন অসাধারণ নাম হয় কি করে? দোকানী সেসব তত্ত্বকথা নিয়ে মাথা ঘামায়নি কোনদিন। ছেলেবেলা থেকে যে নাম শুনে আসছে, আমার মতো পথচারীকে তা বলে দিয়েই সে খালাস। কিন্তু আমি যে তখন উৎসুকচিত্ত, আনন্দিতপ্রাণ! কে, কখন, কেন এ নাম রেখেছিল, সেসব উদ্বেলিত প্রশ্নের তখন কোন জবাব পাইনি। পেয়েছিলাম পরে। মানে, নিজেই মাথা খাটিয়ে একটা সদুত্তর খাড়া করেছিলাম মনে মনে। সেকথা পরে বলছি।

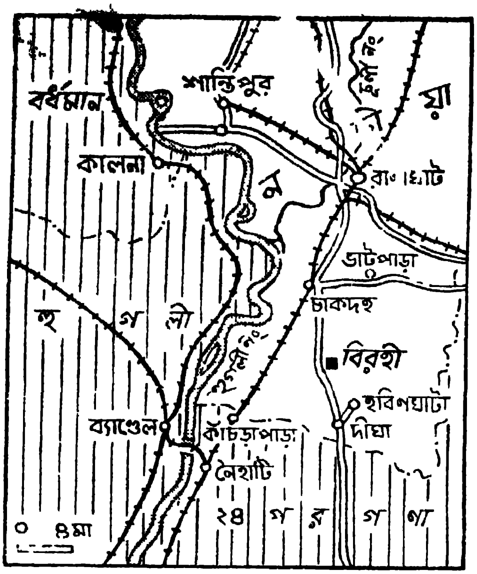
তার চেয়ে বরং পশ্চিমবাংলার কান-জুড়ানো পাঁচটা গ্রামের নামের কথা আগে বলি। মাধুর্যে তারা 'বিরহী'র থেকে কিছু কম যায় না। এমনিতেই যেসব নামের কথা মনে আসছে তারা সংখ্যায় এত প্রচুর যে ম্যাপ দেখে, মৌজার তালিকা মিলিয়ে সে লিস্ট আর দীর্ঘ করব না। খেদ এই যে, দুই বাংলার গ্রামের নাম নিয়ে এখনও বিশেষ কোন গবেষণা হল না। সেসব নামের উৎপত্তির কারণ; স্থানীয় কিংবদন্তীর সঙ্গে তাদের যোগসূত্র; পুর, নগর, দহ, খালি, বেড়িয়া, ডিহি, বাজার, গ্রাম, গঞ্জ, ঘাটা, পুকুর, ডাঙ্গা, সোল, মারী, গুড়ি, চক, আবাদ প্রভৃতি অনুসর্গের আঞ্চলিক প্রাচুর্যের হেতু ইত্যাদি বিষয়ে বেশ চিত্তাকর্ষক অনুসন্ধান হওয়া সম্ভব। এ সম্পর্কে কাজ যে একেবারে হয়নি তা নয়। বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্তভাবে হয়ত হয়েছে। কিন্তু আমার বক্তব্য, আরও সুসংবদ্ধভাবে ও পূর্ণতররূপে সে কাজে কেউ হাত দিলে বড় ভাল হয়।

যাক সেকথা। পশ্চিমবাংলার সুন্দর সুন্দর গ্রামের নামের প্রসঙ্গে ফিরে আসি। নীচের তালিকাটি কিছু দীর্ঘ হলেও যাঁরা এই বিশেষ বিষয়ে আগ্রহী তাঁদের হয়ত ধৈর্যচ্যুতি ঘটবে না। রাজ্যের উত্তরতম জেলা দার্জিলিং থেকেই শুরু করি। সেখানকার

সুরেল, সীমানা, বাতাসী নামগুলি কি রকম? পরের জেলা জলপাইগুড়ি থেকে কালাচাঁদ ছাড়া সহসা অন্য কোন নাম মনে করতে পারছি না। আর এই একটিমাত্র নামও আমার খুব পছন্দ নয়। কোচবিহারে সুরেলা গ্রামের নাম—আলোকঝারি, সোনারচালুন, মধুর-ভাষা, উছলপুকুরী। আরও দক্ষিণের জেলা পশ্চিম দিনাজপুরও রিক্ত নয়। সেখানকার বংশীহারী, বিন্দোল, চূড়ামন, বিরহিনী, আঁধারিয়া, মহুয়া, ভদ্রশীলা প্রভৃতি নামগুলি নিশ্চয়ই মন্দ নয়। মালদহের মালতীপুর, মিলকি, ত্রিমোহিনী, মহারাণী, ভাবুক ও আনন্দপাথার খারাপ কিসে? পদ্মার দক্ষিণে প্রথম জেলা মুর্শিদাবাদ। সেখানকার সুন্দর কয়েকটি গ্রামের নাম—কিরীটেশ্বরী, চন্দনবাটি, কানকোনা, রাঙামাটি, হিজল, ঝিল্লী, বিলোল ও আঁধারমানিক। বীরভূমের মলয়পুর, বসন্ত, সন্ধ্যাজল, কুণ্ডলা, ময়ূরেশ্বর, কীর্নাহার, দীঘলগ্রাম, সিঁদুরটোপা ও যশোদা মনে রাখবার মত। রুক্ষ কাঁকুড়ে মাটির দেশ হলেও পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, বর্ধমানে প্রাণমাতানো গ্রামের নামের অভাব নেই। যেমন, (পুরুলিয়ায়)—টুইসামা, শালবনী, হরতন, ঘাগরা, শর্বরী, চিত্রা; (বাঁকুড়ায়)—আদুরী, মুক্তাতোড়, অমরকানন, ঝিলিমিলি, কদমদেউলী, মুকুটমণিপুর; (বর্ধমানে)—বসুধা, মউক্ষীরা, পানশিউলি, আরতি, অকালপৌষ, গঙ্গাটিকুরী। নদীয়ার কথ্য ভাষা খুব মোলায়েম হলেও বিরহী, পানশীলা, সুবর্ণবিহার ছাড়া আর কোন উল্লেখযোগ্য নাম মনে করতে পারছি না। সে তুলনায়, হুগলীর বৈঁচি, পারুল, সুগন্ধা, পিয়াসাড়া, দ্বারবাসিনী, গোনাটিকরী, দিল-আকাশ বা হাওড়ার নিবিড়া, বানীবন, ফুলেশ্বর, দেউলটি, মৌরীগ্রাম হয়ত বেশী শ্রুতিসুখকর। আর বাকি থাকে মেদিনীপুর ও চব্বিশ-পরগনা জেলা। মেদিনীপুরের মালঞ্চ, ময়না, কালিন্দী, কঙ্কাবতী, কলমিজোড়, গগনেশ্বর ও চব্বিশ-পরগনার পিয়ালী, বাসন্তী, বেড়াচাঁপা, মৃণালনগর, চন্দনপিঁড়ি, কঙ্কনদীঘি, পাথরপ্রতিমা তাদের নামের আভিজাত্য নিজেরাই বহন করে। তালিকা আর দীর্ঘ করব না। আমাদের গ্রামগুলি চিরকাল অবহেলিত হলেও অনেক ক্ষেত্রে অবহেলা দিয়ে তাদের নামের ঐশ্বর্য খর্ব করা যায়নি। যে দেশে গ্রামের নাম হয় সুগন্ধা, সন্ধ্যাজল, আঁধারমানিক বা পাথরপ্রতিমা আর নদীর নাম—ইছামতী, কপোতাক্ষ, ময়ূরাক্ষী, সুবর্ণরেখা, সে দেশের মানুষ অন্তত এই একটা প্রসঙ্গে যে বুক ফুলিয়ে গর্ব করতে পারে তাতে সন্দেহ নেই।

এবার চলুন ফিরে যাই বিরহী গ্রামে যার নাম-মাধুর্যে উদ্বুদ্ধ হয়ে এত কথা লিখে ফেললাম। বিরহী-বাজারে পিচের রাস্তার দু'পাশে সামান্য কয়েকটি দোকানপাট। কাছাকাছি হাটও বসে হাট-বারে। আর কিছু ছড়ানো-ছিটানো কুঁড়েঘর নিয়ে ছোট গ্রাম। আপাতদৃষ্টিতে কোনই বিশেষত্ব নেই। কিন্তু একটু গভীরে প্রবেশ করলেই জানা যায়, এই অখ্যাত গ্রামের যা বৈশিষ্ট্য, পশ্চিমবঙ্গে তার তুলনা নেই। আমি অন্যত্রও লিখেছি, এখনও বলছি, কিছুই দেখবার নেই এরকম গ্রাম পশ্চিমবাংলায় তাঁরাই আবিষ্কার করতে পারেন যাঁদের অভিনিবেশের ক্ষেত্র খুবই সংকীর্ণ।

বিরহী-বাজারের কাছ থেকে বার হয়ে পিচের এক শাখা-সড়ক তিন মাইল দূরে, শিয়ালদহ-রাণাঘাট রেলপথের মদনপুর (কল্যাণীর পরবর্তী স্টেশন) অবধি গিয়েছে। সেপথে সিকি মাইলটাক গেলে, মজা নদী যমুনার ধারে অনেকখানি খোলা জায়গা চোখে পড়ে। সেখানে অতি প্রাচীন বট-অশ্বত্থের ছায়ায় পাতলা ইঁটের তৈরি এক জীর্ণ ঘাট ও অদূরের এক দালান-মন্দিরে উপাসিত রাধাকৃষ্ণের বিগ্রহকে ঘিরেই বিরহীর যা কিছু বৈশিষ্ট্য। জনশ্রুতি, আদি মন্দিরটি নির্মাণ করিয়েছিলেন কৃষ্ণনগরের প্রখ্যাত ভূস্বামী মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র। গড়নের পরিবর্তন না হলেও সে ইমারত পরে বহুসংস্কৃত হয়েছে। সামনের ঘাটটিও একই সময়ে তৈরি। ঘাটের পাতলা ইঁটের নজিরে, মূল



মন্দিরটি যে প্রায় দু'শ বছর আগে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের আমলেই স্থাপিত হয়েছিল এমন অনুমান সংগত বলেই মনে হয়। মুরলীধারী মদনগোপাল বিগ্রহটি কাঁঠাল কাঠে তৈরি ও প্রায় তিন ফুট উঁচু; নিম কাঠের রাধিকার উচ্চতা প্রায় আড়াই ফুট। বলরাম ও রেবতীর মূর্তি দুটি অনেক ছোট। এছাড়া আছে এক জগন্নাথমূর্তি, একটি শিবলিংগ ও পাঁচটি নারায়ণশিলা। এসব বিগ্রহের নিয়মিত সেবাপূজার জন্য মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র নাকি দেড় শ বিঘা দেবোত্তর জমি দান করে গিয়েছিলেন। এখন তার কিছুই অবশিষ্ট নেই। মুখোপাধ্যায় উপাধিধারী বর্তমান পুরোহিতবংশ নিত্যপূজা অব্যাহত রেখেছেন কোনগতিকে। রাজ-সেরেস্তা থেকে সামান্য কিছু বার্ষিক সাহায্য পাওয়া যায় ভাইফোঁটার সময়। তখন এক বিশেষ উৎসব হয় এ মন্দিরে। সামনের খোলা মাঠে বড় গোছের এক মেলাও বসে।

সে এক আশ্চর্য মেলা। ভাইফোঁটা উপলক্ষে পশ্চিমবংগের আর কোথাও কোন মেলা হবার কথা আমি শুনিনি। সমাগত যাত্রীদের মধ্যে পুরুষের থেকে স্ত্রীলোকের সংখ্যাই যে সাধারণত বেশী হয় সেটাও এক বিস্ময়কর ব্যাপার। গ্রামাঞ্চলে পূজাপার্বণ ও মেলায় মহিলারা পর্দাপ্রথা বড় একটা মানেন না; ক্ষণস্থায়ী উৎসবে কাতারে কাতারে এসে উপস্থিত হন। কিন্তু বিরহীর এই মেলায় যেন প্রমীলার রাজত্ব। বালিকা, যুবতী, প্রৌঢ়া, বৃদ্ধার এত বিশাল সমাবেশ পাড়াগাঁয়ে বড় একটা দেখা যায় না। মেলার আনন্দে অংশ গ্রহণ করা তাঁদের গৌণ উদ্দেশ্য হলেও আসল অভিপ্রায় ভাইফোঁটা উপলক্ষে মদনগোপালের কপালে বা তাঁর উদ্দেশে ফোঁটা দেওয়া। মর্ত্যের মানবীরা যে স্বর্গের দেবতাকে এভাবে ভ্রাতৃত্বে বরণ করে নেন, এ আশ্চর্য-সুন্দর প্রথা নাকি বহুকালের। স্থানীয় লোকেরা মনে করেন মন্দির প্রতিষ্ঠার কাল থেকেই—অর্থাৎ প্রায় দু'শ বছর ধরে—এ রীতি চলে আসছে। যে কোন মহিলাই কিন্তু ফোঁটা দেবার অধিকারী নন। যাঁদের সহোদর ভাই নেই বা ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার দিন অনুপস্থিত, তাঁরাই দলে দলে আসেন চারপাশের গ্রাম থেকে। কৃষ্ণ তাঁদের কাছে অজ্ঞেয় স্বর্গলোকবাসী প্রবলপ্রতাপ দেবতা নন, আদরের ভাই। প্রিয়কে দেবতা ও দেবতাকে প্রিয় করবার এ এক অভিনব লৌকিক দৃষ্টান্ত। বাঙালী কালী-

সাধকেরা তাঁদের আরাধ্যা দেবীকে কখনও বলেছেন 'মা', কখনও বলেছেন 'মেয়ে', কখনও বা অভিমানভরে বলেছেন 'ক্ষ্যাপা মাগী'। দেবতার সঙ্গে সে নৈকট্যচর্চা ব্যক্তিবিশেষের নিভৃত সাধনার বাইরে যায়নি। কিন্তু ভাইফোঁটার দিন একটা গোটা নারীসমাজ তাঁদের আত্মীয়তার উত্তাপে অভিষিক্ত করে যান বিরহীর মদনগোপালকে।

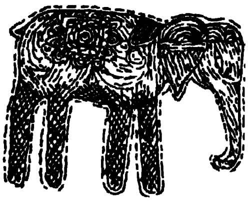
সকলেই যে মন্দিরে ঢুকে কৃষ্ণের কপালে ফোঁটা দিতে পারেন তা নয়। হিন্দুর মন্দিরের প্রথাগত বিধিনিষেধ এখানেও আরোপিত। ব্রাহ্মণবংশীয়ারাই শুধু পুরোহিত মারফত সে অধিকার প্রয়োগ করতে পারেন। অব্রাহ্মণ মহিলারা তেল, হলুদ ও সিঁদুর মেশানো ফোঁটা দেন ঠাকুরঘরে প্রবেশপথের দু'পাশের দেওয়ালে। কৃষ্ণ-ভাইয়ের উদ্দেশে নিবেদিত অগণিত ফোঁটায় সে দেওয়াল আচ্ছন্ন। পশ্চিমবঙ্গের প্রায় দু'হাজার শহর, গ্রামে আমি অদ্যাবধি গিয়েছি। (হায়! মোট আটত্রিশ হাজারেরও কিছু বেশী লোকালয়ের তুলনায় সে সংখ্যা কত নগণ্য!) কিন্তু সুরলোক ও নরলোকের মধ্যে এমন বিস্ময়কর ও ব্যাপক সেতুবন্ধন আর কোথাও দেখিনি। শুধু নামের মনোহারিত্বের, জন্যই নয়, স্বর্গের উদ্ধত মহিমাকে মর্ত্যধূলির খাসে ঘাসে এভাবে ছড়িয়ে দেবার জন্যও বিরহী আমার কাছে এক চিরস্মরণীয় গ্রাম।

কিন্তু বিরহী নামের উৎপত্তির ব্যাখ্যা কি? স্থানীয় কিংবদন্তী অনুসারে, সেখানকার মদনগোপাল নাকি আদিতে এককভাবেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন, সঙ্গে কোন রাধিকা-মূর্তি ছিল না। রাধার বিরহে তিনি এতই কাতর হয়ে পড়েন যে, এক স্বপ্নাদেশের পর সামনের যমুনা নদীর তীরে রাধিকার এক দারুমূর্তি পাওয়া যায় ও সেটিকে কৃষ্ণের পাশে প্রতিষ্ঠা করা হয়। রাধিকার জন্য কৃষ্ণের বিরহ ও তার নিরসনের এ কাহিনীকে অবলম্বন করেই নাকি গ্রামের নাম হয় বিরহী। কিন্তু কৃষ্ণকে ভ্রাতৃভাবে উপাসনা করবার যে রীতি এ অঞ্চলের মহিলামহলে প্রায় দুই শতাব্দী ধরে প্রচলিত তার সঙ্গে এ জনশ্রুতির কোন সম্পর্ক নেই।

কৃষ্ণকে আমরা বহুরূপে কল্পনা করেছি—সবই তাঁর মহামহিমান্বিত রূপ। তিনি গীতার উদ্গাতা, কুরুক্ষেত্র রাষ্ট্রবিপ্লবে তিনিই শ্রেষ্ঠ নায়ক, শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী বাসুদেব তিনিই যিনি সাধুর পরিত্রাণ ও দুষ্কৃতকারীর বিনাশের জন্য যুগে যুগে আবির্ভূত হন। বৃন্দাবনে, মথুরায় তাঁর লীলাজীবনও বৈভবে পরিপূর্ণ। তাঁর পাঁচজন প্রধানা ও ষোল হাজার অপ্রধানা স্ত্রী। কিংবদন্তী, কাহিনী, পৌরাণিক উপাখ্যানে তাঁর মহিমা বিশ্বচবাচরে ব্যাপ্ত; আকাশস্পর্শী তাঁর দিব্যোজ্জ্বল মূর্তি। কিন্তু দেবকীর অষ্টম গর্ভে তাঁর জন্মের পূর্বে অত্যাচারী কংস যে তাঁর আর সাতটি সদ্যোজাত ভাইবোনকে পাথরের ওপর আছাড় মেরে হত্যা করেছিল সেকথা অজানা না হলেও প্রায় বিস্মৃত। ঈশ্বরের অবতার এই মহানায়কের জীবন নানা শৌর্যবীর্যে দ্যুতিমান হলেও নিশ্চয়ই তাঁর একটি ব্যক্তিসত্তাও ছিল, নরদেহধারী সকলেরই যা থাকে। সে চেতনায় নিরপরাধ সাতটি নিহত ভাইবোনের স্মৃতি কি কখনও কোন ছায়া ফেলত না? বৈমাত্রেয় ভাই বলরাম ছাড়াও ভ্রাতৃপ্রতিম সহকর্মী তিনি যথেষ্টই পেয়েছিলেন। তাঁর প্রেয়সীর সংখ্যাও ছিল অগণিত। শুধু কোন সহোদরা ছিল না তাঁর। যাও বা ছিল তারা সকলেই নিহত হয়েছিল কংসের হাতে।

আর বিরহ বলতে কি কেবল প্রেমিকপ্রেমিকার সন্তাপকেই বোঝায়? সন্তানের অদর্শনে মায়ের বিরহ, বন্ধুর অনুপস্থিতিতে বন্ধুর বিরহ, সহোদরার বিচ্ছেদে ভাই-এর বিরহ কি বিরহ নয়? মদনগোপাল মন্দিরের সামনের জীর্ণ ঘাটে, বট-অশ্বত্থের ছায়ায় একাকী বসে এসব চিন্তাই আমার মনে এসেছিল। আর হয়ত এসেছিল, বহুকাল আগে, বিরহী গ্রামের কোন এক ভ্রাতৃহীনা বোনের মনে যিনি হিন্দু-পুরাণের এক

মহামহিমান্বিত দেবতাকে দূরে স্বর্গলোকে নির্বাসন না দিয়ে তাঁর এই অন্তরবেদনা উপলব্ধি করে তাঁকে কাছে টেনে নিয়েছিলেন। তারপরে যে প্রথার তিনি সূত্রপাত করেন, কালক্রমে তা বহুপল্লবিত হয়ে এখন এক বার্ষিক উৎসবে পরিণত হয়েছে। সহোদরার স্নেহপ্রীতি থেকে আজীবন বঞ্চিত কৃষ্ণের এক নিভৃত তৃষ্ণা মিটিয়েছেন এ অঞ্চলের নারীসমাজ। বিরহী নামের উৎপত্তির রহস্য হয়ত এ ব্যাখ্যার মধ্যেই নিহিত।



ডেভিড জে. ম্যাক্‌কাচ্চন

আজ পয়লা মাঘ ১৩৭৮ সাল; ইংরেজীর পনেরোই জানুয়ারি।
কিছুক্ষণ আগে, বিকেলের পড়ন্ত আলোয়, কলকাতার ভবানীপুর সমাধিক্ষেত্রে ডেভিড জে. ম্যাক্‌কাচ্চনের মরদেহ সমাহিত হল। পুরোহিত বাইবেল থেকে ধীরে ধীরে পাঠ করে শোনালেন চিরশান্তি, চিরবিশ্রামের বাণী। পরমপিতার কাছে প্রার্থনা জানালেন ক্লান্ত যাত্রার শেষে মৃতের আত্মা যেন তাঁর ক্ষমাসুন্দর ক্রোড়ে আশ্রয় পায়। এক অল্পবয়সী ইংরেজের সদ্যোখনিত কবরের কাছাকাছি তখন শতাধিক শোকার্ত বাঙালী স্ত্রীপুরুষ নত মস্তকে দাঁড়িয়ে। তাঁদের মধ্যে অন্নদাশঙ্কর রায়, বুদ্ধদেব বসু প্রমুখ গুণমুগ্ধ বন্ধুবান্ধব ও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বহু অধ্যাপক ও ছাত্রছাত্রী। সকলের চোখেই অশ্রুধারা। আজ থেকে বারো বছর আগে, কেম্ব্রিজের এক মেধাবী ছাত্র প্রখর বুদ্ধি ও উৎসাহের দীপ্তি নিয়ে বিশাল ভারতের আর কোথাও না গিয়ে ইংরেজীর অধ্যাপক হয়ে এসেছিল বিশ্বভারতীতে। এদেশের সংস্কৃতির প্রতি অনুরাগের সূচনা সেখানেই। তারপরে ভারতবর্ষের দূরদূরান্তে, উভয় বাংলার গ্রামগ্রামান্তরে দীর্ঘ পথ-পরিক্রমার শেষে আজ সে চিরনিদ্রিত। সহসা কেন জানি অসংলগ্নভাবে মনে হল—শান্তিনিকেতনে থাকবার সময় বা অন্য কখনো সে কি শুনেছিল রবীন্দ্রনাথের সেই আশ্চর্য সুন্দর গান —"সমুখে শান্তি পারাবার" ? ইদানীং সে বাংলা বেশ ভালই শিখেছিল। শীতল কফিনে ঢাকা তার মৃতদেহ যখন ধীরে ধীরে নামিয়ে দেওয়া হল কবরের গভীরে তখন ভাবলাম, এক বাঙালী কবির লেখা গান আজ সঙ্গতভাবেই ভারতপথিক এক ইংরেজের অন্ত্যেষ্টিসঙ্গীত হতে পারত। "সমুখে শান্তি পারাবার; ভাসাও তরণী হে কর্ণধার! তুমি হবে চিরসাথী, লও লও হে ক্রোড় পাতি; অসীমের পথে জ্বলিবে জ্যোতি ধ্রুব তারকার।"...

কিন্তু না, এ গান যতই কেননা মর্মস্পর্শী হোক, মাত্র একচল্লিশ বছর বয়সে নির্বাপিত এক উজ্জ্বল জীবনদীপের উপযুক্ত সমাপ্তিসঙ্গীত হত কিনা সন্দেহ। আমি নিশ্চিতভাবে জানি, অসমাপ্ত এত কাজ ফেলে রেখে এত সহসা অসীমের পথে যাত্রা করবার কোন ইচ্ছাই ডেভিডের অন্তত ছিল না। তার থেকে অনেক অক্ষম, অনেক অনগ্রসর আমরা কয়েকজন সহযাত্রী মনেপ্রাণে আশা করেছিলাম, একটানা দশ-বারো বছরের অমানুষিক পরিশ্রমে ভারতীয়, বিশেষ করে বাংলা-মন্দিরকলা বিষয়ে, যে অজস্র উপাদান সে সংগ্রহ করেছিল, তার সদ্‌ব্যবহার সে করে যেতে পারবে। কোন ফাউণ্ডেশন, স্কলারশিপ বা ফেলোশিপের সাহায্য সে কখনো নেবার চেষ্টা করেনি। প্রায় একক প্রচেষ্টায়, নিজের শেষ কপর্দকটি ব্যয় করে রাশি রাশি তথ্য ও আলোকচিত্র সংগ্রহ

করেছিল। আর ঠিক যখন সে চিন্তা করতে আরম্ভ করেছিল এই ভূরি পরিমাণ তথ্য কিভাবে পরিবেশন করবে, তখনই নিষ্ঠুর নিয়তি তাকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল। চোখের জলে দৃষ্টি আচ্ছন্ন হলেও ডেভিডের কবরের পাশে দাঁড়িয়ে একটা জিনিস আজ পরিষ্কার দেখতে পেলাম। ভারতীয় ও বঙ্গসংস্কৃতির অবহেলিত একটা বিশাল দিক যে অসামান্য কুশলতায় ডেভিড খুলে দিতে পারত তা আর কোনদিন ততখানি বিশদভাবে, ততখানি পারদর্শিতায় উন্মোচিত হবে কিনা সন্দেহ। অনুদ্বিগ্ন ক্লেশবরণের সঙ্গে এত সুশৃংখল একনিষ্ঠ অধ্যয়নরীতির, স্বাচ্ছন্দ্য পরিহারের সহজ প্রবণতার সঙ্গে এমন তীক্ষ্ণ মেধার সমন্বয় এ দুর্ভাগা দেশে আবার কবে সম্ভব হবে জানি না। আজ গভীর শোকতপ্ত হৃদয়ে এ লেখা লিখছি। যা হারালাম, দেশ যা হারালো, আচ্ছন্নের মত হাতড়ে হাতড়ে তার পরিমাপ করবার চেষ্টা করছি। কাউকে আঘাত করা আমার উদ্দেশ্য নয়। তবু ভারতবিদ্যায় নিবেদিতপ্রাণ এই মহান বিদেশীর স্মৃতিতর্পণের সময় একবার নিজেদের দিকেও তাকানো দরকার। মেনে নেওয়া ভাল যে অনাহারে অনিদ্রায় গ্রামগ্রামান্তরে ঘুরে বেড়ানোর খ্যাতিহীন দীর্ঘ ক্লেশে আমাদের অধিকাংশ গবেষকের গভীর অনীহা। মেনে নেওয়া ভাল, শারীরিক ও মানসিক উভয়বিধ শ্রমসাপেক্ষ অনুসন্ধানের ক্ষেত্রগুলিতে বাঙালী গবেষকের সংখ্যা আঙুলে গোণা যায়। মেনে নেওয়া ভাল, সামান্য কিছু প্রতিষ্ঠা পেলেই আমাদের উচ্চ কোটির গবেষকরা সভাসমিতিতে সভাপতিত্ব ও বাণী বিতরণ ছাড়া সাধারণত আর কিছুই করেন না। ব্যতিক্রম অবশ্যই কিছু আছেন। কিন্তু ডেভিড ম্যাক্‌কাচ্চনের নির্বাচিত বিষয়ে তার সমকক্ষ হওয়া তো দূরের কথা, তার প্রগাঢ় জ্ঞানের ভগ্নাংশমাত্রও এ দেশীয় কোন গবেষকের অধিগত এমন অসম্ভব কথা—মার্জনা করবেন—আমি অন্তত বিশ্বাস করি না। তার মহাসম্ভাবনাময় জীবনের অকস্মাৎ পরিসমাপ্তি অনেকের কাছেই গভীর শোকের কারণ সন্দেহ নেই। কিন্তু সে ব্যক্তিগত মনস্তাপের অতীতে ভারতবিদ্যার যে অপূরণীয় ক্ষতি হল আমার কাছে তা ঢের বেশী শোকাবহ।

*

ইংলণ্ডের কোভেনট্রিতে এক নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারে ১৯৩০ খৃীষ্টাব্দে ডেভিডের জন্ম হয়। সেখান থেকেই ১৯৪৮ খৃীষ্টাব্দে স্কুলের শিক্ষা শেষ করে, দেশের প্রচলিত বিধি অনুসারে, সে সৈন্যবাহিনীতে বাধ্যতামূলকভাবে কাজ করে এক বছর। তারপর, কেম্‌ব্রিজের জীসাস কলেজ থেকে ইংরেজী, জর্মন ও ফরাসী এই তিন বিষয়ে আধুনিক ভাষাসাহিত্যের স্নাতক হয় ১৯৫৩ খৃীষ্টাব্দে ও স্নাতকোত্তর উপাধি লাভ করে চার বছর পরে। ইতিমধ্যে, ফরাসী দেশে দু'বছর অধ্যাপনা করবার পর, ১৯৫৭ খৃীষ্টাব্দে সে বিশ্বভারতীতে যোগ দেয় ইংরেজীর অধ্যাপক হিসেবে। আমি যতদূর জানি তার ভারতপ্রীতির হাতেখড়ি সেখানেই। আজও শান্তিনিকেতনের অনেকেই এই উজ্জ্বলদর্শন তরুণ অধ্যাপককে মনে রেখেছেন তার অনাড়ম্বর জীবন ও মিশুকে স্বভাবের জন্য। ১৯৬০ সালে সে আসে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগে ও মাত্র চার বছরের মধ্যে সেখানকার 'রীডার' পদে উন্নীত হয়। শিক্ষক হিসেবে তার কৃতিত্বের কথা অনেকের কাছেই শুনেছি আর অধ্যাপনা বিষয়ে নিজের চোখেই দেখেছি তার চূড়ান্ত সততা। মন্দিরকলার চর্চায় সে না যেতে পারত এমন স্থান নেই, না করতে পারত এমন কাজ নেই। তবু, দূর মফঃস্বলে মন্দির কভারেজের কাজ অসমাপ্ত রেখে বারংবার তাকে কলকাতায় ফিরে আসতে দেখেছি সন্তোষজনকভাবে 'লেসন' তৈরি করে ক্লাস নিতে হবে বলে। আমার বাসার খুব কাছে যে বাড়িতে একখানা ঘর নিয়ে সে 'পেয়িং গেস্ট' হিসেবে থাকত সেখানে, নিতান্ত প্রয়োজনে, সকালের দিকে গেলে সে যে প্রচ্ছন্নভাবে অসন্তুষ্ট হত

তা বুঝতাম। কেননা, সাধারণত তখনই ছিল তার কলেজের পাঠ তৈরি করার সময়। আমি ডেভিডকে চিনতাম সেজন্য কখনও মর্মাহত হইনি।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে যুক্ত থাকার সময়ে বহু উচ্চশ্রেণীর সাময়িকপত্রে অজস্র গবেষণামূলক প্রবন্ধ লিখেছে ডেভিড। বিষয়—প্রধানত ভারতীয় ও বাংলা-মন্দিরকলার বিভিন্ন দিকের বিশদ ও দক্ষ আলোচনা, কখনো বা সাহিত্য। প্রতিটি প্রবন্ধে দেখেছি মনীষার দ্যুতি, গভীর অধ্যয়নের ছাপ আর আশ্চর্য সুন্দর ইংরেজীতে নতুন কিছু পরিবেশন। প্রকাশিত প্রবন্ধের 'অফ্-প্রিণ্ট্' দিতে এসেছে যখন তখন কত আলোচনা হয়েছে সেসব লেখা নিয়ে। আজ চোখের জল মুছে এই কঠোর সত্যটাকে উপলব্ধি করবার চেষ্টা করছি, আমাদের মন্দিরকলা বিষয়ে এত উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ ভবিষ্যতে কখনো যদি বা লেখাও হয়, লেখকের হাত থেকে তার কপি নেবার বা তার সঙ্গে সে সম্পর্কে আলোচনা করবার সুযোগ জীবনে আর পাব না।

বিচ্ছিন্নভাবে অনেক লিখলেও ডেভিডের দুঃখ ছিল এতদিনে তার গবেষণা-গ্রন্থ একটাও প্রকাশিত হল না। বছর দু'য়েক আগে এসিয়াটিক সোসাইটি তার এই ক্ষোভ দূর করবার সিদ্ধান্ত নেন। স্থির হয়, তার দীর্ঘ অধ্যয়নের প্রথম ফসল, 'লেট মিডিভ্যাল টেম্পলস অব বেঙ্গল' তাঁরা প্রকাশ করবেন। . বছর খানেকের ছুটিতে দেশে যাবার আগের কয়েক সপ্তাহে সে-পুস্তকের পাণ্ডুলিপি সম্পূর্ণ করবার কাজে তাকে অমানুষিক পরিশ্রম করতে দেখেছি। বৃষ্টিবাদলে কয়েকদিন গৃহবন্দী থাকবার পর সেসময়ে একবার ডেভিডের বাড়ি গিয়ে দেখি তার ঘর সম্পূর্ণ লণ্ডভণ্ড। ফুটো ছাদের এত অসংখ্য স্থান দিয়ে জল পড়ছে যে তার রাশি রাশি বই, কাগজপত্র, পুরাকীর্তির সংগ্রহ ছত্রখান করে সরিয়ে ফেলতে হয়েছে চারিদিকে। আর তারই মাঝখানে, একটু নিরাপদ জায়গায়, এক স্যুটকেসের উপর ড্রইং-কাগজ বিছিয়ে সে নিবিষ্টচিত্তে একের পর এক মন্দিরের ভিত্তি-নকশা এঁকে চলেছে তার প্রস্তাবিত বই-এর জন্য। সম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপি যথাসময়ে এসিয়াটিক সোসাইটিতে জমা দিয়ে সে বিলেতে গিয়েছিল। খুব আশা করেছিল, ফিরে আসবার আগেই বইটি প্রকাশিত হবে। নানা কারণে সে বই তার মৃত্যুর আগে প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি। মৃত্যুর আগের দিন সকালে, পোলিও রোগের মারাত্মক আক্রমণে যখন তার নিম্নাঙ্গ সম্পূর্ণ অবশ, যখন সদাব্যস্ত হাত দু'টিও নাড়াবার তার শক্তি নেই, তখনও, অ্যাম্বুলেন্সে উঠতে উঠতে, সেই বই-এর শেষ না-দেখা প্রুফ্‌টি সঙ্গে নিয়ে যাবার জন্য গৃহকর্ত্রীর কাছে অনুনয় করেছিল। নিজের নির্বাচিত বিষয়ের প্রতি এমন নিবেদিতপ্রাণ গবেষক আমি আর দেখিনি। ডেভিডের 'লেট মিডিভ্যাল টেম্পলস অব বেঙ্গল' সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে। এসিয়াটিক সোসাইটির অনুরোধে এ পুস্তকের ভূমিকা লিখে দেবার সুযোগ পেয়ে আমি কৃতার্থ। ১৫৬টি আলোকচিত্র, ৬টি ভিত্তি-নকশা সমেত বড় সাইজের ৮৮ পৃষ্ঠার এ বইটি যে এই বিশেষ বিষয়ে অদ্যাবধি প্রকাশিত যাবতীয় গ্রন্থের মধ্যে শ্রেষ্ঠ তাতে সন্দেহমাত্র নেই।

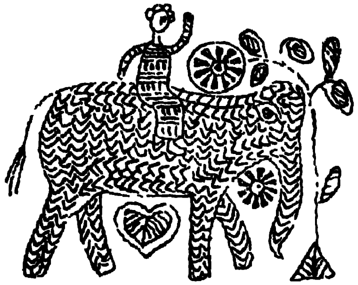
দুঃখে সুখে এতদিনের এত ঘনিষ্ঠ সাহচর্য সত্ত্বেও ডেভিডের শেষ সময়ে যে তার কাছে থাকতে পাইনি, সে মনস্তাপ আমাকে চিরদিন পীড়িত করবে। কলকাতার ব্রিটিশ কাউন্সিলের ব্যবস্থা অনুযায়ী এগারোই জানুয়ারি সকালে উডল্যাণ্ডস্ নার্সিং হোমে স্থানান্তরের সময় থেকে পরদিন রাত্রি দশটা অবধি ধীরে ধীরে সর্বশরীর অসাড় হয়ে এলেও বরাবরই তার জ্ঞান ছিল। বারোই জানুয়ারি রাত এগারোটায় তার মৃত্যু হয়। বৃদ্ধ পিতামাতা ও স্বদেশ থেকে কয়েক হাজার মাইল দূরে, বন্ধুবান্ধবদের অনুপস্থিতিতে কী চিন্তাভাবনা তার অন্তিম মুহূর্তগুলিতে ভীড় করে এসেছিল তা কিছুটা অনুমান করতে পারি। আমিও

একবার মৃত্যুর বড় কাছাকাছি এসে পড়েছিলাম। সাত-আট বছর আগে, হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে চুঁচুড়া থেকে পি. জি. হাসপাতাল অবধি প্রায় ত্রিশ মাইল পথ আসবার সময় অ্যাম্বুলেন্সের স্ট্রেচারে শুয়ে শুয়ে পরিবার-পরিজনের সঙ্গে বিচ্ছেদের কথা বারবার মনে এলেও অসমাপ্ত কাজের কথাই ভেবেছিলাম বেশী। ডেভিডের জ্ঞানভাণ্ডার আমার থেকে অনেক বেশী সমৃদ্ধ ছিল। বহুগুণ বেশী পরিশ্রম নিয়োজিত হয়েছিল সে-ভাণ্ডার তিলে তিলে গড়ে তুলতে। কঠিন কষ্টার্জিত সে অমূল্য সম্পদ মাত্র একচল্লিশ বছর বয়সে ছেড়ে যাবার সুতীব্র বেদনা আমি অনায়াসে অনুভব করতে পারি। প্রায়ই তাকে বলতে শুনতাম, ভারতীয়, বিশেষ করে দুই বাংলার মন্দিরকলা সম্পর্কে বিশদভাবে সব কথা লিখতে গেলে দশ ভল্যুম-এর বই হয়। তার জ্ঞানের পরিধি, তার সংগ্রহের পরিমাণ সম্বন্ধে কোন ভ্রান্ত ধারণা না থাকায় এ উক্তিকে আমি কখনো অতিশয়োক্তি বলে মনে করিনি। আরও আশ্চর্য এই যে, ভাষাসাহিত্যের ছাত্র ও অধ্যাপক হয়েও সম্পূর্ণ ভিন্ন ও দুরূহ এক বিষয়ে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য সে অর্জন করেছিল অন্যের সাহায্য ব্যতীত শুধু নিজের চেষ্টায়। আমাদের অল্পবিদ্য অথচ উন্নাসিক পণ্ডিতসমাজে, হায় এহেন দৃষ্টান্ত কত বিরল!

ভারতীয় স্থাপত্য-ভাস্কর্যের বিশাল ক্ষেত্রে অবাধে বিচরণশীল হলেও 'টেরাকোটা' মন্দিরের প্রতি ডেভিডের এক সুগভীর প্রীতি ও মমত্ববোধ ছিল। সে জন্যই বছরের পর বছর একটানা পরিশ্রমে বাংলা-মন্দিরের পুঙ্খানুপুঙ্খ ডকুমেন্‌টেশনের কাজ সম্পূর্ণ একক প্রচেষ্টায় সে প্রায় শেষ করে এনেছিল। ডকুমেন্‌টেশন বলতে দূর থেকে মন্দিরের এক-আধটি মামুলি ছবি তোলা শুধু নয়, তাদের প্রতি অঙ্গের, প্রতি বৈশিষ্ট্যের বিশদ ফোটোগ্রাফ। এছাড়া সর্বাঙ্গীণ মাপজোখ তো ছিলই। প্রায়ই বলত, এই অমূল্য কৃষ্টিসম্পদগুলি রক্ষা করবার জন্য সরকারী বা বেসরকারী কোনরকম চেষ্টারই যখন অস্তিত্ব নেই তখন অবধারিত বিনষ্টির আগে এদের যতগুলির ডকুমেন্‌টেশন করে রাখা যায় ততই ভাল। ভবিষ্যৎ গবেষকদের পথ তাতে সুগম হবে। যানবাহনের সুবিধা থাকলে যে একই সময়ের মধ্যে আরও অনেক বেশী কভারেজ করতে পারত এবং তাহলে আরও বহু লুপ্ত বা ভগ্ন মন্দিরের দলিলচিত্র যে উত্তরকালের জন্য রক্ষিত হত সে দুঃখও করত প্রায়ই। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ডেভিডকে ঘুরে বেড়াতে হয়েছে হয় পায়ে হেঁটে, নয় সাইকেলে চেপে। নিজের যে সাইকেলটি ছিল তা কলকাতায় ব্যবহার করত ট্রাম-বাসের ভীড় এড়াবার জন্য। দূর মফঃস্বলে সেটি নিয়ে যেতে পারত না বলে ঘড়ি বাঁধা দিয়ে, জিনিসপত্র বাঁধা দিয়ে, এই অপরিচিত বিদেশী স্থানীয় দোকানদারদের কাছ থেকে সাইকেল জোগাড় করত। তারপর, শীত গ্রীষ্ম বর্ষা অগ্রাহ্য করে, গ্রামীণ বন্ধুর পথে বেরিয়ে পড়ত দশ-পনেরো মাইল দূরের মন্দির কভার করতে। বিদেশের কোন ফাউণ্ডেশন, এদেশের কোন সংস্থা—যাঁরা কত ঘোরতর অপাত্রকেও পোষণ করে থাকেন—ডেভিডকে এ বিষয়ে কণামাত্রও সাহায্য করেননি। করলে, তাঁরা গৌরবান্বিত হতেন, জ্ঞান-জগতের উপকার হত, এ দুর্ভাগা দেশও লাভবান হত। কিন্তু গভীর পরিতাপের বিষয় তা হয়নি। তাকে কিন্তু কখনো তার ব্যক্তিগত ক্লেশের দিকটাতে গুরুত্ব আরোপ করতে দেখিনি। দ্রুততর যানবাহনের অভাবে, সীমিত সময়ের মধ্যে, সে যে উত্তরকালের জন্য সর্বাধিকসংখ্যক মন্দিরের বিশদ তথ্য সংগ্রহ করতে পারল না, শুধু এ-ই ছিল তার আক্ষেপ। খ্যাতি, আরাম সব কিছুর মোহ ত্যাগ করে, দূর বিদেশের কৃষ্টিসম্ভার উদ্ধার করবার জন্য কোন বাঙালী বা ভারতীয় এভাবে আত্মোৎসর্গ করেছেন বলে আমার জানা নেই। ডেভিডের অকালমৃত্যু সেজন্য শুধু গভীর শোকাবহই নয়, মর্মান্তিক লজ্জার বিষয়ও বটে।

গত কয়েক বছরে, পশ্চিমবাংলার দূরদূরান্তে অসংখ্য জায়গায় আমরা একত্র গিয়েছি। ডেভিডের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে দৈহিক ক্লেশ, নানারকম বাধাবিপত্তি হাসিমুখে সহ্য করেছি। আমাকে ছাড়া আরও বহু স্থানে সে অবশ্য একলাই গিয়েছে। আজ এই নিশুতি রাতে আমার নির্জন পড়ার ঘরে বসে সেসব যৌথ পর্যটনের কত অজস্র কাহিনী, কত টুকরো টুকরো ঘটনার স্মৃতি মনে পড়ছে। এই সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধে তার কতটুকুই বা বলা যাবে! প্রাক্তন হৃদ্‌রোগী আমি, ডাক্তারের পরামর্শে, পিঠে বালিশ দিয়ে, বিছানায় পা ছড়িয়ে বসেই লেখাপড়া করি। প্লাই-উডের হালকা একটা টেবিল পায়ের উপর আড়া-আড়িভাবে রাখা থাকে। সেই টেবিল ঘেঁষে বিছানার ওপাশে বসে (যেমন সে বরাবরই বসত) গোটা একটা সন্ধ্যা ডেভিড কাটিয়ে গেল মৃত্যুর ঠিক সাত দিন আগে। ওড়িশার অতি দুর্গম অঞ্চলে প্রায় পনের দিনের সফর সেরে সবে ফিরেছে। বললাম—বেশ রোগা হয়ে গেছ ডেভিড; কালোও হয়েছ একটু। অভ্যাসমাফিক এসব ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে বললে—খাওয়াদাওয়ার সামান্য কিছু অসুবিধা হয়েছে আর যানবাহনের অভাবে হাঁটতেও হয়েছে প্রচুর। পরে, তার সঙ্গীদের কাছে এই অভিযাত্রী দলের অবর্ণনীয় দুর্ভোগের কথা শুনেছি। তাঁদের ধারণা, ওড়িশা ও তার অব্যবহিত পূর্বে মধ্যপ্রদেশে ভ্রমণের মাত্রাতিরিক্ত ক্লেশই ডেভিডের মৃত্যুর কারণ হতে পারে। কিন্তু তার মুখ থেকে সেরকম কোন আভাসও পাইনি। তার বদলে শুনলাম, তার রাশি রাশি টাটকা অভিজ্ঞতার কথা। শেষের দিকে বললে—এখনও এত কাজ, এত কভারেজ বাকি পড়ে আছে যে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকরিটা বোধ হয় ছেড়েই দিতে হবে। তারপরে, কোনও পিছুটান না রেখে, একাদিক্রমে যদি দুটো বছর দেশময় ঘুরে বেড়াতে পারি তা হলে সর্বভারতীয় স্থাপত্যভাস্কর্যবিদ্যার প্রস্তুতিটা চলনসইভাবে সম্পূর্ণ হয়। তখন, কেমব্রিজে ফিরে গিয়ে, ভারতীয় ও বাংলা-মন্দিরকলা বিষয়ে সত্যিকারের একটা বড় কাজে হাত দেওয়া যেতে পারে। হায়! আমি স্বপ্নেও ভাবিনি, ডেভিডের শরীর তখনই ভিতরে ভিতরে এত দুর্বল যে তার আয়ু দু' বছর তো দূরের কথা আর এক সপ্তাহেরও বেশী নয়। ভাবলে, সদ্যোমুক্ত বাংলাদেশে বেশ বড়সড় একটা পরিক্রমার প্রস্তাব তুলতেই পারতাম না। পূর্ববঙ্গে ছিলাম সেই একেবারে ছেলেবেলায়। তারপরে আর যাইনি বললেই চলে। ডেভিড বহুবার সেখানে গিয়েছে, রাশি রাশি কভারেজ করে এনেছে। সেসব দেখে নিরুপায় আমি গভীর হতাশায় ম্রিয়মাণ হয়েছি। সেদিন কথাটা তুলতেই ডেভিড লাফিয়ে উঠল। বললে, বাংলাদেশে কত জায়গা এখনও দেখা বাকি—চলো দু'জনে একসঙ্গে বেরিয়ে পড়ি। হায়! তখনো ভাবিনি তার আয়ু মাত্র আর সাত দিন! ভবিষ্যতে কখনো হয়ত যাব বাংলাদেশে। কিন্তু ডেভিড তখন আমার সঙ্গে থাকবে না।

এই সঙ্গে না থাকার কথাটাই আজ বিকেলে ডেভিডের কবরের কাছ থেকে চলে আসবার সময় তীব্র বেদনার সঙ্গে আর একবার মনে পড়েছিল। পুরাতত্ত্বের সন্ধানে আমরা দু'জন কত বার কত সমাধিক্ষেত্রে গিয়েছি। বীরভূমের ইলামবাজার অথবা বাঁকুড়ার হাট-কৃষ্ণনগরে নীলকরদের গোরস্থানে, বহরমপুর-কাশিমবাজারের আশেপাশে আর্মেনীয়, ওলন্দাজ ও ইংরেজদের কবরখানায়, কলকাতার পার্ক স্ট্রীটের সমাধিক্ষেত্রে একত্র গিয়েছি, ছবি তুলেছি, নোট করেছি। তারপর, কাছাকাছি পাশাপাশি থেকে প্রতিবারই ফিরে এসেছি একসঙ্গে। আজ ভবানীপুর সমাধিক্ষেত্র থেকে চলে আসবার সময়, ফুলে ফুলে ঢাকা ডেভিডের কবরটির দিকে তাকিয়ে নিতান্ত অবুঝের মত অনেকক্ষণ অপেক্ষা করেছিলাম। এই প্রথমবার ডেভিড আমার সঙ্গে ফিরে এলো না।



যাত্রাশেষ

পশ্চিমবাংলার দিকে দিগন্তরে পথপরিক্রমার আজ সমাপ্তি; আজ যাত্রাশেষ। ভ্রমণক্লান্ত পান্থের মত দেহে মনে এখন অসীম অবসাদ। নতুন কোন দর্শনীয় স্থান, অভিনব কোন বিষয়বস্তু নিয়ে আজ আর লেখা সম্ভব নয়। এ অক্ষমতা মার্জনীয়।

তার চেয়ে বরং আজ স্মৃতিমন্থন করি। অল্প যা কিছু বলতে পেরেছি, অনেক যা কিছু বলা হয়নি তারই স্মৃতি। মানচিত্রে আয়তন যতই কেননা ক্ষুদ্র হোক, পশ্চিমবাংলার কী বিশাল ব্যাপ্তি আমার মনে, কী সীমাহীন তার ঐতিহ্যের পরিসর আমার কল্পলোকে! সে গভীর অনুভবের কতটুকুই বা প্রকাশ করতে পেরেছি পরিপূর্ণ প্রত্যয়ের সঙ্গে? যে জীবনদাত্রীর দিকে, আমার চিন্তা-ভাবনার যে ধাত্রীর দিকে দেখে দেখে আঁখি ফেরে না, তাঁর উদার মহিমার সামান্য কিছুও কি ব্যক্ত করতে পেরেছি এই দুর্বল লেখাগুলিতে?

সারা পথের ক্লান্তি আর সারা দিনের তৃষায় অবসন্ন পথিকের আজ সাঙ্গতামামির দিন। গভীর রাত্রির এই নীরবতায়, এই সূচীভেদ্য অন্ধকারেও নিজের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আমার কাছে কিন্তু সবই বাঙ্ময়, সবই প্রত্যক্ষ। সেজন্য স্বীকার করতে দ্বিধা নেই যেভাবে যা বলতে চেয়েছিলাম অনেক ক্ষেত্রে তা হয়ত পারিনি। আবার অনেক সময় অনুভূতির তীব্রতাই আমাকে মূক করেছে; ভাবের আধিক্যই হয়েছে ভাবপ্রকাশের অন্তরায়। শুধু একটা বিষয়ে সংশয় নেই—আমার সাধ্য অনুসারে, আমার ক্যামেরা ও কলমের শক্তি অনুসারে, আমি চেষ্টার ত্রুটি করিনি।

এ বই-এর প্রথম লেখার অন্তর্নিহিত সুরটিকেই এ নিবন্ধমালার মূল সুর হিসেবে ধ্বনিত করতে চেয়েছি বরাবর। যাত্রা শুরু করেছিলাম রবীন্দ্রনাথের উদ্ধৃতি দিয়ে—

"দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয়া
ঘর হতে শুধু দুই পা ফেলিয়া
একটি ধানের শিষের উপরে
একটি শিশির বিন্দু॥"

সে উদ্ধৃতির পতাকা উড়িয়ে ঘরকুণো অথবা বিদেশ-বিলাসী বাঙালীকে আহ্বান করেছি তার সোনার বাংলার দিকে মুখ ফেরাতে, তার স্বাধিকারে প্রতিষ্ঠিত হতে। কতখানি সফল হয়েছি তার বিচার পাঠকপাঠিকাদের হাতে ছেড়ে দেওয়াই ভাল। আজ, এ বই-এর সমাপ্তিরেখা টানবার মুহূর্তে, সেসব কল্পিত সহযাত্রীর সান্নিধ্য যেন অনুভব করতে পারছি। এ লেখাগুলির মধ্যে ডুবে গিয়ে আমি যখন ফিরে গিয়েছি গ্রাম-পরিক্রমার পরম রমণীয় দিনগুলিতে তখন আভাসে যেন বুঝেছি তাঁরাও আমার সঙ্গে আছেন,

তাঁরাও আমার অনুগামী।

আর বরাবর সঙ্গে ছিলেন রবীন্দ্রনাথ, জীবনানন্দ দাশ ও বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রথম জনের নৈকট্য শুধু লিখবার সময়ে নয়, তাঁর উপস্থিতি আমার সমস্ত জীবনব্যাপী। তাঁর বিপুল সৃষ্টির মন্দাকিনীধারায় তাবৎ বাঙালী লেখকের মত আমিও আকণ্ঠ নিমজ্জিত। আমাদের প্রকাশ-বেদনাকে তিনি একদিকে যেমন তীব্র করেছেন, অন্যদিকে তেমনি ম্লান মূক মুখগুলিতে প্রকাশের ভাষাও যুগিয়েছেন। তাঁর কাছে আমাদের ঋণের সীমা-পরিসীমা নেই। জীবনানন্দ দাশের দৃষ্টি অনুসরণ করে বারবার বাংলার মুখের দিকে তাকিয়েছি নতুন চেতনায়, নতুন উপলব্ধিতে। তাঁর কাছেই শিখেছি, আটপৌরে বঙ্গজননীর কোলের কাছটিতে বসে কি করে তাঁর ভুবনমোহন রূপের গভীরে অবলীলাক্রমে তলিয়ে যাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথ ও জীবনানন্দ সর্বদা সঙ্গে না থাকলে গ্রাম-পরিক্রমার দীর্ঘ শারীরিক ক্লেশ হাসিমুখে সহ্য করতে পারতাম কিনা সন্দেহ। আর প্রেরণা যুগিয়েছেন বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় যাঁর সঙ্গে অন্তরঙ্গতা, এক অর্থে, আরও গভীর। তিনিই সেই রূপকার যিনি পশ্চিমবাংলার এক বিশেষ অঞ্চলের পল্লীপ্রকৃতির শোভা আমার মুগ্ধ দৃষ্টির সামনে মেলে ধরেছেন, যে অঞ্চলে আমি উত্তীর্ণ হয়েছি কৈশোর থেকে যৌবনে। আমার পিতৃকুলের নিবাস (ছিল) পূর্বঙ্গের বরিশালে আর মাতৃকুলের উত্তরবঙ্গের মালদহে। জন্মসূত্রেই হয়ত বা যাযাবরবৃত্তির ছোঁয়াচ আমায় স্পর্শ করে থাকবে। সেই আমি, জীবনের প্রথম উন্মেষকালে, ঘটনাচক্রে এসে হাজির হয়েছিলাম বিভূতিভূষণের পল্লীপ্রকৃতির মাঝখানে। নদীয়া জেলার সেই ক্ষুদ্র মফস্বল শহরে, ঘেঁটুফুলের গন্ধে আমোদিত মাঠে-প্রান্তরে, চূর্ণী নদীর ধারে ধারে আম-জাম-জামরুলের বাগানে আমার সেই কৈশোর-স্মৃতির অবিস্মরণীয় দিনগুলিকে নানা রঙে রঙিন করেছেন বিভূতিভূষণ। নিতান্ত ব্যক্তিগত সেসব বোবা উপলব্ধিকে আশ্চর্য কুশলতায় বর্ণিত হতে দেখেছি তাঁর লেখনীতে। তখন সেই অবুঝ ছেলেবেলায় মনে হয়েছে, আমার স্তব্ধ অনুভূতিগুলির প্রকাশের জন্যই তিনি যেন কলম ধরেছেন; আমার প্রকৃতিমগ্ন চেতনার বাণীরূপ দিয়ে আমার ব্যর্থ প্রকাশবেদনা থেকে আমাকে উদ্ধার করাই যেন তাঁর ব্রত। কখনও তাঁকে দেখিনি। তবু তাঁকে একেবারে আমার নিজস্ব লেখক বলে বরণ করে নিতে একটুও দ্বিধা হয়নি। তারপরে, সেই অখ্যাত পল্লী-শহরে, কৈশোর থেকে যখন যৌবনে উত্তীর্ণ হলাম, তখনও আমার পাশাপাশি, আমার হৃদয়ের খুব কাছাকাছি, বিভূতিভূষণ। জীবন-জিজ্ঞাসার প্রথম প্রশ্নগুলোর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে, বেদনাদীর্ণ মনের আশ্রয়সন্ধানে বিভূতিভূষণের কাছেই ফিরে গিয়েছি বারংবার। প্রকৃতিপ্রেমের মহৈশ্বর্যে ওষধিসন্ধান করেছি পার্থিব দুঃখ-বেদনার। বিভূতিভূষণের আঁকা নদীয়া জেলার নিসর্গদৃশ্যের সেসব প্রাণজুড়ানো ছবি আজও আমার মনের গভীরে সমুজ্জ্বল।

সেই যে প্রথম যৌবনে পল্লীপ্রকৃতির দিকে, গ্রামের দুঃখী মানুষের দিকে আমার মুখ ফিরিয়ে দিয়েছিলেন বিভূতিভূষণ, তাতে বেঁচে গিয়েছি আমি। চূর্ণী নদীতীরের সে জনপদ ছেড়ে এসেছি বহুকাল। তবু সেখানকার কত শত স্মৃতি, কত অনুভব, কত উপলব্ধি বড় বেদনার মত এখনও মনে বাজে। তারপরে দুর্বার স্রোতে ভেসে গিয়েছি জীবনের ঘাটে ঘাটে, নানা হর্ষবিষাদে, নানান অভিজ্ঞতায়। সেসব অভিজ্ঞতার সবই যে প্রীতিপ্রদ হয়েছে এমন নয়। তবু হৃদয়নন্দনবনের নিভৃত নিকেতনে আচার্যের আসনে মুখ্যত যে তিনজনকে বসিয়েছি তাঁদের পুণ্য আশীর্বাদে উদার দৃষ্টি প্রসারিত করতে পেরেছি অভিনিবেশযোগ্য সব কিছুর দিকে। তাঁদেরই আশীর্বাদে কোথাও আমার হারিয়ে যাবার মানা নেই; কি প্রকৃতিতে, কি মানুষের সমাজে। সেখানেই ঘুরে বেড়িয়েছি

দীর্ঘকাল। আর সে অসীম রূপভাণ্ডার থেকে মণিমুক্তা কুড়িয়ে এনেছি দু'হাত ভরে। তারপরে সময়ের ব্যবধানে, মনের নিভৃতে, সে রত্নরাজির গায়ে নানা রং চড়িয়েছি, নানাভাবে তাদের ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখেছি নিঃসঙ্গ পরিতৃপ্তিতে। রঙের ঔজ্জ্বল্য ম্লান হয়নি এতটুকু। কালের প্রকোপে কোন অংশ অস্পষ্ট হয়ে আসেনি।

আমার সঞ্চয়ে এইগুলিই আসল ছবি; মনের 'ডার্করুমে' পরিবর্ধিত অসংখ্য চিত্রকল্প। তার অল্পই হয়ত পেশ করতে পেরেছি 'দেখা হয় নাই'-এর পাঠকসমাজে। বিকল্পে, 'ফোটোগ্রাফিক ডার্করুমে' প্রস্তুত যে আলোকচিত্রগুলি এ গ্রন্থে মুদ্রিত হয়েছে তা যদি বা কারও প্রশংসা অর্জন করে, আমার কাছে তাদের মূল্য কিন্তু খুব বেশী নয়। কেননা, মনের সৃজনীশক্তির সঙ্গে ক্যামেরার সীমাবদ্ধ চিত্রণক্ষমতার কোন তুলনাই চলে না।

মনের পর্দায় কি করে ছবি ধরা পড়ে, কি করে তা স্থায়ী হয়, দিনে দিনে কি করে তাতে নতুন রঙের প্রলেপ লাগে, সেসব দুরূহ প্রশ্নের সমাধান না করতে পারলেও ছবি ধরে রাখবার আর এক বিজ্ঞানসম্মত উপায়ের—ফোটোগ্রাফীর—নিবিড় চর্চা আমার অবসরের অন্যতম অবলম্বন। সেখানে রাসায়নিক প্রলেপমাখানো পর্দার উপরে ছবি ধরে কি করে তাকে চিত্রায়িত করতে হয় সে বিদ্যার শিক্ষানবিসী করেছি বহুকাল। সেখানে কোন হেঁয়ালি নেই, অজ্ঞেয় রহস্য নেই, নিরুত্তর প্রশ্ন নেই। সব কিছুই সেখানে দৃঢ় কার্যকারণ-সূত্রে বাঁধা। নির্দিষ্ট পরিবেশের মধ্যে প্রবহমান কালের এক ক্ষুদ্র ভগ্নাংশকে হুবহু একইভাবে চিরদিনের মত বন্দী করে রাখবার সে এক অভ্রান্ত উপায়। কিন্তু সময়ের ব্যবধানে, হৃদয়ের উত্তাপে, মনের পর্দায়-ধরা ছবির অবয়বে যে নানা রঙের উন্মোচন হয় তার তুলনা ফোটোগ্রাফীতে কোথায়!

এক-এক সময়ে ভাবি, ফোটোগ্রাফীতে মেতে নিতান্ত মামুলি একটা খেলো নেশার দাসত্ব করছি আমি। বহু পরিশ্রমে, দেশদেশান্তর ঘুরে, যে রাশি রাশি নেগেটিভ সংগ্রহ করে আনি, তাদের মূল্য কতটুকু! অনেক অকিঞ্চিৎকর ঘটনা, অনেক অতি সাধারণ বস্তুর তারা জড় প্রতিকৃতি মাত্র। সৃজনশীলতার দ্যোতনায়, কল্পনার প্রলেপে, নিষ্প্রাণ অস্তিত্ব থেকে উদ্ধার করে তাদের বর্ণসুষমাময় আলেখ্যে পরিণত করবার ক্ষমতা ফোটোগ্রাফীর নেই। আমার সযত্নরক্ষিত নেগেটিভের বাক্সগুলিতে হয়ত নানা রঙের কাহিনীর বীজ বন্দী হয়ে কাঁদে। কিন্তু তাদের সাধ্য নেই পুষ্পিত তরুতে পরিণত হবার। মনের পরতে পরতে বহুদিন আগেকার ছায়া-ফেলা কোন ছবি, নানা রূপে-রসে-রঙে বিকশিত করতে পারে এমন কুশলতা আলোকচিত্রণবিদ্যায় কোথায়! কেননা, আমি যে রঙের কথা বলছি সে তো আর বাজারে-কেনা কেমিকেল রং নয়!

নিজের মন রাঙিয়ে পাঠকের মনেও তা সঞ্চারিত করবার সাধনায়, কলমের দু'চারটি আঁচড়ে অপূর্ব এক-একটি দৃশ্যচিত্র ফোটাবার এই প্রয়াসে, গোটা একটা জীবন দেখতে দেখতে কাটিয়ে দেওয়া যায়। দুরূহ সাধনা সন্দেহ নেই। বাংলাসাহিত্য এখন এত অগ্রসর, পূর্বসূরিদের—বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথের—অজস্র দান এতই উচ্চ মার্গের, যে সে সাধনা আরও কঠিন বই সহজ হয়নি। তবু শক্তি পরীক্ষার ক্ষেত্র এখানেই বিস্তৃত কেননা জীবনে কঠিন জিনিস মাত্রেই সুন্দর। কিন্তু সে যে কত দুঃসাধ্য ব্যাপার তা আমার থেকে বেশী আর কে জানে! সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী জীবিকার জোয়াল কাঁধে নিয়ে লেখা, ফোটোগ্রাফীর চর্চা আর অফুরন্ত গ্রাম-পরিক্রমার কাজ চলতেই থাকবে। আবার কখনও এ ধরনের পুস্তক রচনায় ফিরে আসব কিনা জানি না। যদি আসি, হয়ত আরও একটু বলসঞ্চয় করে ফিরব, আরও অনেক নতুন জিনিস নতুনভাবে পরিবেশন করবার ক্ষমতা নিয়ে। আজ—

"পেয়েছি ছুটি বিদায় দেহ ভাই,
সবারে আমি প্রণাম ক'রে যাই।"

অনুক্রমণিকা

বিষয় পৃষ্ঠা

বিষয়	পৃষ্ঠা

বিষয় পৃষ্ঠা